গৌরাঙ্গ-পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭৫

— দশ টাকা —

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে
শ্রীপরেশচন্দ্র বসু কর্তৃক মুদ্রিত

যাঁর প্রেরণায় এই গ্রন্থের রচনা

সেই

সর্বজনবান্ধব গৌরগতচিত্ত

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষকে

উৎসর্গ

এই লেখকের অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ :

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ)

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)

জগদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

ভক্ত বিবেকানন্দ

রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

গরীয়সী গৌরী

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

উদ্যত খড়্গ (সুভাষচন্দ্রের জীবনী ১ম, ২য় খণ্ড)

ভূমিকা

আমার 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনলীলা ও তার তাৎপর্য ধারাবাহিক ভাবে তিন খণ্ডে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছি, তাতে, সেই পরিধির মধ্যে, তাঁর পরিজনের সকলকে আনার অবকাশ ছিল না। যাঁরা এসেছেন তাঁরাও কাহিনীর প্রবাহে নানা অধ্যায়ে ছড়িয়ে রয়েছেন এবং তাঁদের বৃত্তান্তও সর্বক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। এই গ্রন্থে ১০৮ জন পরিকরের জীবনী আদ্যোপান্ত সুসম্বদ্ধ করে গ্রথিত হল।

আকর গ্রন্থগুলিতে কোনো কোনো তথ্যের ব্যাপারে অসামঞ্জস্য আছে, সেই কারণে আমার গ্রন্থোক্ত কোনো বিবরণে কেউ হয়তো ত্রুটি ধরতে পারেন, কিন্তু আশা করি ভক্তি ও আন্তরিকতার বিচারে সে ত্রুটির মার্জনা হবে।

'আখর জোটন করিতে লিখন
আগে পাছে হয় নাম।
না লইবে দোষ মনের সন্তোষ
বন্দনা আমার কাম॥'

অচিন্ত্যকুমার

পঞ্চতত্ত্ব

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও গদাধর

অষ্ট প্রধান মহান্ত

স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ বসু
মাধব ঘোষ, গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ

ছয় গোস্বামী

সনাতন, রূপ, রঘুনাথদাস, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট

দ্বাদশ গোপাল

অভিরাম ঠাকুর, সুন্দরানন্দ, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত
কমলাকর পিপলাই, উদ্ধারণ দত্ত, মহেশ পণ্ডিত, পুরুষোত্তম দাস
পরমেশ্বরী দাস, কালাকৃষ্ণ দাস, পুরুষোত্তম, হলায়ুধ ঠাকুর

সূচীপত্র

গৌরাঙ্গ
পরিজন

॥ ১ ॥

মাধবেন্দ্রপুরী

মহাপ্রেমনিকেতন মাধবেন্দ্র। ধরা-বাঁধা কোনো বাসস্থান নেই, তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ান। দুধ ছাড়া কিছু খান না, তাও যদি কেউ সেধে দেয়, তা হলেই। নিজে চেয়ে কিছু নেন না, উপোস করে থাকলেও না। সব সময়েই আনন্দে ভরপুর হয়ে আছেন। এ শুধু কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ। কৃষ্ণ যদি অশনে রাখেন, তিনিই রেখেছেন অনশনে। উপবাসও তো কৃষ্ণের কাছে গিয়েই বাস করা।

তীর্থভ্রমণ করতে-করতে গিয়েছেন মথুরায়। এক সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ তাঁকে অতিথিরূপে ঘরে ডেকে এনেছেন। সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে সন্ন্যাসীদের যে কিছু খেতে নেই। ব্রাহ্মণ ফাঁপরে পড়ল, তাহলে কি অতিথি অভুক্ত থাকবে? মাধবেন্দ্র সন্ন্যাসী হলেও কৃষ্ণপ্রেমময়তনু। তাঁর কাছে আবার জাতি-কুলের অভিমান কী। বললেন, দুধ নিয়ে এস, দুধ খাব। আর তোমাকে দিয়ে যাব কৃষ্ণপ্রেমের মন্ত্র।

মাধবেন্দ্র ঈশ্বরপুরীর গুরু। ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। সুতরাং লৌকিক লীলায় মাধবেন্দ্র মহাপ্রভুর গুরুর গুরু পরমগুরু।

মথুরা থেকে এসেছেন বৃন্দাবনে। গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা করে গোবিন্দ-কুণ্ডে স্নান করে গাছের নিচে বসেছেন। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। খাবার দুধ জোটে নি, কৃষ্ণপ্রেমে কীর্তন করে চলেছেন।

একটি রাখাল ছেলে হঠাৎ তাঁর কাছে এসে উপস্থিত। তার হাতে এক ঘটি দুধ।

তুমি এই দুধ খাও। বালক মাধবেন্দ্রের সামনে ঘটি নামিয়ে রাখল।

কে এই বালক? এমন নয়নমনোহর! আর গলার স্বরটিও কী মধুর! দেখেশুনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়—এই বালক কে, কোথায় থাকে, কী করে জানল আমি উপবাসী।

তুমি কে? জিজ্ঞেস করল মাধবেন্দ্র।

আমি এক গয়লার ছেলে, বালক মিঠি-মিঠি হাসে: ছোট্ট গয়লা।

কোথায় থাকো ?

কোথায় আবার থাকব, এই গ্রামেই থাকি।

করো কী ?

যারা কারু কাছে কিছু চায় না, না পেলে অনাহারে থাকে, তাদের আমি খাদ্য জোগাই।

তুমি কী করে জানলে আমি অনাহারে আছি ?

বালক আবার হাসল : কী করে জানলাম ? গ্রামের গোপিনীরা গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করতে এসেছিল। তারা তোমাকে দেখে গেল, দেখেই বুঝে নিল সারা দিন কিচ্ছু খাও নি। তারাই আমাকে দুধ দিয়ে পাঠাল তোমার কাছে।

গোপিনীরাই বা কী করে বুঝল আমার কিছু জোটে নি পানাহার। আর এ ছেলেটা কি তাদের চাকর ? বলামাত্রই ফরমাস খাটতে ছুটেছে ?

তুমি খেয়ে নাও, আমি পরে এসে ঘটি নিয়ে যাব। আমার সময় নেই, আমাকে এখুনি গিয়ে আরো গরু দুইতে হবে।

বলেই বালক ছুট দিল। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাধবেন্দ্র দুধ খেয়ে ঘটি ধুয়ে রাখলেন। কিন্তু কই সেই বালক তো ফিরে এল না। পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে—পথও যা প্রতীক্ষাও তাই।

চোখে ঘুম নেই, সারা রাত বসে নামকীর্তন করতে লাগলেন। শেষ-রাতের দিকে চোখে বুঝি একটু ঘোর লাগল। স্বপ্ন দেখলেন মাধবেন্দ্র।

স্বপ্ন দেখলেন সেই রাখাল-ছেলে এসেছে।

চলো আমার সঙ্গে।

কোথায় ? জিজ্ঞেস করলেন মাধবেন্দ্র।

এসো না আমার সঙ্গে। বলে সেই বালক মাধবেন্দ্রের হাত ধরল।

পথ দেখিয়ে তাঁকে এক লতায়-পাতায় ছাওয়া ছায়াভরা সুন্দর কুঞ্জের মধ্যে নিয়ে এল। বললে, দেখ আমি এই কুঞ্জের মধ্যে কী কষ্টে আছি। আমার মাথার উপরে কোনো আচ্ছাদন নেই, চারপাশে কোনো প্রাচীর নেই। শীতে-গ্রীষ্মে-বৃষ্টিতে আমার দুর্ভোগের একশেষ হচ্ছে।

তোমাকে এখানে আনল কে ? বসাল কে ?

আমি আগে গিরিগোবর্ধনের উপরে মন্দিরের মধ্যে ছিলাম। বললে

বালক, আমার সেবক ম্লেচ্ছের ভয়ে আমাকে এই কুঞ্জে এনে রেখে পালিয়ে গেছে। সে আর এল না। এখন তুমি আমাকে উদ্ধার করো।

তোমাকে গোবর্ধনে কে এনেছিল?

কেউ আনে নি, কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তুমি আমার আমাকে গোবর্ধনে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। সেখানে নতুন করে মন্দির নির্মাণ করে দাও। আমি তো তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি। কবে মাধব আসবে, কবে তার প্রেমে তার সেবা অঙ্গীকার করে নেব।

এ তো গোপালের মূর্তি!

হ্যাঁ, আমিই তো গোপাল! আমিই তো গোবর্ধন ধরেছিলাম। তাই তো গোবর্ধনে আমার অধিকার। তুমি ওঠো, আমাকে গোবর্ধনে রেখে এস।

মাধবেন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল।

এ কী, আমি কৃষ্ণকে দেখলাম অথচ চিনতে পারলাম না! মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন মাধবেন্দ্র।

কিন্তু শুধু কাঁদলেই তো হবে না, কাজ করতে হবে। আজ্ঞা পালন করতে হবে।

প্রাতঃস্নান সেরে মাধবেন্দ্র গ্রামে গেলেন। গ্রামবাসীদের একত্র করে বললেন, তোমাদের এ গ্রামের ঈশ্বর কুঞ্জের মধ্যে লুকিয়ে আছেন, চলো তাঁকে বার করে নিয়ে আসি।'

গ্রামবাসীরা কোদাল-কুড়ুল নিয়ে চলল। কুঞ্জ একেবারে নিবিড় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। লতাপাতা কেটে প্রবেশের পথ তৈরি করে সবাই ভিতরে ঢুকল। দেখল, সত্যিই তো, মূর্তি ঘাসে-মাটিতে ঢাকা পড়ে আছে। এবার তাকে মুক্ত করে বার করে নিয়ে এস, তোলো পাহাড়ের উপর।

ভীষণ ভারি মূর্তি—জোয়ান-জোয়ান পালোয়ান নিয়ে এস। পাথরের সিংহাসন করো। তারপর তোলো গোপালকে, বসাও সিংহাসনে।

যথাদিষ্ট গোপালকে গোবর্ধনে বসান হল।

এবার তবে অভিষেকের আয়োজন করো। বাদ্য-ভেরী নিয়ে এস। নাচ-গানের আসর সাজাও।

গ্রামের ব্রাহ্মণেরা একশো নতুন ঘটে গোবিন্দকুণ্ডের জল নিয়ে এল। মাধবেন্দ্র নিজের হাতে শ্রীঅঙ্গের ধুলো-মাটি ধুয়ে দিলেন। তারপর তেল

দিয়ে শ্রীঅঙ্গকে চকচকে করে তুললেন। পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতে স্নান করালেন, গন্ধোদকে সে স্নানের সমাপ্তি হল। তারপর শ্রীঅঙ্গ মার্জনা করে নববস্ত্র পরালেন। গলায় দুলিয়ে দিলেন চন্দন-তুলসীর মালা, ফুলের মালা। তারপরে ভোগ লাগালেন।

দই দুধ ঘি সন্দেশ—গোপালের জন্যে কত লোক কত কিছু যে নিয়ে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। তার উপরে দশজন ব্রাহ্মণ এসে রাঁধতে লেগেছে। পাঁচ-সাতজন বসেছে রুটি বানাতে। রাশি-রাশি রুটি, স্তূপে-স্তূপে ভাত। নতুন কাপড়ের উপর পলাশের পাতা পেতে তার উপরে রাখছে পাহাড় করে। বিচিত্র স্বাদের বহু তরকারিও রান্না হচ্ছে। মাঠা-মাখন-সর-পিঠে-পায়েসও কত। অনেক ঘট ভরে রাখছে ঠাণ্ডা জল।

গোপালের যে অনেক দিনের খিদে।

মাধবেন্দ্রের কাছে আর লুকোনো যাবে না, সে দেখতে পেল গোপাল সব খেয়ে নিল কিন্তু আবার তারই স্পর্শে অন্ন-ব্যঞ্জন যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল। স্তূপের থেকে একটি কণাও ভ্রষ্ট হল না।

তারপর মাধবেন্দ্র গোপালকে সুবাসিত জলে আচমন দিয়ে পানের খিলি খেতে দিলেন। তারপর আরতি দিয়ে শয়ন দিলেন নতুন খাটে। কাশের বেড়া দিয়ে ঢেকে দিলেন চার পাশ।

তারপর গ্রামের অধিবাসীরা সকলে প্রসাদ পেল।

ব্রজবাসী ব্রাহ্মণদের বিষ্ণুমন্ত্র দিয়ে বৈষ্ণব করলেন মাধবেন্দ্র। তোমরা এবার থেকে আমার গোপালসেবার ভার নাও।

গোপাল প্রকট হল—আশে-পাশে দেশে-দেশে রব উঠল—চলো যাই দেখে আসি, গোপালপ্রীতি তো সকলের সহজপ্রীতি।

এক মহাধনী ক্ষত্রিয় গোপালের মন্দির করে দিল, কেউ করে দিল রান্না ও ভাঁড়ার ঘর। কেউ বা অঙ্গনের প্রাচীর। বাংলা দেশ থেকে দুজন বৈরাগী ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলে তাদের দীক্ষা দিয়ে তাদের হাতে মাধবেন্দ্র মন্দিরের মূল ভার সঁপে দিলেন।

সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

দু বছর পরে গোপাল আবার স্বপ্নে দেখা দিল।

বললে, মাধব, তুমি আমার জন্যে অনেক কিছু করেছ কিন্তু আমার গাত্র-তাপ এখনো গেল না।

কী করলে যাবে? জিজ্ঞেস করলেন মাধবেন্দ্র।

যদি আমার গায়ে মলয়চন্দন মেখে দিতে পারো তবেই আমার জ্বালা

সে চন্দন কোথায় পাওয়া যাবে?

নীলাচলে।

ঘুম থেকে জেগে উঠেই মাধবেন্দ্র চললেন নীলাচলে।

পথিমধ্যে এলেন বাংলা দেশে, শান্তিপুরে, অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে। প্রেমময় মাধবেন্দ্র, তাকে দেখে অদ্বৈত পরমানন্দে বললেন, আমাকে দীক্ষা দিন।

মাধবেন্দ্র দীক্ষা দিলেন অদ্বৈতকে। দীক্ষা দিয়ে চললেন দক্ষিণে।

রেমুনাতে এসে পৌঁছুলেন। রেমুনাতে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত। দর্শন করলেন গোপীনাথ।

সেবক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, গোপীনাথের কী কী ভোগ লাগে আমাকে একটু বলবেন? আমার গোপালকে আমি তেমনি ভোগ লাগাব।

ব্রাহ্মণ সব বিবরণ দিল। সন্ধেয় যে ভোগ লাগে সে হচ্ছে ক্ষীর, তার আরেক নাম অমৃতকেলি। বারোটি মাটির পাত্রে সে ক্ষীর দেওয়া হয় গোপীনাথকে। সে ক্ষীরের স্বাদ অপূর্ব, তার তুলনা হয় মর্ত্যে এমন কিছু নেই, তাই তার নাম অমৃতকেলি।

সন্ধে হয়ে এসেছে, এখুনি ক্ষীরভোগ লাগবে, দেখে যাই না কেমনতরো।

পাত্রে-পাত্রে ক্ষীর আসছে, সেবার কী অপরূপ সৌষ্ঠব! হঠাৎ মাধবেন্দ্রের মনে হল, যদি অল্প একটু প্রসাদ পাই, তাহলে স্বাদ জেনে নিয়ে সেই স্বাদের ক্ষীর তৈরি করে আমার গোপালকে ভোগ লাগাই।

পর মুহূর্তে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন, ছি-ছি, আমি না অযাচক? আমি ক্ষীর খাবার জন্যে লালসা করলাম? এই আমার অযাচিতবৃত্তি? এই আমার আসক্তিশূন্যতা?

আরতির পর গোপীনাথকে প্রণাম করে কাউকে কিছু না বলে চুপিচুপি সরে পড়লেন মাধবেন্দ্র। গ্রামের শূন্য হাটের একটা ঘরে বসে আপন মনে নামকীর্তন করতে লাগলেন।

এদিকে গোপীনাথের পূজারী সেবক গোপীনাথকে শয়ন দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে, স্বপ্নে গোপীনাথ তাকে বললেন, ওঠো, দরজা খোলো। আমি

আমার ধড়ার আঁচলে এক পাত্র ক্ষীর লুকিয়ে রেখেছি। তোমরা আমার মায়ায় তা জানতে পারো নি। তোমরা এগারোখানাকেই বারোখানা করে দেখেছ। যাও ঐ লুকোনো ক্ষীরপাত্র মাধবপুরীকে দিয়ে এস।

মাধবপুরী! সে কোথায়?

দেখবে গ্রামের হাটে শুকনো মুখে বসে আছে।

কোন হাটে কে জানে। পূজারী তাড়াতাড়ি স্নান করে মন্দিরের দরজা খুললে দেখতে পেল, সত্যিই তো, গোপীনাথের ধড়ার আড়ালে একটি ক্ষীরপাত্র লুকোনো রয়েছে।

সেই পাত্র হাতে নিয়ে বেরুল পূজারী। এ-হাট থেকে ও-হাটে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কোথায় মাধবপুরী! কোথায় মাধবেন্দ্র! তোমার জন্যে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছে। এসে দেখে যাও। খেয়ে যাও।

মাধবেন্দ্র আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। বেরিয়ে এসে প্রেমাবেশে কাঁদতে লাগলেন।

ক্ষীরের বৃত্তান্ত সমস্ত তাঁকে বললে পূজারী।

ক্ষীরভাণ্ড মাথায় নিয়ে মাধবেন্দ্র প্রেমবিহ্বল হয়ে গেলেন। পূজারী ভাবল, এই না হলে কৃষ্ণের বশ্যতা। একমাত্র প্রেমভক্তিতেই তো কৃষ্ণ বশীভূত! এমন ভক্তের জন্যে কৃষ্ণ ক্ষীর চুরি করবে এ আর আশ্চর্য কী!

পূজারী মাধবেন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করল।

ক্ষীর আস্বাদ করলেন মাধবেন্দ্র। মৃৎপাত্রকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে বহির্বাসে বেঁধে নিলেন। ভাবলেন, এখান থেকে এখন পালাই। রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই চারদিকে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে, আমার জন্যে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছেন। দলে-দলে লোক আমাকে দেখতে আসবে। আমার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে।

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে গেলেন মাধবেন্দ্র। চললেন নীলাচলের দিকে। পথ হাঁটেন আর প্রতিদিন একখানা করে সেই ক্ষীরপাত্রের ভাঙা টুকরো খান। আর সেই পোড়া মাটির টুকরোতেই গভীর প্রেমাবেশ।

ভক্ত প্রতিষ্ঠা না চাইলেও প্রতিষ্ঠা তার সঙ্গে সঙ্গে চলে। ভক্তই তো কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিষ্ঠা।

আগে গোপীনাথ শুধু গোপীনাথ ছিল, মাধবেন্দ্রের দৌলতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হয়ে গেল।

নীলাচলে এসে মাধবেন্দ্র জগন্নাথের সেবক মহান্তদের বললেন, 'গোপাল চন্দন ভিক্ষা করেছেন। চন্দন কোথায় পাব?'

মহান্তরা বললে রাজকর্মচারীদের। গোপালের ইচ্ছায় এক মণ চন্দন ও বিশ তোলা কর্পূর জোগাড় হল। যোগাড় হল পথের ছাড়পত্র। দুজন ভারবাহীও নিযুক্ত হল। তাদের পথখরচেরও অনটন হল না।

রেমুনা হয়েই ফিরতে হবে, মাধবেন্দ্র দলবল নিয়ে থামলেন রেমুনায়। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, গোপালদেব এসেছেন। বলছেন, মাধব, আমিও যে, গোপীনাথও সেই। আমরা বহুমূর্তিতেই একমূর্তি। তুমি এই চন্দন গোপীনাথের অঙ্গেই লেপন করো, তাতেই আমার দাহ যাবে, আমি শীতল হব!

গোপীনাথের সেবকদের কাছে মাধবেন্দ্র বললেন এ স্বপ্নকাহিনী।

সত্যি? তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কতদূর পথ হেঁটে এসে কত কষ্ট করে এই চন্দন-কর্পূর সংগ্রহ করেছেন মাধবেন্দ্র। পথে কত বিপদ-বাধা কত অনিদ্রা-অনাহার, কিছু গ্রাহ্য করেন নি। গ্রাম্যকথার ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গী পর্যন্ত নেননি। শুধু গোপালের তাপ শীতল করব এই আনন্দে পথ ভেঙেছেন। প্রেমে আবার নিজের ক্লেশ কী, শুধু প্রিয়ের সন্তোষ হবে তাতেই তার অখণ্ড উপশম।

গোপাল ভক্তশ্রম সফল করল। তোমাকে আর চলতে হবে না, বইতে হবে না, উদ্বেগ ভোগ করতে হবে না। গোপীনাথকে দিলেই আমাকে দেওয়া হবে।

সমস্ত গ্রীষ্মকাল প্রত্যহ গোপীনাথকে সেই চন্দন দেওয়া হল। চন্দনের সঙ্গে কর্পূর মেশালে আরো তা ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু কৃষ্ণের আসল উপশম প্রেমে। সেই প্রেমই তো চন্দন। আর অশ্রুই তো কর্পূর। প্রেমের সঙ্গে অশ্রু এসে মিশলেই তো কৃষ্ণের বিশ্রাম।

চন্দন দেওয়া শেষ হলে, গ্রীষ্মের অবসানে, মাধবেন্দ্র ফিরলেন নীলাচলে।

আবার সেখান থেকে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে এসে শুধু তাঁর এক আর্তি! 'কৃষ্ণ পেলাম না, মথুরা পেলাম না।

তাঁর শিষ্য রামচন্দ্রপুরী তাঁকে উপদেশ দিতে চাইলেন: 'তুমিই তো পূর্ণব্রহ্ম, তোমার আবার কান্না কিসের ?

দূর হ ! মাধবেন্দ্র তিরস্কার করে উঠলেন : তুই আমাকে মুখ দেখাবিনে, তুই আমায় অসদ্গতি ঘটাবি। কৃষ্ণ পেলাম না বলে আমি নিজের দুঃখে কাঁদছি আর তুই আমাকে ব্রহ্ম শোনাচ্ছিস ? দূর হয়ে যা।

শিষ্য ঈশ্বরপুরীর অন্য ভাব। তিনি গুরুকে নিরন্তর কৃষ্ণকথা শোনাচ্ছেন, শোনাচ্ছেন কৃষ্ণশ্লোক, কৃষ্ণলীলা। শোনাতে-শোনাতে তিনিও প্রেমের সাগর হয়ে উঠেছেন।

তুষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্র ঈশ্বরপুরীকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, কৃষ্ণ তোমার প্রেমধন হোক। তারপর নিজেই শ্লোক পড়লেন: অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যমে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করম্যোহম॥ হে দীনদয়ার্দ্র নাথ, হে মথুরানাথ, কবে আমি তোমার দর্শন পাব ? হে দয়িত, তোমার অদর্শনে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছে, আমি কী করব বলে দাও।

শ্লোক বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তর্ধান করলেন।

ভক্তিকল্পতরুর অঙ্কুর এই মাধবেন্দ্র। এই অঙ্কুরের পুষ্টি ঈশ্বরপুরীতে। আর সেই বৃক্ষই শ্রীচৈতন্য।

॥ ২ ॥

ঈশ্বরপুরী

আজকের হালিশহর গ্রামের পুরোনো নাম কুমারহট্ট। এই গ্রামের বাসিন্দে শ্যামসুন্দর আচার্য। তাঁর ছেলেই ঈশ্বরপুরী।

কী করে কে জানে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। আর তখুনি তিনি দীক্ষা নিলেন সন্ন্যাসে।

ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর মাধবেন্দ্র আর সেই অঙ্কুরের পুষ্টি হল ঈশ্বরে।

দীক্ষা নেবার পর থেকে ঈশ্বর মাধবেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে। ঈশ্বরের

আর কাজ কী—শুধু গুরুসেবা, গুরু-শুশ্রূষা। গুরুপ্রসাদের পথ দিয়েই ভগবানের করুণা।

ঈশ্বর গুরুর দেহপরিচর্যা তো করছেনই, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথাও শোনাচ্ছেন গুরুকে। তাঁর শরীরে যত প্রেম ছিল মাধবেন্দ্র তা পরিপূর্ণ করে দিয়ে দিলেন ঈশ্বরকে। 'যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে। সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বপুরীরে।' প্রেমের সাগর করে তুললেন। বললেন, কৃষ্ণ তোমার প্রেমধন হোক।

মাধবেন্দ্র তিরোহিত হলে ঈশ্বরপুরী বেরিয়ে পড়লেন। ইতি-উতি ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে-ঘুরতে চলে এলেন নবদ্বীপ। নবদ্বীপ তখন ধন-পুত্র-রসে মত্ত, কৃষ্ণ বা কীর্তন শুনলেই পরিহাস করে ওঠে। বিদ্যার অভিমানে ভক্তিকে হেয় করে। শুধু ক্রোধ-অবতার অদ্বৈত আচার্যই হুঙ্কার করে বলছেন, দাঁড়াও, কৃষ্ণকে সকলের চোখের কাছে এনে ধরব। তখন দেখবে কী হয়, কে কী করে!

সেই নিতাই-গৌর-আনা অদ্বৈতের ঘরে ঈশ্বরপুরী একদিন অলক্ষিতে এসে উপস্থিত হলেন।

চারদিকে ভক্ত-শিষ্য নিয়ে শান্তিপুরে নিজের গৃহে বসে আছেন অদ্বৈত, কৃষ্ণকথা বলছেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী এসে ভিড়ের একপাশে সংকুচিত হয়ে বসে পড়লেন।

এ কে সন্ন্যাসী? শীর্ণকায় দীনবেশ অথচ উজ্জ্বলকান্তি, কে এ আগন্তুক! হঠাৎ অযাচিত এসে পড়ে কৃষ্ণকথার মাঝখানে বসে পড়েছে, কে এ নিরভিমান!

জিজ্ঞেস করতে পারি আপনি কে? অদ্বৈত সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করলেন।

ঈশ্বরপুরী বললেন, আমি কেউ নই। আমি শুধু আপনার চরণ দর্শন করতে এসেছি।

অদ্বৈত মুকুন্দকে কৃষ্ণলীলার শ্লোক পড়তে বললেন।

মুকুন্দ পড়তে লাগল।

আর শোনামাত্রই ঈশ্বরপুরী কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। যত পড়া উচ্চতর হয় তত প্রেমাশ্রু উদ্বেলতর হয়ে ওঠে।

যে বিত্তবানের ঘরে জন্মায় তারই মধ্যে বৈভবের প্রকাশ ঘটে। এ সাধু কোন প্রেমধনীর উত্তরাধিকারী? পরম প্রেমের ভাণ্ডারী তো একমাত্র মাধবেন্দ্র। সুতরাং ঐ সাধু মাধবেন্দ্রেরই বংশধর।

সবাই তখন চিনতে পারল ঈশ্বরপুরীকে।

টোল থেকে ছাত্র পড়িয়ে ফিরছে নিমাই, পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা।

সন্ন্যাসীকে দেখে নিমাই নমস্কার করল।

এ সুন্দর পুরুষটি কে, ঈশ্বরপুরী অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন। শুধু সুন্দর নয়, গম্ভীর, সর্ব-লক্ষণ-গুণধর।

তুমি কে? কোথায় থাকো? কী পুঁথি পড়াও? ঈশ্বরপুরী জিজ্ঞেস করলেন নিমাইকে।

নিমাইয়ের সঙ্গের ছেলেরা অবাক হল। এ লোকটা দেশবিশ্রুত নিমাই পণ্ডিতকে চেনে না?

ইনি নিমাই পণ্ডিত। কে একজন বললে সগর্বে।

তুমিই সেই? ঈশ্বরপুরী আনন্দ করে উঠলেন।

আমাদের বাড়ি চলুন। নিমাই সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করল।

চলো।

নিমাই ঈশ্বরপুরীকে সমাদর করে বাড়িতে নিয়ে গেল। শচীমাতা কৃষ্ণনৈবেদ্য রান্না করে দিলেন। ভিক্ষাশেষে বিষ্ণুঘরে বসে কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন। তাঁর কৃষ্ণপ্রেম দেখে সবাই সন্তুষ্ট হল। নিমাইয়েরও মন্দ লাগল না।

সেখান থেকে ঈশ্বরপুরী চলে গেলেন গোপীনাথ আচার্যের ঘরে। সেখানে থেকে গেলেন এক মাস।

সেখানে, গোপীনাথের ঘরে, বহু লোক জমায়েত হয়। চলো সন্ন্যাসীকে দেখে আসি। এদিকে সন্ন্যাসী অথচ কৃষ্ণের জন্যে কাঁদে।

টোলে পড়ানো সাঙ্গ করে নিমাইও রোজ সন্ধ্যাবেলা আসে, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে চলে যায়।

ঈশ্বরপুরী এত জানেন অথচ এটুকু জানেন না যাকে তিনি খুঁজছেন, যার জন্যে তিনি কাঁদছেন, সেই এসেছে তাঁকে প্রণাম করতে।

'কৃষ্ণলীলামৃত' বলে একখানা পুঁথি লিখেছেন ঈশ্বর। ভক্ত গদাধর রোজ সন্ধ্যায় সে পুঁথি সকলকে পড়িয়ে শোনায়।

একদিন নিমাইকে ধরলেন ঈশ্বর। বললেন, আমি কৃষ্ণচরিত নিয়ে একখানা পুঁথি লিখেছি, তুমি দয়া করে একটু দেখে দাও, কোথায় কী দোষ-ত্রুটি হয়েছে সংশোধন করে নিই।

নিমাই স্মিতমুখে বললে, ভক্তের কৃষ্ণবর্ণনায় কোনো দোষ হয় না। ভক্তের যেমনতরোই কবিত্ব হোক না কেন, উত্তম মধ্যম আর অধম, কৃষ্ণ সমান সুখী।

মূর্খে বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥

কথাটা হচ্ছে বিষ্ণবে নমঃ, বিষ্ণায় নমঃ নয়। বিষ্ণায় ভুল, বিষ্ণবে শুদ্ধ। যে মূর্খ সে বিষ্ণায় বলছে আর যে পণ্ডিত সে ঠিক বিষ্ণবে বলছে। কিন্তু কৃষ্ণ ভুল-শুদ্ধ দুটোই নিচ্ছে। কৃষ্ণ ভাষা দেখে না, ভাব দেখে। পোশাক দেখে না পদবী দেখে না, হৃদয় দেখে। দেখে অনুরাগ আছে কিনা, আন্তরিকতা আছে কিনা। অনুরাগ আর আন্তরিকতা থাকলেই কৃষ্ণ মহাআনন্দিত। ভাব পেলে তিনি আর ব্যাকরণ খোঁজেন না।

তবু যদি ব্যাকরণে দোষ থাকে তাই বা শুদ্ধ করে দেব না কেন? ভাবও আছে, ব্যাকরণও শুদ্ধ, তবেই তো সোনায় সোহাগা। ভক্ত ভালো, বিদ্বান ভক্ত আরো ভালো। যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

ঈশ্বরপুরী বললেন, তবু যদি কোথাও কোনো দোষ থাকে, তুমি দেখে দাও। তুমি দেখে দিলে তোমার কোনো দোষ হবে না।

নিমাই তাই প্রত্যহ এসে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সেই পুঁথির বিচার করে।

একদিন একটা ক্রিয়া-পদের ধাতুরূপ নিয়ে কথা উঠল।

নিমাই ঈশ্বরের ভুল ধরল। বললে, এ আত্মনেপদী নয়, এ ধাতু পরস্মৈপদী।

বলে নিমাই বাড়ি চলে গেল।

পুঙ্খানুপুঙ্খ করে বিচার করলেন ঈশ্বরপুরী। দেখলেন আত্মনেপদীই ঠিক।

পরদিন নিমাই এলে বললেন, তুমি কাল যে পরস্মৈপদী বলে গেলে সেটা ভুল, আত্মনেপদীই শুদ্ধ।

নিমাই আর কিছু বলল না, তর্কে প্রবৃত্ত হল না। ভগবান চিরকাল ভক্তকেই জয়ী করে থাকেন। ভক্তের বিজয়বর্ধনই কৃষ্ণের স্বভাব।

কিন্তু ঐ বিচারের মধ্যে আর কোনো বক্তব্য কি প্রচ্ছন্ন ছিল না?

অর্থাৎ আত্মপদে থেকো না, পর-পদে চলে এস। অহংকার ছেড়ে চলে এস ভক্তিতে, শরণাগতিতে।

ঈশ্বরপুরী আবার নবদ্বীপ ছাড়লেন। বেরুলেন পর্যটনে।

পিতার পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে নিমাই গয়ায় এসেছে। গয়ার মহিমাবর্ণন শুনতে-শুনতে জেগেছে প্রেমাবেশ। আর বিষ্ণুর চরণ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে মহাভাব। একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে। দেখা দিয়েছে স্বেদ-অশ্রু-কম্প-পুলক। নর্তনে-কীর্তনে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। আর এ অশ্রুধারা যেন অবিচ্ছিন্ন গঙ্গাধারা।

কী আশ্চর্য, সেই সময়ে গয়ায় ঈশ্বরপুরী এসে উপস্থিত।

যেন দৈবযোগ।

নিমাই ঈশ্বরপুরীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, আমার গয়ায় আসা সফল হল। বিষ্ণুপাদপদ্মে যার নামে পিণ্ড দেওয়া শুধু সেই উদ্ধার পাবে কিন্তু আপনাকে দর্শন করলে কোটি পিতৃপুরুষের মুক্তি। আপনিই মঙ্গলপ্রধান, সকল তীর্থের পরম তীর্থ, আমাকে এই সংসারসমুদ্র থেকে রক্ষা করুন। আমাকে কৃষ্ণপ্রেমরস পান করতে দিন।

ঈশ্বরপুরী বললেন, তুমি যে ঈশ্বর-অংশ তাতে আর সন্দেহ নেই। এই অপরূপ রূপ অপার্থিব চরিত্র আর অলৌকিক বিদ্যা আর-কিছুতে সম্ভব নয়। কাল রাতে নিদ্রাঘোরে আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম আজ গয়ায় এসে তারই সাক্ষাৎ ফললাভ করলাম। যেদিন নবদ্বীপে প্রথম তোমাকে দেখি সেদিন থেকে তুমি ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারছি না। কৃষ্ণদর্শনের সুখ একমাত্র তোমাকে দেখেই।

আমার কী ভাগ্য! নিমাই নির্মল নয়নে হাসল।

তীর্থশ্রাদ্ধ শেষ হবার পর বাসায় এসে নিমাই রান্না করতে বসেছে, কৃষ্ণনাম বলতে-বলতে ঈশ্বরপুরী এসে হাজির।

ভালো সময়েই এসেছি যা হোক। বললেন ঈশ্বপুরী।

নিমাই বললে, আমার কী ভাগ্য! এই অন্নই আজ ভিক্ষা করুন।

তা হলে তুমি খাবে কী?

আমি আবার রান্না করে নেব।

না, আর বৃথা রান্না করতে হবে না। আমরা এই অন্নই ভাগ করে নিই এস।

আপনি কোনো সংকোচ করবেন না। এ অন্ন কটি আপনিই ভিক্ষা করুন। আমার রান্না এখুনিই হয়ে যাবে।

সমস্ত অন্ন ঈশ্বরপুরীকে পরিবেশন করে দিল। ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনো কিছুতে মতি নেই বলেই তাঁর প্রতি এত করুণা।

ঈশ্বরপুরীকে খাইয়ে নিজে রান্না করে খেয়ে নিল নিমাই।

তারপর একদিন ঈশ্বরপুরীর কাছে গিয়ে নিমাই বললে, আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিন।

শুধু মন্ত্র কেন, তুমি আমার কাছে যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দেব—এমন কি প্রাণ পর্যন্ত।

নিমাইকে দশাক্ষর মন্ত্রের দীক্ষা দিলেন ঈশ্বর।

নিমাই ঈশ্বরকে প্রদক্ষিণ করে বললে, আজ থেকে আপনার পায়ে আমার দেহ বিকিয়ে গেল। আমার বলতে আমার আর কিছুই রইল না। আমার মন বুদ্ধি অহংকার—সমস্ত, সমস্ত আপনার। আপনি আমাকে কৃপা করে এমন শক্তি দিন যাতে আমি নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসতে পারি।

নিমাইকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন ঈশ্বর। দুজনেই কাঁদতে লাগলেন।

গয়ায় আর কতদিন থাকবে নিমাই। তার আত্মপ্রকাশের সময় হয়ে এসেছে।

ঈশ্বরপুরীর থেকে বিদায় নিয়ে নিমাই গৃহে ফিরল।

মাধবেন্দ্রের তিরোধানের পর ঈশ্বরপুরী আর বেশি দিন মর্তকায়ায় থাকলেন না। নির্বাণের সময় কাছে ছিল গোবিন্দদাস আর কাশীশ্বর গোসাঁই, তাদের বললেন, নীলাচলে চলে যাও, সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সেবা করো। গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণই কলিকালে জীবনিস্তারের জন্যে নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সম্প্রতি নীলাচলে আছেন, তাঁরই চরণে গিয়ে শরণ নাও।

গোবিন্দ আর কাশীশ্বর গুরুবাক্য শিরোধার্য করে নীলাচলে চলে এল। গোবিন্দ আগে, কাশীশ্বর কদিন পরে। সার্বভৌমের সঙ্গে বসে কৃষ্ণকথায় মেতে আছেন মহাপ্রভু, গোবিন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য, আমার নাম গোবিন্দ, তাঁরই আদেশে আপনার কাছে এসেছি, আমাকে আপনার চাকর করে নিন।

ঈশ্বরপুরী লীলাসংবরণের সময় কী বলে গেছেন তাও বললে।

মহাপ্রভু গুরুবাক্যের মর্যাদা দিলেন, সেবকরূপে গ্রহণ করলেন গোবিন্দকে। মহাপ্রভুর চরণসেবাই গোবিন্দের প্রত্যহের নিয়মসেবা হল।

পরে কাশীশ্বর এলে তাকেও রাখলেন। তার কাজ হল প্রভুকে রোজ জগন্নাথ দর্শনে সাহায্য করা।

নীলাচল থেকে গৌড়ে আসছেন গৌরহরি। নৌকা করে পৌঁছুলেন পানিহাটি। রাঘব পণ্ডিত তাঁকে বহুমানে তার বাড়িতে নিয়ে এল। সেখানে একদিন থেকে মহাপ্রভু চললেন শান্তিপুর। সহসা পথের মাঝখানে মনে পড়ে গেল কুমারহট্টের কথা, তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান যে কুমারহট্ট।

চলো তাঁর জন্মভিটা দেখে আসি।

প্রভু বোলে, কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে-গ্রামে অবতার ॥
প্রভু বোলে, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ ॥

জন্মভিটাতে পেঁাছে অবোধ বালকের মত কাঁদতে লাগলেন গৌরাঙ্গ। সহচর ভক্তেরাও কাঁদতে লাগল। চলল কীর্তন-ক্রন্দন, প্রেমবিলাসধূলিতে ধূসর হয়ে গেল সকলে।

নাও, নাও এ স্থানের মাটি নিয়ে চলো। বললেন গৌরহরি, এর মত পবিত্র এর মত মূল্যবান আর কী আছে? কয়েক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে গৌরহরি বাঁধলেন বহির্বাসে।

অনুগামী পার্ষদেরাও ঝুলি বোঝাই করে মাটি নিতে লাগল।

দেখতে দেখতে শত শত গ্রামবাসী ভক্তও দু-হাতে করে তুলতে লাগল মাটির পিণ্ড।

দেখতে দেখতে ছোটখাটো একটি ডোবা তৈরি হয়ে গেল।

তার নামই চৈতন্যডোবা।

পার্ষদমণ্ডলী সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু কুণ্ড পরিক্রমা শুরু করলেন। প্রভুর নয়ন থেকে নেমে এল অশ্রুগঙ্গা।

প্রেমজলে সে ডোবা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

গুরুকে কী ভাবে ভালবাসতে হয়, কী করে তাঁকে সম্মান দিতে হয় আর গুরুবিরহসন্তাপ কী নিদারুণ তারই জলন্ত নিদর্শন এই সুশীতল গৌরকুণ্ড।

॥ ৩ ॥

অদ্বৈত আচার্য

'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।'

শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে অদ্বৈতের জন্ম, বাবার নাম কুবের পণ্ডিত, মার নাম নাভা দেবী। পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। লাউড়ে বাড়ি বলে সবাই 'নাড়াবুড়া' বলে ডাকে। গৌরাঙ্গ ডাকে শুধু নাড়া।

গৌরাঙ্গের জন্মকালে অদ্বৈতের বয়স প্রায় বাহান্ন।

কুবের আচার্য রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত। আগে-আগে হিন্দু রাজাদের খাস পরিচারকদের মাথা ন্যাড়া থাকত। সেই থেকে সমস্ত প্রিয় পার্শ্বচরদের নাম হয়ে গিয়েছিল 'নাড়া'। সেই অর্থেও অদ্বৈতকে নাড়া ডাকা অসম্ভব নয়।

হাতেখড়ির পর কমলাক্ষ পাঠশালায় ভর্তি হল। সেখানে সহপাঠী পেল স্বয়ং রাজপুত্রকে। রাজপুত্র হলে কী হবে, বেচারা কমলাক্ষের দৌরাত্ম্যে একেবারে জবুথবু। তবু কমলাক্ষ এমন মধুর যে তাকে না ভালোবেসে তার উপায় নেই।

রাজকুমার কমলাক্ষকে তাদের বাড়িতেও নিয়ে যায়।

রাজা দিব্যসিংহ জিজ্ঞেস করেন, ও কে?

রাজকুমার বলে, আমার সেথো। পাঠসঙ্গী।

রাজা আরো পরিচয় পায়। তারই সভাপণ্ডিতের ছেলে। বালককে দেখে কী রকম মুগ্ধ হয়ে যায় রাজা। তাই ধরে, ক্রমে-ক্রমে, শক্তি-উপাসক দিব্যসিংহ বিষ্ণু-উপাসক হয়ে ওঠে। সবাই বলে, অদ্বৈতের প্রভাব।

কমলাক্ষের বয়েস প্রায় বারো, কুবেরপণ্ডিত সপরিবারে শান্তিপুরে চলে আসে। শান্তিপুরে এসে ফুল্লবাটি গ্রামের শান্তনু আচার্যের কাছে কমলাক্ষ শাস্ত্র পড়তে শুরু করে। কিছুকালের মধ্যেই বেদবিৎ মহাপণ্ডিত হয়ে ওঠে। শান্তনুর ভাষায়, বেদপঞ্চানন। তখন রাঢ়ের শ্যামাদাস পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী বলে প্রখ্যাত। তার সঙ্গে কমলাক্ষের তর্কযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে হেরে যায় শ্যামাদাস। হেরে গিয়ে বিনত শ্যামাদাস বিদ্বিষ্ট না হয়ে উলটে কমলাক্ষের শিষ্যত্ব নেয়। আর সেই থেকে কমলাক্ষের নাম হয়ে যায় অদ্বৈত।

বাবা-মা মারা গেলে অদ্বৈত গয়ায় যায় পিণ্ড দিতে। সেখানেই তার মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে দেখা। এ বুঝি মহাকালের নির্দেশ। এই মহৎ সাক্ষাৎই ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মপ্রচারের ভবিষ্যৎ ভূমিকা।

পরে নীলাচলে যাবার পথে শান্তিপুরে এলেন মাধবেন্দ্র। মাধবেন্দ্রের প্রেমাবেশ দেখে অদ্বৈতের আনন্দ আর ধরে না। বললে, আমাকে দীক্ষা দিন।

মাধবেন্দ্র দীক্ষা দিলেন।

গয়া থেকে কাশী গেল অদ্বৈত। সেখানে সন্ন্যাসী বিজয়পুরীর সঙ্গে দেখা। বিজয়পুরীও পরে চলে এল শান্তিপুর। অদ্বৈতকে ভাগবত পড়ে শোনাল।

অদ্বৈত জিজ্ঞেস করলে, একটি বালককে দেখতে যাবে ?

কোথায় ?

নবদ্বীপে।

কে সে বালক ?

আহা, একবারটি গিয়ে দেখে এস না।

বালক গৌরাঙ্গকে দেখতে বিজয়পুরী নবদ্বীপ গেল।

কাশী থেকে মথুরা এসে পরিক্রমা শুরু করল অদ্বৈত। পরিক্রমা করতে-করতে পেয়ে গেল একটি কৃষ্ণবিগ্রহ। মদনমোহন। একটা বটগাছের নিচে অভিষেক করে তাকে স্থাপন করল। যতদিন আছি ব্রজধামে নিত্য এর সেবা করব। কিন্তু তারপর—তারপর কী হবে ?

মথুরার দামোদর চোবে ও তার স্ত্রী বল্লভা এসে ধরল অদ্বৈতকে। এ বিগ্রহ আমাদের দিয়ে দিন। একে আমরা ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা-পূজা করি।

ঘরের আচ্ছাদনে যেতে বুঝি ইচ্ছে হয়েছে বিগ্রহের। অদ্বৈত দিয়ে দিল।

কিন্তু আমি ? আমি কী নিয়ে থাকি ?

বিশাখা-অঙ্কিত কৃষ্ণের চিত্রপট পেয়ে গেল অদ্বৈত। তাই নিয়ে সে ফিরল শান্তিপুরে।

দীক্ষা দেবার পর মাধবেন্দ্র দেখল সেই কৃষ্ণপট। বললে, আরেকজন কই ?

আরেকজন !

হ্যাঁ, আরেকজন। আরেকজনকেই চাই। বলে মাধবেন্দ্র রাধিকার একটি চিত্রপট এঁকে উপহার দিলেন অদ্বৈতকে। বললেন, যুগল মূর্তির আরাধনা করো।

যুগল মূর্তি! সেই দুই কি এক হয়ে উঠবে না?

একদিন লাউড় থেকে দিব্যসিংহ এসে হাজির। মুখে অবিরল কৃষ্ণনাম, বলা যায় কৃষ্ণানুরাগের নামমূর্তি। বললে, গঙ্গাতীরে নিরালায় কুটির নির্মাণ করে অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণনাম জপ করতে এসেছি। একবার দেখে যাই তোমাকে।

এ কি দিব্যসিংহ? না কি কৃষ্ণদাস?

অদ্বৈত আনন্দিত অন্তরে বললে, তুমি কৃষ্ণদাস তোমার নাম কৃষ্ণদাস রাখলাম। যে কৃষ্ণদাস সেই হয়তো দিব্যসিংহ।

কৃষ্ণদাস ফুল্লবাটিতে কুটির তৈরি করে কৃষ্ণনাম জপ করতে বসল।

হরিদাস এসে মিলল অদ্বৈতের সঙ্গে। বুঢ়ন গ্রাম থেকে প্রথম এল ফুলিয়ায়, পরে শান্তিপুরে।

'হেনকালে তথায় আইল হরিদাস।
শ্রদ্ধা বিষ্ণুভক্তি যার বিগ্রহে প্রকাশ॥'

অদ্বৈত তার পিতৃশ্রাদ্ধে হরিদাসকে নিমন্ত্রণ করে বসল।

আত্মীয়-কুটুম্বেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল, এ তুমি করেছ কী? হরিদাস যে যবন।

হরিদাস কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণদাস। দিনে তিন লক্ষ অভঙ্গ হরিনাম করে। সে বেদবিৎ ব্রাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

আত্মীয়-কুটুম্বেরা অদ্বৈতের ঘরে পাত পাড়ল না। অনেক বিনয়ের পর 'সিধে' নিতে রাজি হল। তাই দাও, যে যার বাড়িতে রান্না করে নেব। তোমার গৃহে অন্ন গ্রহণ করতে পারব না।

নিমন্ত্রিতেরা চলে গেল সিধে নিয়ে। গৃহের অন্ন পড়ে রইল। সবান্ধবে উপোস করে রইল অদ্বৈত।

তারপরে নামল বৃষ্টি, মুষলবর্ষণ। তার ফলে গ্রামের সমস্ত আগুন নিবে গেল। আগুনের অভাবে ব্রাহ্মণের দল চোখে অন্ধকার দেখল। পরদিন তারা অদ্বৈতের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হল, কাতর মুখে বললে, আমাদের কালকের বাসি অন্নই খেতে দাও।

খাওয়াবার পর অদ্বৈত তাদেরকে হরিদাসের গোঁফাতে, মাটির নিচেকার ঘরে নিয়ে গেল। সবাই দেখল সেই অঝোর বর্ষণেও হরিদাসের মৃৎপাত্রে জলন্ত আগুন।

শত দুঃখদৈন্য ক্লেশকষ্টের মধ্যেও হরিদাসের অন্তরে জলন্ত ভক্তি।

সবাই বুঝল তখন অদ্বৈতের মহিমা।

অদ্বৈত ও হরিদাসের মিলনে বিরাট শক্তির বিস্ফোরণ ঘটল, ভেসে গেল জাতিকুলের বেষ্টনী। ভক্তির জগতে মানুষে-মানুষে ব্যবধান রইল না।

কিন্তু সংসারাসক্ত মানুষ যে বহুমুখী হয়ে রয়েছে। যেন পেঁচা তার কোটরের মধ্যে চোখ বুজে বসে আছে, এমন স্বচ্ছ দিনের আলো, তাই দেখতে পাচ্ছে না। চারদিকে শুধু অনাচার আর অভক্তি, শুধু কৃত্রিম অনুষ্ঠানের বাহুল্য। উপায় কী? জগৎ তৃপ্ত হবে কিসে? কিসে তার দাহ যাবে, ঘোর কাটবে?

যদি কৃষ্ণ আরেকবার আসত। যদি ঢালত তার প্রেমভক্তির ধারাজল। সেই আসারেই তবে জগতের আসান হত।

অদ্বৈত গঙ্গাজল আর তুলসী দিয়ে কৃষ্ণের পূজা করে আর প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে ডাকে, তুমি এস, তুমি অবতীর্ণ হও। তুমি যদি ভক্তির বিস্তার করো তা হলেই মানুষের নিস্তার হবে।

অদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কারেই গৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

নবদ্বীপে টোল খুলেছে অদ্বৈত।

শুভদিনে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রকট হল গৌরহরি। অদ্বৈত তার স্ত্রী সীতাদেবীকে বললে, একদিন গিয়ে শিশুটিকে দেখে এস।

সীতা গেল শচীগৃহে। ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করল। যাতে অপদেবতার দৃষ্টি না পড়ে, তেতো লাগে, তাই তার নাম রাখল নিমাই।

ভালো নাম হল বিশ্বম্ভর। প্রেমে সমস্ত বিশ্ব ভরে দেবে বলেই ঐ নাম। সমস্ত দেখে-শুনে অদ্বৈতের বুঝতে বাকি রইল না এই সেই পরিত্রাতা, যার জন্যে তার এত প্রতীক্ষা, এত গর্জন-ক্রন্দন। 'মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।' কিন্তু প্রভু নিজে না ঘোষণা করলে নিঃসংশয় হই কী করে?

বড় ভাই বিশ্বরূপের সঙ্গে বিশ্বম্ভর মাঝে-মাঝে আসে অদ্বৈতমন্দিরে। বিশ্বরূপ আসে শাস্ত্র শিখতে আর বিশ্বম্ভর আসে দেখা দিতে।

সংসারে বিরক্ত হয়ে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। শচীমাতার মনে হল অদ্বৈতই তাকে সংসার ছাড়তে পরামর্শ দিয়েছে। কে জানে নিমাইকেও না সেই পথের পথিক করে। অদ্বৈতের প্রতি শচীমাতা অপ্রসন্ন হয়ে রইল।

গয়া থেকে ফিরে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হল গৌরাঙ্গ। রামাই-পণ্ডিতকে বললে, রামাই, অদ্বৈতকে গিয়ে খবর দাও। বলো যাকে সে চেয়েছিল সে এসেছে। সে যেন পূজার সজ্জা নিয়ে সস্ত্রীক চলে আসে।

অদ্বৈত রামাইকে বললে, দাঁড়াও, ঠাকুরের ঠাকুরালি দেখি। আমি নন্দন আচার্যের ঘরে লুকিয়ে থাকব, আর তুমি গিয়ে প্রভুকে বলো অদ্বৈত এল না।

রামাই তেমনি বললে প্রভুকে। তারও ভাবখানা, দেখি না কাণ্ডটা কী দাঁড়ায়।

অন্তর্যামী প্রভু নির্বিকার মুখে বললেন, যাও নন্দন আচার্যের বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে এস।

রামাই তখুনি ছুটল নন্দন আচার্যের বাড়ি। অদ্বৈতকে বললে, চলুন, ধরা পড়ে গেছেন।

অদ্বৈত ভাবল, কে ধরা পড়ল!

শ্রীবাসের ঘরে গিয়ে দেখল বিষ্ণুখট্টায় বসে আছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। নিত্যানন্দ ছাতা ধরে আছে, গদাধর তাম্বুল জোগাচ্ছে, সর্বপ্রাণনাথ বলে ভক্তেরা স্তুতি করছে। অদ্বৈত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গৌরাঙ্গ তার মাথার উপর পা রাখলেন। নিজের গলার মালা অদ্বৈতের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, নাড়া, বর চাও, বর নাও।

অদ্বৈত বললে, তোমাকে দেখলাম, তোমাকে পেলাম এতেই তো আমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হল। এর বাইরে আবার বর কী।

তোমার জন্যেই তো আমি গোচর হলাম। বললেন গৌরহরি, আর ভক্তি বিলোবার জন্যেই আমার সব-কিছু।

তাহলে তেমন ভক্তি দাও যাতে ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে কোলাকুলি করে।

> অদ্বৈত বোলেন, যদি ভক্তি বিলাইবা।
> স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
> বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
> তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে-যে জানে বাধে॥
> সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
> চণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গায়্যা॥

গৌরাঙ্গে অদ্বৈতের প্রভুবুদ্ধি—এই তো স্বাভাবিক, কিন্তু, না, অদ্বৈতে গৌরাঙ্গের গুরুবুদ্ধি। লৌকিক লীলায় মাধবেন্দ্র গৌরাঙ্গের গুরুর গুরু, আর

অদ্বৈত সেই মাধবেন্দ্রের শিষ্য। সুতরাং অদ্বৈত গৌরাঙ্গের গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই। সেই অর্থে অদ্বৈত নিশ্চয়ই গৌরাঙ্গের প্রণম্য। গৌরাঙ্গ তাই অকুণ্ঠে প্রণাম করে অদ্বৈতকে।

কিন্তু এটা অদ্বৈতের মনঃপূত নয়। তার কাছে গৌরাঙ্গ হচ্ছে কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণদাস হবার আনন্দ কোটি ব্রহ্মসুখের চেয়েও বেশি। সুতরাং তার ভৃত্য হওয়াতেই তৃপ্তি, পদতলে প্রণামে ধূলিধূসর হতে।

বড় সাধ হল প্রভু তাকে শাস্তি দেয়। শাস্তি পেলেই তো বুঝতে পারে সে দীনহীন, সে নিকৃষ্ট, সে অবজ্ঞেয়। সে ভৃত্যমাত্র।

কিন্তু কী করে প্রভুর আক্রোশকে সে ডেকে আনবে?

অদ্বৈত শিষ্যদের সামনে যোগবাশিষ্ঠ পড়াতে বসল। ভক্তির উপরে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করল। বলল, জ্ঞান বিনে ভক্তির শক্তি কোথায়? ভক্তি হচ্ছে দর্পণ, জ্ঞান হচ্ছে চোখ। যার চোখই নেই তার দর্পণে কাজ কী?

গৌরাঙ্গের কানে খবর গিয়ে পৌঁছুল। এই কথা? ভক্তির চেয়ে জ্ঞানকে বড় করেছে? অসারকেই সারভূত বলে প্রচার করেছে? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রভু ছুটলেন শান্তিপুর।

অদ্বৈত টের পেল মহারুদ্র আসছেন তাকে শাসন করতে। আমি তো তাই চাই। তাঁর হাতের শাসন-পীড়নই তো আমার ঘনিষ্ঠ আনন্দ।

গৌরাঙ্গকে আরো বেশি করে খেলাবার জন্যে ঘরের পিঁড়ার উপর বসে অধিকতর উৎসাহে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগল।

গৌরাঙ্গ গর্জন করে উঠলেন: নাড়া, বলো জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে কে বড়ো?

এ কে না জানে? নিশ্চিন্তমুখে বললে অদ্বৈত, সর্বকালে জ্ঞানই বড়ো। যার জ্ঞান নেই তার শুধু ভক্তি দিয়ে কী হবে?

ভক্তি দিয়ে কী হবে! 'ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন।' পিঁড়া হতে অদ্বৈতকে ধরে টেনে এনে উঠোনে ফেলে দুই হাতে তাকে প্রবল কিল-চড় মারতে লাগলেন গৌরাঙ্গ। যত মার খায় ততই সুখ পায় অদ্বৈত। বোঝে, এই তো ঠাকুর, এই তো ঠাকুরের ঠাকুরালি।

শাস্তিবিধানের পর গৌরাঙ্গ তাকে ছেড়ে দিলে অদ্বৈত মহানন্দে নাচতে লাগল। জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি বড়ো, ভক্তি বড়ো—ভক্তি দিয়েই সব কিছু হবে—ভক্ত্যা সর্বং ভবিষ্যতি।

মহাপ্রকাশের দিনে সকলকে প্রেম দিলেন মহাপ্রভু, শুধু শচীমাতাকে দিলেন না।

সে কী, শচীমাতার কী অপরাধ?

শচীমাতা বৈষ্ণবাপরাধ করেছে। অদ্বৈতের প্রতি অপ্রসাদ পোষণ করেছে।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বড় ছেলে সন্ন্যাসী হবার পর ছোট ছেলেও বুঝি সন্ন্যাসী হয়—এর জন্যে অদ্বৈতের উপর দোষরোপ করেছে। সেই অপরাধের শাস্তি এই প্রেম-না-পাওয়া।

শিক্ষাগুরু ভগবান জননীকেও শাস্তি দিলেন।

এখন উপায়? এই অপরাধের খণ্ডন হবে কী করে?

একটিমাত্র প্রণামে। একটুমাত্র ক্ষমায়।

শচীমাতা অদ্বৈতকে প্রণাম করতে গেল। অদ্বৈত পদধূলি দিতে রাজি হল না। কী করে আমি মা-যশোদাকে পদধূলি দিই? শচীমাতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে-করতে আবেশে অদ্বৈত মূর্ছিত হয়ে পড়ল আর সেই সুযোগে তাকে প্রণাম করল শচীমাতা। প্রণামই সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষমাকে আবাহন করে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের খণ্ডন হয়ে গেল। শচীমাতার শরীরে জাগল প্রেমবিকার।

কাজীদমনের দিন যখন কীর্তনে বেরোলেন গৌরাঙ্গ, দলের প্রথমে রাখলেন হরিদাসকে, মধ্যে অদ্বৈতকে আর শেষে নিত্যানন্দকে। এ যেন কাজীকে সম্বোধন করে বলা—দেখ ভক্তিধর্মের মহিমা, যাতে জাতি-কুলের বিচার নেই, যাতে মুসলমানও ব্রাহ্মণের চেয়ে অধিকতর গৌরবের অধিকারী হতে পারে। আর সবার নিচে, সবার পিছে সর্বহারাদের মাঝে আমরা দুই ভাই, গৌর-নিতাই।

কাটোয়ায় গিয়ে সন্ন্যাস নিলেন গৌরাঙ্গ। বৃন্দাবনের উদ্দেশে ছুটতে লাগলেন উন্মত্ত হয়ে, কোথায় বৃন্দাবন, কোথায় যমুনা। পথ ভুলিয়ে নিত্যানন্দ তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে এল, বললে, এই যমুনা। যমুনা-ভ্রমে গঙ্গাতেই অবগাহন করলেন গৌরাঙ্গ। মনে পড়ল এক কৌপীন পরেই তিনি গৃহত্যাগ করেছেন, এখন স্নানান্তে দ্বিতীয় কৌপীন পাবেন কোথায়?

তাকিয়ে দেখলেন গঙ্গাতীরে কৌপীন ও বহির্বাস নিয়ে অদ্বৈত দাঁড়িয়ে আছে।

এ কী, তাঁর বৃন্দাবনে আসার খবর অদ্বৈত জানল কী করে ?

মুহূর্তে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল গৌরাঙ্গের। তবে এ বৃন্দাবন নয়, এ আমি যমুনায় স্নান করিনি !

অদ্বৈত বললে, তোমার পাদপূত সমস্ত স্থানই বৃন্দাবন। আর যেখানে তুমি স্নান করবে তাই যমুনা। গঙ্গা আর যমুনা এক ধারা—একাকারা।

নৌকো করে গৌরাঙ্গকে নিয়ে এল তার বাড়িতে। যত্ন করে খাওয়াল। দু-তিন দিন ধরে রাখল, সেবা করার সুযোগ নিল। নৃত্য-কীর্তন দেখাল। তারপর নীলাচলের পথে রওনা করিয়ে দিল।

পথে কে গৌরাঙ্গের দেখাশোনা করবে ? অদ্বৈতই সঙ্গী নির্বাচন করে দিল। নিত্যানন্দ জগদানন্দ, দামোদর আর মুকুন্দ। কেন, আমিও যাই না সঙ্গী হয়ে! নদীয়ার চাঁদের হাট ভেঙে গেলে আমি এখানে কী নিয়ে থাকব ?

প্রভু তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি যদি ব্যগ্র হও তাহলে আর-সকলকে, আমার মাকে কে প্রবোধ দেবে ?

অদ্বৈতকে আলিঙ্গনে নিবৃত্ত করে ফিরিয়ে দিলেন গৌরাঙ্গ।

তারপর প্রায় তিন বছর পরে যখন শুনল মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা করে নীলাচলে ফিরেছেন তখন অদ্বৈত নিজেই চলল নীলাচল।

মান্যপাত্র সর্বশিরোধার্য অদ্বৈতকে মহাপ্রভু সম্বর্ধনা করলেন। বললেন, তোমার আগমনে আমি এতদিনে পরিপূর্ণ হলাম।

সংকীর্তনে মূল-গায়ন ও প্রধান নর্তকের পদে অদ্বৈত নির্বাচিত হল। নরেন্দ্র-জলকেলি গুণ্ডিচা-মার্জন, উদ্যান-ভোজন, রথাগ্র-নর্তন সর্বব্যাপারে অদ্বৈতই অগ্রগণ্য। অদ্বৈতই মহাপ্রভুর কাছে, 'আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু।'

সেই অদ্বৈতই একদিন ফুল আর তুলসী দিয়ে মহাপ্রভুর পূজা করতে বসল।

আমি দাস আমি ঈশ্বর নই—প্রভুর এই কথা আর মানতে রাজি নয় অদ্বৈত। কিন্তু প্রভুও ছেড়ে দিলেন না, পূজাপাত্র থেকে ফুল-তুলসী নিয়ে তিনিও অদ্বৈতের পূজা করলেন। 'যোঽসি সোঽসি, নমোঽস্তুতে।' তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার। নমস্কারের উত্তরে নমস্কার। 'এই মত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।' শিব রামকে নমস্কার করছে, রাম শিবকে।

আজ শুধু চৈতন্যের গান হবে, ভক্তদের বললে অদ্বৈত। 'আজ আর কোনো অবতার গাওয়া নাই। সর্ব অবতারময় চৈতন্য গোঁসাই।'

সেই থেকে চৈতন্যলীলাগানের আরম্ভ।

ফিরে যাবার সময় প্রভু বললেন, আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দান করো।

কিন্তু প্রতি বৎসর নীলাচলে আমি আসব তোমাকে দেখতে। অদ্বৈতের এই অনুরোধে সম্মতি দিলেন প্রভু।

সেবার নীলাচলে কী বৃষ্টি! প্রতিবারই নানারকম শাকের ব্যঞ্জন তৈরি করে প্রভুকে খাওয়ায় অদ্বৈত। প্রভুকে তো একা নিমন্ত্রণ করা যায় না, তাঁর স্বগণদেরও বলতে হয়। কিন্তু সেবার প্রভুর একাকী খেতে ইচ্ছে হল। অনেকের সঙ্গে এলে তাঁকে অল্প খেয়ে উঠে পড়তে হয়, তেমন করে পেট ভরে না।

সেবারও যথারীতি সদলবলে ডাকা হয়েছে প্রভুকে। সীতাদেবী জোগান দিয়েছে আর সমস্ত একা রান্না করেছে অদ্বৈত। প্রভু একা এসে সমস্ত গ্রহণ করুন এ বুঝি অদ্বৈতেরও গোপন অভিলাষ। সন্ন্যাসীগোষ্ঠি নিয়ে এলে অল্প একটু মুখে তুলেই তিনি উঠে পড়বেন।

ছুটে এল নিদারুণ প্রভঞ্জন। নামল তুমুল শিলাবৃষ্টি। সন্ন্যাসীগোষ্ঠিদের সাধ্য কী বাড়ি থেকে বেরোয়, খেতে আসে। ঝড়ে-অন্ধকারে পথঘাট সব মুছে গিয়েছে।

মুখে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ—শুধু একা প্রভু এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, কী রান্না করেছ, সব নিয়ে এস, আর যদি কেউ না আসে আমি একা খাব। কিছুই বেশি হতে দেব না।

কিছুই বেশি হবে না, কমও পড়বে না। সর্বত্র সেই একেশ্বরেরই জয় হোক।

বল্লভ ভট্ট তর্ক তুলল। কৃষ্ণই যদি পরম গতি, একমাত্র পুরুষ, তবে জীব-প্রকৃতি তাঁর স্ত্রী। পতিব্রতা স্ত্রী কি কখনো স্বামীর নাম উচ্চারণ করে? তবে তোমরা কৃষ্ণনাম বলছ কী করে? এ তোমাদের কি রকম ধর্ম?

অদ্বৈতকে লক্ষ্য করে বললে বল্লভ। অদ্বৈত বললে, পরমপতি প্রভুকে জিজ্ঞেস করো।

শ্রীচৈতন্য নিজের থেকেই বললেন, বল্লভ, তুমি ধর্মের মর্ম জান না, তাই তোমার এই উদ্ভট প্রশ্ন। স্বামীর আজ্ঞাপালন করাই স্ত্রীর ধর্ম। স্বামীর নাম

নেবার জন্যে স্বামীই স্ত্রীকে আদেশ করেছেন, স্ত্রী যদি পতিব্রতা হয় তাহলে স্বামীর সে-আদেশ সে অমান্য করে কী করে? অতএব যাও, তুমিও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। নাম করতে-করতেই প্রেমের দেখা পেয়ে যাবে। আর তোমার প্রশ্ন থাকবে না, তর্ক থাকবে না।

নীলাচলে যাবার পথে জগদানন্দ এসেছে শান্তিপুর। অদ্বৈতকে জিজ্ঞেস করল, প্রভুকে কিছু বলবার আছে?

অদ্বৈত বললে, তুমি সেই বাউলকে বোলো, সকলে বাউল হয়ে গিয়েছে, হাটে আর চাল বিকোচ্ছে না। কী করে বিকোবে? কেউই যে আর আউল নেই, কারুরই আর ব্যস্ততা নেই, সবাই চুপচাপ বসে আছে।

যদি জিজ্ঞেস করেন একথা কে বলেছে? জিজ্ঞেস করল জগদানন্দ।

অদ্বৈত বললে, বোলো যে বলেছে সেও এক বাউল।

বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল॥

কলিহত জীবকে কৃষ্ণনাম দেবার জন্যে তোমাকে আহ্বান করেছিলাম। তুমি এসেছ, নির্বিচারে আপামর কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছ। কৃষ্ণপ্রেম পায়নি এমন লোক আর নেই সংসারে! যাদের উপর বিতরণের ভার ছিল তাদেরও কাজ ফুরিয়েছে। এবার তবে হাট গুটিয়ে ফেল।

মহাপ্রভু বুঝলেন, অদ্বৈত তাঁকে অন্তর্ধান করবার ইঙ্গিত পাঠিয়েছে।

তথাস্তু। তাই হোক। বলে তিনি চুপ করে গেলেন।

॥ ৪ ॥

নিত্যানন্দ

বীরভূমের একচক্রা গ্রামে হাড়াই ওঝার বাড়ি। থানা মৌড়েশ্বর, মল্লারপুর স্টেশন থেকে মাইল সাতেক হবে। হাড়াই ওঝাকে কেউ-কেউ হাড়াই পণ্ডিতও বলে। ভালো নাম মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হল।

একচক্রা থেকে কিছু দূরে মৌড়েশ্বর শিবের মন্দির। হাড়াই আর পদ্মাবতী দুজনেই মৌড়েশ্বর শিবের পূজো করে। দুজনেই শিবভক্ত। দুজনেই শর্বানন্দ।

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে হাড়াইয়ের ঘরে পদ্মাবতীর কোল আলো করে নিত্যানন্দের আবির্ভাব হল।

নাম রাখা হল কুবের। হাড়াই পণ্ডিতের ছেলে কুবের পণ্ডিত।

ছেলেবেলা হতেই নিত্যানন্দের অদ্ভুত খেলা। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ খেলা। পুতনা-বধ শকট-ভঞ্জন, কালীয়দমন, অঘাসুর-বধ, বকাসুর-বধ—এই সব খেলাকেই সে ভালোবাসে। একদিন দিব্যি অক্রুর সেজে এল কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যেতে। এই দেখ কংসের ধনুর্যজ্ঞে কেমন ধনুক ভাঙছে, কেমন দুই মল্লপ্রধান চানুর আর মুষ্টিককে ঘায়েল করছে—আবার এই দেখ কৃষ্ণের মথুরাযাত্রা দেখে গোপীভাবে কাঁদছে আকুল হয়ে।

বাবা-মা ভীষণ ভয় পায়। এইটুকু শিশু, এত সব কৃষ্ণলীলা কী করে জানল?

পাড়ার আর সব ছেলেদেরও দেখ। তারাও নিত্যানন্দ ছাড়া আর কারু সঙ্গে খেলবে না। আমাদের নিতাইয়ের যখন কৃষ্ণলীলার খেলা ছাড়া আর কিছুতে মন নেই, আমাদেরও ঐ খেলাতেই আনন্দ।

নিতাইয়ের বয়স যখন বারো তখন নবদ্বীপে সন্ধ্যায় গৌরচন্দ্রের উদয় হল। একচক্রা থেকে গর্জন করে উঠল নিতাই।

এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এ কিসের শব্দ? কোথাও বাজ পড়ল বোধহয়। না কি মৌড়েশ্বর শিব প্রলয়-বিষাণে হুঙ্কার ছাড়লেন?

নিত্যানন্দকে কেউ চিনতে পারল না।

সেই থেকে নিত্যানন্দের মন কেমন উড়ু-উড়ু। ঘরের বন্ধন কেটে কোথাও

চলে যাবার জন্যে ছটফট করছে। বাবা-মা বোঝেন নিতাই আর ঘরে থাকতে চাইছে না, কিন্তু কোথায় যাবে সে, কিসের আবিষ্কারে, কিসের আকর্ষণে? যতই নিতাই চাঞ্চল্য দেখায় ততই হাডাই তাকে আঁকড়ে ধরে। 'ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে। ননীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে॥'

হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী এসে হাড়াই পণ্ডিতের আতিথ্য নিলে।

আমার কী ভাগ্য! আমার গৃহে আপনি ভিক্ষে করুন। হাড়াই আনন্দিত চিত্তে সংবর্ধনা করল।

সারা রাত কৃষ্ণপ্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করল দুজনে।

ভোর হলে সন্ন্যাসী যখন বিদায় নিয়ে যাবে তখন হাড়াইকে বললে, আমার একটি ভিক্ষে আছে।

বলুন। আপনাকে আমার অদেয় কিছু নেই।

আমি তীর্থপর্যটনে যাচ্ছি। বললে সন্ন্যাসী, আমার সঙ্গে কোনো ব্রাহ্মণ নেই। আপনার বড় ছেলেটিকে দিন, আমার সে সঙ্গী হবে।

নিত্যানন্দ—নিতাইকে দেব? হাড়াইয়ের বুকে যেন শেল বিঁধল।

অল্প কদিনের জন্যে দিন। দিন কয়েক ঘুরে আবার সে ফিরে আসবে।

হাড়াই বলতে গেল পদ্মাবতীকে। অঞ্চলের গ্রন্থি খুলে নিতাই-নিধিকে ছেড়ে দিতে পারবে?

পদ্মাবতী বললে, তুমি পারলে আমিও পারব।

স্বামীকে মনে করিয়ে দিল বিয়ের পর নারায়ণ সাক্ষী করে তারা কী প্রতিজ্ঞা করেছিল? প্রতিজ্ঞা করেছিল অতিথিকে কখনো বিমুখ করব না। আজ বুঝি সেই প্রতিজ্ঞার পরীক্ষা নিচ্ছেন নারায়ণ।

নিত্যানন্দের হাত ধরে সন্ন্যাসী পথে বেরিয়ে পড়ল।

কে এ সন্ন্যাসী?

এ সেই বিশ্বরূপ, নিমাইয়ের দাদা। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস নাম শ্রীশঙ্করারণ্য পুরী। মাধবেন্দ্র পুরীর যে গুরু লক্ষ্মীপতি পুরী তার কাছ থেকেই বিশ্বরূপের দীক্ষা।

আসলে বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের অভিন্নস্বরূপ বলরাম।

গৃহত্যাগ করে প্রথমেই নিতাই বক্রেশ্বর গেল। সেখান থেকে বৈদ্যনাথ। তারপর গয়া হয়ে কাশী, শিব-রাজধানী, 'যেথা ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী।' সেখান থেকে প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন হয়ে হস্তিনাপুর। তারপর প্রভাস

দ্বারকা গোমতী গণ্ডকী হয়ে, মহেন্দ্র পর্বত অতিক্রম করে হরিদ্বার। সেখান থেকে যাত্রা করল দক্ষিণে, দ্রাবিড়ে, একেবারে কন্যকানগর বা কন্যাকুমারী পর্যন্ত। বেশবাস অবধূতের মত কিন্তু কৃষ্ণাবেশে বশীভূত। সন্ন্যাসী তো রুক্ষ-রুষ্ট নয় কেন, এ যে তরলায়িত, এ যে ভাববিহ্বল! 'নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ। ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রস॥'

দাক্ষিণাত্যে পাণ্ডুরপুরে এসে থামল শঙ্করারণ্য। নিত্যানন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে তার সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

নিত্যানন্দ সহস্রতেজা সূর্যের মত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

একা-একা ফিরতে লাগল নিত্যানন্দ। নাম নিল অবধূত।

হঠাৎ মাধবেন্দ্রের সঙ্গে দেখা। ভক্তিরসের আদি সূত্রধার মাধবেন্দ্র, অহর্নিশ যে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, মেঘ দেখলেই যে কৃষ্ণবিরহে কেঁদে ওঠে।

মাধবেন্দ্র বললে, কী বলছেন? আপনিই তো প্রকট প্রেমমূর্তি। আপনাকে পেয়েই তো অনুভব করছি আমার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা আছে।

কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? জিজ্ঞেস করল নিত্যানন্দ। যেখানে যাই সেখানে দেখি কৃষ্ণের আসন আচ্ছাদিত। তিনি কোথায় গেলেন?

তিনি নদীয়ায় গিয়েছেন। নাম নিয়েছেন নিমাই। তাঁর সংকীর্তন-লীলা আরম্ভ হতে আর দেরি নেই।

তা কি আর নিত্যানন্দ জানে না? যখন মহাপ্রকাশ হবে তখন ঠিক তার পাশে গিয়ে দাঁড়াব। আমিই তো তার কীর্তন-লীলার প্রধান সহচর।

মাধবেন্দ্র গেল সরযুদর্শনে, নিত্যানন্দ সেতুবন্ধে। সেখান থেকে ঘুরতে-ঘুরতে নীলাচল। নীলাচল থেকে গঙ্গাসাগর। তারপর আবার ফিরল মথুরায়। 'নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি। কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি॥'

গয়া থেকে ফিরে নবদ্বীপে গৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ করেছে। শুরু করেছে নাম-লীলা। বিলিয়ে দিচ্ছে প্রেমধন। এবার তবে যেতে হয়, জুটতে হয় ভাইয়ের সঙ্গে।

জানো কাল রাতে আমি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখেছি। বললে নিমাই, দেখলাম এক তালধ্বজ রথ আমার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেই রথ থেকে রজতপর্বতের মত এক বিশালবাহু মহাপুরুষ নেমে এল। তার পরনে নীল রঙের কাপড়, মাথায়ও ঐ রঙের পাগড়ি, ডান কাঁধে স্তম্ভ, বাম

হাতে বেত-বাঁধা কানা কলসী, বাঁ-হাতে কুণ্ডল—যেন সাক্ষাৎ হলধর। আমার দিকে তাকিয়ে বারে-বারে বললে, এ বাড়ি কি নিমাই পণ্ডিতের? আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? উত্তর হল, আজ নয়, কাল পরিচয় পাবে। আমার মনে হচ্ছে নবদ্বীপে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, শ্রীবাস আর হরিদাস, তোমরা যাও, খোঁজ নিয়ে এস, কে এল, কোথায় এল?

অনেক ঘোরাঘুরি করে ফিরল দুজনে। বললে, ঘরে-ঘরে খোঁজ নিয়ে এলাম, কোথাও কেউ আসে নি।

নিমাই বললে, চলো, আমি দেখি গে।

সটান নন্দন আচার্যের বাড়িতে এসে হাজির হল।

দেখল নিত্যানন্দ অবধূতবেশে বসে আছে। স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিল ঠিক তেমনটি। 'ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়।'

ধ্যানের বস্তু সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এক পলকে চিনল নিত্যানন্দ। এ যে তার সেই 'আপন ঈশ্বর', আপন-বান্ধব।

নিমাই শ্রীবাসকে বললে, ভাগবতের শ্লোক পড়ো।

কৃষ্ণরূপ বর্ণনার শ্লোক পড়ল শ্রীবাস। শ্লোক শুনতেই নিত্যানন্দের প্রেমাবেশ হল, নিমাইয়ের বাহুবন্ধনে ধরা দিল নিমেষে। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, 'তুই সেই কানাই না রে? কিন্তু তোর চুড়ো আর বাঁশি কই?'

নিমাইও অস্ফুট উত্তর দিল: ব্রজের খেলা দৌড়োদৌড়ি, নদের খেলা গড়াগড়ি। ব্রজের খেলা বাঁশির কান, নদের খেলা হরি-গান। ব্রজের বেশ ধড়াচূড়া, নদের বেশ কৌপীন পরা।

পরে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলে, আগামীকাল গুরুপূর্ণিমা, আপনি কোথায় ব্যাসপূজা করবেন?

নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই বামনার ঘরেই পূজা করব।

শ্রীবাসের মহা আনন্দ, স্বচক্ষে নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা দেখবে।

শ্রীবাসের ঘরে রাত কাটাল নিত্যানন্দ। অর্ধরাতে হঠাৎ সে হুঙ্কার করে উঠল। কী ব্যাপার? নিত্যানন্দ তার দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে ফেলেছে।

এ কী দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙলেন কেন? শ্রীবাস আর্তনাদ করে উঠল।

আর কী হবে দণ্ড-কমণ্ডলু দিয়ে? যাকে পাবার জন্যে ওদের সম্বল করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি তাকে পাবার পর ওদের আর আমার কী দরকার? কেন আর অনর্থক এই বোঝা বওয়া?

শ্রীবাস নিমাইকে খবর দিতে ছুটল।

নিমাই এসে নিত্যানন্দকে বললে, চলো গঙ্গাস্নান করে আসি।

সকলকে নিয়ে গঙ্গায় চলল নিমাই। নিত্যানন্দের দণ্ড-কমণ্ডলু গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল।

নিত্যানন্দের যেন জীবনের প্রতিও আর মমতা নেই। সে জলে নেমে কুমির দেখে তাকে ধরবার জন্যে সাঁতার দিল। সকলে হায়-হায় করে উঠল। নিমাই শাসনের সুরে বললে, উঠে এস। তোমাকে আজ ব্যাসপূজা করতে হবে না?

আদেশ শুনে নিত্যানন্দ উঠে পড়ল।

নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, আচার্য শ্রীবাস। পূজা-অন্তে শ্রীবাস নিত্যানন্দের হাতে এক গাছি ফুলের মালা দিয়ে বললে, স্বহস্তে এই মাল্য ব্যাসদেবের আসনে দিন, এই পূজার বিধি।

নিত্যানন্দ মালা হাতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, মালা দেবার গলা কই?

এ কী, মালা দিন আসনে। মন্ত্র বলুন।

নিতাই নিস্পন্দ, নীরব।

শ্রীবাস-অঙ্গনের অন্যপ্রান্তে বসে কীর্তন করছিল নিমাই। তার কাছে খবর গেল, নিত্যানন্দ পূজা সাঙ্গ করছে না, মালা হাতে কেবল এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আপনি আসুন।

নিমাই এসে হাঁক দিল, ব্যাসকে মালা দাও।

আনন্দে মত্ত হল নিত্যানন্দ। হাতের মালা গৌরসুন্দরের গলায় দুলিয়ে দিল। গৌরসুন্দর ষড়ভুজ মূর্তি ধরলেন।

> শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম শ্রীহল মুষল।
> দেখিয়া মূর্ছিত হৈল নিতাই বিহ্বল॥

নিত্যানন্দ শ্রীবাসের ঘরেই থেকে গেল। সদানন্দ বাল্যভাব। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনীর সে শিশুপুত্র। মালিনী তাকে কাছে বসিয়ে না খাওয়ালে তার খাওয়া হয় না—'আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।' তার যত বালক-চাপল্য—সমস্ত স্নেহচক্ষে ক্ষমা করে মালিনী।

শ্রীবাসকে পরীক্ষা করতে চাইল নিমাই। বললে, তুমি যে অবধূতকে এক নাগাড়ে তোমার ঘরে রাখছ এটা কি ঠিক হচ্ছে?

শ্রীবাস নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। নিমাই কী বলতে চাইছে বুঝে উঠতে পারল না।

এই অবধূতের কোন জাত কোন কুল কিছুই জান না। একে নিরন্তর ঘরে রাখা উচিত হচ্ছে না। তোমার নিজের জাতকুলের জন্যে যদি কিছু মায়া থাকে তবে অবধূতকে বিদায় করো।

শ্রীবাস হেসে ফেলল। বললে, তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ। এ তোমার উচিত নয়। নিত্যানন্দ যদি মদিরা ও যবনীতেও আসক্ত হয় আর তার জন্যে যদি আমার ধন-প্রাণ কুল-মান যায় তবু তার প্রতি আমার বিশ্বাস অটল থাকবে।

সত্যি? আমার নিতাইয়ের উপর তোমার এত বিশ্বাস? নিমাই শ্রীবাসকে বুকে জড়িয়ে ধরল: তোমাকে বর দিচ্ছি লক্ষ্মী যদি নগরে নগরে ভিক্ষে করেও বেড়ায় তবু তোমার ঘরে দারিদ্র্য হবে না। আমার নিতাইচাঁদকে তোমার হাতেই সমর্পণ করলাম।

নদীয়ার পথে-পথে ঘুরে বেড়ায় নিত্যানন্দ। বালকদের সঙ্গে খেলা করে। কখনো এর-ওর বাড়ি ঢুকে পড়ে, কখনো বা শচীমাতার অঙ্গনে। শচীমাতাকে দেখলেই প্রণাম করতে হাত বাড়ায়। শচীমাতা হেসে পালিয়ে যান কিন্তু মনের মধ্যে পুরোনো স্নেহ উথলে ওঠে। মনে প্রশ্ন জাগে, এ কি তবে আমার বিশ্বরূপ?

একদিন পালিয়ে না গিয়ে নিতাইয়ের হাত দুটো ধরে ফেললেন শচীমাতা। জিজ্ঞেস করলেন, বল তুই কে? তুই কি আমার বিশ্বরূপ?

হ্যাঁ, মা, আমি বিশ্বরূপ। নিতাই বললে, একথা যেন কাউকে প্রকাশ কোরো না।

আমার বাড়িতে আজ তোমার ভিক্ষা। মা ডেকে পাঠিয়েছেন। নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করল নিমাই। বললে, কিন্তু অনুরোধ করছি, চঞ্চলতা করবে না।

আমি বুঝি চঞ্চল? তুমি নিজে যেমন তেমনি সবাইকে দেখ। নিত্যানন্দ হাসল।

নিমাই নিতাই দু ভাই পাশাপাশি খেতে বসল। সেই ভাব, সেই স্বভাব, সেই সমস্ত।

সন্দেহ নেই, এরাই ওরা, ওরাই এরা। যেন কৌশল্যার ঘরে রাম-লক্ষ্মণ। যশোদার ঘরে কৃষ্ণ-বলরাম।

পরিবেশন করতে-করতে শচীমাতা দেখলেন দুটি পাঁচ বছরের উলঙ্গ শিশু পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। নিমাই কালো নিতাই ফর্সা। কিন্তু দুজনেই চতুর্ভুজ। নিমাইয়ের হাতে শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম আর নিতাইয়ের হাতে শঙ্খ-চক্র হল-মুষল। হাতের থালা খসে পড়ল, শচীমাতা ভূমিতলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

কী হল, কী হল, উঠে পড়ল দু ভাই। মায়ের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনল।

শচীমাতা উঠে বসে কাঁদতে লাগলেন। নিত্যানন্দকে বললেন, তুমি তোমার ছোট ভাই নিমাইকে দেখো।

মা, কাঁদছ কেন? মালিনীকে জিজ্ঞেস করল নিত্যানন্দ।

মালিনী দেখল তার শিশু নিতাই। যার স্পর্শে তার শুষ্কস্তনে দুধ আসে। বললে, বাবা, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভোগের ঘৃতপাত্র কাকে নিয়ে গেছে।

কোন কাক চিনতে পারবে?

ঐ তো বাটি মুখে করে উড়ে গিয়ে বাটি ফেলে দিয়ে ফের ঐ গাছের ডালে এসে বসেছে। মালিনী কাকটাকে চিনিয়ে দিল।

নিত্যানন্দ কাককে সম্বোধন করে বললে, বাটি ফেরত দিয়ে যাও।

কাক উড়ে গেল। বাটি মুখে করে উড়ে এসে রাখল ঠিক নিতাইয়ের কাছে।

মালিনী স্তব করতে বসল। নিতাই বললে, ওসব ছাড়ো, আমাকে খেতে দাও।

শচীমাতাও পাঁচটি ক্ষীরসন্দেশ খেতে দিলেন নিতাইকে।

মহাভাবাবেশ হয়েছিল, বাল্যভাবে নিত্যানন্দ দিগম্বর হয়ে গিয়েছিল। নিমাই বললে, বসন পরো। 'চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ মাত্র মানে।' নিমাই-ই বসন পরিয়ে দিল। শাসনে শান্ত হয়ে বসল নিত্যানন্দ। খেতে চাইলে শচীমাতা সন্দেশ দিলেন।

একটি খেয়ে বাকি চারটি নিতাই ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। একটাই যথেষ্ট। এতগুলি একসঙ্গে দিলে কেন?

সন্দেশটা খেয়েই নিতাই আবার হাত পাতল।

শচীমাতা বললেন, আর পাব কোথায়? নিজেই তো তখন শুধু শুধু ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

দেখ গে পাবে।

শচীমাতা ঘরে ঢুকে দেখলেন, কী আশ্চর্য, নিটোল চারটি সন্দেশ থালায় শোভা পাচ্ছে, গায়ে ধূলো মাখা। যেগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সেগুলো ঘরের মধ্যে এল কী করে ?

বাবা, এগুলো ঘরের মধ্যে এল কী করে ? সন্দেশ নিয়ে দাওয়ায় চলে এলেন শচীমাতা। দেখলেন, নিতাইয়ের হাতে চারটি সন্দেশ, সে খাচ্ছে তাই তৃপ্তের মত।

এ আবার কোত্থেকে পেলে ? শচীমাতার চোখে বিস্ময়ের ঘোর লাগল।

নিত্যানন্দ বললে, যা ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলাম তাই আবার কুড়িয়ে এনেছি।

তারপর সেদিন গৌরসুন্দর নিজের হাতে চন্দনে-মাল্যে সাজালেন নিত্যানন্দকে। স্তব করতে লাগলেন। 'নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ। এই তুমি নিত্যানন্দ রাম মূর্তিমন্ত ॥'

স্তবশেষে বললেন, তোমার একখানা কৌপীন আমাকে দাও।

কৌপীন পেয়ে তাকে টুকরো টুকরো করলেন, ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। বললেন, এই পবিত্র বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধো, কৃষ্ণদাস হয়ে যাও।

তারপর আদেশ করলেন, নিত্যানন্দ, হরিদাস, ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষ্ণনাম ভিক্ষা করো। 'প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥'

হরিদাস আগে আগে চলেছে, পিছে নিত্যানন্দ। হরিদাস নাম করছে কিন্তু নিত্যানন্দ মূক।

এ কী, আপনি চুপ করে আছেন ? জিজ্ঞেস করল হরিদাস।

আমি ও সবের কি জানি !

সে কী, মহাপ্রভু যে বললেন নাম করতে।

তুমি করতে হয় করো, আমি তার আদেশের ধার ধারি না।

তবে আপনি এসেছেন কেন ?

নাম প্রচারের জন্যে।

তাই তো, তাই তবে করুন।

শোনো তাই করছি। বলে নিত্যানন্দ দু'বাহু তুলে বলে উঠল :

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥

দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে।
সে জন আমার হয় আমি হই তার রে॥

গৌরাঙ্গ নিজেকে লুকোতে চাইছে নিত্যানন্দ তাকে লুকোতে দেবে না। কৃষ্ণই যে বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপে এসেছে একথা সে ফাঁস করে দেবে। তাই হরিদাস মহাপ্রভুর আদেশে ভজ কৃষ্ণ বলুক, নিত্যানন্দ বিদ্রোহাচরণ করেই বলবে, ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

মাতাল হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে এরা কারা? এরা দু' ভাই জগদানন্দ আর মাধব, ডাক-নাম জগাই-মাধাই। নদীয়ার নগর-কোটাল। বিস্তর পয়সা। হেন দুষ্কর্ম নেই যা করে না। গো-মাংস ভক্ষণ, ডাকাচুরি, পরগৃহদাহ, মদ্যপান, নারীনির্যাতন—মাতাল লম্পট দুটোর অকার্য কিছু নেই। কাজী কী করবে? কাজী তো ওদের টাকায় বশীভূত।

চলো ওদের নাম শুনিয়ে আসি। বললে নিত্যানন্দ।

চলো।

হরিদাস বললে, ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ। আর নিত্যানন্দ বললে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ।

ধর ধর বলে তাড়া করল জগাই-মাধাই। হরিদাস আর নিত্যানন্দ দুজনেই ছুট দিল। হরিদাস পালাল অদ্বৈতের ঘরে, নিত্যানন্দ চলে এল গৌরাঙ্গের কাছে। সব বিবরণ শুনে গৌরাঙ্গ বললেন, দুই পাপাশয়কে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব। 'খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা।'

নিত্যানন্দ চুপ করে রইল। মনে মনে বললে, মেরেই যদি ফেললে তা হলে আর উদ্ধার করলে কী! তা হলে নামের মাহাত্ম্য আর রইল কোথায়?

তারপর রাত্রে একদিন বাড়ি ফিরছে নিত্যানন্দ, জগাই-মাধাই তার উপর চড়াও হল। ঐ সেই অবধূত যাচ্ছে না? নাম বিলোচ্ছে! মার ব্যাটাকে।

মদের ভাঙা কলসীর টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে মাধাই নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। নিত্যানন্দের কপালে লেগে কেটে গেল, রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে।

নিত্যানন্দ ভ্রূক্ষেপও করল না। বললে, মেরেছিস তো মেরেছিস, আমার ব্যথা লাগেনি। শুধু তোরা একবার সুমধুর হরিনাম বল, বল গৌরহরি। তোদেরও সমস্ত ব্যথা চলে যাবে।

দেখি কেমন তোর ব্যথা না লাগে—মাধাই আবার তাকে মারতে এগোল।

জগাই তাকে নিরস্ত করলে। দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে মেরে তোর কী এমন পৌরুষ বাড়বে ?

গৌরাঙ্গের কাছে খবর পৌঁছুল। তিনি বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলেন। রুদ্রমূর্তি ধরে সুদর্শনকে আহ্বান করলেন।

নিত্যানন্দ আবার বিদ্রোহ করল। বললে, প্রভু তুমি এ কী করছ ? তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ এই অবতারে তুমি অস্ত্র ধরবে না, কাউকে নিধন করবে না। শুধু নামমন্ত্রে চিত্তশুদ্ধি করে সবাইকে উদ্ধার করবে। তবে অন্যথা করছ কেন ? এরা তো দুঃখী, মোহান্ধ, এদেরকে প্রাণে না মেরে আমাকে ভিক্ষে দাও। আমি এদের মধ্যে তোমার পতিতপাবন লীলার মহিমা দেখাই।

গৌরাঙ্গ তবুও নিবৃত্ত হতে চান না।

নিত্যানন্দ বললে, দণ্ড দিতে হলে দুজনকেই দিতে পারো না। মাধাই আমাকে দ্বিতীয়বার মারতে চাইলে জগাই তাকে বাধা দিয়েছিল, জগাইয়ের জন্যেই আমি বেঁচে গিয়েছি।

তুই আমার নিতাইকে বাঁচিয়েছিস ? আয় আমার বুকে আয়। গৌরাঙ্গ হাত বাড়ালেন।

জগাই গৌরহরির পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। প্রভু তাকে তুলে নিয়ে বুকে ধরলেন। প্রেমধনে ধনী হয়ে জগাই কাঁদতে লাগল।

আমারও তা হলে গতি করো। মিনতি করল মাধাই। আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল কোরো না।

আমার নিজের শরীরের চেয়ে আমার ভক্তের শরীর আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয়। আমার নিতাইয়ের শরীরে তুই আঘাত করেছিস, তোর নিস্তার নেই।

তোমার রাজত্বে কারু নিস্তার নেই এ কি কখনো হতে পারে ? বলো আমার পথ বলে দাও।

তা হলে তুমি নিত্যানন্দের পায়ে পড়ো, নিত্যানন্দই তোমার উপায় করবে।

নিত্যানন্দ বললে, প্রভু, এ শুধু আমার মান বাড়াবার জন্যে তোমার প্রচ্ছন্ন লীলা। বেশ, কোনো জন্মে আমার যদি কোনো সুকৃতি থাকে,

আমি তা মাধাইকে দিলাম। বলে ভূপতিত মাধাইকে বুকে তুলে নিল। বললে, এ আমার মাধাই। এ যদি আমার হয় তবে ও তোমারও।

জগৎ যারে ত্যাগ করে
নিতাই তারে বুকে ধরে।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলে
জগৎ যারে ঠেলে ফে
ভয় নেই তোর আছি বলে
নিতাই তারে করে কোলে॥

গৌরাঙ্গও বুকে নিলেন মাধাইকে। গৌরাঙ্গের রুদ্রমূর্তি নিত্যানন্দের করুণামূর্তিতে লীলায়িত হল।

গৌরাঙ্গকে নিয়ে নিত্যানন্দ শান্তিপুরে চলেছে। পথে ললিতপুর গ্রাম, এক গৃহস্থ সন্ন্যাসীর বাড়িতে এসে উঠেছে। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতেই সন্ন্যাসী তাকে কামিনী-কাঞ্চন-প্রাপ্তির আশীর্বাদ করল। ধন হোক বিদ্যা হোক বধূ হোক বংশ হোক।

গৌরাঙ্গ বললে, এসব আশীর্বাদ নয়। বলুন কৃষ্ণের প্রসাদ হোক।

সন্ন্যাসী খেপে গেল। বললে, ধন না হলে খাবে কী?

যদি কর্মফলে থাকে খাওয়া আপনি মিলবে। ধন-পুত্রও তো থাকে না। শুধু কৃষ্ণপ্রসাদই থাকে। আপনি শুধু বলুন আমার কৃষ্ণে মতি হোক।

কোথাকার কে এক দুগ্ধপোষ্য বালক আমার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। আমাকে শেখাচ্ছে আশীর্বাদ! সন্ন্যাসী রাগে আগুন হয়ে উঠল।

ছি-ছি, বালকের অন্যায় স্পর্ধা, আপনার সঙ্গে তর্ক করে! নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীকে শান্ত করতে চাইল। ও অবোধ, ও কী জানে! আপনার সঙ্গে ওর তুলনা! ওকে আপনি মার্জনা করুন।

প্রশংসা শুনে সন্ন্যাসী খুশি হল। বললে, আনন্দ আনব, খাবে?

আনন্দ কী? গৌরাঙ্গ চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল নিত্যানন্দকে।

নিত্যানন্দ বললে, মদ।

বিষ্ণু, বিষ্ণু। গৌরাঙ্গ ছুট দিল, ঝাঁপ দিল গঙ্গায়।

নিত্যানন্দকে বললে, আমার নবদ্বীপবাস ফুরিয়ে এল। আমি এবার সন্ন্যাস নেব। শিখাসূত্র ত্যাগ করব। আমি কাঙাল সেজে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা না করলে লোকে হরিনাম নেবে না, নামবে না তাদের অভিমানের মঞ্চ থেকে।

কিন্তু তোমার মায়ের কী দশা হবে? নিত্যানন্দ বললে কাতর হয়ে।

নিতাই, তুমি সবই জানো। আমি একা কেঁদে সকলের হৃদয় গলাতে পারব না। মা কাঁদবে, বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদবে, ভক্তদল কাঁদবে, তবেই না কঠিন মাটি কোমল হবে। তবেই না তাতে তুমি ভক্তির বীজ ছড়িয়ে দেবে, তবেই না প্রেমের ফসল ফলবে।

কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিলেন।

প্রেমোন্মাদে চললেন বৃন্দাবন।

সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ আর চন্দ্রশেখর।

নিত্যানন্দ মাঠের রাখালদের শিখিয়ে দিল, প্রভুকে দেখলেই হরিবোল বলবি আর যদি বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞেস করেন গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিবি।

গরু চরাচ্ছিল ছেলেগুলো, গৌরসুন্দরকে দেখে হরিবোল বলে উঠল।

ব্রজের ধ্যানে বিভোর হয়ে আছেন, প্রভু বললেন, তোমরাই বুঝি ব্রজের বালক! বলতে পারো আমার বৃন্দাবন আর কতদূর? কোন্ পথে গেলে পাব আমার বৃন্দাবনকে?

এই যে এই পথে। গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিল।

গৌরহরি শেষ পর্যন্ত শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে গিয়ে উঠলেন।

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে শচীমাতার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল: মা, মা—

কে রে? আমার নিমাই এলি?

না, আমি তোমার নিতাই। তোমার নিমাইকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে এনে রেখেছি। তুমি চলো একবার, দেখবে চলো।

এখুনি যাব। বিষ্ণুপ্রিয়ার উদ্দেশ করে ডাকলেন শচীমাতা। বউমা, শিগগির চলো। নিমাই শান্তিপুরে এসেছে।

নিত্যানন্দ গম্ভীর মুখে বললে, আপনি একাই চলুন।

আর বউমা?

সন্ন্যাসীর যে স্ত্রীদর্শন নিষেধ।

নিষেধ? আমার নিমাই তবে সত্যিই সন্ন্যাসী হয়েছে?

নিত্যানন্দ চুপ করে রইল।

সে যদি আমাকে ছাড়তে পারে আমি তাকে ছাড়তে পারব না কেন? শচীমাতা শক্ত হতে চাইলেন। বউমা যদি না যায় তো আমিও যাব না।

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে লাগল। বললে, না মা, আপনি যান। হয়তো তাঁর ইচ্ছে আপনার সঙ্গে দেখা হোক। তাই আপনি একবার তাঁকে দেখে আসুন।

শাশুড়ীকে উত্তরীয় ও নামাবলী দিয়ে সাজিয়ে দিল বিষ্ণুপ্রিয়া। তারপরে রওনা করিয়ে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল।

নিত্যানন্দ শিবিকায় চড়িয়ে শচীমাতাকে শান্তিপুরে নিয়ে এল। মাতা-পুত্রের মিলন করিয়ে দিল।

মায়ের থেকে অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভু চললেন নীলাচল।

কমলপুরে ভার্গী নদীর তীরে এসে দাঁড়াল সকলে।

গৌরাঙ্গ বললেন, কপোতেশ্বর মহাদেব দেখে আসি।

দামোদর আর মুকুন্দ সঙ্গে গেল। নদীতীরে নিত্যানন্দ আর জগদানন্দ অপেক্ষা করতে লাগল।

জগদানন্দের হাতে গৌরাঙ্গের দণ্ড। সে-ই গৌরাঙ্গের দণ্ডবাহক। কিন্তু প্রভু এতক্ষণেও ফিরছেন না কেন? জগদানন্দ অধীর হয়ে উঠল।

'তুমি দণ্ড ধরো তো, আমি একবার দেখে আসি কেন এত দেরি হচ্ছে।'

গৌরসুন্দরের দণ্ডের প্রয়োজন কী? সন্ন্যাসীরা দণ্ড নেয় আসক্তিকে শাসন করবার জন্যে। স্বয়ং ভগবানের আবার আসক্তি কী!

নিত্যানন্দের মনে হল এ দণ্ড শুধু তাকেই দণ্ড দেবার জন্যে। আমি যাঁকে হৃদয়ে বহন করছি, তিনি আবার দণ্ডকে বহন করে চলবেন এ অসহ্য।

সুতরাং আজ দণ্ডের দণ্ড হোক।

দণ্ডকে তিন খণ্ড করে নদীতে ভাসিয়ে দিল নিত্যানন্দ।

জগদানন্দ ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলে, দণ্ড কই?

তিন টুকরো করে ভেঙে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি।

কী সর্বনাশ! জগদানন্দের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেল। এখন তবে উপায় কী!

যাঁর দণ্ড তিনিই ভেঙেছেন, তোমার এত ভয় পাবার কী হয়েছে!

ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গ দণ্ডের খোঁজ করলেন না।

আঠারনালায় এসে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে নিত্যানন্দকে বললেন, আমার দণ্ড দাও।

তুমি প্রেমাবেশে আমার উপর পড়লে, আমি তোমাকে নিয়ে আমার

হাতে-ধরা দণ্ডের উপর পড়লাম। তুজনের ভারে দণ্ড ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেল। তারপর টুকরোগুলো কোথায় গিয়ে পড়ল কিছুই জানি না। সপ্রতিভ সহাস্যমুখে বললে নিত্যানন্দ।

না, প্রভু, জগদানন্দ বলে উঠল, অবধূত গোসাঁই নিজের হাতে দণ্ড ভেঙে ভার্গী নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

দিয়েছি তো বেশ করেছি। নিত্যানন্দ বিরক্ত হয়ে বললে, একখানা শুকনো বাঁশ বই তো নয়।

গৌরাঙ্গ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন, শুকনো বাঁশ! যে সন্ন্যাসীর দণ্ডে সমগ্র দেবলোক বিরাজ করছে, যা ত্যাগ-ধর্মের প্রতীক, তাকে তুমি সামান্য শুকনো বাঁশ বলছ?

হ্যাঁ, বলছিই তো, একশোবার বলছি। সে বাঁশ তুমি বুকে করে বয়ে বেড়াবে এ আমার পক্ষে অসহ্য। নিত্যানন্দ মাথা পাতল। দণ্ড ভাঙার জন্যে যে দণ্ড দিতে হয় দাও, আমি মাথা পেতে নেব।

অন্তরে গভীর প্রসন্নতা, বাইরে প্রভু ক্রোধভাব জাগিয়ে রাখলেন। বললেন, আমার সবেধন এই দণ্ড ছিল আমার সঙ্গের সাথি, তোমরা তাও রাখলে না। বেশ, যাও, আমার আর তবে কারু সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রইল না, আমি একাই জগন্নাথ দর্শনে যাব।

সে কী কথা! সবাই আপত্তি করল।

হ্যাঁ, একা যাব। তোমাদের সঙ্গে একত্রে যাব না। হয় তোমরা আগে যাও, নয়তো আমি আগে যাই।

মুকুন্দ বললে, তুমি আগে যাও। আমরা পরে যাব।

গৌরাঙ্গ একা চললেন। একাকী ছিলেন বলেই তো সার্বভৌম তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারল।

জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে—বলতে বলতে বিদ্যুৎগতিতে ছুটলেন গৌরাঙ্গ। মন্দিরে ঢুকে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সার্বভৌম তাঁকে সুস্থ করবার জন্যে গৃহে নিয়ে গেল।

সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল নিত্যানন্দ। সঙ্গে সহচরগণ।

জগন্নাথের সেবক বললে, আপনারা স্থির হয়ে জগন্নাথদর্শন করুন, ঐ সোনার-বরণ ঠাকুরের মত চাঞ্চল্য প্রকাশ করবেন না।

নিত্যানন্দ মৃদু-মৃদু হাসল। ঢুকল মন্দিরে।

ঢুকেই এক লাফ দিয়ে রত্ন-সিংহাসনে উঠে ধরতে গেল বলরামকে। এক বিরাটদেহ পালোয়ান সেবক নিত্যানন্দের হাত ধরে বাধা দিতে গেল, নিত্যানন্দ হাত ছাড়িয়ে নিতে পড়ল গিয়ে দশ হাত দূরে। হাড়গোড় ভেঙে গেল বোধ হয়।

বলরামের গলার মালা তুলে নিয়ে নিজের গলায় পরল নিত্যানন্দ।

সেবক বললে, আমি মত্ত হাতি ধরে রাখতে পারি কিন্তু এই অবধূতকে ছুঁতে না ছুঁতেই আমি মেঝের উপর ছিটকে পড়লাম। এ কি মানুষ না আর কেউ?

আমি এবার দক্ষিণে যাব। বললেন গৌরহরি।

সেখানে কী?

আমার ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে দক্ষিণ দেশে গিয়েছে বলে শুনেছি, নিত্যানন্দের দু'হাত চেপে ধরলেন প্রভু, আমি তার সন্ধানে যাব, পারি তো ফিরিয়ে আনব।

নিত্যানন্দই যে বিশ্বরূপ এ তো প্রভুর জানা। তবে আবার এই লীলা কেন?

নিত্যানন্দ বুঝল এই লীলাচ্ছলেই গৌরাঙ্গ দক্ষিণ-দেশ উদ্ধার করতে চলেছেন।

বললে, আমি তোমার সঙ্গে যাব। পথ-ঘাট সমস্ত আমার জানা।

প্রভু বললেন, না আমি একা যাব। আমার দণ্ড নেই ঝুলি নেই কিছু নেই, আমি এক নিঃস্ব একাকী।

এ হতেই পারে না। তোমার দু'হাত তো নামের সংখ্যাগণনায় বদ্ধ থাকবে, বহির্বাস বা জলপাত্র বইবে কী করে? প্রেমাবেশে অচৈতন্য হয়ে পড়লে তোমাকে দেখবে কে? বেশ তো, আমাদের না নাও ব্রাহ্মণকুমার কৃষ্ণদাসকে সঙ্গী করো। সেই তোমার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারবে।

'গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে'—সেই কৃষ্ণদাসকে সঙ্গী করে চললেন গৌরহরি।

আলালনাথ পর্যন্ত এগিয়ে দিল নিত্যানন্দ, পরে নীলাচলে ফিরে প্রভুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

দু' বছর পর ফিরলেন গৌরহরি।

শচীমাতার কাছে খবর গেল নিমাই আবার নীলাচলে স্থির হয়েছে।

মা গো, আজ্ঞা করো, আমরাও একবার তবে দেখে আসি প্রাণগৌরকে। অদ্বৈতসহ অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্ত শচীমাতার অনুমতি চাইল। অনুমতি পেয়ে চলে এল শ্রীক্ষেত্র।

কীর্তনে-নর্তনে প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠল চারদিকে।

গৌরাঙ্গ গৌড়ীয় ভক্তদের বললেন, তোমরা এবার দেশে ফিরে যাও। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় এস।

তারপর একদিন নিত্যানন্দকে নিয়ে বসলেন গোপনে।

বললেন, তুমি সুরধুনী তীরে গিয়ে হরিনাম বিলোও। জীবজগৎ অন্ধ হয়ে আছে, তুমি হরিনাম দিয়ে এদের চোখ ফোটাও। পিপাসায় শুষ্ক বিরস হয়ে আছে, তুমি হরিনাম দিয়ে এদের শীতল কর। নিন্দুক পাষণ্ড পাপী দুরাচার কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। মুখে-বুকে হরিনাম নিয়ে কারু যেন আর যমভয় না থাকে। যারা কুমতি, যারা তার্কিক, যারা শুধু পড়ুয়া তাদের প্রেমধন দান করে দুঃখের খণ্ডন কর। 'মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যে জন, ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন।' নিত্যানন্দ, সংকীর্তন-প্রেমরসে সর্বদেশ প্লাবিত কর। নামপ্রেমে বিশ্ব ভরে দেব বলেই আমার নাম বিশ্বম্ভর। তুমিই আমার লীলার সহায়, আমার বিশ্বম্ভর নাম সার্থক কর। অবিচারে অবিচ্ছিন্নে নাম দাও, প্রেম দাও সকলকে।

প্রাণগৌরের আদেশ পেয়ে নিত্যানন্দ চলল গৌড়দেশে।

আর ভয় কী, অবিচারে নাম দিতে হবে, নামপ্রেমে ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে কোলাকুলি করাতে হবে—পার্ষদদের নিয়ে নিত্যানন্দ চলল গঙ্গাতীরে।

নিত্যানন্দের লীলা আরম্ভ হল।

পথেই সহচরদের সকলকে উদ্দাম ভাব দিলেন। রামদাসের দেহে গোপালের প্রকাশ হল, গদাধর রাধিকা-ভাবে বিভাসিত হল, আর রঘুনাথ বৈদ্যে দেখা দিল রেবতীর ভাবনা। কৃষ্ণদাস আর পরমেশ্বরদাসও গোপাল-ভাবে হৈ-হৈ করতে লাগল। পুরন্দর তো একেবারে গাছে উঠে বসল, বললে, আমি অঙ্গদ।

গঙ্গাতীরে পানিহাটি গ্রাম। সেই গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে সবাইকে নিয়ে উঠলেন নিত্যানন্দ। সর্বদাই গর্গর-মাতোয়ারা। একে একে গায়কের দল এসে জুটতে লাগল। মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ তিন ভাই—তিন ভাই-ই কীর্তন-বিশারদ, তিন ভাই-ই গান ধরল।

নিত্যানন্দ নৃত্য শুরু করলেন। পদভরে কাঁপতে লাগল পৃথিবী। নৃত্য করতে করতে যার দিকে দৃষ্টি ফেলেন সে-ই প্রেমবিহ্বল হয়ে যায়।

চার স্থানে গৌরাঙ্গের নিত্য আবির্ভাব। শচীর মন্দিরে, রাঘবের ভবনে, শ্রীবাসের কীর্তনে আর নিত্যানন্দের নর্তনে।

তাই রাঘবগৃহে নিত্যানন্দের নৃত্যলীলা।

হঠাৎ খাটের উপর বসে পড়ে নিত্যানন্দ বললেন, আমার অভিষেক করো।

সুবাসিত গঙ্গাজলে স্নান করানো হল, নববস্ত্র পরিয়ে চন্দন মাখানো হল শ্রীঅঙ্গে, গলায় দোলানো হল তুলসীর বনমালা। অভিষেক-মন্ত্র পড়া হল। রাঘব পণ্ডিত নিজে মাথায় ছাতা ধরল। আনন্দ-ক্রন্দনের রোল উঠল চারদিকে।

রাঘব, আমার জন্যে কদম ফুল নিয়ে এস। নিত্যানন্দ আদেশ করলেন।

কদম ফুল!

হ্যাঁ, কদমকাননে আমার নিত্য বাস। কদম আমার সব চেয়ে প্রিয় ফুল।

কিন্তু এ তো কদমের সময় নয়।

সময় নয়? নিত্যানন্দ হাসলেন। তোমার মধ্যে কেউ গিয়ে দেখ, কোথাও-না-কোথাও ফুটতেও পারে।

রাঘব পণ্ডিত বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখল জম্বীরের গাছে অসংখ্য কদম ফুল ফুটে আছে।

যে দেখল সেই অবাক হল। এ কী অতিমানুষি বিভূতি!

কদমের মালা গলায় পরে খাটে সমাসীন নিত্যানন্দ। বললেন, সবাই একটা নতুন গন্ধ পাচ্ছ না?

হ্যাঁ, চারদিকে দমনক ফুলের গন্ধ পাচ্ছি।

এ গন্ধ কোত্থেকে আসছে বলতে পার?

কোত্থেকে?

শোনো বলি। তোমাদের নাচ দেখতে, তোমাদের কীর্তন শুনতে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে চলে এসেছেন। এ তাঁরই সৌরভ। তোমাদের সকলের দেহ-মন কৃষ্ণনাম-সৌরভে পরিপূর্ণ হোক।

রাঘবের ঘরে তিন মাস ধরে চলল এই ভক্তিবিলাস।

সপ্তগ্রাম থেকে রঘুনাথদাস এসে হাজির।

গৌরাঙ্গ পাবার জন্যে বার বার বাড়ি থেকে পালায় রঘুনাথ, তার বাপ তাকে বার বারই ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। শান্তিপুরে দুবার গৌরহরির সাক্ষাৎদর্শন পেয়েছিল, দুবারই মহাপ্রভু তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, অনাসক্ত হয়ে বিষয় ভোগ করো।

কেন যে ফিরিয়ে দিচ্ছেন বুঝতে পারছে না রঘুনাথ।

তাই নিত্যানন্দের কাছে জানতে এসেছে।

গঙ্গাতীরে একটা বটগাছের নিচে বসে আছে রঘুনাথ, দেখল ভক্তদলের সঙ্গে নিত্যানন্দ আসছেন। দেখেই রঘুনাথ দণ্ডবৎ প্রণত হল।

নিত্যানন্দ বললেন, ঐ সেই চোরটা বুঝি এত দিনে দর্শন দিল।

চোর! রঘুনাথ ম্লান হয়ে গেল। আমি কী চুরি করলাম, কবে চুরি করলাম। নিত্যানন্দের সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। এখুনি-এখুনি চুরি করলাম কী!

চুরি করোনি তো চুরি করবার চেষ্টা করেছিলে। যে চুরি করতে চেষ্টা করে অথচ পারে না সে-ও চোর।

কী আবার চেষ্টা করলাম।

না বলে নেওয়ার নামই তো চুরি। তুমি আমাকে না বলে আমার গৌরধন নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, সেটা চুরি করার চেষ্টা হল না?

গৌরধন শুধু তোমার?

শুধু আমার। বললেন নিত্যানন্দ, আমি না বলে দিলে কেউ পাবে না গৌরচরণ। আমি দরজা খুলে না দিলে কেউ গৌর-অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারবে না।

রঘুনাথ এতক্ষণে বুঝল মহাপ্রভু কেন তাকে দু-দুবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

বুঝল নিত্যানন্দের হাতেই ঘরের চাবি। প্রেমের ছাড়পত্র।

মহাপ্রভুও তাই বলেছেন। 'নিতাই যারে দিবে ইচ্ছা করে, আমি তারই হব অবিচারে।'

করজোড়ে রঘুনাথ বললে, আমাকে তবে দণ্ড দিন।

নিত্যানন্দ বললেন, তুমি তবে দই-চিঁড়ের মহোৎসব লাগাও।

দই দুধ চিঁড়ে কলা চিনি কর্পূর—বিরাট আয়োজন করল রঘুনাথ। আহূত-অনাহূত বিস্তর লোকসমাগম হল। অঙ্গন ছাপিয়ে বসল গিয়ে নদীতীরে, কেউ কেউ তীরে স্থান না পেয়ে জলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেককে

দুখানি করে মালসা দেওয়া হল, একটিতে ক্ষীর-চিঁড়ে, আরেকটিতে দই-চিঁড়ে।

সকলকে বিতরণ করা হয়ে গেলে নিত্যানন্দ ধ্যানযোগে আকর্ষণ করে মহাপ্রভুকে নিয়ে এলেন নীলাচল থেকে। জনে-জনে সকলের কাছে নিয়ে গেলেন তাঁকে, প্রত্যেক মালসা থেকে একমুঠো চিঁড়ে তুলে মহাপ্রভুর মুখে দিতে লাগলেন, মহাপ্রভুও দিতে লাগলেন নিত্যানন্দের মুখে। সকলে ভাবল, নিত্যানন্দই বুঝি নিচ্ছেন, নিত্যানন্দই বুঝি খাচ্ছেন। কোনো-কোনো ভাগ্যবান শুধু দেখতে পেল গৌররায়কে।

তারপর বিরলে দুই ভাই বসলেন চিঁড়ে খেতে, পাশাপাশি আসনে। রাঘব পণ্ডিত এসে পড়লে তাকেও ভাগ দিলেন।

বলো প্রভু নিতাই, আমি কি গৌর পাব? রঘুনাথ কেঁদে পড়ল।

নিত্যানন্দ বললেন, তুমি আমার ভক্তদের দই-চিঁড়ে খাওয়ালে, মহাপ্রভু নিজে এসে খেয়ে গেলেন। আর দেরি নেই, তুমি পাবে গৌরধন। দেখো প্রভু তোমাকে স্বরূপের হাতে সঁপে দেবেন, তোমাকে ডাকবেন স্বরূপের রঘুনাথ বলে।

গৌরসেবার বিগ্রহই নিত্যানন্দ। তাঁর কাজ শুধু গৌরাঙ্গের সেবা করা। গৌরাঙ্গের আদেশ পালন করে গৌড়ে এসে হরিনাম বিলোচ্ছেন এও গৌরসেবা। কিন্তু আরো—আরো সেবা করবার জন্যে মন উচাটন। পারছেন না বলেই তাঁর মনে অশান্তি।

কত কিছুই পারছেন না, পারছেন না গৌরের শ্রীঅঙ্গ সাজিয়ে দিতে।

কিন্তু, ভাবলেন, নিজে সাজলেই তো গৌরাঙ্গকে সাজানো হবে। যিনিই মহাপ্রভু তিনিই তো নিত্যানন্দ।

ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্রই নানা লোক নানা অলঙ্কার তৈরি করে আনল।

দুই হাতে সোনার অঙ্গদ-বলয় পরলেন, দশ আঙুলে সোনার অঙ্গুরি, কণ্ঠে মণি-মুক্তোর মালা, শ্রুতিমূলে সোনার কুণ্ডল, পাদপদ্মে রজত-নূপুর, তার উপরে মলবন্ধ, হাতে লৌহদণ্ড—যেন হলধর মুষল ধারণ করে আছেন।

তারপর শুরু করলেন ঘরে ঘরে পর্যটনকেলি। 'কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে, ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্তন বিনে।'

একদিন গদাধর দাসের বাড়িতে এসে উঠলেন।

হাঁক দিলেন, গোপী, দান দে, দান দে।

গদাধর গোপীভাবে বিভোর। সে মাথায় গঙ্গাজলের কলসী নিয়ে কে দুধ কিনবে গো বলে দ্বারে দ্বারে ফিরি করে। কড়ি নেই বললে বিনাদামে দিয়ে যায়।

নিত্যানন্দের সঙ্গে গদাধর প্রেমানন্দে নাচতে লাগল। মাধব ঘোষ এসে গাইতে লাগল দানলীলা।

পানিহাটি থেকে নিত্যানন্দ গেলেন খড়দহে।

একবার এখানকার জমিদারের কাছে কিছুটা জমি চেয়েছিলেন নিত্যানন্দ, বসবাস করবেন বলে।

জমি? জমিদার ব্যঙ্গ করে বললে, ঐ গঙ্গায় ওখানে দহ আছে ওখানে গিয়ে থাকো।

নিত্যানন্দ মৃদু হেসে একগাছি খড় ঐ দহে ছুঁড়ে দিল আর তার ফলে দহ থেকে উঠে এল শক্ত ভূমি। আর সেই থেকে নাম হল খড়দহ।

খড়দহ থেকে এলেন সপ্তগ্রাম। উঠলেন ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের বাড়িতে।

সে-যুগে সুবর্ণ-বণিকেরা সামাজিক নানা নির্যাতনে বিড়ম্বিত ছিল, তাদের কৃতার্থ করবার জন্যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে 'বণিককূলের নাথ' করে পাঠালেন। নিত্যানন্দ সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল করে তুললেন। 'বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকেরে দিল প্রেমভক্তি অধিকার। সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে। আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তনে বিহরে॥'

উদ্ধারণকে বললেন, তোমার পবিত্রতা সকলের কাছে প্রচার করব। তুমি আজ থেকে আমার রান্না করে দেবে।

ব্রাহ্মণেরা চটে গেল। এ কখনো হতে পারে? বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধতা কিছুতেই সহ্য করব না আমরা। তোমরা সবাই এস, একটা সিদ্ধান্ত করো।

আগে চলো স্বচক্ষে দেখে আসি সত্যিই উদ্ধারণ রাঁধছে কিনা। শোনা কথায় কিছু করে ফেলা ঠিক হবে না।

নিত্যানন্দ বললেন, উদ্ধারণ, ওঁরা এসেছেন। তুমি অড়হরের যে কাঠি দিয়ে ভাত ঘাঁটছ ওটি অঙ্গনে পুঁতে দাও।

যথা আজ্ঞা, উদ্ধারণ তাই করল। দেখতে দেখতে সেই কাঠি থেকে ঘনবদ্ধ মাধবীলতা বেরিয়ে এল, সমস্ত অঙ্গন ফেলল আচ্ছন্ন করে।

বিরোধী ব্রাহ্মণেরা আর রা কাড়তে পেল না। নিত্যানন্দের চরণে শরণ নিলে।

সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মন্দির-প্রাঙ্গণে সেই মাধবীলতা এখনো বিরাজ করছে।

সেখান থেকে গেলেন শান্তিপুর, মিললেন অদ্বৈতের সঙ্গে। 'দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণ।'

তারপর গেলেন নবদ্বীপ। যাই এবার একবার মাকে দেখে আসি।

শচীমাতা আনন্দে অধীর হলেন। বাপ, তুমি অন্তর্যামী, আমার দুঃখী মনের অভিলাষ টের পেয়ে আমাকে দেখা দিতে এসেছ।

তোমার চরণদর্শন করতে এসেছি।

নবদ্বীপে কিছুদিন থাকো।

তাই থাকব মা। প্রতি গৃহে সংকীর্তনের আসর বসাব।

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণতনয় ডাকাতের দলের সর্দার। নিত্যানন্দের গায়ে এত গয়না, ইচ্ছে হল লুণ্ঠন করে নেয়। উপায় কী? উপায়, ভক্তের ভান করে কাছে কাছে থাকা আর সুযোগ পেলেই গলা টিপে ধরা।

নিত্যানন্দ নিজেই সুযোগ করে দিলেন। গেলেন হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ি। সেখানে লোকজন বিশেষ নেই, ডাকাতি করতে সুবিধে হবে।

গভীর রাত্রে ডাকাতের দল বাড়ি ঘেরাও করল।

দেখল নিত্যানন্দ খাচ্ছেন, ভক্তদল বসে আছে।

এবার সবাই ঘুমুবে। ঘুমিয়ে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ব সকলে। আর একটু অপেক্ষা করি।

অপেক্ষা করতে করতে ডাকাতের দলই ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল দেখল ভোর হয়ে গেছে।

আরেক রাতে এল অনেক তোড়জোড় করে। আজ আর অপেক্ষা করব না।

গিয়ে দেখল অনেক প্রহরী বাড়ি পাহাড়া দিচ্ছে। ডাকাতদের চেয়েও তারা সংখ্যায় বেশি, আর স্বাস্থ্যে-তেজে বলীয়ান।

আর কী বকছে রে প্রহরীগুলো?

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলছে।

আজ কাজ নেই। আরেক রাতে আসা যাবে। ভরা অমাবস্যার অন্ধকারে।

ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতের দল বাড়ি ঢুকল। কিন্তু এ কী, চোখে

যে তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এ রাতের অন্ধকার নয়, এ তাদের চোখের অন্ধতা। সবাই নিমেষে অন্ধ হয়ে গেল। চোখে দেখতে না পেয়ে সবাই গর্তে গিয়ে পড়ল। শুরু হল ঝড়বৃষ্টি। সেই সঙ্গে বৃশ্চিকদংশন।

তখন ডাকাতেরাই আর্তনাদ করতে লাগল। প্রভু নিত্যানন্দ, আমাদের কৃপা করো।

নিত্যানন্দকে স্মরণ কর মাত্রই তাদের চোখ খুলে গেল, থেমে গেল ঝড়বৃষ্টি, শান্ত হল বিষদাহ। তারা নিত্যানন্দের পা ধরে কাঁদতে লাগল।

বলো কৃষ্ণ কৃষ্ণ। প্রেমভক্তি দিয়ে নিত্যানন্দ উদ্ধার করলেন ডাকাতদের।

নিমাইয়ের এক সহপাঠী ব্রাহ্মণ নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। বললেন, কী কতগুলো অলঙ্কার পরে বেড়ায়, আচার-অনুষ্ঠান কিছু মানে না।

মহাপ্রভু বললেন, নিত্যানন্দের চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। তাঁর গায়ে যে অলঙ্কার দেখছ তা প্রাকৃত অলঙ্কার নয়, তা নববিধ ভক্তি। আর আচার? শোনো—'মদিরা'যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে, তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥'

ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে অকপটে সব বললে নিতাইকে। বললে, আমার অপরাধ মার্জনা করো।

নিত্যানন্দ বললেন, অপরাধ? আমার প্রভু কারো অপরাধ দেখেন না। যে গৌরাঙ্গকে ভালোবাসে তার আবার অপরাধ কী? বলো গৌরহরি।

গৌরাঙ্গ যদিও নিত্যানন্দকে বলে দিয়েছিলেন, প্রতি বৎসর নীলাচলে এস না, তবুও প্রতি বৎসরই রথযাত্রায় নিত্যানন্দ যেতেন নীলাচলে। গৌড়ে প্রেম বিতরণ তো করছি, তবু বৎসরান্তে একবার শ্রীমুখখানি দেখতে না পেলে বাঁচি কী করে?

তা ছাড়া আমি গেলে যিনি বারণ করেছেন, তিনিই তো বেশি সুখী হবেন। আমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন তো শুষ্ক বিদ্রোহ নয়, আমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন প্রেমেরই কারুকলা। 'আজ্ঞার পালনে কৃষ্ণের হয় যে সন্তোষ। প্রেমে আজ্ঞা ভাঙিলে হয় কোটি সুখপোষ।'

নিত্যানন্দ সরাসরি মহাপ্রভুর কাছে না গিয়ে এক উদ্যানে এসে বসলেন। গৌরাঙ্গ ধ্যানে আবিষ্ট হলেন। দেখলেন একা একা চলে এসেছেন গৌরহরি। এসে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে স্তব করছেন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেতেই নিত্যানন্দ উঠলেন, দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন গৌরাঙ্গকে।

গৌরাঙ্গ আবার তাঁর কানে কানে কী কথা বললেন।

হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও নিত্যানন্দকে গৃহাশ্রমী হতে হবে। এই মহাপ্রভুর নির্দেশ। তাছাড়া 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয় রাম নিত্যানন্দ। বিধিনিষেধের তাহে নাহিক সম্বন্ধ।'

অম্বিকা-কালনার সূর্যদাস সরখেলের দুই মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবীকে বিয়ে করলেন নিত্যানন্দ। বিয়ের পর খড়দহে বসতি করলেন। 'মন হৈল খড়দহ করিব শ্রীপাট। প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট।' খড়দহে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করলেন আর প্রচার করলেন প্রেমভক্তি।

নিত্যানন্দের এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলের নাম বীরচন্দ্র আর মেয়ের নাম গঙ্গা।

বীরচন্দ্র একচাকা গ্রামের পাশে বীরচন্দ্রপুর বলে এক নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন আর সেইখানেই শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র বা শ্রীবাঁকা রায় বিগ্রহ-সেবা প্রকটিত করেন।

মহাপ্রভুর অপ্রকটের দু' বছর পরে নিত্যানন্দ তিরোধান করেন। যুগপৎ মিলিয়ে যান খড়দহের শ্যামসুন্দরে আর বীরচন্দ্রপুরের বঙ্কিমচন্দ্রে।

॥ ৫ ॥

হরিদাস

বনগাঁয়ের কাছে বুঢ়ন গ্রামে মুসলমানের ঘরে হরিদাসের জন্ম।

কী করে যে মুসলমানের ছেলে হরিদাস হল, সংসারবন্ধন ছিন্ন করে বৈরাগী হল, কেউ বলতে পারে না। কে তার গুরু ছিল, কিংবা কেউ তার গুরু ছিল কিনা, কোথা থেকে সে কুড়িয়ে পেল ভক্তির স্পর্শমণি, হরিদাসের পূর্বজীবন কারু জানা নেই। হরিদাসও কাউকে বলে নি স্পষ্ট করে। শুধু এইটুকু বলেছে, এইটুকু বুঝিয়েছে যে জাতি-কুল নিরর্থক, আসল হচ্ছে ভক্তি।

আসল হচ্ছে দৈন্য, অভিমানশূন্যতা। আসল হচ্ছে নামসংকীর্তন।

বেনাপোলের জঙ্গলে একটি কুটির করে একা-একা থাকে হরিদাস। যুবক, অকৃতদার। কুটিরের কাছে নিজের হাতে একটি তুলসী-গাছ পুঁতেছে, সকাল-সন্ধ্যেয় তাকে জল দেয়। প্রাতঃস্নান সেরে নামকীর্তনে বসে। সূর্যাস্তের আগে বন থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি কোনো ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়ে ভিক্ষা নেয়। তারপরে আবার শুরু করে নামকীর্তন।

এক মাসে এক কোটি নাম করবে এই ছিল হরিদাসের নিয়ম। তাহলে দিনে তিন লক্ষেরও বেশি নাম করা দরকার। শুধু দিনের বারো ঘণ্টায় সেই সংখ্যাপূরণ অসম্ভব। তাই রাত্রেও হরিদাসকে বসতে হয় নাম নিয়ে।

উচ্চরবে নাম করে হরিদাস। শুধু ধ্বনি নয়, এক মধুরের উৎসব। যে শোনে সেই তন্ময় হয়ে যায়।

মনে মনে নাম জপে শুধু সাধকের নিজের মুক্তি, কিন্তু উচ্চরব নামকীর্তনে পরসেবা, পরোপকার।

বনগাঁয়ের জমিদার রামচন্দ্র খান। তারই তাঁবের লোকেরা হরিদাসের প্রতি আকৃষ্ট হবে এ তার অসহ্য হল। হরিদাসের চরিত্রে কোনো ছিদ্র পাওয়া যায় কিনা তারই খোঁজ করতে লাগল।

অদোষসুন্দর হরিদাস। কোথাও এতটুকু মসিবিন্দু পাওয়া গেল না।

ঠিক করল, প্রত্যক্ষে হরিদাসকে অপদস্থ করতে হবে। সুন্দরী গণিকা লক্ষহীরাকে বললে, যাও, হরিদাসের বৈরাগ্যধর্ম নাশ করো।

লক্ষহীরা বললে, এ আর বেশি কথা কী। তিন দিনের মধ্যেই তাকে ধর্মচ্যুত করব।

তিন দিন নয়, আজই, এই মুহূর্তে তাকে আবদ্ধ করো। আমার পাইককে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, সে তোমাদের দুজনকে একত্র ধরে নিয়ে আসবে।

লক্ষহীরা বললে, আগে সঙ্গ হোক, পরে পাইক পাঠাবেন।

অনেক সাজল-গুজল লক্ষহীরা, তারপরে রাত করে চলে এল হরিদাসের সাধনকুটিরে। দেখল হরিদাস কুটিরে বসে অনন্যলক্ষ্যে হরিনাম করছে।

লক্ষহীরা আশ্রমের মর্যাদা রাখল। তুলসীকে প্রণাম করল। প্রণাম করল তেজঃপুঞ্জকলেবর হরিদাসকে।

দ্বারপ্রান্তে বসল গণিকা। বেশবাসের শাসনকে শিথিল করে দিল। বললে, ঠাকুর, তোমাকে দেখে তোমার সঙ্গলাভের জন্যে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমাকে তুমি দয়া করে একটিবার অঙ্গীকার করবে না?

হরিদাস তাকে তাড়িয়ে দিল না। কোনো রূঢ় বাক্যও প্রয়োগ করল না। বসিয়ে রাখল। শুধু মধুর কণ্ঠের নাম শোনাল।

বললে, নিশ্চয়ই তোমাকে অঙ্গীকার করব, তার আগে, একটু অপেক্ষা করো, আমার নামসংখ্যা সমাপ্ত হোক।

রাত প্রভাত হয়ে গেল তবু হরিদাসের সংখ্যাপূরণ হল না।

লক্ষহীরা বললে, আমি আবার রাত্রে আসব।

রামচন্দ্র খবর নিতে এল।

কাল বচনে অঙ্গীকার করেছে আজ নিশ্চয়ই সঙ্গম সফল হবে। রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করল গণিকা।

আবার রাত্রে গিয়ে বসল দুয়ারে।

তোমার কাল খুব কষ্ট হয়েছে। সারা রাত শুতে পারোনি। ঘুমুতে পারোনি, ঠায় বসেছিলে সারাক্ষণ। তার জন্যে আমার কষ্টও কম হয়নি। হরিদাস বললে মধুরস্বরে, কিন্তু কী করব, আমার নামসংখ্যা যে আজও পূর্ণ হয়নি। তুমি বোসো, আমার নামকীর্তন শোনো। আজই পূর্ণ হয়ে যাবে আশা করি। পূর্ণ হয়ে গেলেই তোমার অভিলাষও পূর্ণ হবে।

কিন্তু সে রাত্রেও হরিদাসের নামসংখ্যার পূরণ হল না। বললে, কাল আবার এস। মাসে কোটি নাম, কাল যজ্ঞ শেষ হবে আশা করি। ব্রতপূর্তির পরেই স্বচ্ছন্দে তোমার বাসনা মিটিয়ে দেব।

প্রভাতে রামচন্দ্র আবার এল খোঁজ নিতে। কী হল?

আজ আবার যাব।

হ্যাঁ, শিকার ছেড়ো না।

তৃতীয় রাত্রে হরিদাসের সংখ্যাপূরণ হল। লক্ষহীরাকে জিজ্ঞেস করলে, বলো তোমার কী বাসনা?

চোখে জল ও কণ্ঠে মধু নিয়ে লক্ষহীরা বললে, কৃষ্ণসেবার বাসনা।

বলে হরিদাসের পায়ে পড়ল। অপার পাপ করেছি, আমাকে উদ্ধার করুন।

হরিদাস বললে, তোমাকে উদ্ধার করব বলেই তো তিন দিন এই কাননে থাকলাম, নইলে প্রথম দিনেই রামচন্দ্রের কারসাজির কথা টের পেয়ে পালিয়ে যেতাম। বন্ধ্যা ভূমিতে ফসল ফলাব, গণিকাকে বৈষ্ণবী করব, তারই জন্যেই আমার এই তিন রাত্রির তপস্যা। এখন থেকে তোমার নাম কৃষ্ণদাসী।

আমি তবে এখন কী করব?

ঘরের সমস্ত দ্রব্য দান করো, আর তোমার ঘরেরও দরকার নেই, তুমি আমার ঘরে এসে থাকো। নিরন্তর নাম করো। আর তুলসীর সেবা করো।

কৃষ্ণদাসী তাই করল। সমস্ত পার্থিব সম্পদ বিলিয়ে দিল। কেটে ফেলল কেশদাম। ভিখারিনি সাজল। জঙ্গলের মধ্যে হরিদাসের পর্ণকুটিরে এসে উঠল। রাখা-শুখা ছোলা চিবিয়ে খায়, আর দিনে-রাত্রে তিন লক্ষ নাম নেয়। কোনোদিন ছোলাও জোটে না তবু উপবাসে অনিদ্রায়ও নামের সংখ্যায় স্খলন নেই।

আর হরিদাস?

হরিদাস তাকে ঘর-দোর ছেড়ে দিয়ে চাঁদপুরে চলে গিয়েছে।

চাঁদপুরে বলরাম আচার্যের অতিথি হয়েছে। বলরাম হিরণ্য ও গোবর্ধন দাসের কুলপুরোহিত। হিরণ্য ও গোবর্ধন দুই ভাই সপ্তগ্রামের জমিদার, বিরাট ধনী অথচ ধার্মিক, নামগুণগানে উৎসুক।

একদিন তারা বলরামকে বললে, হরিদাসকে নিয়ে আসুন, তার মুখে নামমাহাত্ম্য শুনি।

বলরামের মিনতিতে রাজী হয়ে হরিদাস জমিদার-সভায় উপস্থিত হল।

নাম করলে কী হয়?

কেউ বললে, নাম করলে পাপক্ষয় হয়। কেউ বললে, মুক্তি মেলে।

হরিদাস বললে, মুক্তি নামে কেন, নামাভাসেই পাওয়া যায়। মুক্তি বা পাপনাশ নামের আনুষঙ্গিক ফল। নামের মুখ্য ফল প্রেম। নাম করলে কৃষ্ণে ভালোবাসা আসে।

এই পণ্ডিত বলে কী? জমিদারদের তশিলদার গোপাল চক্রবর্তী তেড়ে এল। যে মুক্তি কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে পাওয়া যায় না তা মাত্র নামাভাসে মিলে যাবে? হরিদাস ঠাকুর, বাজি ধরো। যদি নামাভাসে মুক্তি না হয় তাহলে তোমার নাক কেটে দেব।

হরিদাস রাজী হল। বললে, এ তো ভাই আমার মনগড়া কথা নয়, এ শাস্ত্রের কথা।

বৃথা শাস্ত্র। চক্রবর্তী আবার তর্ক জুড়ল।

সবাই চক্রবর্তীর উপর চটে গেল। কিন্তু হরিদাসের রোষ নেই। বললে, ওঁর রূঢ়তায় আপনারা কেউ ব্যথিত হবেন না। উনি তর্কনিষ্ঠ, তর্ক তো ওঁকে করতেই হবে।

কিন্তু বাজির কথা ভুলে যেও না ঠাকুর। নাক কাটা যাবে।

ভক্ত তার নিন্দুককে ক্ষমা করে, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তনিন্দা সইতে পারে না। তিনদিনের মধ্যে গোপাল চক্রবর্তীর কুষ্ঠ হল। তার হাতের আঙুল কুঁকড়ে গেল, নাক খসে পড়ল।

হিরণ্য দাসের ছেলে নেই। গোবর্ধনের একমাত্র ছেলে রঘুনাথ। সেই বিরাট জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু, পনেরো বছর বয়সে রঘুনাথ হরিদাসকে প্রথম দেখেই তন্ময় হয়ে গেল। হরিদাসের স্নেহদৃষ্টিই তার মনে ভক্তি ও বৈরাগ্যের স্পর্শমণি ছুঁইয়ে দিল। সেই কৃপাতেই সে সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে পেল গৌরহরিকে।

চাঁদপুর থেকে হরিদাস শান্তিপুরে এল। মিলল অদ্বৈতের সঙ্গে।

শান্তিপুরেও হরিদাসের আশ্রম-কুটিরে এক রূপসী যুবতীর আবির্ভাব হল। সেও লক্ষহীরার মত এসেছে তাকে প্রলুব্ধ করতে, কিন্তু হরিদাস আগের মতই নির্বিকার। তাকে দ্বারে বসিয়ে রেখে নাম শুনিয়েছে। নামসংখ্যা সমাপ্ত হচ্ছে না বলে তাকেও তিন দিন ঘুরিয়েছে, বলেছে, কী করব বলো, যা নিয়ম করেছি তা ছাড়ি কী করে?

তখন রমণী আত্মপ্রকাশ করল। আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছি। আমি মায়া। আমার মোহিনীশক্তিতে ব্রহ্মা পর্যন্ত মুগ্ধ কিন্তু তোমাকে বিচলিত করতে পারলাম না। বরং আমিই তোমার কৃষ্ণনামে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ঠাকুর, কৃষ্ণনাম যে দেখি কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়ে তোলে। তুমি আমাকে সেই কৃষ্ণনাম দাও, গৌর-অবতারে প্রেমবন্যায় ভেসে যাই।

ঠাকুর হরিদাস মায়ারও গুরু। মায়াকেও সে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

শান্তিপুর থেকে চলে এল ফুলিয়ায়। কৃত্তিবাসের জন্মভূমিতে।

ফুলিয়া আর শান্তিপুর তখন গোড়াই কাজীর অধীনে আর নবদ্বীপের শাসক চাঁদ কাজী।

হরিদাসের তখন প্রেমোন্মাদ অবস্থা। কুটিরে বা গোফায় বসে নির্জনেই শুধু আর নাম করে না, গঙ্গাতীর ধরে চলতে চলতে নাম করে। সঙ্গে সঙ্গে চলে শত শত ভক্তস্রোত—সে আরেক গঙ্গা।

গোড়াই কাজী চঞ্চল হয়ে উঠল। যবন হয়ে হিন্দুর আচার করে কেন?

কিন্তু নিজে শাসন করে এমন সাহস হল না। হরিদাসের প্রভুত্ব ও

প্রতিপত্তিতে ভয় পেল। তাই মুলুকপতির কাছে গিয়ে নালিশ করল, এর একটা বিহিত করুন।

হরিদাসকে ধরে নিয়ে এস। মুলুকপতি পাইক পাঠিয়ে দিল।

হরিদাস নির্বিবাদে ধরা দিল। কৃষ্ণের প্রসাদে তার কালান্তককেও ভয় নেই। বলো কৃষ্ণ কৃষ্ণ। চলো মুলুকপতিকে গিয়ে দর্শন করি।

কিন্তু তক্ষুনি-তক্ষুনি মুলুকপতির দর্শন পাওয়া গেল না। তাই হরিদাসকে জেল-হাজতে নিয়ে যাওয়া হল।

কারাগারে তখন অনেক হিন্দু বন্দী। ঠিক সময়ে খাজনা দিতে না পারার দরুন কয়েদ খাটছে। তারা হরিদাসের নাম শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি আসছেন এই কারাগারে? তবে তো কারাগার তীর্থ হয়ে উঠবে।

কারাগারের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে হরিদাস, দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়াল বন্দীরা। কেউ কেউ বা রক্ষকদের অনুমতি নিয়ে দাঁড়াল উঁচু জায়গায়, এখানে-ওখানে। আমাদের চোখ ভরে দেখতে দাও হরিদাসকে। কৃষ্ণময়-জীবিতকে।

দর্শনমাত্রই সকলের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হয়েছে। সবাই ভক্তিনম্র হয়ে নমস্কার করছে হরিদাসকে।

হরিদাস হাসিমুখে সবাইকে আশীর্বাদ করল: যেভাবে আছ চিরকাল সেইভাবেই থেকো।

এ আশীর্বাদ পেয়ে অনেকেই বিষণ্ণ হল। তার মানে কি এখন যেমন বন্দী আছি, চিরকাল তেমনি বন্দীই থাকব? এ কেমনতরো আশীর্বাদ?

তোমরা আমার আশীর্বাদের মর্ম বোঝনি। হরিদাস বুঝিয়ে দিল। আমি বলতে চেয়েছি, তোমাদের মনে এখন যেমন কৃষ্ণপ্রীতি কৃষ্ণাভিমুখিতা এসেছে, সেই প্রীতি সেই প্রবণতা যেন চিরন্তন থাকে। 'বন্দী থাকো—হেন আশীর্বাদ নাহি করি। বিষয় পাসরো, অহর্নিশ বোল হরি।'

মুলুকপতির দরবারে হরিদাসকে হাজির করানো হল। ধর্মীয় প্রশ্নের বিচার হবে তাই অনেক গণ্যমান্যের সমাবেশ হয়েছে। আটজন কাজী আসন নিয়েছে মঞ্চে। উজির নাজির তো আছেই।

মুলুকপতি হরিদাসকে সসম্মান আসন দিল। সাদর সম্ভাষণ করে বললে, তোমার ভাই এমন দুর্মতি হল কেন? মুসলমান হয়ে কেন তুমি হিন্দু-আচারে মন দিলে? শোনো, তোমাকে কলমা পড়ে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

হরিদাস বললে, প্রভু, ঈশ্বর এক, শুদ্ধ ও শাশ্বত। তিনিই সকলের হৃদয়ে একাসনে বিরাজ করছেন। তিনিই হিন্দুর কৃষ্ণ, মুসলমানের আল্লা। তিনিই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, ভক্তের ভগবান। হিন্দুর পুরাণে যে সার-কথা, মুসলমানের কোরানেও সেই সার-কথা। যার যেমন রুচি সে তেমনি ভাবে তেমনি নামে ঈশ্বরকে ডাকে। নামে আলাদা ডাকে এক। ঈশ্বর আমাকে যে নাম নিতে প্রেরণা দিচ্ছেন আমি সেই নামে তাঁকে ডাকছি। কত হিন্দুও তো স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে ঈশ্বরকে আল্লা বলছে। তেমনি আমিও হিন্দু হয়ে ঈশ্বরকে কৃষ্ণ বলছি, রাম বলছি, হরি বলছি। আপনি যদি মনে করেন এতে আমার অপরাধ হচ্ছে আমাকে যথোচিত শাস্তি দিন।

মুলুকপতি নরম হতে চাইলেও গোড়াই কাজী টলল না। বললে, একে যদি শাস্তি না দেন তাহলে মুসলমান সমাজে অনাচার প্রশ্রয় পাবে।

মুলুকপতি কঠিন হল। বললে, সত্যিই তো, নিজের শাস্ত্রমতেই তোমার চলা উচিত। তুমি নিজের শাস্ত্র বলো, তোমার আর কোনো চিন্তা থাকবে না।

হরিদাস বললে, ঈশ্বর আমাকে দিয়ে যা বলান তাই বলব, যা করান তাই করব। এর অন্যথা হতে পারবে না।

তোমাকে হরিনাম ছাড়তে হবে।

যদি আমার শরীরকে টুকরো টুকরো কেটেও ফেলা হয় আমি হরিনাম ছাড়তে পারব না। 'খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ। তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।'

গোড়াই কাজীর দিকে তাকাল মুলুকপতি। এখন একে কী শাস্তি দেব বলো ?

একে বাইশ বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত মারতে হবে। গর্জে উঠল গোড়াই। মেরে মেরে শেষ করে দিতে হবে। যবন হিঁদুয়ানি করলে প্রাণান্তই তার উদ্ধারের একমাত্র পথ।

পাইকেরা দড়ি দিয়ে বাঁধল হরিদাসকে। বাজারে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত মারতে লাগল। শোকে দুঃখে ক্রোধে অভিভূত জনতা পাইকদের পায়ে পড়ে মিনতি করতে লাগল, তোমাদের টাকা দিচ্ছি, ঠাকুরকে তোমরা আস্তে আস্তে মারো, অল্প করে মারো। তাঁর রক্তাক্ত গাত্র দেখতে পারি না।

পাইকদের প্রাণে দয়ার ছায়ামাত্র নেই। এ বাজারে জনতা ক্লিষ্ট হয় তো ও বাজারে নিয়ে যায়।

কিন্তু হরিদাস—হরিদাসের কী অবস্থা ?

হরিদাসের দেহস্মৃতি নেই, সে কৃষ্ণনামামৃতসমুদ্রে ডুবে আছে। শত প্রহারেও তার মুখে মালিন্য নেই, নির্মম নির্যাতন সত্ত্বেও সে কৃষ্ণবিশ্রামে প্রসন্ন-পরিপূর্ণ।

এত মারেও মরে না কে এ লোকাত্তর পুরুষ। পাইকদের কি রকম ধাঁধা লাগল। এ কোনো পীর নাকি ? নইলে মরে না কেন ? না মরলে যে আমরা মরব। মুলুকপতির আদেশ পালন করতে পারিনি বলে আমাদের প্রাণদণ্ড হবে।

অত্যাচারীদের দুঃখেই দুঃখিত হরিদাস। আমি বেঁচে থাকলে যদি তোমাদের অমঙ্গল হয় তবে আমি মরি।

কৃষ্ণধ্যানে যোগমগ্ন হল হরিদাস। নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

মৃতজ্ঞানে নিশ্চিন্ত পাইকেরা হরিদাসকে মুলুকপতির দরজায় এনে ফেলে দিল।

মুলুকপতিও দেখল, মরে গেছে। বললে, একে তবে মাটি দাও।

গোড়াই আপত্তি করে উঠল। ওকে কবর দিলে তো ও তরে যাবে। ওর মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দাও। যাতে চিরকাল ও দুঃখ পায়। চিরকাল দুর্গতিতে থাকে।

পাইকেরা ধরাধরি করে হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিল।

ভাসতে ভাসতে অবশেষে তীরে এসে উঠল হরিদাস। ছুটল ফুলিয়ার দিকে। মুখে শুধু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

দেশময় সাড়া পড়ে গেল। মরা হরিদাস বেঁচে উঠেছে। যে নামের সে আশ্রয় করেছিল সেই নামই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

স্বয়ং মুলুকপতি এসে পায়ে পড়ল। আমাদের সকল অপরাধ মার্জনা করুন। আপনাকে কেউ চিনতে পারিনি। আপনি যেখানে খুশি সেখানে যান, যা খুশি নাম করুন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।

হরিদাস গোফায় বসে কৃষ্ণকীর্তন শুরু করল।

সেই গোফায় কোন্ দূর বিবরে এক বিষধর সাপ ছিল। হরিদাসের কাছে যারা আসে তারা বিষের জ্বালায় ছটফট করে। কী ব্যাপার ? হরিদাসের আশ্রমে এই জ্বালা কেন ?

হরিদাস বলে, কই আমি তো কিছু বুঝি না।

ফুলিয়ার বেদেরা এসে বললে, গোফার নিচে এক মহানাগ বাস করছে। তার বিষেই এই দাহ।

আপনি এ গোফা ছেড়ে অন্যত্র চলুন। ভক্তদল হরিদাসকে অনুনয় করল। আমাদের এখানে আসতে আতঙ্ক হচ্ছে। তারপর বিষের জ্বালায় আমরা বসতে পারছি না।

অলক্ষিত সাপকে সম্বোধন করে হরিদাস বললে, যদি কোনো মহাশয় এখানে সর্পরূপে থেকে থাকেন তিনি দয়া করে কালকের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করুন, নয়তো ভক্তকষ্ট পরিহার করতে আমি নিজেই এ গোফা ছেড়ে যাব।

সন্ধ্যাকালে সকলে দেখল এক প্রকাণ্ড সাপ বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। পীতে-নীলে-শুক্লে মহা-ভয়ঙ্কর পরম সুন্দর সাপ, মাথায় মহামণি, ধীরে ধীরে চলে গেল অন্যত্র।

হরিদাসের দৃষ্টিতে অবিদ্যা-বন্ধন দূর হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল তাপ-দাহ।

অদ্বৈতের মতো নবদ্বীপে গৌরজন্ম জানতে পারল হরিদাস। এত দিন নির্জনে সাধন করছিল, এখন গৌরাঙ্গের আনন্দের হাটে এসে বেসাতি নিয়ে বসল।

গৌরাঙ্গ সাতপ্রহর ধরে ভাবে আবিষ্ট থেকে সর্বাবতার মূর্তি দেখালেন।

হরিদাসকে ডেকে বললেন, বাইশ বাজারে ওরা যখন তোমাকে বেত মারছিল তখন তুমি আমাকে স্মরণ করেছিলে। তাই একটা ঘা-ও তোমার পিঠে পড়তে দিইনি. সমস্তই আমি নিজে পিঠ পেতে নিয়েছি। এই দেখ চিহ্ন। প্রভু শ্রী-অঙ্গ মুক্ত করে আঘাতের চিহ্ন দেখালেন। বললেন, হরিদাস, আমার দেহের চেয়ে তোমার দেহ অনেক বড়। আমার প্রকাশে যদিও বা কিছু দেরি হত, তোমার কষ্ট সইতে না পেরেই আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

জলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥

কারুণ্যপূর্ণ কথা শুনে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে কাঁদতে লাগল হরিদাস।

নবদ্বীপের চাঁদ কাজী নগরকীর্তন বন্ধ করার হুকুম জারি করল। বৈষ্ণবদের মৃদঙ্গ মন্দিরা ভেঙে ফেলল। ফের যদি চেঁচাও জাত মারব।

এই কথা শুনে প্রভু রুদ্রাবতার হয়ে উঠলেন। বজ্রন :দ গর্জন করলেন, হরিদাস, নিত্যানন্দ, চলো, দ সন্ধ্যায় নবদ্বীপে কীর্তন করে বেড়াব, দেখি কার সাধ্য বাধা দেয় হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালো, সহস্র কণ্ঠে তোলো হরিধ্বনি।

নগরকীর্তনের বিরাট দল নিয়ে বেরুলেন গৌরহরি। সর্বাগ্রে অদ্বৈত, তারপর হরিদাস, তারপরে শ্রীবাস পণ্ডিত। পশ্চাতে মহাপ্রভু, সঙ্গে নিত্যানন্দ আর গদাধর।

কাজী ভয় পেয়ে পালাল অন্তঃপুরে।

কাজীকে দমন করতে এসেছিলেন প্রভু, উদ্ধার করে গেলেন। হুকুম বাতিল হয়ে গেল।

নবদ্বীপে গৌরহরির প্রতিটি লীলায় সহায়-সহচর হরিদাস।

যখন গৌরহরি নীলাচলে যাচ্ছেন, হরিদাস জিজ্ঞেস করল, আমার কি গতি হবে?

তোমার জন্যে আমি নীলাচলচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করব। বললেন গৌরহরি, তোমাকে নিয়ে যাব নীলাচলে।

যখন দাক্ষিণাত্য জয় করে প্রভু শ্রীক্ষেত্রে ফিরলেন, গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল।

হরিদাস অদ্বৈতকে জিজ্ঞেস করলে, আমি কি যেতে পারি?

তুমি নিশ্চয়ই যাবে। তোমাকে না দেখলে প্রভু দুঃখিত হবেন।

আমি শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে যাব না। দূর থেকে প্রভুর চরণ দর্শন করব।

দূর থেকে কেন?

আমি যে নীচ জাতি। আমার স্পর্শে ক্ষেত্রবাসী মহাত্মাদের শরীর অপবিত্র হবে।

সে সকল কথা প্রভু জানেন। তুমি চলো।

হরিদাস এসেছে তবু দলের মধ্যে নেই, মহাপ্রভু উদাসীন হয়ে রইলেন। যখন শুনলেন তার দৈন্যের কথা, দুঃখের কথা, ব্যাকুল হয়ে ছুটলেন তার সন্ধানে। কাশী মিশ্রকে ডেকে গম্ভীরার কাছে এক নির্জন উদ্যানে একটি কুটিরে হরিদাসের থাকবার জায়গা ঠিক করলেন। এখন কোথায় হরিদাস? তাকে পাই কোথায়? খুঁজি কোথায়?

পথের একধারে বসে উচ্চে নাম-কীর্তন করছে—ঐ তো হরিদাস।

প্রভু তার কাছে যেতেই হরিদাস তাঁর পায়ের উপর পড়ল। প্রভু তাকে বুকে তুলে নিলেন।

হরিদাস বললে, আমাকে ছাড়ো, আমাকে স্পর্শ কোরো না। আমি নীচ, অস্পৃশ্য, নরাধম।

তুমি ভাগবতোত্তম। তোমাকে স্পর্শ করি নিজে পবিত্র হতে। প্রভু প্রেমভরে হরিদাসকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন।

আত্মস্তুতি শুনে হরিদাস কানে আঙুল দিল।

চলো তোমার জন্যে বাসা ঠিক করেছি। রোজ আমি ওখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলব। গোবিন্দ তোমার জন্যে প্রসাদান্ন নিয়ে আসবে। তুমি মন্দিরের চক্র দেখে প্রণাম করবে আর নামসংকীর্তন করবে।

হরিদাসের সেই আবাসস্থলই সিদ্ধবকুল।

আমার একটি শুধু বাসনা। হরিদাস বললে, আমার মনে হচ্ছে তুমি শিগগিরই লীলা সম্বরণ করবে। আমাকে শুধু এই কৃপা কর, যেন তোমার অপ্রকট হবার আগেই আমার দেহপাত হয়। হৃদয়ে তোমার চরণকমল ধরতে ধরতে, চোখে তোমার মুখখানি দেখতে দেখতে আর মুখে তোমার নাম বলতে বলতে আমার যেন প্রাণ যায়।

প্রভু বললেন, হরিদাস, তোমার কোনো প্রার্থনাই কৃষ্ণ অপূর্ণ রাখবেন না। কিন্তু আমার যা সুখ সব তো তোমাকে নিয়ে। তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে কী করে?

একটা পিপীলিকা চলে গেলে পৃথিবীর কোনো হানি হয় না। আমার মত ক্ষুদ্র জীবাধমের অভাবেও তোমার লীলায় কোনো ত্রুটি হবে না।

সিদ্ধ-বকুলের অঙ্গনতলে প্রভু কীর্তন আরম্ভ করলেন।

অনাবৃত স্থানে রোদ-বৃষ্টি সহ্য করে হরিদাস দিবানিশি নাম করে, তার কষ্ট সইতে পারেন না গৌরহরি। হরিদাস তো গৃহবাসী হবে না, তাই তাকে কী করে আচ্ছাদন দেওয়া যায়, কী করে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানো যায়, উপায় খুঁজতে লাগলেন। একদিন জগন্নাথের দন্তকাষ্ঠ এনে নিজের হাতে পুঁতে দিলেন। সেই বকুল গাছের প্রসাদী দাঁতনই শাখা-পত্র-পল্লবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ছায়া আর আচ্ছাদন দুই-ই পেয়ে গেল হরিদাস।

হরিদাস প্রভুকে কাছে বসতে বললে। প্রভু বসলেন সন্নিহিত হয়ে।

প্রভুর দুখানি চরণ বুকের মধ্যে টেনে নিল হরিদাস, নিষ্পলক চোখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, বললে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আর নাম উচ্চারণ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণ ছেড়ে দিল।

সারা জীবন হরে-কৃষ্ণ বলে প্রাণ ছাড়বার সময় গৌরাঙ্গের নাম করলে। হরে-কৃষ্ণই সাধন, আর চৈতন্য-চরণই সাধ্য।

নাম-সাধনের ফলে অন্তিমে পাওয়া যাবে গৌরাঙ্গকে।

॥ ৬ ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত

শ্রীবাসের জন্ম শ্রীহট্টে, ব্রাহ্মণ বংশে। বাপের নাম জলধর পণ্ডিত। নবদ্বীপে এসে বাড়ি করে। বাড়ি করে কুমারহট্টেও। কিন্তু নিয়ত বাসস্থান নবদ্বীপ।

শ্রীবাসেরা চার ভাই। শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি আর শ্রীনিধি।

ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিল শ্রীবাস, প্রায় উদ্ধতের শিরোমণি। কিন্তু যখন তার ষোলো-সতেরো বছর বয়েস, গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখল কে একটা লোক কী পড়ছে, আর কতগুলি মানুষ গোল হয়ে বসে তাই শুনছে।

কী হচ্ছে রে ওখানে ?

গল্প পড়ছে। পুরাণের গল্প।

কে পড়ছে ?

দেবানন্দ পণ্ডিত।

যাই শুনি গে। গল্প যখন, ভালো লাগতে পারে।

জনতার এক পাশে শান্ত হয়ে বসল শ্রীবাস। একটু শুনেই বুঝে নিল দেবানন্দ ঠাকুর ভাগবত পড়ছে। বলছে প্রহ্লাদের কাহিনী। নিতান্ত গল্পই বলছে দেবানন্দ। প্রহ্লাদের ভক্তির কথা বলছে না, বলছে না শরণাগতির কথা। কী বলিষ্ঠ বিশ্বাসে কৃষ্ণের কাছে সর্বসমর্পণ করে দিয়েছে সে কথার ব্যাখ্যা কই।

এ কী রকম পাঠ ? শুধু অন্বয় আর অনুবাদ, লেশমাত্র ভক্তির সৌরভ

নেই। তবু প্রহ্লাদচরিত্রে ভক্তি কল্পনা করে নিতে বাধল না শ্রীবাসের, নিজের থেকেই প্রেমাকুল হয়ে কাঁদতে বসল।

এ জঞ্জাল জুটল কোত্থেকে? পাঠ শুনতে বসে কাঁদে! আর-আর পড়ুয়ারা শ্রীবাসকে হাত ধরে টেনে সভার বার করে দিল।

দেবানন্দ এতটুকু প্রতিবাদ করল না।

অদ্বৈত প্রভু নবদ্বীপে বাস করতে এসেছে কিন্তু তার সময়ের বেশির ভাগই কাটে শ্রীবাসের বাড়িতে। অদ্বৈত যখন টোল খুলল তখন শ্রীবাসই তার মনোযোগী ছাত্র।

সমাজের দুরবস্থা দেখে অদ্বৈত আর শ্রীবাস দুজনেই খুব বিমর্ষ—শোধন-সাধন করতে যদি কোনো অবতারপুরুষ আসতেন!

গৌরাঙ্গের আবির্ভাব-তিথিতে চন্দ্রগ্রহণের মুহূর্তে শ্রীবাস হঠাৎ উল্লাস করে উঠল। কী হল, কী হল? কী হল কে জানে। মনে হচ্ছে কে যেন এসেছে।

জগন্নাথ আর শ্রীবাস প্রতিবেশী, দুই পরিবারে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তাই নিমাইয়ের জন্মকালে মঙ্গলকর্মে শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনীর ডাক পড়ল। শ্রীবাসও সাহায্য করল জগন্নাথকে। মালিনীর মধ্যে জাগল বাৎসল্যভাব আর শ্রীবাসের মধ্যে শুধু দাস্যভাবে সেবাবাসনা।

কিন্তু নিমাই যত বড় হয়ে উঠছে ততই উদ্ধতের চূড়ামণি হচ্ছে। রূপে-গুণে ভুবনমোহন হয়ে এ তার কী কঠিন আচরণ! সর্বক্ষণ কেবল পুঁথি হাতে করেই রয়েছে, মুখে একটুও কৃষ্ণকথা নেই। নেই ভক্তির আর্দ্রতা।

অথচ শ্রীবাসেরা চার ভাই কতদিন ধরে রুদ্ধগৃহে উচ্চনাদে কীর্তন করছে—ভগবানের আবির্ভাবের আশ্বাসে। এ নিয়ে পাষণ্ডীদের কাছে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয়েছে তাদের, কত বা বক্র পরিহাস। আস্তে আস্তে কীর্তন করা যায় না? এত চেঁচাবার কী দরকার? আর পাগলের মত নাচতে হবে এই বা কোন্ শাস্ত্রে লিখেছে? কেউ বলছে, বেটাদের ঘর ভেঙে গঙ্গায় ফেলে দাও, কেউ বলছে তাড়িয়ে দাও নবদ্বীপ থেকে। তবু সব তারা সহ্য করেছে কৃষ্ণ-আবির্ভাবের মুহূর্ত গুনে-গুনে। জগন্নাথের ঘরে এক অদ্বিতীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেও তার এ কী বিমুখ ব্যবহার! সেও কিনা বিদ্যারসেই মত্ত!

আহা নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হত কত সুখের হত! শুকনো ডালে ফুল ফুটত। মরা নদী উজান বইত। মুখে-মুখে জেগে উঠত হরিনাম।

একদিন পথের উপর নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা। হাতে তেমনি পুঁথি। বিদ্যার ঝুড়ি।

উদ্ধতের চূড়ামণি, চলেছ কোথায়? শ্রীবাস গর্জন করে উঠল।

নিমাই বিনয়ে নমস্কার করে পদ্মনেত্রে তাকিয়ে রইল।

রাত্রি-দিন কী অত পড়ছ-পড়াচ্ছ? পুঁথির মধ্যে আছে কী?

নিমাই যেন নিজেও জানে না কী আছে।

লোকে পড়ে কেন? বললে, আবার শ্রীবাস, শুধু একটি কথা জানবার জন্যে, তার নাম কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণভক্তি। শোনো, গম্ভীর মুখে উপদেশ করল শ্রীবাস, অনেক তো পড়লে, এখন একটু কৃষ্ণভজন করো।

আপনাদের কৃপায় তাও একদিন হতে পারে।

গয়া থেকে ফিরে আসার পরেই নিমাইয়ের মধ্যে প্রেমবিকার জাগল। শচীমাতা ভাবলেন, নিমাইয়ের বায়ুব্যাধি হয়েছে, বললেন, চিকিৎসক ডাকো, আমার নিমাইয়ের উন্মাদ-বায়ু ভালো করে দিক।

শ্রীবাস দেখতে এল।

আশ্চর্য, শ্রীবাসকে স্বাভাবিক অনুরাগে নমস্কার করল নিমাই। ভক্ত দেখে তার ভক্তিভাব আরো বেড়ে গেল। মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

একে বায়ুরোগ কে বলে? শ্রীবাস বললে, এ মহাভক্তিযোগ।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে নিমাই জিজ্ঞেস করলে, তোমার কী মনে হয়? বায়ুরোগ? এ আমার একটা বাই?

শ্রীবাস বললে, তোমার উপরে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হয়েছে, তোমার শরীরে মহাভক্তিযোগ দেখতে পাচ্ছি। এরকম বাই যদি আমার হত! 'তোমার যেমন বাই তাই আমি চাই।'

নিমাই গম্ভীর হয়ে বললে, তুমিও যদি বায়ুরোগ বলতে তাহলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরতাম।

কিন্তু শচীমাতার বায়ুজ্ঞান দূর হলেও ভাবনা দূর হয় না। নিমাইকে তিনি বেঁধেই রাখতে চান, আগে ভয় ছিল মাটিতে কেবল আছাড় খায়, এখন ভয় হল, উদাসীন হয়ে না বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

সেই থেকে শ্রীবাসের অঙ্গনে নিমাইয়ের [illegible]

চলল পুরো এক বছর।

বহির্মুখদের বাইরে রাখবার জন্যে দ্বারে কপাট দিয়ে কীর্তন হয়। তাতে পাষণ্ডীরা জ্বলে-পুড়ে মরে, ভাবে শ্রীবাসকে কী করে জব্দ করবে।

গোপাল চাপাল সেই পাষণ্ডীদের প্রধান। যেমন বাচাল তেমনি দুর্মুখ। বিদ্যার ঔদ্ধত্যে বেশি বকবক করত বলেই সবাই চাপাল বলত।

সে একদিন শ্রীবাসের রুদ্ধ দ্বারের পাশে মদের ভাণ্ড রেখে গেল।

শ্রীবাস দরজা খুলে দেখল ভক্তবিদ্বেষের বিষ কতদূর ছড়িয়েছে। মদের ভাণ্ড রেখে বোঝাতে চাইছে শ্রীবাস মদ খায়।

শ্রীবাস শিষ্টজনদের ডেকে এনে দেখাল।

বিষের ক্রিয়া দেখতে দেখতে চাপাল গোপালের দেহে প্রকট হল কুষ্ঠরূপে।

নীলাচল থেকে মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়া গ্রামে এলেন তখন চাপাল গোপাল তাঁর পায়ে পড়ল।

গৌরহরি বললেন, শ্রীবাসের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও, তিনিই তোমার ভক্তবিদ্বেষের পাপ মোচন করবেন।

শ্রীবাসের শরণ নিল গোপাল। শ্রীবাসের কৃপায় নিরাময় হয়ে গেল।

কিন্তু এখন যে শুনছি নবাবের লোক শ্রীবাসকে বেঁধে নিতে আসছে। পাষণ্ডীর দল নালিশ করেছে শ্রীবাসের বিরুদ্ধে। তার কীর্তনের জ্বালায় আমরা টিকতে পারছি না।

নবাবের নৌকো এসে পড়ল বলে।

শ্রীবাস ভয় পেল। কিন্তু গোবিন্দস্মরণ সমস্ত ভয়ের উপর। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে উপস্থিত থাকতে তার ভয় কিসের?

বিশ্বম্ভর প্রভু নগরে একা-একা ঘুরে বেড়ায়। নিরস্ত্র ও নিঃসঙ্গ। কই নবাবের নৌকো, নবাবের রাজশক্তি!

শ্রীবাসের বাড়ি গিয়ে দেখল শ্রীবাস ঘরে দরজা দিয়ে নৃসিংহদেবের পূজো করছে।

কার পূজো করছিস? কার ধ্যান? বন্ধ দরজায় লাথি মারতে লাগল নিমাই: যার পূজো করছিস চেয়ে দেখ সেই তোর সামনে বসে আছে।

শ্রীবাস চেয়ে দেখল ঘরে দরজা নেই, বীরাসনে বিশ্বম্ভর চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরে বসে আছে। বলছে, তোর ভয় নেই, যদি নবাবের

নৌকো আসে, আমি তাতে আগে গিয়ে চড়ব, সকলের আগে নবাবকে দিয়ে কৃষ্ণ বলাব। যদি মত্ত হস্তিও নিয়ে আসে দেখবি সেও কৃষ্ণ বলবে। আমাকে ছাখ, আমাকে দেখে নির্ভ ্র।

শ্রীবাসের গৃহেই গৌরাঙ্গের অভিষেক হল।

ঘরের সকলেই প্রাণ ঢেলে সেবা-পূজার কাজ করতে লাগল।

ঐ পরিচারিকার নাম কী?

দুঃখী। ওকে সবাই দুঃখী বলে ডাকে।

আজ থেকে ওর নাম সুখী হয়ে গেল। বললেন গৌরহরি, ওকে সবাই সুখী বলে ডেকো। শ্রমনিষ্ঠাতেই ওর অনন্ত ভক্তি। ও ভক্তিতেই আনন্দিতা।

কিন্তু সেদিন কীর্তনে উল্লাস আসছে না কেন? মহাপ্রভু উন্মনা হয়ে উঠলেন। বললেন, নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে আছে এখানে।

অন্তরে ভক্তি নেই, শুধু কৌতূহলে আকৃষ্ট হয়ে এসেছে। পাছে ধরা পড়ে তাই এককোণে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে আছে লুকিয়ে।

খুঁজে বার করে নিতে দেরি হল না।

সে আর কেউ নয়, শ্রীবাসের শাশুড়ী। শাশুড়ী বলে তার মার্জনা নেই। তাকে সভাস্থল থেকে বার করে দেওয়া হল।

নিমেষে জমে উঠল কীর্তন।

কিন্তু সেদিন প্রভুর কীর্তনের মধ্যেই শ্রীবাসের ছেলেটি মারা গেল।

শ্রীবাস পরিজনদের বললে, কান্নাকাটি কোরো না। কোলাহল শুনলে প্রভুর নৃত্য-সুখে ভঙ্গ হবে। আর স্বয়ং প্রভু যেখানে নৃত্য করছেন সেখানে মৃত্যু কোথায়?

হঠাৎ প্রভু শ্রীবাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কোনো দুঃখ উপস্থিত হয়েছে?

দুঃখ? যার ঘরে তুমি, তোমার প্রসন্ন মুখ, সে ঘরে আবার দুঃখ কোথায়?

প্রভু, শ্রীবাসের শিশুপুত্রটি মারা গেছে। বললে এক ভক্ত, তোমার আনন্দভঙ্গের ভয়ে শ্রীবাস তোমাকে এতক্ষণ বলেনি।

প্রভু কেঁদে উঠলেন। দেখ দেখ শ্রীবাসের ভক্তি দেখ। আমার প্রতি প্রেমে সে পুত্রশোক পর্যন্ত ভুলে আছে।

তখন প্রভু মৃত শিশুকে প্রশ্ন করলেন, শ্রীবাসের গৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন?

মৃত শিশু কথা কয়ে উঠল। বলল, কে কার পিতা, কে কার পুত্র। যতদিন নির্বন্ধ ছিল পণ্ডিতের ঘরে খেলা করে গেলাম। এখন আবার অন্য ঘরে ডাক পড়েছে, চলেছি সেখানে। তুমিই সমস্ত খেলার মালিক। আবার তুমিই পিতা, তুমিই পুত্র, তুমিই সমস্ত পরিবার-পরিজন।

শ্রীবাসকে সান্ত্বনা দিলেন প্রভু। বললেন, তুমি পুত্রহারা হওনি। আজ থেকে আমি আর নিত্যানন্দই তোমার দুই পুত্র। এক পুত্র হারিয়ে তুমি দুই পুত্র পেলে।

একদিন কীর্তনের সময় নিবিড় মেঘ করে এল। সবাই ভাবল অঙ্গন বুঝি বৃষ্টিতে ভেসে যাবে, কীর্তন আর হতে পাবে না।

প্রভু একবার গগন-অঙ্গন নিরীক্ষণ করলেন। মেঘ কেটে গেল। বৃষ্টি ঝরল না।

সেদিন শ্রীবাসকে বললেন, শ্রীবাস, বৃহৎ সহস্রনাম পড়ো।

শুনতে শুনতে প্রভুর নৃসিংহ-আবেশ হল। গদা হাতে নিয়ে পাষণ্ডদলন করতে নগরে ধাবিত হলেন। লোকজন ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল।

লোকভয় দেখে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন প্রভু। শ্রীবাসের ঘরে ফিরে এসে গদা ফেলে দিলেন। বললেন, পথের মানুষকে অকারণে ভয় পাইয়ে উদ্বিগ্ন করেছি। শ্রীবাস, আমার অপরাধ হয়েছে।

শ্রীবাস বললে, তোমার আবার অপরাধ কী। নৃসিংহের ভাবে তোমাকে যে দেখেছে সেই উদ্ধার পেয়েছে। তোমার রুদ্রমূর্তি তাই মঙ্গলের হেতু। তুমি মারতে আসছ এই বলে তোমার যে নাম করেছে তাতেই তার পাপক্ষয় হয়ে গেছে। সুতরাং তোমার কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই।

দেবানন্দ পণ্ডিতকে একদিন তিরস্কার করলেন গৌরহরি।

তুমি না আমার শ্রীবাসকে একদিন সভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে? ভাগবত শুনতে শুনতে সে কৃষ্ণপ্রেমে কেঁদেছিল এই অপরাধে?

দেবানন্দ চুপ করে রইল।

ভাগবত পড়ানো তাহলে ছেড়ে দাও। প্রেমভক্তিই তো ভাগবত। তাহলে কী সুখে তুমি শ্রম করছ? যদি ভাগবতে প্রেমেরই দেখা না পেলে তবে কিসে, কোথায় তোমার সন্তোষ?

দেবানন্দ ভাগ্যবান, প্রতিবাদ করল না। নম্রশিরে দণ্ড স্বীকার করে নিল। যে প্রভুর দণ্ড নিতে জানে সে অনায়াসে ভক্ত হয়ে ওঠে।

এ যবন কে ?

এ আমার দরজি ! বললে শ্রীবাস।

আমার ভক্তের দরজি ? গৌরহরি সে যবন-দরজিকেও কৃপা করলেন।

কিন্তু তাই বলে তুমি ঐ মাতালটার ঘরে যেতে পারবে না। শ্রীবাস ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গকে বাধা দিল।

প্রভু বললেন, আমার বেলায়ও কি বিধিনিষেধ খাটবে ? আমি যাব।

কিন্তু আমিও বলছি, তুমি যদি ঐ মাতালের বাড়িতে যাও আমি গঙ্গায় ডুবে মরব।

মাতাল তো ভক্তিহীন আর শ্রীবাস তো ভক্ত। ভক্তের সংকল্প প্রভু লঙ্ঘন করতে পারলেন না।

যা বলেছ, তোমার বাক্য মিথ্যে করতে পারি না। প্রভু হার স্বীকার করে অন্য পথে পা বাড়ালেন।

সন্ন্যাসের আগে শ্রীবাসকে বললেন, কুমারহট্টে গিয়ে বাস করো।

দাক্ষিণাত্য থেকে নীলাচলে ফিরলে প্রভুদর্শনে গেল শ্রীবাস, সঙ্গে তার তিন ভাই। প্রভু বললেন, আমি তোমাদের চার ভাইয়ের মূল্যক্রীত।

তুমি বিপরীত বললে। তোমার কৃপামূল্যে আমরাই তোমার কাছে বিক্রীত হয়েছি।

নীলাচলে প্রভুর নাচ দেখছেন প্রতাপরুদ্র, পাশে তাঁর মহাপাত্র হরিচন্দন। কিন্তু সামনে শ্রীবাস দাঁড়িয়ে আছে বলে দর্শনে ব্যাঘাত হচ্ছে। হরিচন্দন বারে বারে শ্রীবাসকে ঠেলছে, একপাশে সরে দাঁড়াবার জন্যে। তন্ময়তার জন্যে শ্রীবাস প্রথমটা লক্ষ্য করেনি, কিন্তু শেষবার ধাক্কাটা একটু জোরালো হল দেখে শ্রীবাস হরিচন্দনকে চড় মেরে বসল।

হরিচন্দন রুখে দাঁড়াল।

প্রতাপরুদ্র তাকে নিরস্ত করলেন। বললেন, তোমার মহাভাগ্য, তুমি ভক্ত শ্রীবাসের হস্তস্পর্শ পেলে। তোমার নিজেকে কৃতার্থ মনে করা উচিত। আমার ভাগ্যে নেই আমি পেলাম না।

প্রতি বৎসরই নীলাচলে গিয়ে প্রভুকে দেখে আসে শ্রীবাস। কোনো কোনো বার মালিনীকে সঙ্গে নেয়। মালিনীও বাৎসল্যভাবে নানা ব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়ায় প্রভুকে।

প্রভুর নিজের মাকে মনে পড়ে যায়।

বললেন শ্রীবাস, জগন্নাথের এই প্রসাদী বস্ত্রখানা তুমি আমার মাকে দিও। তাঁর সেবা ছেড়ে আমি যে সন্ন্যাস করেছি আমার সেই অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিও। তাঁকে বোলো আমি নিত্য তাঁর গৃহে যাই, তাঁর হাতের রান্না খেয়ে আসি। একবার সব ফুরিয়ে ফেলি, আবার সব ভরে দিই। তুমি বললেই মার বিশ্বাস হবে।

অদ্বৈতের সঙ্গে শ্রীবাসও জুটল মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলে স্তব করতে।

যে একান্তে থাকতে চায় তাকে সকলের সামনে টেনে আনো কেন? মহাপ্রভু আপত্তি করলেন।

শ্রীবাস বললে, সূর্য একবার উঠে পড়লে তাকে কি আর গোপন করা চলে? ঐ দেখ হরিধ্বনি করে জনতা আসছে তোমার চরণদর্শনে। বলো আমি হাত দিয়ে সূর্যকে ঢেকে রাখি!

শান্তিপুরে এসেছিলেন গৌরহরি, সেখান থেকে গিয়েছেন কুমারহট্টে, শ্রীবাসের বাড়িতে। শ্রীবাসের তখন দারুণ দুর্দিন, তেল দীপের তলায় এসে ঠেকেছে।

ঘর থেকে তো কোথাও বেরোও না দেখছি, শ্রীগৌরাঙ্গ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে চালাও কী করে?

প্রভু, কোথাও গিয়ে ভিক্ষে করতে ইচ্ছে করে না।

তোমার এত বড় পরিবার, উপযুক্ত উপার্জন না করলে নির্বাহ করবে কী করে?

অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

তবে তুমি সন্ন্যাস করো।

পারব না।

ভিক্ষেও করবে না সন্ন্যাসও করবে না তবে এই পরিবার পোষণ হবে কী করে? তোমার ঘরে এনে কাউকে তো কিছু দিয়ে যেতেও দেখলাম না। তবে তুমি কী করে চালাবে আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

শ্রীবাস দু হাতে তালি দিয়ে উঠল—এক, দুই, তিন তালি। বললে, এই এক, দুই, তিন তালি দিয়ে চুপ করে যাব।

তার অর্থ কী?

তার অর্থ তিন দিন উপবাস করব আর তিন দিন উপবাসের পরও যদি আহার না জোটে গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গায় ডুবব।

কী? আমার ভক্ত শ্রীবাস অন্নের দুঃখে উপবাস করে থাকবে? গৌরহরি হুঙ্কার ছাড়লেন: যদি লক্ষ্মীও ভিক্ষে করে, আমার ভক্তের গৃহে দারিদ্র্য থাকবে না। গীতায় কী বলেছি তোমার মনে নেই? যে অনন্যমনা হয়ে শুধু আমাকেই উপাসনা করে, সর্বভাবে আমাতেই আসক্ত থাকে তার যোগক্ষেম আমি বহন করি।

যে যে জনে চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভিক্ষা দেই মুই মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনি আসিয়া সর্বসিদ্ধি মেলে তারে॥

বেশ, তুমি তোমার ঘরেই বসে থাকো, শ্রীবাসকে আশ্বাস দিলেন প্রভু, সমস্ত আপনা-আপনিই চলে আসবে।

শ্রীরামকে ডেকে বললেন, ঈশ্বরবুদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসের সেবা করবে।

শ্রীরাম প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করল।

গৌরাঙ্গের তিরোভাবের পরেও শ্রীবাস বেঁচে ছিল, কিন্তু কোথায়, কত দিন, কেউ জানে না।

দুই গদাধর

॥ ৭ ॥

গদাধর পণ্ডিত

চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রামে মাধব মিশ্রের বাড়ি। তার স্ত্রী রত্নাবতী। তাদের দুই ছেলে—বাণীনাথ আর গদাধর।

মাধব বেলেটি ছেড়ে চলে আসে নবদ্বীপে। আর নবদ্বীপেই গদাধরের জন্ম। গদাধর আশৈশব নিমাইয়ের সঙ্গী।

দুইজনে একসঙ্গে পড়াশোনা করে, ন্যায়চর্চা করে। একসঙ্গেই অদ্বৈতের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

একদিন পথের উপর গদাধরকে ধরল নিমাই।

ন্যায় পড়ে খুব তো পণ্ডিত হয়ে উঠেছ, নিমাই বললে, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

তর্কে পরাঙ্মুখ নয় গদাধর। বললে, বলো।

মুক্তির লক্ষণ কী?

শাস্ত্রগত অর্থ জানা যা আছে, বললে গদাধর।

নিমাই বললে, ঠিক হল না।

আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি। গদাধর আবার ব্যাখ্যা করল।

নিমাই সে ব্যাখ্যাও খণ্ডন করে দিল। বললে, এখন বাড়ি যাও, পরে বুঝবে।

কিন্তু গদাধর এ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না নিমাইয়ের প্রতি অদ্বৈতের স্নেহ কেন বন্দনার চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। তার প্রতি ঈশ্বর পুরীই বা কেন এত সশ্রদ্ধ! নিমাইয়ের বিদ্যাবুদ্ধি বেশি এ কে না স্বীকার করবে, কিন্তু এরা যেন আরো কী অতিরিক্ত দেখেছে ওর মধ্যে। কই গদাধর তো কিছু বোঝে না। পড়ায়-খেলায় সব সময়ে সে নিমাইয়ের কাছাকাছি আছে বলেই বুঝি এই দৃষ্টির অল্পতা।

নিমাই গয়া থেকে ফিরে একেবারে এক নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীবাসের বাড়িতে ফুল তুলছে গদাধর। সাজি হাতে শ্রীমান পণ্ডিতও এসেছে, তার সমস্ত মুখে হাসির ফুল ফোটানো।

এত হাসি কেন? শ্রীবাস জিজ্ঞেস করল।

কাল নিমাই গয়া থেকে ফিরেছে। শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। সেই উদ্ধত নিমাই কেমন করুণ, কোমল বিনম্র হয়ে গিয়েছে। আনন্দে কেবল কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে কাঁদছে। দেখে আর তাকে মানুষ বলে বোধ হচ্ছে না।

বলো কী? আমাদের মনস্কামনা তাহলে সিদ্ধ হল?

আজ প্রাতে আমাকে, তোমাকে আর সদাশিবকে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে যেতে বলেছে। তার মনে কী দুঃখ তা সে ব্যক্ত করবে। ফুল তুলেই যাব সেখানে। তুমিও চলো।

কই গদাধরকে তো নিমাই যেতে বলেনি।

তাই বলে সে কি যাবে না? দেখবে না নিমাইকে? শুনবে না তার কী দুঃখ?

গদাধর গেল বটে কিন্তু শুক্লাম্বরের ঘরের এক কোণে লুকিয়ে রইল। অঙ্গনে ভক্তসমাবেশে যে তার নিমন্ত্রণ নেই।

দীর্ঘকায় সবল-সুন্দর পুরুষ নিমাই এসে দাঁড়াল অঙ্গনে। বন্ধুদের দেখে হৃতসর্বস্বের মত কেঁদে উঠল : আমার কৃষ্ণ কোথায় কোন্ দিকে গেল? এই তো আমার কাছে ছিল কিন্তু এখন আর দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় লুকোল?

সে কী আর্তি! সে কী অশ্রু!

মূর্ছিত হয়ে পড়ল নিমাই।

মূর্ছাভঙ্গের পর নিমাই শুনতে পেল ঘরের মধ্যে বসে কে কাঁদছে।

ঘরের মধ্যে কে? উতলা হয়ে জিজ্ঞেস করল নিমাই।

শুক্লাম্বর বললে, তোমার গদাধর।

শুধু গদাধর নয়, তোমার গদাধর। বাল্যকাল থেকেই সে নিমাইয়ের পিছে-পিছে ছায়ার মত ফিরছে, বাল্যকাল থেকেই তার সংসার-বিরক্তি।

গদাধরকে ডাকল নিমাই। বললে, গদাধর, বাল্যকাল থেকেই তুমি কৃষ্ণ-ভজন করছ, কিন্তু আমার—আমার কী হল? শুধু বৃথা-রসে আমার জীবন গেল। আমি কৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, আমার নিজের দোষে সে অমূল্যনিধিকে হারিয়ে ফেলেছি। বলো কোথায় গেলে তাকে খুঁজে পাব?

নিমাই আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

আরেক দিন গদাধরকে নিরালায় পেয়ে নিমাই ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আমার কৃষ্ণ কোথায়?

গদাধর বললে, তোমার কৃষ্ণ তো তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

দুই হাতের নখে নিমাই তার বুক চিরতে লাগল। গদাধর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিরস্ত করল। শচীমাতা ছুটে এলেন। গদাধর নিমাইকে রক্ষা করেছে দেখে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন। বললেন, গদাধর, তুমি নিমাইয়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকো, ও যেন কোনো ব্যথা না পায়, ওর যেন না কোনো অপঘাত ঘটে।

নবদ্বীপে গদাধরই নিমাইয়ের দেহরক্ষী।

একদিন মুকুন্দ দত্ত এসে বললে, তোমার তো বৈষ্ণব দেখতে ইচ্ছে, চলো তোমাকে অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাব।

সত্যি? এক্ষুনি যাব। গদাধর উৎসাহিত হয়ে উঠল।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে গদাধরকে নিয়ে গেল মুকুন্দ। বললে, এই দেখ।

গদাধর বিনয়-অভ্যাসে নমস্কার করল বটে কিন্তু এ সে কী দেখছে? দেখছে সজ্জিত খাটের উপর সুন্দর শয্যায় চন্দ্রাতপের নিচে বিলাসবেশে কে এক রাজপুত্র বসে আছে, চার পাশে নরম বালিশ, বাটায় পান, তাম্বুলরাগে ঠোঁট দুটি লাল, তাতে আবার হাসি, চাকরের হাতে ময়ূরের পাখায় দিব্যি হাওয়া খাচ্ছে আরামে। শুধু তাই নয়, চুলের পারিপাট্য দেখেছ? তার উপর আবার আমলকী তেলের সুবাস ছেড়েছে।

ভালো বৈষ্ণব দেখতে এসেছি যাহোক। গদাধরের সমস্ত মন কুঁকড়ে গেল। ইনি কে? জিজ্ঞেস করল পুণ্ডরীক।

ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র গদাধর। বললে মুকুন্দ, ইনি ন্যায় পড়েছেন, কিন্তু সেটা এঁর পরিচয় নয়, শিশুকাল থেকেই ইনি ভক্তি-পথের পথিক—এটাই এঁর পরিচয়।

তা এঁর তেজোময় শরীর দেখে বুঝতে পারছি। ইনি আকৃতিতে সুন্দর, প্রকৃতিতেও সুন্দর। পুণ্ডরীক সমর্থন করল।

তবু গদাধরের অপ্রসাদ ঘোচে না।

তার মনোভাব বুঝতে পেরেছে মুকুন্দ। ভাবল পুণ্ডরীকের আসল রূপ এবার প্রকাশ করে দিই।

ভাগবত থেকে পুতনা-সম্পর্কিত শ্লোকটি সে সুস্বরে আবৃত্তি করল:

আহা, যে রাক্ষসী পুতনা কৃষ্ণকে মারবার জন্যে স্তনে কালকূট মিশিয়ে পান করানো সত্ত্বেও স্বর্গে ধাত্রীগতি পেয়েছে, সেই দয়াময় হরি ছাড়া আর কার আশ্রয় নেব?

শ্লোক শোনা মাত্রই পুণ্ডরীকের শরীরে সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব ফুটে উঠল, পুলকহুঙ্কার করে চারদিকে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে মাটিতে আছড়ে পড়ল। কোথায় গেল তার পানের বাটা, ময়ূরের পাখা, গন্ধজলের ঝারি। নিজের বেশবাস নিজেই দু'হাতে ছিঁড়তে লাগল—আর কেশপাশ ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেল। আকুলকণ্ঠে কাঁদতে লাগল পুণ্ডরীক, কৃষ্ণ, আমার প্রাণ, আমার ঠাকুর, আমাকে তুমি পাষাণ করলে কেন? কবে তুমি আমাকে ভক্তি দেবে? কবে এ পাষাণ বিগলিত হবে?

ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর কাঁদছে পুণ্ডরীক।

গদাধর ভয় পেল। আমি ভক্তদ্রোহী হলাম। শুধু বসনে-ভূষণে বিচার করলাম। শুধু গেরুয়া-কৌপীন পরলেই ভক্ত হয় না। আর মাথায় গন্ধতেল

মেখেছে বলে ভণ্ড বলবে এ ঠিক নয়।

মুকুন্দকে বললে, পরিচ্ছদ দেখে বৈষ্ণবকে বিষয়ী ভেবেছিলাম, তুমিই দেখালে প্রচ্ছন্ন ভক্তকে। কিন্তু আমি যে প্রথমে এঁকে অবজ্ঞা করেছিলাম তার স্খালন হবে কিসে? মুকুন্দ, আমি ঠিক করেছি, আমি এঁর থেকে দীক্ষা নেব। এঁর থেকে দীক্ষা নিলে ইনি আমাকে শিষ্যবোধে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

প্রস্তাব শুনে পুণ্ডরীকের আনন্দ আর ধরে না। বললে, বহু পুণ্যে এমন শিষ্য মেলে। আগামী শুক্লা দ্বাদশীতেই দীক্ষা দেব।

নিমাইয়ের কাছে অনুমতি নিতে গেল গদাধর। সব বললে অকপটে। বললে, তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে তাঁর মার্জনা ক্রয় করে নেব। তুমি কী বলো?

সানন্দে সম্মতি দিল নিমাই। যত শিগগির পারো—যত শিগগির।

পুণ্ডরীকের কাছে দীক্ষা নিল গদাধর।

যার কাছেই দীক্ষা নিক, গদাধর গৌরাঙ্গেরই মর্মসঙ্গী। লীলাকালে গৌরাঙ্গকে গদাধরই তাম্বুল যোগায়, তার শয্যাস্তিকে নিজে শয্যা রচনা করে ঘুমোয়। গৌরাঙ্গের যত ভাববিনিময় সব গদাধরের সঙ্গে। চন্দ্রশেখরের ঘরে যখন কৃষ্ণলীলা নাটকের অভিনয় হয়, তখন গৌরহরি নিজে লক্ষ্মী সাজল আর রুক্মিণী সাজাল গদাধরকে।

সেই গদাধরকে নবদ্বীপে রেখে নিমাই চলল সন্ন্যাস নিয়ে।

গদাধর নানা যুক্তি তুলল, কিন্তু কিছুই নিমাইয়ের গ্রাহ্য হল না। ঘরে থেকেও ঈশ্বরব্রতী হওয়া যায় এ যুক্তিও টিকল না। তখন গদাধরকে বাধ্য হয়েই বলতে হল, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। যাতে তোমার স্বস্তি, যাতে সকলের স্বাস্থ্য, তুমিই তা ভালো বুঝবে।

তবু বুঝি গদাধর আশা করেছিল নিমাই তাকে সঙ্গে নেবে।

কিন্তু না, গদাধর দুঃখের পাষাণভার বুকে নিয়ে পড়ে রইল নবদ্বীপ। কিন্তু গৌরমুখ না দেখে কতদিন দেহে প্রাণ রাখতে পারব? দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করে গৌরাঙ্গ নীলাচলে ফিরলে গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে সেও চলল দর্শন করতে। আর সকলে ফিরে গেলেও গদাধর ফিরল না। সে থেকে গেল নীলাচলে।

সমুদ্রতীরে যমেশ্বর টোটায় বাসা করে থাকে গদাধর। গৌরহরি প্রত্যহ সেখানে যান, গদাধর তাঁকে ভাগবত শোনায়।

সেদিন বালির উপরে বসে দু'জনে কৃষ্ণকথা আলোচনা করছেন, হঠাৎ প্রভু বললেন, এ জায়গাটা খোঁড়ো তো।

বালি খুঁড়তে লাগল গদাধর। প্রথমে মোহনচূড়ার অগ্রভাগটুকু দেখা গেল। ক্রমশ পূর্ণ বিগ্রহ আবিষ্কৃত হল। গোপীনাথ দেখা দিলেন।

গদাধরের দুই সঙ্কল্প, ক্ষেত্র-সন্ন্যাস আর গোপীনাথ। অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্র কোনোদিন ছাড়ব না আর গোপীনাথের সেবা করব।

কিন্তু এ কী, স্বয়ং প্রভু যে নীলাচল ছেড়ে চলেছেন গৌড়পথে, বৃন্দাবনের উদ্দেশে।

গদাধর বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

প্রভু বললেন, তুমি তোমার ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছাড়বে কী করে?

গদাধর বললে, যেখানে তুমি, সেখানেই শ্রীক্ষেত্র।

আর তোমার গোপীনাথ?

তুমিই আমার গোপীনাথ।

না, এ ঠিক নয়। প্রভু গম্ভীর হলেন: প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপ।

হয় হোক, আমার হবে, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না। বেশ তো, ছায়ার মত করে সঙ্গে নিয়ে যেতে না চাও আমি দূরে দূরে থাকব, একা একা যাব।

কিন্তু যাবে তো আমারই জন্যে।

কে বললে? আমি যাব আমার শচীমাতাকে দেখতে। গদাধর কেঁদে ফেলল।

কটক পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে পিছে পিছে চলে এসেছে গদাধর।

প্রভু তাকে কাছে ডাকলেন। একটা কথা শুধু আমাকে বলো।

কী কথা?

তুমি কি আমার সুখ চাও, না, নিজের সুখ চাও?

এই তো শেষ কথা। গদাধর স্তব্ধ হয়ে রইল। কৃষ্ণসুখে সুখী হওয়াতেই তো সুখ।

প্রভু বললেন, যদি আমার সুখ তোমার কাম্য হয় তবে তুমি নীলাচলে ফিরে যাও। আমার দিব্যি যদি আর কিছু বলো—

গদাধর মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

প্রভু সার্বভৌমকে বললেন, ওকে শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি

ভক্তের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হতে দেব না।

সেবার আর প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হল না। গৌড় থেকেই ফিরতে হল নীলাচল। ফিরে এসে বললেন, গদাধরকে দুঃখ দিয়েছিলাম বলেই এ যাত্রা বৃন্দাবন-দর্শন হল না।

'গদাধর ছাড়ি গেলাম ইহোঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥'

গদাধর বললে, প্রভু, এবার তুমি আমাকে মন্ত্র দাও।

কেন? তোমার আগের ইষ্টমন্ত্র কী হল?

সে মন্ত্র আমি আরেকজনের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। তাই সে মূর্তির ভালো স্ফূর্তি হচ্ছে না।

তা হোক। তুমি আবার সেই পুণ্ডরীকের কাছ থেকেই মন্ত্র নিও। পুণ্ডরীক এসে যাবে নীলাচল।

তাই হল। পুণ্ডরীকের কাছেই আবার দীক্ষা নিল গদাধর।

এবার বল্লভ ভট্ট উলটে দীক্ষা নতে চাইল গদাধরের কাছে। গদাধর বললে, আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্রের অধীন। তাঁর আদেশ ছাড়া দীক্ষা দিতে পারব না।

বেশ, তবে আমার ভাগবতের টীকা শোনো। আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করেছি।

তুমি আমার প্রভুকে শুনিয়েছিলে?

তিনি শুনতে চাইলেন না।

কী বললেন?

বললেন, আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি না। শুধু এক অর্থ মানি। সে হচ্ছে শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন। যদি আর কোনো অর্থ থাকেও আমার দরকার নেই। কিন্তু তুমি বলো এ একটা কথা হল?

নীলাচলজন আর কেউ শুনল?

কেউ না। কিন্তু গদাধর, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একটু শোনো। তুমি শুনলেও আমার কিছু মান থাকে। বলে সম্মতির অপেক্ষা না করেই বল্লভ টীকা পড়তে লাগল।

গদাধর মহা ফাঁপরে পড়ল। কেউ জোর করে শোনাতে শুরু করলে কী ভাবে তাকে সৌজন্যসহকারে নিরস্ত করা যায় কিছুই ভেবে পেল না।

তুমি সেস্থান ত্যাগ করলে না কেন? কেন কানে আঙুল দিলে না? এ তোমার কেমনতরো শিষ্টচার? নীলাচলজন রোষ প্রকাশ করল।

গদাধর বুঝল এ প্রভুরই রোষ। কিন্তু সে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে কোনো যুক্তি প্রয়োগ করল না। অন্তত একটুকুও বললে না, কেউ জোর করে শোনালে আমি কী করব? তবু যদি আমার দোষ দেখে প্রভু আমাকে রোষ করেন, আমি তাই নেব মাথা পেতে। প্রতিবাদ করতে যাব না। সর্বজ্ঞের শিরোমণি আমাকে যা দেবেন, ক্রোধ বা অনুরাগ, আমি তাই শিরোধার্য করব।

শুধু সারল্য দিয়ে কিনে নিল গৌরাঙ্গকে।

নিজেই এসে কেঁদে পড়ল প্রভুর পায়ে।

কী আশ্চর্য, তোমাকে এত খেপাতে চেষ্টা করলাম, তুমি একটুকুও খেপলে না। শুধু সারল্যকেই ভাবমুদ্রা করলে। প্রভু গদাধরকে আলিঙ্গন করলেন।

তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করলেন বল্লভকে। বললেন, গদাধরের কাছে মন্ত্র নিতে চেয়েছিলে না? তার কাছ থেকে নাও কিশোর গোপালের মন্ত্র।

বাণীনাথের ছেলে নয়নানন্দ—গদাধরের ভাই-পো। ভাই-পোকে গদাধরই দীক্ষা দেয়। দীক্ষাকালে উপহার দেয় নিজের বুকের কৃষ্ণবিগ্রহ আর একখানি গীতা, যাতে প্রভুর নিজের হাতে কটি শ্লোক লেখা।

প্রভু অপ্রকট হবার পর শ্রীনিবাস গদাধরের কাছে ভাগবত পড়তে নীলাচলে এল।

গদাধর বললে, আমার ভাগবতখানা ছিঁড়ে গিয়েছে, তুমি গৌড়ে গিয়ে নরহরির কাছ থেকে একখানা নতুন ভাগবত নিয়ে এস।

গৌড়ে ফিরে গেল শ্রীনিবাস। নতুন ভাগবত নিয়ে নীলাচলে আসছে, পথের মাঝখানে খবর এল, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী দেহরক্ষা করেছেন।

॥ ৮ ॥

গদাধরদাস

গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।

এঁড়েদর শঙ্খবণিককুলে জন্ম, নিমাইয়ের নবদ্বীপলীলায় অংশগ্রহণ করলেও আসলে সে নিত্যানন্দসঙ্গী।

গদাধর পণ্ডিত আর নরহরি সরকার দুজনেই তার বন্ধু। নিমাইয়ের মহাপ্রকাশের দিনে এরা সবাই নিমাইকে সাজিয়েছে, অঙ্গনে মন্দিরে নেচেছে নিমাইয়ের সঙ্গে। সন্ন্যাস নেবার পর নিমাই যখন শান্তিপুরে এল, তখন সেই নর্তন-কীর্তনের ভক্তদের মধ্যে একজন এই গদাধর।

প্রথমবার গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে গিয়েছিল গদাধর।

যথাকালে প্রভু সবাইকে বললেন, গৌড়ে ফিরে যাও। গদাধরদাসকে বললেন, যাও, মাঝে মাঝে আমি যাব তোমাদের কাছে, গোপনে থেকে তোমাদের নাচ দেখব।

প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে গদাধরদাস ফিরে চলল নবদ্বীপ। তার প্রাণকান্তের সুখের জন্যে এই বিচ্ছেদক্লেশ সে হাসিমুখে মেনে নিল। গোপী ছাড়া আর কার এত ত্যাগ, কার এত তিতিক্ষা?

গৌরপ্রেম-পাগলেরা গৌড়েই ফিরে চলল।

সকলকে ভাবময় করে পথ চলছে নিতাই, গদাধরদাসের দেহে রাধাভাব আবির্ভূত হল। কে দই কিনবে, কে দই কিনবে গো—বলে অট্ট-অট্ট হাসতে লাগল। নাচতে লাগল বিভোর হয়ে।

গদাধরের ঘরে বালগোপাল প্রতিষ্ঠিত। সে কিসের কী পূজা করবে, শুধু গোপীভাবেই তন্মনা। গঙ্গাজলের কলসী মাথায় নিয়ে তার শুধু অবিচ্ছিন্ন ডাক—কে গো-রস কিনবে?

একদিন স্বগণ নিয়ে নিত্যানন্দ এসে উপস্থিত। গোপাল-লীলায় নৃত্য শুরু করে দিল। মাধব ঘোষ দানখণ্ড কীর্তন জুড়ল। নানারঙ্গে নিত্যানন্দ দানখণ্ড নৃত্য করলে।

গদাধরের শরীরে বাহ্যজ্ঞান নেই। সে ব্রজাঙ্গনার আবেশেই সমাহিত।

কিন্তু সেদিন রাত্রে তার অন্যমূর্তি।

সে হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল কীর্তনদ্বেষী কাজীর মোকাবিলা করতে।

যে কাজীর ভয়ে সবাই তটস্থ তাকে তার এতটুকু ভয় নেই। সরবে হরিনাম করতে করতে সে এগোচ্ছে, এগোতে এগোতে একেবারে কাজীর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, কাজী কোথা? তাকে ডাকো, সে আমার মত হরি বলুক, কৃষ্ণ বলুক। সবাই বলছে, সে কেন বাকি থাকে?

অগ্নিশর্মা হয়ে বেরিয়ে এল কাজী। কিন্তু কৃষ্ণাবিষ্ট গদাধরকে দেখেই শান্ত হয়ে গেল। মুখে রোষভাষ এল না। বললে, তুমি কী মনে করে?

চৈতন্য-নিত্যানন্দ জগৎসংসারকে হরি বলাচ্ছে, তুমিই শুধু বাদ পড়েছ। তাই আমি তোমার দুয়ারে এলাম। বলো তুমিও হরি বলো।

কাজী গদাধরকে প্রবোধ দেবার ছলে বললে, তুমি আজ যাও, কাল এস, কাল হরিনাম করবো।

আর কাল কেন? হাসল গদাধর: আজই তো এখুনিই তো হরিনাম উচ্চারণ করলে। এই একবার নামোচ্চারণেই তোমার সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়ে গেল।

নীলাচল থেকে গৌরাঙ্গ গৌড়ে এসেছেন। এসেছেন পানিহাটিতে, রাঘবভবনে। খবর পেয়ে গদাধর ছুটে এসেছে, প্রভুর পায়ের কাছে নত হতেই তিনি তার মাথায় চরণ তুলে দিলেন।

প্রভুর তিরোভাবের পর গদাধর নবদ্বীপে চলে এল। প্রভু যান কিন্তু মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া আছেন। যতটুকু পারা যায় তাঁরই কাছাকাছি থাকব, তাঁরই সেবা করব।

বিষ্ণুপ্রিয়াও যখন অপ্রকট হলেন, তখন নবদ্বীপে তার আর আকর্ষণ ল না। সে কণ্টকনগরে চলে গেল। সেখানে গৌরাঙ্গবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তার সেবা-অর্চনায় বাকি জীবনটুকু নিবেদন করে দিল।

দুই গঙ্গাদাস

॥ ৯ ॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত

জগন্নাথ মিশ্রের তিরোধানের পর শচীদেবী অকূল পাথারে পড়লেন—নিমাইয়ের লেখাপড়ার কী হবে?

সবাই বললে, গঙ্গাদাসের টোলে ভর্তি করে দাও।

ব্যাকরণে ধুরন্ধর, গঙ্গাদাসের খুব নামডাক। নিমাইয়ের হাত ধরে শচীমাতা গঙ্গাদাসের বাড়ি গেলেন। অন্তঃপুরে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, এই পিতৃহীন বালককে আপনার হাতে সঁপে দিতে চাই। একে আপনি শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে দিন।

গঙ্গাদাস সানন্দে সম্মত হল। বললে, নিমাইয়ের মত ছাত্র পাওয়া মহা ভাগ্যের কথা। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি যথাসাধ্য যত্ন নিয়ে পড়াব নিমাইকে।

ওর বাপ নেই।

তার জন্যে কিছু আটকাবে না।

নিমাই তার ছাত্র হবে এতে গঙ্গাদাস নিজেই যেন পূর্ণকাম।

গুরুকে প্রণাম করল নিমাই।

গঙ্গাদাস আশীর্বাদ করল, তোমার বিদ্যালাভ হোক।

বারো বছরের ছেলে নিমাই গঙ্গাদাসের টোলে ভর্তি হল। সেখানে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের ছাত্রও কম নেই কিন্তু সকলকে পরাস্ত করে নিমাই সহজেই এগিয়ে গেল। ছাড়িয়ে গেল আলঙ্কারিক কমলাকান্তকে, তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দকে।

'প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর'—অধ্যয়ন ছাড়া আর কোনো কথা নেই। বিদ্যার দীপ্তিতে তপ্ত হয়ে যেন পথ চলছে। তর্কে কারু কাছে নত হচ্ছে না। যদি 'হয়' বলো তো 'নয়' করে দিচ্ছে, যদি 'নয়' বলে তো 'হয়' এনে বসাচ্ছে। তারপরে সমস্ত খণ্ডন করে আবার সমস্ত স্থাপন করছে।

বেশি কলহ মুরারি গুপ্তের সঙ্গে।

তুমি বৈদ্য, তুমি কেন এসব পড়তে এসেছ? তুমি লতাপাতার খোঁজ করো

গে। তোমার রুগীদের উপকার হবে। নিমাই পথের মধ্যে ধরল মুরারিকে।

মুরারির বয়স অনেক বেশি হলেও নিমাইয়ের যখন সে সহপাঠী তখন নিমাই পরিহাস করতে পারে বৈকি।

ব্যাকরণ ছাড়ো, ব্যাকরণে তোমার কফ-পিত্ত-অজীর্ণের কোনো ব্যবস্থা নেই। নিমাই আবার খোঁচা মারল : ব্যাকরণের তুমি জানো কী!

মুরারি রাগ করল না। বললে, তোমার সব প্রশ্নেরই তো উত্তর দিই। বলো না কী জিজ্ঞেস করবে?

বেশ তো, আজ যা পড়লে তার ব্যাখ্যা করো।

মুরারি এক ব্যাখ্যা করে, নিমাই আরেক ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। মুরারির সমস্ত ইতিকে নিমাই নিমেষে নেতি করে দেয়। আবার মুরারি যদি না-কে আশ্রয় করে নিমাই পলকে তাকে হাঁ-তে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় এক পরম অস্তিত্বে।

শেষে তুষ্ট নিমাই মুরারির গায়ে হাত রাখল। একটা নতুন আনন্দে শিহরিত হল মুরারি। ভাবল এ চিদানন্দমূর্তি পুরুষ কে? এ কি সামান্য মানুষ, না, আর কিছু?

গঙ্গাদাস দেখে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

দু বছরে ব্যাকরণ শেষ করে নিমাই গেল ন্যায় পড়তে।

ন্যায়ের টোলে তার সহপাঠী রঘুনাথ। 'দীধিতির' গ্রন্থকার রঘুনাথ।

ছাত্র ভালো হলে কী হবে, রঘুনাথের মনে সুখ নেই। শুনতে পেয়েছে নিমাই ন্যায়ের টিপ্পনী লিখছে। নিমাইয়ের টিপ্পনীর কাছে তার 'দীধিতি' কি স্থান পাবে?

তুমি কি ন্যায়ের টীকা লিখছ? রঘুনাথ একদিন শুধোল নিমাইকে।

এই একটু-আধটু। তুমি কী করে জানলে?

কে যেন বলল।

সেটা তেমন কিছু বলবার কথা নয়। হাসল নিমাই।

তোমার পুঁথি আমাকে একটু পড়তে দেবে?

কেন দেব না? কাল যখন দুজনে নৌকো করে গঙ্গা পার হব তখন আমিই তোমাকে আমার পুঁথি থেকে পড়ে শোনাব।

পরদিন গঙ্গা পার হবার সময় নৌকোয় বসে নিমাই তার ন্যায়ের টিপ্পনী পড়তে লাগল।

তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল রঘুনাথ।

কতক্ষণ পরে নিমাই তাকিয়ে দেখল রঘুনাথ কাঁদছে।

এ কী, কাঁদছ কেন? নিমাই পড়া বন্ধ করল।

তোমার এ বই থাকতে আমার 'দীধিতি' চলবে না। যা বোঝাতে আমার দশ পৃষ্ঠা লেগেছে তা তুমি দুই ছত্রে প্রাঞ্জল করেছ। রাতদিন খেটে আমি আমার বই লিখেছিলাম, আশা ছিল পাণ্ডিত্যে অগ্রগণ্য হব কিন্তু আজ আমার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি হল।

তুমি এর জন্যে ভাবছ কেন? নিমাই বললে, আমিই আমার পুঁথি জলাঞ্জলি দিচ্ছি।

সে কী? রঘুনাথ চমকে উঠল।

ন্যায় তো অফল শাস্ত্র। এর আবার ভালো-মন্দ কী। যা অফল তার জলেই যাওয়া উচিত। বলে নিমাই তার নিজের পুঁথি গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। কে নাম চায়? কে প্রতিষ্ঠার জন্যে কাঙাল?

কত দিন পরে নিমাই নিজেই টোল খুলে বসল। মাত্র ষোল বছর বয়সে নবদ্বীপে কেউ টোল খুলতে সাহস পায়নি। নবদ্বীপে কত সব ডাকসাইটে পণ্ডিত কিন্তু ছাত্র বেশি নিমাইয়ের টোলে।

ছাত্র বেশি হবে না কেন? নিমাই যে অল্প কথায় জলের মত বুঝিয়ে দেয়। নিমাইয়ের কাছে পড়তে কারু যে এতটুকু ক্লেশ হয় না।

গঙ্গাদাস তাকিয়ে দেখে গুরুর টোলের চেয়ে শিষ্যের বেশি ঔজ্জ্বল্য। তাই দেখে গঙ্গাদাসের দুচোখ আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু গয়া থেকে নিমাই যে ফিরে এল, একেবারে আরেকরকম চেহারা নিয়ে। আগের সেই বিদ্যা-ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই, এখন কেবল বিনয়-বিরক্তি। এখন কেবল কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ। সবাই বলছে, নিমাইয়ের মধ্যে ভক্তির উদয় হয়েছে। কিন্তু এমন ভক্তি দেখে-শুনে শাস্ত্রও চুপ করে গিয়েছে। এমন ভক্তির কথা শাস্ত্রও ভাবতে পারেনি।

পড়ুয়ারা ঘিরে ধরল নিমাইকে। আমাদের পড়াবেন না?

পড়ুয়াদের দেখে গঙ্গাদাসের কথা মনে পড়ে গেল। নিমাই তখন গঙ্গাদাসের বাড়ি চলল। শিষ্যদের বললে, তোমরাও এস।

গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল নিমাই।

গঙ্গাদাস বললে, তুমি নির্বিঘ্নে পিতৃশ্রাদ্ধ করে এসেছ, তুমি ধন্য। তুমি

তোমার ছাত্র নিয়ে বোসো। তোমার যাবার পর ওরা তাদের গ্রন্থে ডোর দিয়েছে। বলে নিমাই পণ্ডিত এলে আবার ডোর খুলব।

নিমাই বললে, নবদ্বীপে কত বড় বড় পণ্ডিত আছে, তাদের কারু কাছে পড়লেই তো হত।

ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে দেখ না। তারা বলে নিমাইয়ের মত গুরু নেই।

টোলে গিয়ে বসল নিমাই। পড়ুয়ারাও আসন নিল।

হরি-হরি বলে ডোর খুলল পড়ুয়ারা। হরি-হরি বলে পুঁথি মেলল।

কী আশ্চর্য, ওদের মুখে হরিনাম আনল কে? ওরা তো নিমাইয়ের ভিতরের খবর কিছু রাখে না, তবু আপনা-আপনি ঐ নাম ধ্বনিত হল কেন?

আবিষ্ট হয়ে নিমাইও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। সূত্র বৃত্তি টীকা—সমস্তই কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ ছাড়া শাস্ত্র নেই, কৃষ্ণ ছাড়া ব্যাখ্যা নেই। হর্তা কর্তা পালয়িতা সমস্তই কৃষ্ণ।

কতক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসতেই লজ্জা পেল নিমাই। ভাবল এ সব আমি কী পড়াচ্ছি? এই কি আজকের ব্যাকরণের বিষয়?

তোমাদের কাছে সূত্রের আজ কী ব্যাখ্যা করলাম?

কিছুই বুঝতে পারলাম না। যে কোনো শব্দ ধরছেন তার মধ্যে কেবল কৃষ্ণ পাচ্ছেন।

হ্যাঁ, আজকের মতো পুঁথি বাঁধো। কাল আবার পড়া হবে।

পরদিন পড়াতে বসেও নিমাইয়ের সেই ভাব। মুখরে-মৌনে সমস্ত শব্দই কৃষ্ণচ্ছায়া। কৃষ্ণ ছাড়া কিছু বলবার নেই শোনবার নেই দেখবার নেই ভালোবাসবার নেই।

আমরা দূরদেশ থেকে এখানে বিদ্যার্জন করতে এসেছি, পড়ুয়াদের মধ্য থেকে প্রতিবাদ উঠল : আমরা কৃষ্ণকথা শুনতে আসিনি।

নিমাই বললে, কৃষ্ণই একমাত্র বিদ্যা।

পড়ুয়ারা তখন গঙ্গাদাসের কাছে গিয়ে নালিশ করল।

গয়া থেকে ফিরে এসে অবধি নিমাই কী রকম হয়ে গিয়েছে। যা কিছু ধরে, শব্দ বা ধাতু, কৃৎ বা তদ্ধিত, তার শুধু এক ব্যাখ্যা। সে হচ্ছে শুধু-কৃষ্ণ। কৃষ্ণই বিশেষ্য, কৃষ্ণই বিশেষণ, কৃষ্ণই আবার সমস্ত ক্রিয়া—তা সমাপিকাই হোক বা অসমাপিকাই হোক। আমরা কী বিপদে পড়লাম বলুন তো। এ ভাবে চললে আমরা পড়ব কী, শিখব কী। দয়া করে আপনি ওঁকে একটু

বুঝিয়ে বলুন।

গঙ্গাদাস নিমাইকে ডেকে পাঠাল।

নিমাই এসে প্রণাম করল গুরুকে। আমাকে ডেকেছেন ?

হ্যাঁ, ডেকেছি। পড়াতে বসে ব্যতিরিক্ত অর্থ করো কেন ? যতটুকু ন্যায্য শুধু ততটুকুতেই অর্থকে আবদ্ধ রাখবে। অর্থের অপর্যাপ্তি ঘটাবে না।

নিমাই চুপ করে রইল।

যাও, ভালো করে পড়াও গে। দেখো ছাত্রদের যেন কোনো অভিযোগ না থাকে।

যাবার আগে গঙ্গাদাসকে আবার প্রণাম করল নিমাই। গঙ্গাদাস আশীর্বাদ করল, বিদ্যালাভ হোক।

কৃষ্ণভক্তিই পরমবিদ্যা। পড়াতে বসে নিমাই আবার শব্দে-অশব্দে দৃশ্যে-অদৃশ্যে কৃষ্ণ দেখতে লাগল। রত্নগর্ভ আচার্য কাছেই বসে ছিল, ভাগবতের একটি কৃষ্ণ-বর্ণনার শ্লোক আওড়াল আর নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

এমন ভাবতরঙ্গ ছাত্ররা কোনোদিন দেখেনি।

কেউ কেউ ভাবল গঙ্গাদাসকে ডেকে এনে দেখালে হয়। সে এসে দেখুক কাকে বলে বিদ্যালাভ, কাকে বলে বিদ্যাবিলাস।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে ধূলিধূসর নিমাই উঠে বসল। পড়ুয়াদের বললে, তোমাদের কাছে একটি ভিক্ষা চাই, মুক্তি-ভিক্ষা। আমি আর পড়াতে পাচ্ছি না, পড়াতে গেলেই দেখি একটি কৃষ্ণবর্ণ শিশু বাঁশি বাজাচ্ছে, তাকে দেখে আর তার বাঁশি শুনে আমি পাগল হয়ে যাই, কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছু আমার মুখে আসে না। আমাকে এই পড়ানোর দায় থেকে তোমরা রেহাই দাও। তোমাদের এমনি করে বঞ্চনা করা আমার উচিত হচ্ছে না। তোমরা আর কারুর কাছে গিয়ে পড়ো।

না, না, আমরা আর কারু কাছে যাব না। পড়ুয়ারা বললে, আমরা তোমার কাছে যা দেখলাম, যা শিখলাম, তাই আমাদের ঢের।

তবে এস আমরা কৃষ্ণ-কীর্তন করি। হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

সে ধ্বনিতরঙ্গ গঙ্গাদাসেরও কানে গিয়ে ঢুকল। গঙ্গাদাস আর পারল না দূরে থাকতে।

নবদ্বীপলীলায় সেও গৌরাঙ্গের সঙ্গী হল।

তারপর এত আকৃষ্ট হল প্রভুকে দেখতে নীলাচলে চলল। শুধু তাই নয়,

জগন্নাথের রথের সামনে কীর্তনানন্দে নৃত্য করল।

নবদ্বীপে ফিরে এসে আর কোথাও গেল না। প্রভু তাকে বলে দিয়েছিলেন, আমার মাকে দেখো, মায়ের খোঁজ-খবর কোরো। সেই কর্তব্যপালনই ব্রতভক্তি বলে মানল। আজ গুরু শিষ্য, শিষ্যই গুরু।

শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে এসেছেন প্রভু, মাকে দেখতে চেয়েছেন। খবর পাঠিয়েছেন, যেন গঙ্গাদাস মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

গঙ্গাদাস শচীদেবীকে শান্তিপুরে নিয়ে চলল।

একদিন শচীমাতা নিমাইকে গঙ্গাদাসের হাতে সঁপে দিয়েছিল। আর আজ গঙ্গাদাস কি মাকে ছেলের হাতে সঁপে দিতে চলেছে? নিমাইয়ের তো সেদিন বিদ্যার প্রার্থনা ছিল। শচীমায়ের আজ কিসের প্রার্থনা?

মাকে দেখে নিমাই বললে, মা, আমার যেটুকু কৃষ্ণভক্তি সে শুধু তোমার প্রসাদে। তাই তোমাকে যে স্মরণ করবে তার সংসারবন্ধন থাকবে না।

আইর ভক্তির সীমা কে বুঝিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার জঠরে॥
প্রাকৃত শব্দেও যে যা বলিবেক আই।
আই-শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥

সুতরাং শচীমাতাকে কী পৌঁছে দেবে! শচীমাতাই গঙ্গাদাসকে প্রভুর চরণে পৌঁছে দিচ্ছেন। যথাযথ ও ব্যতিরিক্ত সমস্তই প্রভুর পাদপদ্মে।

॥ ১০ ॥

গঙ্গাদাস বিপ্র

নবদ্বীপের আরেক গঙ্গাদাস—গঙ্গাদাস গোসাঁই।

কী কারণে কে জানে রাজরোষে পড়েছে গঙ্গাদাস। ভেবেছে রাত্রিযোগে সপরিবারে পালাবে নৌকো করে। নবদ্বীপ ছেড়ে যাবে জন্মের মত।

গঙ্গাদাস সপরিবারে এল খেয়াঘাটে। দেখল কোথাও একটা নৌকো নেই। চারদিক অন্ধকার। অন্ধকারের উপর অন্ধকার।

কী করবে কোথায় যাবে, নবাবের গ্রাস থেকে কী করে পরিবারকে

বাঁচাবে, পথ পেল না গঙ্গাদাস। ভগবানকে ডাকতে লাগল। পরিত্যক্ত অসহায়ের মত কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে।

কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। একটুকু একটু আলোড়ন নেই তরঙ্গে।

গঙ্গাদাস ঠিক করল গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করবে।

তবু সমস্ত নিথর-পাথর।

তারপর গঙ্গাদাস সত্যি-সত্যি জলে নামল।

ঐ, ঐ একটা নৌকো আসছে না? নৌকোই তো। খালি নৌকো। আর তার দিকেই তো আসছে।

গঙ্গাদাস ডাক দিল।

মাঝি-ভাই, আমাদের পার করে দাও।

মাঝি জিজ্ঞেস করলে, কত দেবে?

এক টাকা আর এক জোড়া কাপড়। কী, রাজী?

চলো।

মাঝি গঙ্গাদাসকে সপরিবারে পার করে দিল।

কে এক নিমাই পণ্ডিত শ্রীবাসের ঘরে বিষ্ণুখট্টায় বসে মহাপ্রকাশ করেছে খবর পেয়ে দেখতে গেল গঙ্গাদাস।

তুমিই সেই গঙ্গাদাস না? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।

গঙ্গাদাস স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

কী, আমাকে চিনতে পাচ্ছ না?

গঙ্গাদাস আরো অবাক মানল। কোনোদিন এই দিব্যকান্তি সুপুরুষকে সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে ভাবতে পারল না।

সেদিন সেই নৌকোর মাঝিকে মনে নেই?

কোন্ নৌকো? কে মাঝি?

সেই যে বিপন্ন হয়ে ঘাটে বসে কাঁদছিলে, ডাকছিলে আমাকে, আমার সাড়া না পেয়ে ডুবে মরতে নেমেছিলে নদীর মধ্যে—কী, মনে পড়ছে না? আর আমি অমনি সেই নৌকো নিয়ে হাজির হয়েছিলাম—

আপনি—তুমি, তুমিই সেই?

হ্যাঁ, আমিই সেই জীবনতরীর কর্ণধার। তোমার কান্না শুনে নেমে এসেছিলাম বৈকুণ্ঠ থেকে। কিন্তু শোনো, পারের মাশুল অত কম দিতে চেয়েছিলে কেন?

গঙ্গাদাস নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মোটে একটি টাকা আর এক জোড়া বস্ত্র। শোনো, আমার আরো বেশি চাই। মনের সমস্তটুকু আকুলতা, প্রাণের সমস্তটুকু অনুরাগ। কী, পারবে না দিতে?

গঙ্গাদাস পারকর্তার পায়ের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

সেই থেকে গঙ্গাদাস প্রভুর একান্ত ভক্ত।

সেই থেকে গঙ্গাদাস প্রভুর নবদ্বীপলীলার অন্তরঙ্গ সহচর। জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের পর প্রভু যখন তাদেরকে নিয়ে বসলেন রুদ্ধকক্ষে তখন সেখানে গঙ্গাদাস। কীর্তনান্তে গঙ্গায় যে জলকেলি হল সেখানে গঙ্গাদাস। চন্দ্রশেখরের ঘরে যে অভিনয় হল সেখানে গঙ্গাদাস। কাজীদমনের দিন নগরকীর্তনেও গঙ্গাদাস।

তারপর যখন শুনল প্রভু সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে যাচ্ছেন তখন গঙ্গাদাস অঝোর চোখে কাঁদতে বসল, হে আমার মানবজন্ম-তরীর মাঝি, আমার খেয়ার কর্ণধার, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

গঙ্গাদাস প্রভুকে ষোল আনা মাশুল দিয়েছে। দিয়েছে সমস্ত প্রাণের আচ্ছাদন।

দুই মুরারি

॥ ১১ ॥

মুরারি গুপ্ত

মুরারির জন্ম শ্রীহট্টে, বৈদ্যবংশে। পরে নবদ্বীপবাসী। নিমাইয়ের চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু সহাধ্যায়ী। গঙ্গাদাসের টোলে দুজনে পড়ে একসঙ্গে। নম্র, নির্বিরোধ। পড়তে বসে নিমাইয়ের কত 'আটোপটঙ্কার', মুরারি প্রত্যুত্তর করে না। স্তব্ধ হয়ে বসে শোনে। ভাবে নিমাইয়ের একখানা চরিতকথা লিখলে কেমন হয়।

কিন্তু নিমাই যখন বালক তখন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি মুরারি। সে তখন জ্ঞানমার্গের পথিক। অদ্বৈতবাদী। তার মন্ত্র তখন 'নাহং' নয়, তার

মন্ত্র তখন সোঽহং। আমি কেউ নই নয়, আমিই সেই।

তর্কেই তখন তার প্রতিষ্ঠা, অনুগতিতে নয়।

আর তর্ক করতে করতে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে, যখন একা-একা পথ চলে তখনো কাল্পনিক প্রতিপক্ষের উদ্দেশে হাত নাড়ে, মুখ নাড়ে, শাস্ত্রব্যাখ্যা আওড়ায়।

পথের মধ্যে হঠাৎ সেদিন পিছন থেকে কে হেসে উঠল।

মুরারি তাকিয়ে দেখল, নিমাই। তার অঙ্গ-ভঙ্গির নকল করে খুব হাত-মুখ নাড়ছে আর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে অর্থহীন প্রলাপ বকছে।

এ কী হচ্ছে শুনি? মুরারি তেড়ে গেল।

জ্ঞানমার্গ হচ্ছে। বলেই নিমাই ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে বালকের দলও উধাও।

জগন্নাথের ঘরে দেখি এক অপদার্থ জন্মেছে। মুরারি দারুণ বিরক্ত হল।

দাঁড়াও তোমার জারিজুরি গুঁড়ো করে দিই।

দুপুরে খেতে বসেছে মুরারি, হঠাৎ কে গম্ভীর কণ্ঠে তার নাম ধরে ডেকে উঠল।

মুরারি ভাবল কোনো সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ় ব্যক্তি বুঝি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। হয়তো বা কোনো শাস্ত্রব্যাখ্যার সূত্র জানতে।

ব্যস্ত হয়ে উঠল মুরারি। দেখ তো কে এল।

আর দেখতে হল না। বালক নিমাই এসে উপস্থিত।

এ কী, তুমি? মুরারি অবাক হয়ে গেল। এ বালক অমনি গম্ভীর কণ্ঠে তাকে ডেকে উঠল নাম ধরে! এ কি পরিহাস, না, তিরস্কার?

তুমি এখানে কী করতে এসেছ? তবু একবার গর্জে উঠল মুরারি।

কী করতে এসেছি? তোমার ভোজনের অন্ন নষ্ট করে দিতে এসেছি। দেখি কোন্ ব্রহ্ম তোমাকে রক্ষা করে। বলে চোখের পলকে ভোজনের থালা অশুচি করে দিয়ে ছুট দিল নিমাই।

ধর ধর—, কেউ নিমাইকে ধরতে পারল না।

দূর থেকে বালক পরুষ স্বরে বললে, ও সব হাত-নাড়া মাথা-নাড়া ছাড়ো। জ্ঞানকাণ্ড ফেলে দাও, ছেড়ে দাও কূটতর্ক। জীবে আর ব্রহ্মে ভেদ করো। ধরো ভক্তির পথ, অনুগতির পথ।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুরারি। তাকে ভাবনায় ধরল।

মুরারির মনে ভক্তিরস সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতকে বলছেন গৌরহরি,

অধ্যাত্ম-ভাবনার রসুনের গন্ধ তাতে লেগে আছে। নইলে কিনা এখনো তার যোগবাশিষ্ঠে আগ্রহ !

অধ্যাত্মযোগের দোষ কী ? জিজ্ঞেস করলে অদ্বৈত।

যার ভগবান হরিতে ভক্তি আছে সে তো অমৃতের সাগরে খেলা করে, তার আবার খালের জলে সাঁতার কাটার দরকার কী !

ক্রমে-ক্রমে নিমাইয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে থেকে মুরারির মধ্যে জাগল দাস্যভাব। ভগবানই সেব্য, আমি তাঁর সেবক, ভগবান প্রভু, আমি তাঁর ভৃত্য—এই ভাবই দাস্যভাব। জীবের স্বরূপগত ভাবই দাস্যভাব। 'এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।'

কিন্তু মুরারির দাস্য শ্রীরামচন্দ্রে।

একদিন মুরারির গৃহে গৌরাঙ্গ কীর্তন করতে এলেন। বললেন, মুরারি, তোমার রঘুনাথের প্রশস্তি শোনাও।

নিজেই রঘুবীরাষ্টক লিখেছে মুরারি। মুরারি তো ভাষ্যকার বা বৈয়াকরণ নয়, প্রভুর প্রভাবে মুরারি তো কবি।

নিজের লেখা রামস্তোত্র পড়ে শোনাল মুরারি।

গৌরাঙ্গ বললেন, মুরারি, তুমি রামদাস। বলে মুরারির কপালে 'রামদাস' কথাটি লিখে দিলেন স্বহস্তে।

মুরারি ভাবল, প্রভুই তার ইষ্টদেব, নবদূর্বাদলশ্যাম রাম।

কিন্তু হঠাৎ প্রভুর এ কী নির্দেশ !

মুরারি, কৃষ্ণভজনা করো। কৃষ্ণচিন্তাই জীবের একমাত্র চিন্তা।

কী বলছ ? মুরারি স্তব্ধ-বিস্ময়ে তাকাল প্রভুর দিকে। কৃষ্ণ ?

হ্যাঁ, কৃষ্ণই ভগবান। কৃষ্ণই সর্বাশ্রয়। তাকে ধরো।

তুমি এই কথা বলছ ? মুরারির ঘোর কাটে না। শেষকালে কৃষ্ণকে ধরব ?

হ্যাঁ, কৃষ্ণ বিনা ধ্যান নেই। কৃষ্ণ বিনা উপাসনা নেই।

তুমি যখন বলছ তখন তোমার বাক্য শিরোধার্য করব। মাথা পেতে আদেশ মেনে নিল মুরারি। আমি তোমার দাস, তোমার বাক্য লঙ্ঘন করি কী করে ?

মুখে রাজী হয়ে এল বটে কিন্তু মুরারির মনে সুখ নেই। তার হৃদয়ের ধন রঘুনন্দনকে সে ছাড়বে কী করে ?

হে রাম, আমার রঘুনাথ, তোমাকে আমি কেমন করে বিসর্জন দেব? তোমার জায়গায় আর কাকে এনে বসাব? তোমাকে যদি ছাড়তে হয় তা হলে এই অসার দেহ থেকে আমার প্রাণও আজ ছেড়ে যাক।

সমস্ত বিনিদ্র রাত্রি কেঁদে-কেঁদে ক্ষয় করল মুরারি।

প্রভাত হলে প্রভুর পায়ে এসে পড়ল। বললে, তোমার আদেশ অমান্য করি আমার এমন সাধ্য নেই কিন্তু আমি যে আমার রামের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি, তাকেও ছাড়তে পারি না। না, কিছুতেই না। এখন এর উপায় কী বলো?

তুমিই বলো। প্রভুর মুখে মৃদু-মৃদু হাসি।

এর একমাত্র উপায় আছে। সে উপায় মৃত্যু। মুরারি প্রভুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। আমাকে কৃপা করো। আমাকে তোমার সামনে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে দাও। 'তবে মোরে এই কৃপা করো দয়াময়। তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়॥'

প্রভু মুরারিকে ধুলোর থেকে বুকে তুলে নিলেন। বললেন, মুরারি, কেন তুমি তোমার রামকে ছাড়বে? তোমার ভাবনিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্যেই তো কৃষ্ণভজনের প্রস্তাব করেছিলাম। তুমি যে আমার কথাতেই তোমার রামকে ছেড়ে দাওনি, তোমার এই ভজন-দৃঢ়তাকে প্রশংসা করি। রাম—রামই তোমার শ্যামমূর্তি।

এর পর মুরারি আর ফিরল না, গৌরাঙ্গের পায়ে সর্বস্ব বিলিয়ে দিল।

প্রভু, আমাকে তোমার চরণ থেকে ছাড়িয়ে দিলেও আমি যেন তোমার চরণ না ছাড়ি, আমাকে দাও সেই সেবাশক্তি।

মহাপ্রকাশের সময় প্রভু বললেন, মুরারি, আমার রূপ দেখ।

মুরারি দেখল বীরাসনে রামচন্দ্র বসে আছেন। বামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ। বানরদল চারদিকে দাঁড়িয়ে স্তব করছে।

মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মুরারি।

প্রভু বললেন, মুরারি, বর চাও।

জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণে রতি থাকে। যেখানে-যেখানে তোমার সপার্ষদ অবতার হবে সেখানে-সেখানে যেন তোমার দাস হয়ে থাকতে পারি।

প্রভু বললেন, তাই হবে।

শ্রীবাস-মন্দিরে সেদিন আবার চতুর্ভুজ মূর্তি ধরলেন প্রভু। হুঙ্কার দিয়ে

ডাকলেন গরুড়কে। কই আমার বাহন গরুড় কই ?

আমিই তোমার বাহন, আমিই তোমার গরুড়। মুরারি ছুটে এল। দুই হাতে ধরে প্রবল শক্তিতে প্রভুকে কাঁধে তুলে নিল। সমস্ত অঙ্গন ঘুরে বেড়াল পাক দিয়ে।

আর কিছু নয়, শুধু দাস্যশক্তিতে তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াব। সমস্ত জীবন তুমি আমার দাস্যের উপর দৈন্যের উপর আরোহণ করে থাকবে।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঁই ॥

বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে বললে, খেতে দাও।

স্ত্রী থালায় করে অন্ন পরিবেশন করল স্বামীকে।

কিন্তু মুরারির এ কী আচরণ! ঘি দিয়ে ভাত মেখে সে নিজের মুখে তুলছে না, মাটিতে ফেলছে আর বলছে, কৃষ্ণ খাও।

স্ত্রী তার স্বামীকে চেনে। তার স্বামী মহাভাগবত, চৈতন্যবিহ্বল। তাই থালায় যত ভাত কম হয় তত আবার সে পরিবেশনে পূরণ করে।

সকাল বেলা গৌরাঙ্গ এসে হাজির।

বলো কী করতে হবে? সেবাতৎপর মুরারি উন্মুখ হয়ে দাঁড়াল।

ওষুধ দাও।

কেন, কী হয়েছে?

অজীর্ণ।

সে কী, কী খেয়ে তোমার অজীর্ণ হল?

রাশি-রাশি ভাত খেয়ে। ঘিয়ে মাখা ভাত।

এত ভাত খেলে কোথায়?

তুমি জানো না কোথায় খেলাম? তোমার না হয় বাহ্যজ্ঞান ছিল না তোমার পতিব্রতা স্ত্রী জানে। যত ভাত তুমি কৃষ্ণ খাও বলে মাটিতে ফেলছিলে তত ভাত আমাকে নির্বিকারে খেতে হয়েছে। তোমার দেওয়া অনুরাগের অন্ন ফেলি কী করে? এখন দাও, ওষুধ দাও।

কী ওষুধ! কী ওষুধে তোমার অজীর্ণ সারবে?

শুধু জলে। ভক্তিরসে। কই তোমার জলের কলসী কোথায়?

প্রভু কলসীর সব খেয়ে নিলেন। বললেন, তোমার কলসী ভক্তিরসে ভরা, সেই ভক্তিই একমাত্র ওষুধ।

যার অন্নে অজীর্ণ তার জলেই আবার মহৌষধ। অন্ন আর জল দুই-ই ভক্তিতে সুস্বাদু, ভক্তিতে সুশীতল।

'না বুঝি কৃষ্ণের লীলা কখন কী করে।' এই গড়ে তুলছে এই আবার ভেঙে দিচ্ছে। এই ভরতে-ভরতে শূন্য করে দিচ্ছে এই আবার সর্বশূন্যকে উদ্বেল করে তুলছে। যে সীতার জন্যে রাবণকে স্ববংশে মারছে, সেই সীতাকেই আবার ফিরে পেয়ে পাঠাচ্ছে বনবাসে। কখন তার আবির্ভাব হবে, কখন বা তিরোভাব, কেউ বলতে পারে না। আমাদের প্রভুই বা কবে অন্তর্ধান করবেন কে বলবে।

কিন্তু প্রভুর অন্তর্ধানের পরেও বেঁচে থাকব এ অসহ্য। তাঁর জীবদ্দশায় আমার মৃত্যু ঘটুক।

মুরারি একটা ধারালো কাটারি তৈরি করাল। ঘরের মধ্যে রেখে দিল লুকিয়ে। রাত হলেই গলায় বসাব।

রাত হতে পারল না। তার আগেই সর্বভূত-হৃদয় বিশ্বম্ভর মুরারির দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

মুরারি, আমার একটা কথা রাখবে?

সে আবার একটা কথা! নিশ্চয়ই রাখব। আমার শরীর কেন? শুধু তোমার জন্যে।

ঠিক বলছ?

পরীক্ষা করে দেখ।

তোমার কাটারিখানা দাও।

কাটারি? মুরারি আকাশ থেকে পড়ল।

আত্মহত্যা করবার জন্যে যে কাটারিখানা গড়িয়ে এনেছ সেইখানা।

এ সব বাজে কথা তোমাকে কে বললে? মুরারি চাইল পাশ কাটাতে।

এমন কথা নেই যা আমি না জানি। কে তোমাকে গড়িয়ে দিয়েছে তাও বলতে পারি। কাটারিখানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাও আমার জানা।

বলে প্রভু নিজেই বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। কোথায় কোন্ অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছিল, বার করে নিয়ে এলেন। এই সেই কাটারি।

কিন্তু, গুপ্ত, এ তোমার কেমনতরো ব্যবহার? এ বুদ্ধি তুমি কার কাছে শিখলে? তুমি চলে গেলে আমি কার সঙ্গে খেলব?

মুরারি কাঁদতে লাগল।

গুপ্ত, আমাকে একটি ভিক্ষে দাও।

কী দেব ? আমার কি কিছু অদেয় আছে ?

এই মৃত্যুবুদ্ধি ভিক্ষে দাও। যেন আর কোনোদিন তোমার মৃত্যুতে না মতি হয়। শুধু মন নয়, দেহও বিকিয়ে দাও আমাকে।

তাই দেব। বাঁচব তোমার জন্যে। যতদিন বাঁচব ততদিন তোমার নামগান করব। তোমার নামগান করবার জন্যেই টিকিয়ে রাখব দেহকে।

প্রভুকে দর্শন করতে নীলাচলে গেল মুরারি। কিন্তু নরেন্দ্র সরোবর পর্যন্ত গিয়ে আর এগুলো না, বসে পড়ল।

তার সঙ্গী ভক্তবৃন্দ বললে, কী হল, বসে পড়লে কেন ?

আপনাদের দয়ায় এতদূর এসেছি, আমি আর যেতে পারছি না। আমি দীন-দুঃখী, মহাপাপী। জগন্নাথদর্শনে আমার সাহস নেই। আপনারা যান। আমার কথা প্রভুকে গিয়ে বলুন।

কী কথা ?

আমার অক্ষমতার কথা।

প্রভুরই আদেশ, সর্বাগ্রে জগন্নাথদর্শন করবে, পরে আর সমস্ত। সেই অনুসারে—জগন্নাথদর্শন সেরে ভক্তদল প্রভুর কাছে উপস্থিত হলেন। প্রভু কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, মুরারি কই ? মুরারি কই ?

সে নরেন্দ্র সরোবরের পারে বসে আছে।

তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। বলো আমি তাকে ডেকেছি।

নরেন্দ্র সরোবরের পারে মুরারির কাছে খবর পৌঁছুল। ত্বরা করো। প্রভু তোমাকে ডেকেছেন, তোমাকে তাঁর দরকার।

নয়নজলে ভাসতে-ভাসতে তৃণগুচ্ছ মুখে নিয়ে মুরারি গৌরচন্দ্রের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। পরনের কাপড়ের অর্ধাঞ্চল গলায় জড়িয়ে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল প্রভুকে।

মুরারির আগে গৌরাঙ্গদর্শন পরে জগন্নাথদর্শন।

প্রভু তাকে বুকে তুলে নেবার জন্যে বাহু বাড়ালেন।

মুরারি বললে, আমি অধম পামর, আমার পাপদেহ তোমার স্পর্শযোগ্য নয়।

প্রভু বললেন, মুরারি, দৈন্য ছাড়ো। তোমার দৈন্য দেখলে আমার বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়।

নিজেই তাকে বুকে করলেন। গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলেন হাত দিয়ে।

মুরারিই গৌরাঙ্গের আদি চরিতকার। তাঁর কড়চার নামও 'শ্রীচৈতন্য-চরিত'। সেখানে নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষবর্ণন।

হে চৈতন্যচন্দ্র, তোমার পাদপদ্ম দর্শন করেও যারা তোমাতে পরমেশবুদ্ধি করে না তারা তোমার বৈভবমায়ায় বিমোহিত।

মুরারির প্রতি সর্ব বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্বভূতে কৃপালুতা মুরারির চরিত॥
যেতে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থানে সর্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥

॥ ১২ ॥

মুরারিচৈতন্য দাস

'মুরারিচৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে, সর্প সনে খেলা॥'

কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে প্রায়ই বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়ে থাকেন।

তার সর্বভূতে ভগবান-দর্শন।

তাই তার বাঘে-সাপে ভয় নেই। আর যার প্রাণে কৃষ্ণপ্রেমের অমলধারা নিত্য বয়ে চলেছে তার হিংসা কোথায়?

যদি চেতনায় হিংসা নেই তবে কোনো চেতন পদার্থেও হিংসা নেই।

দিব্যি বাঘ তাড়িয়ে বনে গিয়ে ঢোকে মুরারি। যেন বাঘেরই ভয় পাবার কথা। বাঘ দূরে সরে যেতে চাইলে মুরারিই বাঘকে ডাকে। বাঘ কাছে এলে দিব্যি তার পিঠের উপর চড়ে বসে।

'কখনো চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥'

শুধু তাই নয়, সাপ কোলে নিয়ে বসে থাকে মুরারি। যে-সে সাপ নয়, বিষধর অজগর। যখন মুরারির সমস্ত সত্তাই কৃষ্ণপ্রেম তখন জগতে বিষ কোথায়?

মুরারিচৈতন্য কোথায়? তিন দিন ধরে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা গেল জলের নিচে ডুবে আছে মুরারি।

তার কাছে বুঝি জল-স্থলেরও প্রভেদ নেই।

সমস্তই নিত্যানন্দের শক্তিতে। মুরারিচৈতন্য নিত্যানন্দের গণ। ব্রজের সখারাই নিত্যানন্দের গণ।

মুরারিচৈতন্যের তাই সব সময়েই কৃষ্ণকথা। সব সময়েই আনন্দময়তা। লীলারস-মাধুর্য।

যার গায়ে মুরারির বাতাস লাগে সেই কৃষ্ণ পেয়ে যায়। 'যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত। যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥'

দুই মুকুন্দ

॥ ১৩ ॥

মুকুন্দ দত্ত

মুকুন্দের জন্ম চট্টগ্রামে। জাতিতে বৈদ্য। প্রথমে নবদ্বীপ, পরে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়ায় এসে বাস করে।

আর গান গায়। কীর্তন করে। গানের চেয়ে পরতর আর কিছু নেই। কীর্তনই সাধন-ভজনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। 'সর্ববৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত। মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত ॥'

নিমাইয়ের সঙ্গে এক টোলে পড়ে মুকুন্দ। মুকুন্দের সঙ্গে নিমাইয়ের বেশি ভাব। মুকুন্দ যে গাইতে জানে।

মুকুন্দকে কাছে পেলেই নিমাই 'ফাঁকি' জিজ্ঞেস করে। বলো তো এটার কী মানে। মুকুন্দ যথাসাধ্য উত্তর দেয়।

হল না।

তুমি বললেই হল না?

কেন হল না বুঝিয়ে দিচ্ছি। নিমাই জলের মত বুঝিয়ে দেয়।

মুকুন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভেবেছিল নিমাই ব্যাকরণের ছাত্র, অলঙ্কারের কী জানে। মুকুন্দ তাই অলঙ্কার দিয়ে ব্যাকরণকে চেয়েছিল

ব্যাহত করতে। কিন্তু মুকুন্দ দেখল নিমাই অলঙ্কারেরও অলঙ্কার।

তুমি একটু কৃষ্ণকথা বলতে পারো না? মুকুন্দ নিমাইকে তেড়ে আসে।

আমার দরকার কী। নিমাই হাসে। তোমার বলতে হয় তুমি বলো।

সেদিন মুকুন্দ গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে, পথে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

দেখামাত্রই মুকুন্দ পালিয়ে গেল। ফাঁকির রাজা আবার কী ফাঁকি জিজ্ঞেস করে বিপদে ফেলে বলা যায় না।

ও আমাকে দেখে পালিয়ে গেল কেন বলতে পারো? গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলে নিমাই।

আর কোথাও হয়তো কাজ আছে।

কাজ না আরো কিছু! আমার মুখে কেন কৃষ্ণকথা কৃষ্ণজিজ্ঞাসা নেই তাই ও আমাকে এড়িয়ে চলে। আচ্ছা আমিও দেখব একদিন।

কী দেখবে তা কে বলবে।

মুকুন্দ শুধু গানই গাইতে পারে না, গানে প্রাণ ঢালতে পারে। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ এসেছে, উঠেছে অদ্বৈতের ঘরে। অদ্বৈত বললে, মুকুন্দ, একখানা গান গাও।

কৃষ্ণচরিতের গান ধরল মুকুন্দ। প্রাণে যত প্রেম আছে সব সুরে সঞ্চারিত করে দিল।

ঈশ্বরপুরী কাঁদতে লাগল। সর্বাঙ্গে জাগল প্রেমবিকার।

তখন সবাই চিনতে পারল ঈশ্বরপুরীকে। মুকুন্দের গানই তাকে চিনিয়ে দিল।

গয়া থেকে নিমাই যখন ফিরে এল মহাভক্তিযোগের প্রতিমূর্তি হয়ে, তখন শচীমাতার ঘরে মুকুন্দেরও ডাক পড়ল, দেখ, নিমাইকে চেন কিনা, দেখ তাকে পারো কিনা শান্ত করতে।

'নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয়।'

কোন্ কোন্ শ্লোক ভক্তিযোগসম্মত বেছে নিয়ে মুকুন্দ পড়তে লাগল। তার কণ্ঠে উচ্চারিত শ্লোক শোনাল দিব্যধ্বনির মত।

হরিপ্রেমে উত্তাল হল নিমাই। 'ত্রাস হাস কম্প স্বেদ পুলক গর্জন। একেবারে সর্বভাব দিল দরশন॥'

নিমাইয়ে কীর্তন-প্রকাশ আরম্ভ হল। আর সে-কীর্তনে মূল গায়ক মুকুন্দ।

মুকুন্দই গদাধর পণ্ডিতকে নিয়ে গেল পুণ্ডরীকের কাছে। পুণ্ডরীক

চট্টগ্রামের লোকে, আগে থেকেই তাকে চিনত মুকুন্দ। বিষয়ীর আচ্ছাদনে পুণ্ডরীক তার মহাবৈষ্ণবত্ব ঢেকে রেখেছে।

বাইরের বিলাসব্যসন দেখে গদাধরের মন যখন বিমুখ হতে চাইল তখন মুকুন্দই ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করে চিনিয়ে দিল পুণ্ডরীককে। 'মুকুন্দ সুস্বর বড়—কৃষ্ণের গায়ন।' যেই সেই কৃষ্ণকরুণার মহিমা বর্ণনা করল, যে করুণা রুধিরাশনা রাক্ষসী পুতনাকে পর্যন্ত সদ্গতি দেয়—পুণ্ডরীকের বাহ্যিক বিষয়-আবরণ নিমেষে অপসৃত হয়ে গেল। পুণ্ডরীক মাটিতে মূর্ছিত হয়ে কাঁদতে লাগল কাঙালের মত।

তারপর অনুতপ্ত গদাধর যখন তার চিত্তদোষের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইল তখন মুকুন্দই গদাধরের আবেদন জানাল পুণ্ডরীককে।

গদাধর আপনার কাছে মন্ত্রদীক্ষা চায়।

আমার এত ভাগ্য! শিষ্য পেয়ে পুণ্ডরীকই যেন কৃতকৃতার্থ।

মহা-প্রকাশের সময় গৌরাঙ্গ সবাইকে ডেকে বর দিচ্ছেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, মুকুন্দর ডাক নেই। যে তাঁর কীর্তন-সহচর তারই বেলায় কিনা তিনি নিরুচ্চার থাকবেন!

মুকুন্দের প্রতি প্রভুর কেন এই বৈমুখ্য কেউ বুঝতে পারছে না। মুকুন্দেরও সাহস নেই, বিনা ডাকে প্রভুর সামনে এসে দাঁড়ায়। শুধু অন্তরে দুঃখ নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

শ্রীবাসের আর সহ্য হল না। বললে, মুকুন্দর প্রতি তোমার এত বিরাগ কেন? সে কী করেছে? যার গান শুনে সকলের প্রাণ দ্রবীভূত হয় তার প্রতিই তুমি এত কঠিন? তার যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তাকে শাস্তি দাও, তাকে দূরে রেখে পরিহার করছ কেন?

মুকুন্দের কথা আমার কাছে কিছু বোলো না। প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, ও কখনো দন্তে তৃণ ধরে, কখনো আবার আমাকে লাঠি মারে। ওর মুখও আমি দেখব না।

সে কী কথা! সবাই স্তম্ভিত হয়ে রইল।

প্রভু বললেন, ও যখন যে দলে যায় সেই দলের কথায় সায় দেয়। এদিকে ভক্তিযোগে নাচে গায়, ওদিকে আবার অদ্বৈতের কাছে গিয়ে যোগবাশিষ্ঠ পড়ে। আবার অন্য সম্প্রদায়ে গিয়ে তাদের মত কথা বলে। ভক্তিই যে সমস্ত এই সম্বন্ধে ওর যেন এখনো সংশয় আছে। ভক্তির চেয়েও বড় কিছু

আছে বলে যে ব্যাখ্যা করে সে আমাকে লাঠি মারে না তো কী। যাও, তাকে বলো, তার ভক্তিস্থানে অপরাধ হয়েছে, তাই সে আমার দর্শন পাবে না।

বাইরে থেকে সব শুনতে পেল মুকুন্দ। ঠিক করল এই অপরাধী শরীর আজ রাতেই শেষ করে দেব।

শুধু একটি কথা। শ্রীবাসকে ধরল মুকুন্দ। প্রভুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, কখনো কোনোদিন কি তাঁর দর্শন পাব?

প্রভু বললেন, কোটি জন্মের পরে পাবে।

কোটি জন্ম! তার হিসেব করতে গেল না মুকুন্দ। পাবে—শুধু এই আনন্দেই সে নৃত্য করতে লাগল।

পাব, পাব, আমিও পাব। একদিন না একদিন তো পাব। নিশ্চয় পাব। কোটি-জন্মের কথা কে ভাবে। কোটি জন্মের পরেও তো হবে আমার নিশ্চয়-প্রাপ্তি।

সে কী আনন্দ মুকুন্দের!

শ্রীবাস, মুকুন্দকে আমার কাছে নিয়ে এস।

দণ্ডই প্রসাদ হয়ে দেখা দিল।

মুকুন্দ কাছে এসে দাঁড়াতেই প্রভু বললেন, মুকুন্দ, আমি কোটি জন্মের কথা বলেছিলাম, তুমি তিলার্ধ সময়ে তা পার করে দিলে। আমার বাক্য যে অব্যর্থ তোমার এই বিশ্বাসই তোমাকে জয়ী করল।

মুকুন্দ প্রভুর চরণে পড়ে কাঁদতে লাগল।

ওঠো। তুমি আমার গায়ক। প্রভু তাকে তুলে নিলেন। তোমার আর বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই। তোমার শরীর ভক্তিময়, তোমার জিভেই আমার অধিষ্ঠান।

মুকুন্দ শোক করতে লাগল। তোমাকে শুধু দেখেই বা কী হবে? যদি অন্তরে ভক্তি না থাকে তবে তোমাকে তুমি বলে চিনব কী করে? তোমার বিশ্বরূপ তো দুর্যোধনও দেখেছিল কিন্তু তোমাকে চিনল কই? ভ্রান্ত দর্শনে সবংশে মারা গেল। আমি পাপিষ্ঠ, আমার অবিমিশ্র ভক্তি ছিল না, তবু তুমি, অনাথের নাথ, আমাকে কৃপা করলে।

প্রভু বললেন, তোমাকে আমি পরিপূর্ণ ভক্তি দেব। সর্বাগ্রে দেব তোমার কণ্ঠস্বরে। যখন যেখানে তুমি গান গাইবে সেখানে আমি অবতরণ

করব, সেখানে তুমি আমার গায়ক হবে।

মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি তথা আমি অবতরি॥
যেখানে যখন হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥

ভক্তবৃন্দ নিয়ে গৌরাঙ্গ যখন নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, কীর্তন দিয়ে শুভারম্ভ করল।

গৌরাঙ্গের আনন্দলোকের দ্বারপাল মুকুন্দ। মুকুন্দ গান গেয়ে দ্বার খুলে দিলেই আনন্দের অভিষেক।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সময়েও মুকুন্দের কীর্তন। সমস্ত বিহিত কার্যের সম্পাদনায়ও মুকুন্দ। রাত্রে আবার মুকুন্দকেই আদেশ করলেন কীর্তন করতে। আর সেই কীর্তনের মধ্যেই গৌরহরি কেশব ভারতীকে আলিঙ্গন করলেন, যার ফলে কেশব ভারতীতে ভক্তির জাগরণ হল।

পরদিন ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ যখন পথে বেরুলেন, ভক্তদলও সঙ্গ নিল। কিন্তু মুকুন্দের দায়িত্বই কঠিনতম। সারা পথ একটানা তাকেই গাইতে হল কীর্তন। আবার নীলাচলের পথে মুকুন্দই গৌরাঙ্গের সঙ্গী। কীর্তনে প্রভুর ভাবকে কখনো উত্তাল করে, কখনো বা সংহত করে রাখে। কখনো বিষাদ আনে, কখনো বা অমর্ষ। কখনো চাপল্য জাগায়, কখনো বা দৈন্যে অভিভূত করে দেয়।

অদ্বৈতের ঘরে মুকুন্দই তো সেই করুণ কীর্তন গাইল। 'হা-হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে, কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে। রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্তি ন পাঙ, যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাহা উড়ি যাঙ॥'

ভাবের প্রহারে জর্জর হলেন প্রভু, যত ভাবসৈন্য আছে, নির্বেদ বিষাদ রোষ অমর্ষ ঔৎসুক্য চাপল্য গর্ব আর দৈন্য, যুদ্ধ করতে এল প্রভুর সঙ্গে। কখনো বা ভাবে-ভাবে মহারণ উপস্থিত হল। সমস্তর মূলে ঐ মুকুন্দের কীর্তন।

গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে মুকুন্দের নবদ্বীপেই পরিচয় ছিল। নীলাচলে মন্দিরের সিংহদ্বারে দেখা হতেই চমকে উঠল গোপীনাথ। এ কি, তুমি এখানে?

আমরা প্রভুর সঙ্গে এসেছি। বললে মুকুন্দ।

প্রভু! প্রভু কোথায়?

তিনি পথের মধ্যে আমাদের ছেড়ে একাই চলে এসেছেন। এখন লোকমুখে শুনতে পাচ্ছি, সার্বভৌম তাঁকে মন্দির থেকে কুড়িয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন। আমরা এখন সেই সার্বভৌমের বাড়ি খুঁজছি।

গোপীনাথ সার্বভৌমের ভগ্নীপতি। বললে, আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। কিন্তু আমি ভাবছি—

গোপীনাথ বুঝি জগন্নাথদর্শনের কথা বলতে চাইছে।

না, না, আগে আমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে চলো। আগে প্রভুকে দেখে পরে আমরা জগন্নাথকে দেখব।

আমি সেকথা বলছি না। আমি ভাবছি সার্বভৌমকে কৃপা করবার জন্যেই বুঝি প্রভু দলছাড়া হয়ে একা চলে এলেন মন্দিরে। তোমরা সবাই সঙ্গে থাকলে এই একান্ত-দর্শন হত না। চলো দেখিগে কী হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সার্বভৌমের অভিমানের খণ্ডন হল। প্রভুর দুটি বন্দনাশ্লোক লিখে জগদানন্দের হাতে দিয়ে বললে, প্রভুকে দিও।

জগদানন্দ শ্লোক দুটি পড়তে দিল মুকুন্দকে।

মুকুন্দ পড়েই বুঝল এই শ্লোকপত্র প্রভু ছিঁড়ে ফেলে দেবেন, আত্মস্তুতি সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু শ্লোক দুটি যে ভারি সুন্দর, ভক্তকণ্ঠের রত্ন-হার। মুকুন্দ তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরের দেয়ালে শ্লোক দুটি লিখে রাখল।

বৈরাগ্য-বিদ্যা ও ভক্তিযোগ শিক্ষা দেবার জন্যে যে করুণাসিন্ধু পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীর ধারণ করেছেন আমি তাঁর শরণ নিই। কালপ্রভাবে বিনষ্ট-প্রায় ভক্তিযোগকে পুনরুজ্জীবিত করতে যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর চরণপদ্মে আমার চিত্তভৃঙ্গ প্রগাঢ়রূপে আসক্ত হোক।

যা ভেবেছিল মুকুন্দ, প্রভু সেই শ্লোকপত্র ছিঁড়ে ফেললেন।

কিন্তু মুকুন্দের কৃতিত্বে শ্লোক দুটি লুপ্ত হতে পেল না। ভক্তদের কণ্ঠে-কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী এসেছে। মুকুন্দ প্রভুকে বললে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ব্রহ্মানন্দ ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই। সে সম্পর্কে গৌরাঙ্গের গুরুস্থানীয়।

তাঁকে এখানে আসতে হবে না, আমিই তাঁর কাছে যাব। চলো, তুমিও সঙ্গে চলো। মুকুন্দ প্রভুকে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিয়ে এল।

ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম পরে আছেন।

প্রভু শুধোলেন, ভারতী গোসাঁই কই ?

মুকুন্দ বললে, এই তো তোমার সামনে বসে আছেন।

এ তো অন্য লোক। ভারতী গোসাঁই চর্ম পরবেন কেন ? তুমি আমাকে ভুল জায়গায় নিয়ে এসেছ। চলো কোথায় ভারতী গোসাঁই ?

ব্রহ্মানন্দ প্রভুর কথার তাৎপর্য মুহূর্তে বুঝে নিল। চর্মাম্বর দম্ভের পরিচায়ক। দেখ আমি কত বড় সন্ন্যাসী, আমি বস্ত্রের বিলাসিতাকেও প্রশ্রয় দিই না। আমি পশুচর্মেই আবৃত থাকি।

প্রভু, তুমি ঠিক বলেছ। ব্রহ্মানন্দ অনুতপ্ত স্বরে বললে, যে অভিমানী সে ভক্তিহীন। দম্ভের কাছে ভগবান নেই। আমি আজ থেকেই চর্মাম্বর ত্যাগ করব।

প্রভু বহির্বাস আনিয়ে দিলেন। চর্ম ছেড়ে ব্রহ্মানন্দ বসন পরল।

নীলাচলে প্রায় প্রতি বছরেই আসে মুকুন্দ, চার মাস করে থেকে যায়। গানে-কীর্তনে মাতিয়ে রাখে।

কিন্তু প্রভুর সন্ন্যাসক্লেশ দেখে মুকুন্দের কষ্ট। আবার মুকুন্দের কষ্টে প্রভুর বেদনা।

অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ—নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয় দুখে॥

বলছেন প্রভু, হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় আমি নামের মহিমা শিখেছি আর আমার কৃষ্ণভক্তি জেগেছে গৌড়ীয় ভক্তদের কৃষ্ণনামপ্রচারে। আর সেই প্রচারের প্রধান পুরোহিত মুকুন্দ।

মুকুন্দ শব্দের অর্থই তো প্রেমদাতা। এমন প্রেম যা মুক্তিকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে। সেই প্রেমদাতা কে ? শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রেমদাতা। তাই শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম মুকুন্দ।

মুকুন্দদাস

মুকুন্দ দাসের বাড়ি শ্রীখণ্ডে, জাতিতে বৈদ্য। নরহরি সরকারের বড় ভাই। রঘুনন্দনের পিতা।

ব্যবসায়ে রাজবৈদ্য। গৌড়েশ্বর নবাবের চিকিৎসা করে।

তার অন্তরে যে কৃষ্ণপ্রেম সে খবর কে রাখে?

নবাবের ঘরে উচ্চমঞ্চে বসে মুকুন্দ নবাবের সঙ্গে চিকিৎসাবিষয়ে কথাবার্তা বলছে, নবাবের ভৃত্য পাখা নিয়ে এল নবাবের মাথায় বাতাস করতে। মুকুন্দ দেখল সেই পাখায় ময়ূরপুচ্ছ।

চকিতে প্রেমাবেশ হল মুকুন্দের। জাগল কৃষ্ণস্মৃতি। কৃষ্ণ-উদ্দীপন।

মুকুন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

নবাবের ভয় হল রাজবৈদ্য মারা গেল বোধ হয়। তাড়াতাড়ি মঞ্চ হতে নেমে এসে সেই সেবাযত্ন করে সচেতন করল মুকুন্দকে।

কোথায় ব্যথা পেলে? জিজ্ঞেস করল নবাব।

না, না, তেমন কিছু ব্যথা পাইনি। সামান্যই লেগেছে।

কিন্তু তুমি পড়লে কেন?

মুকুন্দ আত্মগোপন করল। বললে, আমার মৃগী রোগ আছে। তাই এরকম হয় মাঝে মাঝে। ও কিছু নয়।

কিন্তু নবাব জানে মৃগী রোগের লক্ষণ কী! কৃষ্ণ-উদ্দীপন মৃগী রোগ নয়। মুকুন্দ যে সাধন-সিদ্ধ মহাপুরুষ এ বুঝে নিতে তার দেরি হল না। তারই জন্যে তো তার আত্মগোপন।

'আপন ভজন-কথা, না বলিবে যথা-তথা, ইহাতে হইবে সাবধান।' কিংবা—'অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনহ উতরোল, রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া।'

মুকুন্দের বাড়ির পুকুরপারে কদমগাছ। সে গাছ সারা বছর ফুলে ভরে থাকে। মুকুন্দের যে ইচ্ছে কদম ফুল দিয়ে প্রত্যহ কৃষ্ণবিগ্রহের কর্ণভূষণ তৈরি করি। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু কৃষ্ণ মুকুন্দের জন্যে নিত্যপুষ্পিত কদম্ব-তরু হয়েছেন।

মুকুন্দ গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞেস করলে, প্রভু আমার কাজ কী?

প্রভু বললেন, তোমার কাজ ধর্মে ধন-উপার্জন। ধর্মপথে থেকে ধর্মকে রক্ষা করে ধন-উপার্জন।

ছোটভাই নরহরি জিজ্ঞেস করলে, আমার কী কাজ?

প্রভু বললেন, তোমার কাজ আমার ভক্ত-সঙ্গে থেকে কৃষ্ণ-কথার আলোচনা করা।

আমার কী কাজ? জিজ্ঞেস করল রঘুনন্দন, মুকুন্দের ছেলে।

তোমার কাজ কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণসেবা ছাড়া তোমার মন যে আর কোথাও বসে না। তাই তুমি কৃষ্ণকে নিয়েই থাকো।

রঘুনন্দনের আনন্দ তখন দেখে কে।

প্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, মুকুন্দ, তুমি বাপ, রঘুনন্দন ছেলে, না রঘুনন্দন বাপ তুমি ছেলে?

মুকুন্দ বললে, রঘুনন্দন বাপ আমি ছেলে। রঘুনন্দনের থেকেই আমার কৃষ্ণভক্তি জন্মেছে, সুতরাং রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমার গুরু।

তুমি ঠিক বলেছ। তোমার আগে রঘুনন্দনের কৃষ্ণভক্তি জন্মেছে, সুতরাং ভাগবত-জীবনে সে তোমার পূর্ববর্তী। তোমার ভাগবত-জন্মদাতা। সুতরাং নিঃসন্দেহে রঘুনন্দনই তোমার পিতা, সত্যিকারের পালনকর্তা।

ভক্তকথা বলতে ভক্তের মহিমা বর্ণনা করতে গৌরাঙ্গ পঞ্চমুখ।

আর, মুকুন্দের প্রেম, ভক্তদের বলছেন গৌরহরি, যেন তপ্তকাঞ্চন। যেমন নির্মল তেমনি নিগূঢ়।

দুই বাসুদেব

॥ ১৫ ॥

বাসুদেব ঘোষ

গোবিন্দ, মাধব আর বাসুদেব তিন ভাই। তিন ভাই-ই কীর্তনিয়া। আর এই কীর্তনিয়ারূপেই তারা গৌরাঙ্গের লীলাসঙ্গী

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিনভাই
যাঁ সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥

গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে প্রথমবার তিন ভাই গিয়েছিল নীলাচল। গেয়েছিল, নেচেছিল, প্রভুকে অশেষ সন্তোষ দিয়েছিল। পরের বছর আবার

গেল তিন ভাই। প্রভু গোবিন্দকে রেখে মাধব আর বাসুদেবকে বিদায় দিলেন। বললেন, তোমরা নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে ফিরে যাও, নাম প্রচার করো।

বাসুদেব শুধু গায়ক নয়, বাসুদেব পদকর্তা। যে লীলা সে স্বচক্ষে দেখেছে তাই বর্ণনা করেছে। কেবল বিশ্বাস করেছে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ অভিন্ন।

নীলাচলে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর।
নদীয়া নগরে দণ্ডকমণ্ডলুকর ॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিল প্রচার ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদ দেখে শিশু গোরাচাঁদ কাঁদছে মায়ের কোলে। বলছে, মা চাঁদ দে। শচীমাতা হাত তুলে ডাকছে, আয় চাঁদ আয়। কিন্তু চাঁদ বড় নিষ্ঠুর, আসছে না, ধরা দিচ্ছে না। নিমাই কোল থেকে নেমে মাটিতে পড়ে কাঁদছে, কিছুতেই নিবৃত্তি নেই। ঘরে রাধাকৃষ্ণের একখানি পট ছিল, তাই পেড়ে আনল শচী। নে এই ছবি নে। শান্ত করবার জন্যে ছেলের হাতে ছবি দিল। আর, কী আশ্চর্য, ছবি পেয়েই নিমেষে শান্ত হল নিমাই।

চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পটে পহু হের নিজ মুখ ॥

ব্রজলীলার অনুসৃতি করেছে বাসুদেব। নিমাইয়ের গোষ্ঠলীলা, দানলীলা, এমন কি ব্রজগোপীর ভাব আরোপ করে নাগরলীলারও বর্ণনা করেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর সত্যিকারের আন্তরিকতা ফুটেছে সন্ন্যাসলীলার বর্ণনায়।

একেশ্বর বিরলে এসে বসেছে, হরিনাম জপ করছে নিরন্তর। 'সর্ব অবতার শিরোমণি—অকিঞ্চন জনের চিন্তামণি।' আগে দেহে সুগন্ধি চন্দন মাখত, এখন ধুলো বিনে আর কোনো ভূষণ নেই। লক্ষ্মীবিলাস ছেড়ে বৃক্ষতলে বসেছে। বাঁশি ছেড়ে দণ্ড ধরেছে।

ছাড়ল লখিমীবিলাস।
কিবা লাগি তরুতলে বাস ॥

ছাড়ল মোহন করে বাঁশী।
এবে দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী ॥
বিভূতি করিয়া প্রেমধন।
সঙ্গে লই সব আকিঞ্চন ॥
প্রেমজলে করই সিনান।
কহে বাসু বিদরে পরাণ ॥

নিমাইয়ের গৃহত্যাগের বর্ণনা দিচ্ছে বাসুদেব।

শচীর মন্দিরে এসে দুয়ারের কাছে বসল বিষ্ণুপ্রিয়া। ধীরে ধীরে বললে, 'শয়ন-মন্দিরে ছিল, নিশাভাগে কোথা গেল, মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।' বধূর মুখের কথা শুনে শচীমাতা আলুথালু বেশে ছুটে এল। 'শীঘ্র করি জালি বাতি, খুঁজিলেন ইতি-উতি, গৌরাঙ্গের উদ্দেশ না পাঞা।' বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে পথে এসে ডাকতে লাগল নিমাইকে। একজনকে পথে দেখে শচীমাতা জিজ্ঞেস করল, নিমাইকে দেখেছ? দেখেছি। সে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে হরি বলতে বলতে কাঞ্চননগরের দিকে চলেছে।

সন্ন্যাসীর করে ধরি তোমার নিমাই বলে হরি
দ্বিতীয় বসন নাহি গায়।
বাসু কহে আহা মরি তোমার গৌরাঙ্গ হরি
পাছে গিয়া মস্তক মুড়ায় ॥

'কার বোলে করিলা সন্ন্যাস?' শুনেছি রঘুনাথ যখন বনে গেল, জানকীকে সঙ্গে নিয়ে গেল। কৃষ্ণ যখন মথুরায় গেল, সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করল না, উদ্ধবকে পাঠাল বৃন্দাবন। এ যে তুমি দেশান্তরী হয়ে গেলে। এই যদি তোমার মনে ছিল তুমি গৃহবাস করলে কেন? এখন আমি কী করব, কোথায় যাব, কী আশায় দেহ রাখব?

এত কহি বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
ধরণীরে মাগয়ে বিদায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে মোর সমান পাষাণ নহে
তবু হিয়া বিদরিয়া যায় ॥

শচীমাতা কাঁদছে, আমার সোনার পুতলী গোরাচাঁদ কোথায় গেল, কে তাকে রাখল লুকিয়ে? যে সব ছেড়ে চলে গেল তাকে ছেড়ে আমি বাঁচব কী করে? আমার সমস্ত নদীয়া আঁধার হয়ে গেল। বলো, সে কোথায়?

আমিও যোগিনী হয়ে তার সঙ্গ নেব। যে আমাকে গৌরাঙ্গ পাইয়ে দেবে, আমি তার কেনা দাসী হয়ে থাকব।

যে মোরে মিলিয়া দেয় মূল্য দিয়া কিনা লয়
হইতাম দাসের সে দাসী।
বাসুদেব ঘোষ ভনে শচী কান্দে অকারণে
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী॥

কাঞ্চননগরে, কাটোয়ায়, গঙ্গাতীরে বৃক্ষতলে গৌরাঙ্গসুন্দর বসেছে— 'কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর।' গৌরাঙ্গের যে কী অলোকসুন্দর মূর্তি আর কী তার দুর্নিবার আকর্ষণ তাই বোঝাচ্ছে বাসুদেব।

কাঁখে কুম্ভ করি নারী দাঁড়াইয়া চায়।
চলিতে না পারে কেহ নড়ি হাতে ধায়॥
নগরের পুরনারী যতেক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজ পতি—জপ ছাড়ে যতি॥
কেহ বলে হেন গোরা কোন দেশে ছিল।
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥

কেউ বলেছে, কোন বাপ-মায়ের প্রাণ বধ করে এসেছে, কোন নারীর গলায় পা দিয়ে। আবার বলছে, সে মা ধন্য যে এমন পুত্র পেটে ধরেছে, যে নারী একে পতি বলে পেয়েছিল তার মত ভাগ্যবতী কোথায়? কেউ বলছে এমন সুন্দর যৌবনে কেশ মুণ্ডন কোরো না, নিজের দেশে ফিরে যাও।

কিন্তু প্রভু কী বলছে?

প্রভু বলে আশীর্বাদ কর মাতাপিতা।
সাধ আছে কৃষ্ণপদে বেচি নিজ মাথা॥

প্রভু মস্তক মুণ্ডন করতে চাইলেন। যে-ই শুনল হাহাকার করে উঠল। কিন্তু প্রভু বিচলিত হলেন না, মধু শীলকে বললেন, আমি গঙ্গা স্নান করে আসি, তুমি আমার মাথা কামিয়ে দেবে। মধু বলে, এমন চাঁচর কেশ কাটতে পারব না। কেন কাটব? প্রভু বললেন, আমি ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেব, কেশে-বেশে আমার প্রয়োজন নেই।

প্রভু বলে আমি যে ছাড়িব এই ধর্ম।
সন্ন্যাস করিব আমি কেশে নাহি কর্ম॥

কেশেবেশে ধনেজনে কৃষ্ণ নাহি পাই।
সকল তেজিব আমি শুন ওহে নাই॥

মধু বললে, তোমার মাথায় কী করে হাত দেব? তোমার মাথায় হাত দিয়ে আবার কার পা ছোঁব? আমার নিদারুণ অপরাধ হবে। ভাবতেও আমার গা কাঁপছে।

প্রভু বললেন, আমি বলছি তোমাকে আর নিজের বৃত্তি করতে হবে না। তোমাকে কৃষ্ণ আজীবন সুখে রাখবেন, অন্তকালে তোমার বিষ্ণুলোকে গতি হবে।

মধু বললে গোসাঁই, আমাকে ভাঁড়িও না, আমি বুঝতে পাচ্ছি তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু।

মধুশীল বলে গোঁসাই না ভাঁড়াও মোরে।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু জানিনু অন্তরে॥
যে কৃষ্ণ রাখিবে সুখে সেই কৃষ্ণ তুমি
তব পদ বিষ্ণুলোক কি বা জানি আমি॥
মুড়াবে চাঁচর কেশ হাত দিব মাথে।
কিন্তু প্রভু শ্রীচরণ দেও আগে মাথে॥
মধুর বচনে প্রভু দিলা শিরে পদ
বাসু কহে যার কাছে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ॥

'তখন নাপিত আসি, প্রভুর বামেতে বসি, ক্ষুর দিল ও চাঁচর কেশে।' সকলে শোকে উত্তাল হয়ে উঠল। মধুও কাঁদতে লাগল। 'কি হৈল কি হৈল বলে, খুর মোর নাহি চলে, প্রাণ ফাটে বিদরিয়া যায়।' এদিকে 'প্রভুর মুণ্ডন দেখি, কান্দে যত পশুপাখী, আর কান্দে যত শ্রীনিবাসী। বৎস নাহি দুগ্ধ খায়, তৃণদন্তে গাভী ধায়, নেহারে গৌরাঙ্গ মুখ আসি॥'

গৌরাঙ্গকে কেশবভারতী সন্ন্যাস দিল। 'অরুণ দুখানি ফালি, ভারতী দিলেন তুলি, আর দিলা এ ডোর কৌপীন।' তারপর সন্ন্যাস দিয়ে কাঁদতে বসল।

গৌরাঙ্গ' সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কাঁদিলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিমাইয়েরে দিলা॥
পঁহু কহে গুরু মোর পূরাহ মনসাধ।
কৃষ্ণমতি হউক এই দেও আশীর্বাদ॥

ভারতী কাঁদিয়া বলে মোর গুরু তুমি।
আশীর্বাদ কি করিব কৃষ্ণ দেখি আমি॥
ভুবন ভুলাও তুমি সব নাটের গুরু।
রাখিতে লৌকিক মান মোরে কহ গুরু॥
আমার সন্ন্যাস আজি হইল সফল।
বাসু কহে দেখিলাম চরণকমল॥

'কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে,
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে,
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ॥'

কেশবভারতীর থেকে দীক্ষা নিয়ে নদীয়া ছেড়ে শান্তিপুরে এলেন গৌরহরি। অদ্বৈতের গৃহে এসে উঠলেন। শচীমাতা দেখা করতে এল।

"এ মত হৈলে কেনে, শিরের কেশ দেখি হীনে, পরিয়াছে কৌপীন যে বাস। নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথ করি, কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।'

নিমাই মায়ের পায়ে দণ্ডবৎ হল, বললে, মা, এ বিধির নির্বন্ধ। এ কেউ খণ্ডাতে পারবে না। তুমি কেঁদো না, মন স্থির করো।

'ইহার লাগিয়া যত, পড়াইলাম ভাগবত,
এ দুখ কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ড ধরি,
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায়, ইহা নাকি সহা যায়,
কার বোলে হৈলা বৈরাগী॥'

নিমাই বললে, 'মা, তুমি আমার জন্ম-জন্মের মা, অমি তোমার জন্ম-জন্মের পুত্র। তুমিই তো ধ্রুবের জননী হয়ে ছেলেকে বৈরাগ্য দিলে, তুমিই তো কৌশল্যা হয়ে কত কাঁদলে বনবাসী রামের জন্যে। তারপর কৃষ্ণ যখন মধুপুরে গেল, তুমিই তো ঘরে বসে কাঁদলে নন্দরাণী হয়ে। তুমি শোক কোরো না, যখনই তুমি ডাকবে তোমার কাছে চলে আসব। শুধু তুমি আমাকে

তোমার চিত্তে সন্নিহিত করো। আর মা, কৃষ্ণভজন করো। কৃষ্ণই সার, সে ছাড়া আর সংসার নেই।'

শচীমাতা শান্ত হলেন। সুদৃষ্টি মেলে সকলের শোক হরণ করলেন প্রভু। তারপর মায়ের অনুমতি নিয়ে চললেন নীলাচলে।

নীলাচলে মন্দিরে প্রেমাবেশে মূর্ছিত হলেন গৌরাঙ্গ। সার্বভৌম গৌরাঙ্গকে বুকে করে গৃহে নিয়ে গেল। দেখল কৃষ্ণের নানা অবতার।

এইখানেই বাসুদেবের বর্ণনার শেষ।

গোরা মোরে দয়া না ছাড়িয়।
আপন করিয়া মোরে চরণে রাখিয়॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিলুঁ।
শীতল চরণ পাঞা সব না লইলুঁ॥
এ কুলে ও কুলে দুঞি দিলু তিলাঞ্জলি।
রাখিয় চরণে মোরে আপনার বলি॥
বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া॥

॥ ১৬ ॥

বাসুদেব দত্ত

বাসুদেব দত্ত মুকুন্দ দত্তের বড় ভাই।

মুকুন্দের মত বাসুদেবও গৌরাঙ্গের সংকীর্তনসঙ্গী, মধুকণ্ঠ গায়ক।

নীলাচলে প্রভু বাসুদেবকে বলছেন, যদিও তোমার ছোটভাই মুকুন্দ বাল্যকাল হতেই আমার সঙ্গী, তবু তোমাকে দেখে আমার বেশি সুখ হয়।

মুকুন্দ আমার ছোটভাই কে বলে? বাসুদেব আপত্তি করল। বললে, মুকুন্দ আমার আগে তোমার কাছে এসেছে, তোমার সঙ্গ করেছে। সেই চরণপ্রাপ্তিতেই তার পুনর্জন্ম, ভাগবতজন্ম ঘটেছে। সেই জীবনে সে আমার অগ্রজ। 'ছোট হইয়া মুকুন্দ এবে হইল মোর জ্যেষ্ঠ, তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্বগুণশ্রেষ্ঠ।'

প্রভু বললেন, দাক্ষিণাত্য থেকে তোমার জন্যে দুখানি গ্রন্থ এনেছি।

আমার জন্যে? বাসুদেব কৃতজ্ঞ-কৃতার্থের মত তাকাল সানন্দে।

এই নাও। বাসুদেবের প্রসারিত করপুটে গ্রন্থ দু'খানি রাখলেন গৌরহরি। একখানি কৃষ্ণকর্ণামৃত, আরেকখানি ব্রহ্মসংহিতা।

বোঝাতে চাইলেন, বাসুদেবই বিদ্বান, বাসুদেবই রসবেত্তা।

অন্য বৈষ্ণবেরা প্রত্যেকে সেই বই লিখে নিল। ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল বাইরে।

বাসুদেবের পরমবন্ধু শিবানন্দ সেন।

প্রভু-সন্দর্শনে দুজনে একসঙ্গেই গিয়েছিল নীলাচল। দুজনেরই হাতে গঙ্গাজলের কলসী।

প্রভু এক কলসী রাখলেন জগন্নাথের স্নানের জন্যে, আরেক কলসী নিজের ব্যবহারের জন্যে।

এখন কার কলসী কার সেবায় যায়?

পাছে ভক্তদের মনে আঘাত লাগে প্রভু দু' কলসীর জলই সমান ভাগ করলেন। এক অর্ধেক জগন্নাথের, আরেক অর্ধেক গৌরহরির।

পরিবেশনে অসাম্য ঘটতে দিলেন না।

শিবানন্দকে বললেন, শিবানন্দ, তুমি বাসুদেবের আয়-ব্যয়ের সরখেল হও।

বাসুদেবের কী অবস্থা?

বাসুদেব কিছুই সঞ্চয় করে না। যেদিন যা আসে সেইদিনই তা খরচ করে ফেলে। পরের দিনের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করে রাখে না। কিন্তু সে তো গৃহস্থ, সে তো সন্ন্যাসী নয়। তাকে কিছু সঞ্চয় করতে হবে বৈকি। সঞ্চয় না করলে সে কুটুম্বভরণ করবে কী করে? 'গৃহস্থ হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়। সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ না হয়॥'

সঞ্চয় থেকেই তো বাসুদেব পরহিত করবে, করবে আত্মীয়সেবা।

বাসুদেব আয়-ব্যয় সম্বন্ধে উদাসীন। সুতরাং শিবানন্দকে বললেন, ভার নিতে, হিসেব রাখতে।

শিবানন্দ রাজী হল।

বাসুদেব বললেন, প্রভু, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

বলো।

জগৎ-ত্রাণ করতে তোমার অবতরণ। তুমি দয়াময়, তুমিই একমাত্র সমর্থ।

'করিতে সমর্থ তুমি প্রভু দয়াময়, তুমি মনে কর যবে অনায়াসে হয়।'

প্রভু অমৃতস্নিগ্ধ উদারদৃষ্টিতে তাকালেন।

বাসুদেব বললে, জগতের দুঃখ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সকল জীবের সমস্ত পাপ তুমি আমাকে দাও, আমি অনন্ত নরকভোগ করি, তার বিনিময়ে সকল জীবের ভবরোগের অবসান হোক।

বাসুদেবের কথা শুনে প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হল। প্রভু বললেন, তোমার এ প্রার্থনা বিচিত্র নয়। তুমি তো প্রহ্লাদ।

আর সকলকে ত্যাগ করে প্রহ্লাদ নিজের উদ্ধার চায়নি। নিজে বাঁচব আর সকলে ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাবে এ অসম্ভব।

প্রভু আরো বললেন, বাসুদেব, তুমি সর্বজীবের নিস্তার চাইলে। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক, বিনা পাপভোগে সকলের উদ্ধার হোক। ভক্ত যা চায় কৃষ্ণ তাই পূর্ণ করেন। ভক্তবাঞ্ছাপূর্তি ছাড়া তাঁর আর কিছু করণীয় নেই। পাপের ফল ভোগ না করিয়েও কৃষ্ণ পাপীকে উদ্ধার করতে সক্ষম, সেক্ষেত্রে অন্যের পাপের ফল তোমাকে দিয়ে ভোগ করাবেন কেন? বাসুদেব, তুমি পরম বৈষ্ণব, পরম বৈষ্ণব যার হিতকামনা করে সেও বৈষ্ণব হয়ে যায়। আর বৈষ্ণবের সমস্ত পাপ কৃষ্ণ দূর করেন।

তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥

রথযাত্রায় কীর্তন করল বাসুদেব। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে প্রভুর সঙ্গে জলকেলি।

কুমারহট্টে শিবানন্দের বাড়ির কাছে বাস করতে লাগল বাসুদেব। শিবানন্দকে প্রতিবেশী না করলে সে তার সরখেল হয় কী করে? মহাপ্রভুর নির্দেশ তা হলে পালন করা হয় না।

গৌরহরি যখন বাঙলাদেশে এলেন কুমারহট্টে পৌঁছে প্রথম শ্রীবাসের বাড়ি এলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে দুইটি পথের সংযোগে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক পা ডাইনে গেলে শিবানন্দের বাড়ি, কয়েক পা বাঁয়ে গেলে বাসুদেবের বাড়ি। প্রভু দ্বিধায় পড়লেন, কার বাড়ি আগে যান।

বাসুদেব বললে, আগে শিবানন্দের বাড়ি যান।

বাসুদেবের অনুমতি পেয়ে প্রভু আগে শিবানন্দের বাড়ি গেলেন। পরে বাসুদেবের বাড়ি উপস্থিত হলেন।

তাঁকে দেখে বাসুদেব, যে সর্বভূতে কৃপালু, যে শুধু চৈতন্যরসে মত্ত, সে

কাঁদতে লাগল। প্রভুও কাঁদতে লাগলেন।

বললেন, আমার এ শরীর আমার বাসুদেবের। বাসুদেব আমাকে যেখানে বেচবে আমি সেইখানে বিকোব। বাসুদেবের বাতাস যার গায়ে লাগবে তাকে কৃষ্ণ সব সময়ে রক্ষা করবেন। শোনো, বৈষ্ণবমণ্ডল শুনে রাখো, আমার এ দেহ শুধু আমার বাসুদেবের।

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার ॥
দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই ॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে, তারে কৃষ্ণ রক্ষিব সদায় ॥
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল ॥

বাসুদেব ছাড়া এত বড় সৌভাগ্য আর কার! সেই একমাত্র গৌরাঙ্গের শরীরের মালিক।

বাসুদেব দত্ত আর যদুনন্দন আচার্য গৌরহরির দুই সেনাপতি। যদুনন্দন রঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু, বাসুদেবের অনুগৃহীত।

প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়ে প্রভুকে দেখে আসে বাসুদেব। প্রভুর তিরোভাবের দিনেও বাসুদেব নীলাচলে।

দুই চন্দ্রশেখর

চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন

চন্দ্রশেখরের আদিনিবাস শ্রীহট্টে। গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের আগে থেকেই নবদ্বীপের বাসিন্দে।

শচীদেবীর বোনের সঙ্গে বিবাহ হয়। সেই সম্পর্কে চন্দ্রশেখর গৌরাঙ্গের মেসোমশাই।

গৌরাঙ্গের যখন আবির্ভাব হল তখন ত্রিজগতে উল্লাস উঠল। অদ্বৈত সপ্রেমে হুঙ্কার ছাড়ল, হরিদাস নৃত্যকীর্তন শুরু করল। চন্দ্রশেখর গঙ্গাস্নান করে আনন্দের প্রাবল্যে দান করতে লাগল। চন্দ্রগ্রহণের দান নয়, চন্দ্রাবতরণের দান। 'নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি হইল উদয়।'

জন্মের পর যে-সব জাতকর্ম বিধেয়, চন্দ্রশেখর আর শ্রীবাসই তা জগন্নাথকে দিয়ে সম্পন্ন করাল। যে সব প্রতিবেশিনী শিশুকে দেখতে এল তাদের তেলসিঁদুর দিয়ে অভ্যর্থনা করার ভার পড়ল মাসির উপর। মাসির সঙ্গে মিলল এসে মালিনী, শ্রীবাসের স্ত্রী।

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা চন্দ্রশেখর। মেসো হলে কী হবে, গৌরাঙ্গের দাস্যপ্রেমে আত্মহারা। দাস্যপ্রেমের তাৎপর্য কী? শুধু সেবা-বাসনা। 'কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব। গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥'

চন্দ্রশেখরের ঘরে গৌরাঙ্গ নৃত্যাভিনয় করবেন—চলো দেখবে চলো। দৃশ্যে-অঙ্কে বাংলা ভাষায় সেই প্রথম নৃত্যনাট্য। আর, আশ্চর্যের আশ্চর্য, প্রভু রমণী সাজবেন।

রমণী সাজবেন?

হ্যাঁ, প্রকৃতি সাজবেন। চিৎশক্তির প্রতিমা হবেন।

ভালো করে বুঝিয়ে বলো।

দুর্গা হবেন লক্ষ্মী হবেন রুক্মিণী হবেন রাধা হবেন। ভগবানের অন্তরঙ্গ-স্বরূপশক্তিকেই চিৎ-শক্তি বলে। দুর্গা লক্ষ্মী রাধা রুক্মিণী সবই সেই চিৎ-শক্তির বিলাস-বৈচিত্রী।

যে জিতেন্দ্রিয় সেই শুধু এই নৃত্যনাট্য দেখতে পাবে। প্রভু আদেশ করলেন।

আমার তাহলে যাওয়া হবে না। বললে অদ্বৈত। আমি ইন্দ্রিয় জয় করেছি এ আমি বলি কী করে?

আমারও সেই কথা। শ্রীবাসও নিবৃত্ত হল।

তোমরা যদি না যাও, তা হলে আর নৃত্য-নাট্য কেন? প্রভু আশ্বাস দিলেন। যাও, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। তোমরা আজ মহাযোগেশ্বর হয়ে যাবে, আমাকে দেখে কারু মোহ জন্মাবে না।

তা হলে চলো যাই সকলে। নির্ভয়ে। নির্মোহে।

শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে গেলেন। আর-আর বৈষ্ণবদের পরিবারবর্গও উপস্থিত হল।

কে কী সাজবে বলে দাও।

প্রভু বললেন, আমি রাধা সাজব, গদাধর ললিতা সাজবে, নিত্যানন্দ আমার বড়াই হবে। হরিদাস কোতোয়াল সাজবে আর শ্রীবাস সাজবে নারদ।

আর আমি কী সাজব? জিজ্ঞেস করল অদ্বৈত।

তুমি কী না সাজবে? তুমিই তো সমস্ত। তুমি কৃষ্ণ সাজবে।

সাজাবে কে?

সাজাবে বুদ্ধিমন্ত আর সদাশিব।

গান গাইবে কে?

গান গাইবে মুকুন্দ।

চন্দ্রশেখর তার বাড়ির অঙ্গনে প্রকাণ্ড চাঁদোয়া টাঙিয়েছে। শয্যা বিছিয়েছে। দীপসজ্জারও ত্রুটি রাখে নি। সন্ধ্যের পর শুরু হবে নৃত্য-নাট্য।

তার গৃহের কী ভাগ্য! এখানে প্রভু তাঁর মহিমা প্রকাশ করবেন। শুধু গৃহের নয়, তার নিজের কী ভাগ্য! স্বচক্ষে সে দেখবে সেই মহিমা।

হে রঙ্গভূমি, তুমি আজ বৃন্দাবন হও। হরিদাস রঙ্গস্থলকে প্রণাম করল।

কোন্ দৃশ্যে কার কী বক্তব্য, কিছু শেখাতে হবে না। কিছু মুখস্থ লাগবে না প্রভুর শক্তিতে বাক্য আপনা-আপনি স্ফুরিত হবে।

কে তুমি? কে একজন জিজ্ঞেস করল।

আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল।

কী করো তুমি?

আমি শুধু কৃষ্ণ বলে হাঁক দিই। নিদ্রিত জগৎকে জাগিয়ে দিই। সতর্ক করি। নির্ভয় করি।

এ আবার কে এল? কাঁধে বীণা, হাতে কুশ আর কমণ্ডলু, একবুক দাড়ি, সারা গায়ে চন্দনের ফোঁটা। কে তুমি?

আমি নারদ। বললে শ্রীবাস।

তুমি এসেছ কেন?

কৃষ্ণকে খুঁজিতে এসেছি। বললে নারদ, বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলাম কৃষ্ণ

নেই, সমস্ত বৈকুণ্ঠ খাঁ খাঁ করছে। জিজ্ঞেস করলাম, কৃষ্ণ কোথায়? উত্তরে শুনলাম কৃষ্ণ নদীয়ায় গিয়েছে। তাই এসেছি এখানে।

শচীদেবী মালিনীকে জিজ্ঞেস করলে, এই কি তোমার পণ্ডিত?

কী জানি, চিনতে পারছি না। নারদ বলেই তো মনে হচ্ছে।

অদ্বৈতকে কে চিনবে? পঞ্চাশের বেশি বয়স, এখন দেখাচ্ছে পনেরো বছরের কিশোর। অদ্বৈত কোথায়? এ যে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণকে দেখে পুরনারীরা উলু দিয়ে উঠল, পুরুষ দর্শকেরা হরিধ্বনি দিল।

স্ত্রীবেশে সাজানো হচ্ছে প্রভুকে। তাঁর হাতে কঙ্কণ দিতেই তাঁর রুক্মিণীর আবেশ হল। তিনি অধোমুখে চোখের জল ফেলছেন আর সেই সঙ্গে সিক্ত মৃত্তিকায় নখ দিয়ে কৃষ্ণকে প্রেমপত্র লিখছেন।

তারপর রুক্মিণীভাব অন্তর্হিত হয়ে জাগল রাধাভাব।

রাধাভাবেই প্রভু রঙ্গস্থলে আবির্ভূত হলেন।

এ ভুবনমোহিনী কে? শচীমাতাও চিনতে পারছে না। আর বিষ্ণুপ্রিয়া কী দেখছে কী ভাবছে তা বিষ্ণুপ্রিয়াই জানে।

তারপর প্রভু জগৎজননীর ভাব ধরলেন। ভগবতী মহামায়া হয়ে বসলেন বিষ্ণুখট্টায়। সকলকে পুত্রভাব দিলেন। দিলেন স্তনসুধা।

> 'মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া।
> স্তন পান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥'
> কমলা পার্বতী দয়া মহানারায়ণী
> আপনে হইলা প্রভু জগৎজননী॥
> সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা
> আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা॥

সে রাত্রিও প্রভাত হল। সবাই কাঁদতে লাগল, রাত, তুমি কেন পোহালে? 'কেহ বোলে, আরে রাত্রি, কেন পোহাইলা? হেন রসে কেনে কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলা?'

সে রাত শেষ হয়ে যাবার পরও দিনে-রাতে চন্দ্রশেখরের বাড়ি আলো হয়ে রইল। প্রভু এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তবু তাঁর জ্যোতি ম্লান হচ্ছে না।

যে আসে সে চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞেস করে, এ কিসের আলো, কিসের তেজ?

চন্দ্রশেখর বলে, প্রভু যে এসেছিলেন, নৃত্যনাট্য করেছিলেন, তাঁর ছটা।

আরেকদিন মুরারি গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে প্রভু বলতে লাগলেন, মধু দাও, আমাকে মধু দাও।

নিত্যানন্দ গঙ্গাজল দিল প্রভুকে। মধুজ্ঞানে প্রভু সেই জল খেলেন।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞেস করলে, এ তোমার কী ভাব?

আমি আর তোমাদের কৃষ্ণ নই। আমি বলরাম। মধুপ্রিয় বলরাম। রুপোর পাহাড় বলরাম।

চন্দ্রশেখর দেখল সোনার লাঙল কাঁধে নিয়ে বলরাম দাঁড়িয়ে আছে।

গয়ায় যাবার সময় শচীমাতা চন্দ্রশেখরকেই পাঠাল নিমাইয়ের অভিভাবক করে। সন্ন্যাসগ্রহণের কথাও নিমাই চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে গোপন করল না। আর চন্দ্রশেখরই কাটোয়ায় নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণকালীন কৃত্যাদি সম্পন্ন করাল।

তারপর লিখল এই সুমধুর পদ:

ক্ষণেক রহিয়া চলিয়া উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রবেশি নগরে দেখে ঘরে ঘরে
লোক সব নিরানন্দ॥
না মেলে পসার না করে আহার
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী কান্দয়ে গুমরি
থাকলে বিরলে বসি॥
দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর
প্রবেশ করিল যাই।
আধমরা হেন ভূমে অচেতন
পড়িয়া আছেন আই॥
প্রভুর রমণী সেহ অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন মলিন বসন
মুদল নয়ানে ধারা॥

সন্ন্যাসের পর প্রভু যমুনা ভেবে গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ালেন। চন্দ্রশেখর

ছুটল অদ্বৈতকে খবর দিতে। শুধু শান্তিপুরে নয়, নবদ্বীপে গেল, দাঁড়াল শচীমাতার দুয়ারে। চলো শান্তিপুরে চলো, তোমার সন্ন্যাসী পুত্রকে দেখতে পাবে।

যত দুঃখের সংবাদ বহন করবার দায় চন্দ্রশেখরের।

চন্দ্রশেখর বাপুর সোসর
বিষয়বিষেতে রত।
গৌরাঙ্গ চরিত পরম অমৃত
তাহাতে না লয় চিত॥

প্রতি বছর রথের সময় প্রভুর দর্শনের জন্যে নীলাচলে যায় চন্দ্রশেখর। কখনো কখনো স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যায়। চলো দেখে আসি আনন্দ-নিকেতনকে।

॥ ১৮ ॥

চন্দ্রশেখর বৈদ্য

জাতিতে বৈদ্য, কাশীবাসী। শুধু লিখনবৃত্তির উপর নির্ভর করে জীবিকা-নির্বাহ করে।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দল কাশীতে তখন মায়াবাদ প্রচার করছে। ষড়-দর্শনের ব্যাখ্যায় মত্ত হয়েছে। ভক্তির নাম-গন্ধও রাখে নি কোথাও।

চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব। তার বন্ধু তপন মিশ্র। তারা দুইজনে একত্র হয়ে বসে কৃষ্ণকথা বলে আর আনন্দ করে।

বৃন্দাবনের পথে প্রভু কাশী এসেছেন, উঠেছেন তপন মিশ্রের বাড়িতে।

ভিক্ষা-শেষে প্রভু বিশ্রাম করছেন আর তপনের ছেলে রঘুনাথ তাঁর পদসেবা করছে। চন্দ্রশেখর দেখা করতে এল।

চন্দ্রশেখর প্রভুর পায়ে কেঁদে পড়ল। বললে, প্রভু, কাশী আর ভালো লাগে না। শুধু কর্মফলে এখানে পড়ে আছি।

কেন কাশী কি দোষ করল?

এখানে মায়া-ব্রহ্ম ছাড়া আর শব্দ নেই। দিন-রাত শুধু ষড়দর্শনের

ব্যাখ্যা। যেখানে কৃষ্ণ নেই, ভক্তি নেই, প্রেম নেই—তাই সেখানে সুখও নেই। তা ছাড়া—

কী তা ছাড়া?

তা ছাড়া শুধু তোমার নিন্দা। সন্ন্যাসীরা শুধু তোমার নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। এ আর সহ্য করতে পারছি না।

প্রভু শুধু মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

তুমি এইখানে কিছুদিন থাকো।

থাকব।

কিন্তু ভিক্ষা করবে আমার ঘরে। বললে তপন মিশ্র।

তাই করব।

ভক্তবশে স্বীকার করলেন প্রভু।

এক মারাঠী ব্রাহ্মণ এসে হাজির। নাম শুনে এসেছে, কিন্তু দেখতে এমনি চমৎকার হবে ভাবতে পারে নি।

আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম। বললে ব্রাহ্মণ।

এ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণবিমুখ। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করে। কে জানে ক'জন অমন সন্ন্যাসীকেও নিমন্ত্রণ করে বসল! যারা কৃষ্ণবিমুখ তাদের সঙ্গ করতে প্রভু সম্মত নন।

বললেন, আমার নিমন্ত্রণ তপনের ঘরে পাকা হয়ে রয়েছে।

দশদিন প্রভু থাকলেন কাশীতে, চন্দ্রশেখরের গৃহে। পরে চলে গেলেন বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন থেকে যখন ফিরছেন, পৌঁচেছেন কাশী, চন্দ্রশেখর স্বপ্ন দেখল প্রভু তার ঘরে এসেছেন।

ভোর হতে না হতেই চন্দ্রশেখর গ্রামের বাইরে এসে প্রভুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। প্রভুকে ধরে আর যেন কেউ নিয়ে যেতে না পারে।

প্রভুকে দেখতে পেয়েই চন্দ্রশেখর তাঁর পায়ে পড়ল। বাড়িতে নিয়ে গেল হাত ধরে। খবর পেয়ে ছুটে এল তপন মিশ্র। এল পরমানন্দ কীর্তনিয়া। শুরু হল কৃষ্ণকীর্তন।

প্রভু চন্দ্রশেখরকে বললেন, দেখ তো দরজায় একজন বৈষ্ণব এসে বসেছেন, তাঁকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এস।

চন্দ্রশেখর ঘরের বাইরে এসে তাকাল, কোনো বৈষ্ণব দেখতে পেল না।

দরজায় কোনো বৈষ্ণব নেই।

তবে কে আছে?

একজন দরবেশ বসে আছে। মুখে গোঁফ-দাড়ি, গায়ে ভোটকম্বল ও হাতে করোয়া।

ঐ দরবেশকেই ডেকে আনো।

ডাক শুনে দরবেশ অঙ্গনে এসে দাঁড়াল।

তাকে দেখে প্রভু ছুটে এসে আলিঙ্গন করলেন।

আমাকে ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁয়ো না। দরবেশ চাইল মুক্ত হতে।

তোমাকে ছোঁব না? তোমাকে না ছুঁলে পবিত্র হব কী করে?

চন্দ্রশেখর তো বিমূঢ়, হতবাক।

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥

প্রভু তাকে হাত ধরে এনে বসালেন। নিজের হাতে মুছে দিতে লাগলেন গায়ের ধুলো। জিজ্ঞেস করলেন, কী করে পালিয়ে এলে?

আমি পালালাম কোথা, তুমিই তো উদ্ধার করে আনলে।

প্রভু তপন আর চন্দ্রশেখরকে কাছে ডাকলেন। বললেন, ইনিই সনাতন গোস্বামী, হুসেন শার প্রধানমন্ত্রী। কৃষ্ণ এঁকে রৌরব নরক থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, তাঁর পরিচর্যা করো। তপন, একে ক্ষৌরকারের কাছে নিয়ে যাও, এঁকে ভদ্র করো, আর চন্দ্রশেখর, তুমি এঁকে গঙ্গাস্নান করিয়ে একখানা বস্ত্র দাও।

স্নানান্তে চন্দ্রশেখর সনাতনকে একখানা নতুন বস্ত্র দিল।

সনাতন নতুন বস্ত্র নিল না। বললে, আমাকে একখানা পুরোনো ধুতি দাও। তাকেই ছিন্ন করে আমি কৌপীন ও বহির্বাস বানাব।

তারপর যেদিন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের গর্বপর্বত চূর্ণ করলেন প্রভু, সকলকে কৃষ্ণনাম প্রসাদ দান করলেন, সন্ন্যাসীরাও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল, তখন চন্দ্রশেখরভবনে সে কী আনন্দ! আগে অতিনিন্দন ছিল, এখন ওদের অভিনন্দন! 'বেদময় মূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষম অপরাধ পূর্বে যে কৈনু নিন্দন।'

চন্দ্রশেখরভবনে সারারাত কীর্তন হল। ছিল চন্দ্রশেখর, তপন, তপনের ছেলে রঘু, পরমানন্দ কীর্তনিয়া আর বলভদ্র ভট্টাচার্য। এ কী, সেই মারাঠী

ব্রাহ্মণও কীর্তনে গলা মিলিয়েছে।

তারপরে প্রভু বললেন, কাশী ছেড়ে এবার নীলাচলে যাব।

চন্দ্রশেখর বললে, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

আরো সকলে চাইল সঙ্গী হতে।

প্রভু বললেন, না, আমি একা যাব।

সান্ত্বনাবাক্যে সকলকে নিবৃত্ত করলেন প্রভু। তোমরা কাশীতেই থাকো। কাশীতেই ভক্তির সৌরভ ছড়াও।

বৃন্দাবনে যাচ্ছে জগদানন্দ, তার সঙ্গে চন্দ্রশেখর দেখা করল। প্রভু কেমন আছেন। ভালো আছেন তো?

তারপর যখন শুনল রঘু নীলাচলে যাচ্ছে তাকে চন্দ্রশেখর বললে, প্রভুকে আমার দণ্ডবৎ দিও। বোলো আমি কাশীতেই আছি।

॥ ১৯ ॥

শ্রীধর পণ্ডিত

নবদ্বীপের একান্তে দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীধর পণ্ডিতের বাসা, শঙ্খবণিক ও তন্তুবায়দের পাড়া ছাড়িয়ে। কলা, থোড়, মোচা, পাতা ও খোলা বেচে জীবিকা নির্বাহ করে। যা উপার্জন করে, তার আদ্ধেক ব্যয় করে গঙ্গাপূজায়, বাকি আদ্ধেক সংসারে।

সবাই তার নাম রেখেছে খোলা-বেচা শ্রীধর।

এক কথার লোক। একদরের বেপারি। যে জিনিসের যে দাম বলে দেবে, তার আর নড়চড় নেই। নিতে হয় নাও নয়তো পথ দেখ।

দরিদ্র, কিন্তু ভক্তিধনে ধনী। অনেক রাত পর্যন্ত হরিনাম করে। 'দীঘল-আহ্বানে' ডাকে। পাষণ্ডী প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করে, খিদের জ্বালায় ওর না হয় ঘুম আসে না, তাই বলে চেঁচিয়ে আমাদের ঘুম মাটি করে কোন্ হিসেবে?

হিসেবের ধার ধারে না শ্রীধর। সে নিজের আনন্দে থাকে।

বাজারে ডালা সাজিয়ে বসেছে শ্রীধর, নিমাই এসে জিজ্ঞেস করল, দাম কত?

শ্রীধর দাম বললে।

যা দাম বললে তার আদ্ধেক দিতে চাইল নিমাই।

কম হবে না। শ্রীধরের এক কথা।

নিশ্চয়ই হবে। নিমাই ডালা থেকে পাতা-খোলা তুলে নিল।

জোর করে ফের কেড়ে নিল শ্রীধর। বললে, কম দামে ছাড়তে পারব না।

তোমার তো অনেক টাকা আছে, আমার হাতের জিনিস কাড়ো কেন?

আমাকে মাপ করো ঠাকুর। তুমি আর কোথাও দেখ। সেখানে সস্তায় পাবে।

আমি তো শুধু জিনিস নিই না, আমি যোগানদারকেও নিই। নিমাই হাসল, বললে, তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, না?

চঞ্চল, উদ্ধত এক বালক, তাকে চেনবার কী আছে?

শোনো। বললে নিমাই, তুমি প্রত্যহ যে গঙ্গার পূজা করো আমি তার বাবা।

হরি হরি। দু কানে আঙুল দিল শ্রীধর।

এই দুরন্তের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। শ্রীধর অসহায়ের মত বললে, তোমাকে অর্ধমূল্যে দিতে পারব না, কিছু না হয় বিনামূল্যে দেব।

বিনামূল্যে দেবে?

হ্যাঁ, একখণ্ড খোলা ও একখণ্ড থোড় রোজ তোমাকে দেব বিনামূল্যে।

তবে আর কথা কী! তবে আর বিবাদ কিসের?

সেই থেকে শ্রীধরের খোলায় ভাত খায় নিমাই।

এখন জল খাওয়াও।

কাজী-দমনের দিন নগরসংকীর্তনে বেরিয়ে অবশেষে শ্রীধরের ঘরে এসে হাজির হলেন প্রভু।

ভাঙা ঘর, চালে জায়গায়-জায়গায় ফাঁক, দরজায় একটা লোহার জলপাত্র পড়ে আছে।

ভাঙা পাত্র, চোরের কাছেও মূল্যহীন।

পরমানন্দে সেই পাত্রের জল খেলেন গৌরাঙ্গ।

শ্রীধর হায়-হায় করে উঠল। এ কী সর্বনাশ! এ যে আমাকে সংহার করতে আমার ঘরে এল।

প্রভু বললেন, ভক্তের জল খেয়ে আজ আমার শরীর শুদ্ধ হল। কৃষ্ণের চরণে ভক্তি জাগল। দাম্ভিকের রত্নপাত্রের জলে তৃষ্ণা যায় না, ভক্তের লৌহ-পাত্রের জলেই শরীর শীতল হয়।

দন্তে তৃণ ধরে কাঁদতে লাগল শ্রীধর। তুমি কী জল খেলে?

এ আমি ভক্তের জল খেলাম। খেলাম শুদ্ধামৃত। 'পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্মল।' তুমি ভক্ত, তোমার সমস্ত শুচিস্নিগ্ধ।

ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

নগরভ্রমণে বেরিয়ে এই শ্রীধরকেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রভু, এত যে হরি-হরি করছ, তোমার অন্নবস্ত্রের দুঃখ তো গেল না।

দুঃখ? শ্রীধর যেন অবাক হল। দুঃখ কোথায়? উপবাস তো আর করছি না, আর ছোট হোক বড় হোক, কাপড়ও তো পরছি।

তোমার কাপড়ে তো গিঁট-দেওয়া, আর তোমার ঘরের ঐ চাল দেখ, খড় নেই।

তা হোক। তবু দুঃখ বলে মানতে চায় না শ্রীধর। বললে, রত্নঘরে রাজার দিন কাটে, গাছের উপরে পাখির দিন কাটে। আমার দিনও কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু তোমার তো অনেক ধনরত্ন লুকোনো আছে।

শ্রীধর হাসল। বললে, আমি খোলা বেচে খাই, আমার আবার ধনরত্ন!

তোমার সেই পোঁতা ধনের কথা আমি সকলকে বলে দেব। তখন টের পাবে।

সে ধন ভক্তি। বিনামূল্যে আত্মদান।

মহাপ্রকাশের দিন গৌরসিংহ আদেশ করলেন: শ্রীধরকে নিয়ে এস।

কয়েকজন ভক্ত ছুটল তার সন্ধানে। কোথায় শ্রীধর?

অর্ধপথে উচ্চনাদ হরিনাম শুনতে পেল। ঐ, ঐ শ্রীধরের কণ্ঠস্বর। শব্দ লক্ষ্য করে সবাই গিয়ে ধরলে শ্রীধরকে। চলো চলো, প্রভু তোমাকে ডেকেছেন। তুমি প্রভুকে দেখবে আর আমরা তোমাকে স্পর্শ করে কৃতার্থ হব।

প্রভু ডেকেছেন শুনে প্রেমাবেশে শ্রীধর মূর্ছিত হল।

তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল ভক্তেরা।

এস এস শ্রীধর। প্রভু শ্রীধরকে ব্যাকুল হয়ে আহ্বান করলেন। তুমি

আমার বিস্তর আরাধনা করেছ। বহু জন্ম আমার প্রেমে ব্যয় করেছ। এ-জন্মেও আমার অনেক সেবা করলে। তোমার খোলায় তোমারই হাতের দ্রব্য নিত্য আহার করলাম। তুমি আমার রূপ দেখ।

শ্রীধর দেখল তমালশ্যামল বসে আছে, হাতে বাঁশি, দক্ষিণে বলরাম দাঁড়িয়ে। কমলা হাতে তাম্বুল দিচ্ছে, মহাফণী ছত্র ধরেছে মাথার উপর। দেবতারা স্তুতি করছে।

শ্রীধর মুর্ছিত হয়ে পড়ল।

প্রভু বললেন, শ্রীধর, ওঠো, আমার স্তব করো।

শ্রীধর চেতনা পেয়ে উঠল। বললে, আমি স্তুতি করি আমার এমন শক্তি কোথায়?

তোমার বাক্যই আমার স্তুতি।

প্রভুর কৃপায় সরস্বতী শ্রীধরের রসনায় এসে বসল। শ্রীধর স্তুতি করতে লাগল।

প্রভু বললেন, শ্রীধর, বর চাও। তোমাকে আজ আমি অষ্টসিদ্ধি দেব।

তুমি আমাকে আরো ফাঁকি দেবে? কিন্তু, না, আর না, আর আমাকে ভোলাতে পারবে না।

প্রভু বললেন, আমার দর্শন ব্যর্থ হবার নয়। তোমাকে বর চাইতেই হবে। যা চাইবে তাই পাবে।

যদি নাই ছাড়বে, তবে দাও। যে ব্রাহ্মণ আমার খোলাপাতা কেড়ে নিয়েছিল, সেই আমার জন্ম-জন্মান্তরের প্রভু হোক। যে ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে ঝগড়া করত তার পদযুগলই আমার আশ্রয় হোক। শ্রীধর দুই বাহু তুলে কাঁদতে লাগল।

প্রভু বললেন, তোমাকে এক মহারাজ্যের রাজা করে যাব।

আমি আর কিছুই চাই না! এমনি করো যেন চিরদিন তোমার নামগান করতে পারি।

দাস্যযোগে তুমি আমার এই প্রকাশ দেখলে। তোমাকে আমি বেদগোপ্য ভক্তি দিলাম।

নবদ্বীপ ছাড়বার আগের দিন প্রভুকে শ্রীধর একটি লাউ এনে দিল। আর কে এক ভক্ত দুধ নিয়ে এল।

কত দিন ধরে শ্রীধরের লাউ খাবার সাধ গৌরহরির। ও নিয়ে আগে

কত তাদের ঝগড়া হয়েছে।

এখন আর বিবাদ নেই। এখন শুধু নৈবেদ্য আর প্রসাদ।

প্রসন্ন হয়ে প্রভু মাকে বললেন, মা, দুধ-লাউ পাক করে দাও।

সন্ন্যাস নেবার পর প্রভু শান্তিপুরে ফিরলে শ্রীধর গেল দেখা করতে। তারপর প্রভু নীলাচলে গেলে, নীলাচলে।

॥ ২০ ॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী

নবদ্বীপের গরিব ব্রাহ্মণ শুক্লাম্বর। ভিক্ষে করে দিন চালায়। কিন্তু অহর্নিশ কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে। যখন ভিক্ষে করে তখনো কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

ভিক্ষে করে যা পায়, তা দিবসান্তে বাড়ি ফিরে রান্না করে। প্রস্তুত খাদ্য কৃষ্ণকে নিবেদন করে দিয়ে তার প্রসাদ নেয়।

কৃষ্ণানন্দের প্রসাদে দারিদ্র্য জানতেও পারে না।

গৌরাঙ্গের প্রতিবেশী শুক্লাম্বর। কৃষ্ণ-ভক্ত বলেই তার প্রতি গৌরাঙ্গের নিবিড় অনুরাগ।

ঝুলি কাঁধে শুক্লাম্বর ভিক্ষেয় বেরিয়েছে, প্রভু তাকে ডাকলেন।

এস এস। তোমার দেওয়া জিনিসই আমার আদরের আহার। এই বলে প্রভু শুক্লাম্বরের ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুঠো-মুঠো চাল বের করে খেতে লাগলেন।

কী সর্বনাশ! শুক্লাম্বর মাথায় হাত দিল। এ চালের মধ্যে যে বিস্তর খুদকণা রয়েছে।

প্রভু বললেন, তোমার খুদকণাই আমার লোভনীয় খাদ্য। দ্বারকায়ও আমি এমনি তোমার ঝুলি থেকে খুদ কেড়ে নিয়ে খেয়েছি। জন্ম-জন্ম তুমিই আমার প্রেমসেবক। তোমার হৃদয়েই আমার বিহার। তোমার ভোজনেই আমার ভোজন। তোমার ভিক্ষাতেই আমার পর্যটন। প্রেমভক্তি বিলোতে আমি এসেছি, আমি তোমাকে দিলাম সেই প্রেমভক্তি।

গয়া থেকে ফিরে প্রভু সকলকে এই শুক্লাম্বরের বাড়িতেই সমবেত হতে

বলেছিলেন। সান্ধ্যকীর্তন, নগরকীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, সমস্ত ঘটনাতেই শুক্লাম্বর প্রভুর লীলাসঙ্গী।

একদিন প্রভু বললেন, শুক্লাম্বর, তোমার রান্নাকরা অন্ন খেতে ইচ্ছে করছে।

দারুণ কুণ্ঠিত হয়ে শুক্লাম্বর বললে, তুমি কী বলছ! আমি এক পতিত ভিক্ষুক, অপবিত্র, আমার রান্না তুমি খাবে কী!

আমি অতশত জানি না। তুমি বাড়ি গিয়ে কৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত করো, আমি মধ্যাহ্নে গিয়ে খাব।

ভীত শুক্লাম্বর ভক্তদের কাছে পরামর্শ চাইল, কী করা।

কী আবার করা! প্রভুর যখন ইচ্ছে হয়েছে শুক্লাম্বরকে রান্না করতেই হবে। ভক্তের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খাওয়াই তো ভগবানের স্বভাব। তবে যদি খুব ভয় লাগে বোঝ, আলগোছে রান্না কোরো।

ভিক্ষায় পাওয়া চাল ও গর্ভথোড় সিদ্ধ করল শুক্লাম্বর। আর বলতে লাগল, কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।

ভক্ত-অন্নে জগন্মাতা রমা প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন।

গঙ্গাস্নান করে এসে প্রভু আসনে বসলেন। কৃষ্ণে নিবেদন করে দিয়ে অন্নে হাত দিলেন।

খেতে খেতে বললেন, এমন সুস্বাদু অন্ন আর কোনোদিন খাইনি। আর কী সুন্দর এই গর্ভথোড়! আলগোছে এত ভালো রান্না কী করে করলে?

শুধু ভক্তির রসস্পর্শে সমস্ত ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয়ে উঠেছে।

শুক্লাম্বরের ঘরেই বিশ্রাম করলেন গৌরাঙ্গ।

বিজয়দাস সেখানে উপস্থিত ছিল—'আঁখরিয়া' বিজয়। সে প্রভুকে অনেক পুঁথি স্বহস্তে নকল করে দিয়েছে। তার হাতের লেখা মুক্তোর মত। রত্নাক্ষরে লেখে বলে গৌরহরি তার নাম দিয়েছেন রত্নবাহু।

শয়ান প্রভুর পাশে বিজয় বসে ছিল। প্রভু তার গায়ে হাত রাখলেন।

চকিতে বিজয়ের ভাবান্তর ঘটল। দেখল রত্ন-আভরণে সজ্জিত হয়ে এক দীর্ঘাঙ্গ জ্যোতির্ময় পুরুষ শুয়ে আছে।

বিজয় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল প্রভু তার মুখে হাত চাপা দিলেন। বললেন, যতদিন আমি এখানে আছি কাউকে কিছু বোলো না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। বিজয় পরমানন্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। সঙ্গে

সঙ্গেই পড়ে গেল মূর্ছিত হয়ে।

সবাই বুঝল বিজয় কোনো বৈভবদর্শন করেছে।

প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ বিজয় হুঙ্কার করে উঠল কেন? ওর কী হল?

কে জানে কী হল।

বিজয়ের গঙ্গার প্রতি অনুরাগ, এ বুঝি গঙ্গার প্রভাব। কিংবা, প্রভু বললেন, শুক্লাম্বরের ঘরে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, সেই কৃষ্ণকেই দেখল নাকি?

বিজয়ের গায়ে আবার হাত রাখলেন প্রভু।

বিজয় চেতনা পেল কিন্তু সাত দিন পর্যন্ত জড়প্রায় হয়ে রইল।

শুধু শুক্লাম্বরের গৃহ বলেই প্রভু এই রঙ্গ করলেন।

চন্দ্রশেখরের ঘরে নৃত্য-নাট্যের সময় শুক্লাম্বরও অভিনয় করল। সে সাজল নারদের শিষ্য।

নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। সঙ্গে আঁখরিয়া বিজয়।

॥ ২১ ॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত

নৃত্য কীর্তনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আর গৌরাঙ্গের নৃত্যসঙ্গী বক্রেশ্বর। ত্রিবেণীর কাছে গুপ্তিপাড়ায় জন্ম। অকৃতদার।

মুকুন্দের যেমন অহোরাত্র নামকীর্তন, বক্রেশ্বরের তেমনি একভাবে চব্বিশ প্রহরের নৃত্য।

তুয়েতেই প্রভু আনন্দিত।

একদিন প্রভুর পা ধরে বক্রেশ্বর বললে, তুমি আমাকে দশ হাজার গন্ধর্ব যোগাড় করে দাও। ওরা গান করবে আর আমি নাচব। তবেই আমার পরিপূর্ণ সুখ হবে।

প্রভু বললেন, তুমি আমার এক পাখা। আরেক পাখা পেলে আমি আকাশে উড়তে পারতাম।

শুধু মর্তলোকে নয় যেতে পারতাম সুরলোকে। চৌদ্দভুবন ঘুরতে পারতাম।

কুলিয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত ভক্তিহীন, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। ভাগবত পড়ায় বটে, কিন্তু ভক্তি বোঝে না। গৌরহরির ভগবত্তায়ও সে অবিশ্বাসী। সন্ন্যাস নিয়ে প্রভু নীলাচলে চলে গেলেন, তবুও না।

তখন একদিন তার গৃহে বক্রেশ্বর অতিথি হল। কৃষ্ণপ্রেমবিগ্রহবিহ্বল বক্রেশ্বর।

বললে, দেবানন্দ, তোমাকে আজ আমার নাচ দেখাব। দেখবে?

বক্রেশ্বরের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল দেবানন্দ। দেখব।

প্রেমাবেশে নৃত্য করতে লাগল বক্রেশ্বর। অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার, বৈবর্ণ্য ও আনন্দমূর্ছা। সমস্ত নৃত্যসম্পদ প্রস্ফুট হল তার শরীরে। দেবানন্দ চমৎকার মানল। এমন দীপ্তি এমন আকুলতা এমন আনন্দ সে দেখে নি কোনোদিন।

শুধু একাকী দেখে তৃপ্তি নেই, লোকজন ডাকতে লাগল দেবানন্দ। এমনটি কোনোদিন কেউ দেখনি।

নাচতে নাচতে টলে পড়ে যাচ্ছে বক্রেশ্বর, দেবানন্দ দু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলছে। টেনে নিচ্ছে নিজের কোলের মধ্যে। আর সব চেয়ে আশ্চর্য, বক্রেশ্বরের গায়ের ধুলো মাখছে নিজের শরীরে।

আর যায় কোথা! ভক্তধূলির স্পর্শে দেবানন্দের মনে ভক্তি জাগল।

শুধু ভক্তিই জাগল না, চৈতন্যে বিশ্বাস জাগল। তার কুবুদ্ধির বিনাশ হল।

আর সমস্ত বক্রেশ্বরের প্রভাবে। আর সে প্রভাবও তো গৌরাঙ্গেরই প্রসাদ। 'কৃষ্ণ-সেবা হতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।' ভক্তসেবাতেই নিশ্চিত সিদ্ধি।

শ্রীক্ষেত্রেও প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করেছে বক্রেশ্বর। মন্দিরে বেড়াকীর্তনে বক্রেশ্বরই অগ্রণী। উদ্যাননৃত্যেও প্রভুর সে একক সহচর।

বক্রেশ্বর অপরিহার্য। নীলাচলেই সে থেকে গেল প্রভুর সঙ্গে।

॥ ২২ ॥

দামোদর পণ্ডিত

নবদ্বীপের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বাসনাহীন, নিরপেক্ষ ও উদাসীন। প্রভুর নীলাচল-অভিযানের এক সহযাত্রী।

ছোট ভাইয়ের নাম শঙ্কর।

প্রভু দামোদরকে বললেন, তোমাদের দু-ভাইয়ের উপরেই আমার প্রীতি আছে। তোমার উপর আমার সগৌরব প্রীতি আর শঙ্করের প্রতি আমার প্রীতি বিশুদ্ধ, নিঃসঙ্কোচ। সেখানে কোনো গৌরববুদ্ধি নেই।

দামোদর বললে, তাহলে এখন থেকে তোমার কৃপায় শঙ্কর আমার বড় ভাই হয়ে গেল। 'দামোদর কহে—শঙ্কর ছোট আমা হইতে। এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥'

দামোদরে গৌরববুদ্ধি না হয়ে যায় না। দামোদরের এমন প্রচণ্ড প্রেম যে সে স্বয়ং প্রভুকেও শাসন করে। বাক্যদণ্ড দিতে দ্বিধা করে না।

একটি ওড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার প্রভুর কাছে রোজ আসে। পিতৃহীন, তাই বুঝি স্নেহের কাঙাল। স্বভাবটি নম্র, দেখতেও সুকুমার। প্রভুও তাকে স্নেহ করেন আর সেই স্নেহই তাকে তাঁর কোলের কাছে টেনে আনে। 'যাহাঁ প্রীত ত হাঁ আইসে—বালকের রীতি।'

কিন্তু দামোদরের কাছে তা ভালো লাগে না।

তুমি আর এখানে এস না। বালককে নিষেধ করে দামোদর।

বালক সে কথায় কান দেয় না। প্রভু যে তার প্রাণ। তাঁকে না দেখে যে সে থাকতে পারে না। তাই বার-বার চলে আসে।

একদিন দামোদরের অসহ্য লাগল। সে প্রভুকেই গেল শাসন করতে।

অন্যের বেলায় তো খুব উপদেশ দিতে পারো, কিন্তু নিজের বেলায় কী!

প্রভু সবিস্ময়ে দামোদরের দিকে তাকালেন।

পরকে উপদেশ দিতে গোসাঁই খুব পণ্ডিত, দামোদর বিদ্রূপ করে উঠল, অথচ নিজের বেলায় গোসাঁইয়ের খোঁজ নেই। এবার বেরুবে গোসাঁইগিরি।

কেন, কী হল? প্রভুর বিস্ময় আরো বাড়ল।

তুমি জানো না এই ছেলেটা কে?

কে?

ও এক বিধবার ছেলে। বিধবা যদিও সতীসাধ্বী তপস্বিনী, তার এক দোষ আছে।

প্রভু স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

বিধবা সুন্দরী, তার উপরে যুবতী। আর তুমিও পরম সুন্দর যুবক। বিধবার ছেলের সঙ্গে তোমার মাখামাখি দেখে লোকে যে কানাকানি করবে! সে কলঙ্ক-কথন তুমি রোধ করতে পারবে? 'মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে?'

নতমুখে বসে রইলেন প্রভু।

অবশ্য তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, যা ইচ্ছে তুমি তাই করতে পারো, কিন্তু লোকের মুখ তুমি চাপা দেবে কী করে? নিজে তুমি এত বড় পণ্ডিত, নিজেই নিজের আচরণবিধি দেখ না বিচার করে। লোকের কানাঘুষোর সুযোগ করে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?

একেই বলে নিরপেক্ষতা। একেই বলে অন্তরঙ্গ প্রেম। অমঙ্গলের আশঙ্কায় যে প্রেম শাসন করতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হয় না।

প্রভু মুখ তুলে হাসলেন। অন্তরে তাঁর প্রচণ্ড সন্তোষ। এই বাক্যদণ্ড যে তাঁরই অভিপ্রেত। পরোক্ষে লোকশিক্ষা।

প্রভু বললেন, দামোদর, তুমি নবদ্বীপে যাও, আমার মাকে গিয়ে দেখ। দেখ সেখানে কোনো ত্রুটি হচ্ছে কিনা। তুমি যেমন আমাকে শাসন করলে দেখ সেখানেও কোনো শাসনের কারণ আছে কিনা।

দামোদর এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

মাকে বোলো তাঁর জন্যেই আমি তোমাকে তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি নিরন্তর তাঁকে আমার কথা শুনিয়ো। বোলো আমি সুখে আছি। তা হলেই তিনি সুখে থাকবেন। 'মোর সুখকথা কহি সুখ দিহ তাঁরে।' আর শোনো, সেই গোপন কথাটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিও।

কী গোপন কথা?

আমি বার-বার তাঁর কাছে যাই, তাঁর হাতের রান্না খেয়ে আসি। সেই মাঘী-সংক্রান্তির দিন মা কত পিঠে-পায়স রাঁধল, কত অন্ন-ব্যঞ্জন, আমি সব খেয়ে নিলাম। মা ভাবলেন, নিমাই তো নীলাচলে, সে এখানে এসে খায় কী করে—তবে আমি বুঝি স্বপ্ন দেখছি। পাকপাত্র যখন খালি তখন বুঝি আমি কৃষ্ণেরই ভোগ লাগাই নি। অমনি আবার দেখলেন পাকপাত্র আগের

মতই ভর্তি হয়ে আছে। তখন আবার ভোগ লাগালেন। আমি আবার গিয়ে ভোজনে বসলাম। তুমি মাকে বোলো। এ স্বপ্ন নয়, এ আমার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। বোলো তাঁর আদেশেই আমি নীলাচলে আছি আর তাঁর বাৎসল্যের আকর্ষণেই তাঁর কাছে উপস্থিত হচ্ছি বার-বার।

নবদ্বীপ থেকে ঘুরে এলে দামোদরকে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, মাকে কেমন দেখে এলে? তাঁর কি বিষ্ণুভক্তি আছে?

দামোদর ক্ষেপে গেল। বললে, এ তুমি কী বললে? আইয়ের ভক্তি আছে কিনা? তোমার যে বিষ্ণুভক্তি সেও তো আইয়েরই অনুগ্রহ। বিষ্ণুভক্তির যদি কোনো মূর্তি দেখতে চাও, আই-ই তো সেই মূর্তি।

দামোদর, তুমি আজ আমাকে কিনে নিলে। আমারই মনের কথা তোমার মুখে আজ শুনতে পেলাম। আমার সমস্ত ভক্তি-সম্পত্তি আমার মার কাছ থেকেই পাওয়া। তুমি যাও, তুমিই আমার মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

শচীদেবী দেহ রাখলে বিষ্ণুপ্রিয়ার খবরাখবর করে দামোদর। যদিও বিষ্ণুপ্রিয়া কারু মুখাপেক্ষী নয়—'ভক্তদ্বারে দ্বাররুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে' তবু প্রভুর ইচ্ছায় দামোদর বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যে নিত্য গঙ্গাজল তুলে এনে দেয়।

সে গঙ্গাজলে মিশিয়ে দেয় তার অনাবিল সেবা-সুধা।

॥ ২৩ ॥

শঙ্কর পণ্ডিত

দামোদরের ছোট ভাই। প্রভুর 'পাদোপধান'—পায়ের বালিশ।

নবদ্বীপলীলায় প্রভুর কিছু সাহচর্য করলেও শঙ্কর আসলে নীলাচলে প্রভুর সেবাসঙ্গী। শঙ্করের প্রতি প্রভুর বিশুদ্ধা প্রীতি, তাতে কোনো সঙ্কোচ নেই, কোনো বারণ-অবারণ নেই।

প্রভু বলছেন, শঙ্করকেই আমার কাছে রাখো। ওর কাছেই আমি অকুণ্ঠ। 'শুদ্ধ কেবল প্রেম ইহার উপর। অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর।'

নীলাচলে মহাপ্রভুর আগমন থেকে তিরোভাব পর্যন্ত শঙ্কর প্রভুর সেবা করেছে। উৎসবে ভক্তদের খাওয়াবার সময় কাশীশ্বর জগদানন্দের সঙ্গে

একযোগে পরিবেশন করেছে। কখনো বা ঘরভাতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে প্রভুকে।

কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে প্রভুর পদসেবা। 'সাহজিক প্রেমপাত্র আমার শঙ্কর।'

প্রভু গম্ভীরাতে শুয়ে আছেন, দ্বারপ্রান্তে স্বরূপ আর গোবিন্দ ঘুমুচ্ছে। রাধার আবেশে প্রভু উদ্বেলিত হয়েছেন, জেগে উঠে বসে নামকীর্তন শুরু করেছেন—স্বরূপ আর গোবিন্দ যেমনি ঘুমিয়ে ছিল তেমনি ঘুমিয়েই রইল, প্রভুর কী অবস্থা কিছুই জানতে পেল না।

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন প্রভু। ইচ্ছে হল কৃষ্ণকে অন্বেষণ করবার জন্যে এই নিকুঞ্জমন্দির থেকে বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু দ্বার খুঁজে পেলেন না। গম্ভীরার প্রাচীরে মুখ ঘষতে লাগলেন।

মুখে-গালে অনেক ক্ষত হল। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

প্রভুর আর্তনাদে জেগে উঠল স্বরূপ-গোবিন্দ।

এ তুমি কী করেছ? তোমার মুখ এমনি কেটে গেল কী করে? আলো জেলে দেখে স্বরূপ-গোবিন্দ হাহাকার করে উঠল।

প্রভু বললেন, কৃষ্ণবিরহে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, ঘরের মধ্যে টিকতে পারছিলাম না। মনে হল কৃষ্ণ বাইরে আছে তাই তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুবার জন্যে ছুটলাম। অন্ধকারে দরজা খুঁজে পেলাম না। যেদিকেই ছুটি সেদিকেই দেয়াল। দেয়ালের সঙ্গে বারে-বারে মুখ ঘষে যেতে লাগল। সেই ঘষা খেয়েই এত ঘা, আর ঘা থেকেই রক্ত।

সবাই বুঝল প্রভুর এই দিব্যোন্মাদের অবস্থা। না আছে বাহ্যজ্ঞান, না আছে দেহস্মৃতি। কিন্তু তাঁর শ্রীঅঙ্গের কষ্ট তো দু-চোখে দেখতে পারি না।

এর প্রতিকার কী?

এর প্রতিকার শঙ্কর। শঙ্করকে প্রভুর পায়ের তলায় শোয়ানো যাক। শঙ্করই হবে তাঁর রাত্রির প্রহরী।

কিন্তু প্রভু কি রাজী হবেন?

তখন সবাই প্রভুকে গিয়ে ধরল। গম্ভীরার মধ্যে আপনার পায়ের কাছটিতে শঙ্কর শোবে।

প্রভু শঙ্করকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। কে না জানে তার সম্পর্কেই প্রভুর কোনো সঙ্কোচ নেই।

প্রভুর পদতলে শঙ্কর তার শয্যা পাতল। আর শঙ্করের গায়ের উপর প্রভু তাঁর পা প্রসারিত করে দিলেন।

বিদুরের ঘরে ভোজন করে কৃষ্ণও অমনি বিদুরের কোলে পা মেলে দিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। বিদুর যেমন কৃষ্ণের তেমনি শঙ্কর গৌরাঙ্গের পাদোপধান।

প্রভু শুলে শঙ্কর বসে বসে তাঁর পা টেপে। যখন দেখে প্রভুর ঘুম এসে গেছে তখন সে নিজে শোবার কথা চিন্তা করে।

প্রভু দেখেন শঙ্কর খালি গায়ে ঘুমুচ্ছে। শীতের প্রতিও তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রভু তখন তাঁর গায়ের কাঁথাখানি শঙ্করের গায়ের উপর ধীরে বিছিয়ে দেন। শঙ্কর টের পায় না।

কিন্তু মোটমাট তার ঘুম খুব পাতলা। একটুতেই সে উঠে পড়ে। উঠে পড়েই সে আবার প্রভুর পা টিপতে থাকে।

তবে যখন তিনি কাঁথাখানি বিছিয়ে দিচ্ছিলেন তখন বুঝি টের পেয়েও সে উঠে পড়ে নি। নীরবে প্রভুর বিস্তীর্যমান বাৎসল্যটুকু উপভোগ করেছে।

শঙ্করের পাহারা এড়িয়ে প্রভু আর বাইরে বেরুতে পারেন না। তাঁর কমল-কোমল মুখখানি যেমন অম্লান তেমনি অম্লানই থাকে।

নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি-জাগরণ॥
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে॥

প্রভুর তিরোভাবের পরেও কিছুদিন বেঁচে ছিল শঙ্কর। দু হাত বাড়িয়ে প্রভু আবার কবে তাকে তাঁর চরণতলে টেনে নিলেন কেউ জানে না।

॥ ২৪ ॥

পরমেশ্বর মোদক

'আমি পরমেশ্বর।' কে একজন প্রভুর পায়ে পড়ল দণ্ডবৎ হয়ে।

প্রভু তাকে অনায়াসে চিনতে পারলেন। নবদ্বীপের ময়রা, তাঁদের বাড়ির কাছেই তার ঘর। বাল্যকালে তার ঘরে কত গিয়েছে নিমাই, দুধ-

গুড় দিয়ে তৈরি কী সুন্দর মোয়া খেয়ে এসেছে। সেই টানে সেই সুদূর নবদ্বীপ থেকে চলে এসেছে নীলাচলে। দেখে আসি আমার সেই নিমাই কেমন আজ গৌরহরি হয়েছেন !

পরমেশ্বরের ছেলের নাম মুকুন্দ। তাও প্রভুর মনে আছে।

প্রভু পরমেশ্বরকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'পরমেশ্বর! ভালো আছ তো ? তুমি এসেছ, খুব ভালো করেছ।'

পরমেশ্বর বললে, 'মুকুন্দের মাকেও সঙ্গে এনেছি।'

শোনামাত্রই প্রভু সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। স্ত্রীলোকের নাম পর্যন্ত সন্ন্যাসীর শুনতে নেই। কিন্তু সঙ্কুচিত হলেও প্রভু বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। কত কষ্ট করে কত দূর থেকে এসেছে। আর প্রভুর প্রতি পরমেশ্বরের কী অকপট স্নেহ !

পরমেশ্বর সরল, চতুরতার ধার ধারে না, তাই সে তার স্ত্রীর কথাও বললে—মুকুন্দের মা-ও এসেছে। সন্ন্যাসীর কাছে স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ তোলা যে উচিত নয় তার সে বিবেচনা নেই। সে বাকপটুতা জানে না, জানে না রেখে-ঢেকে ওজন করে কথা কইতে। মুকুন্দের মা যে এসেছে এ তো আর মিথ্যে নয়। আর এসেছে প্রভুর প্রতি প্রীতিপ্রেরিত হয়ে।

প্রভু তার অন্তরের ভাবটুকুর খবর পেলেন। যেখানে শুধু সরলতা আর স্নেহ সেখানে প্রভু আর সঙ্কোচে থাকেন কী করে ?

প্রভু অন্তরে আনন্দিত হলেন।

'প্রশ্রয়-পাগল—শুদ্ধবৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে।'

॥ ২৫ ॥

নন্দন আচার্য

গৌরাঙ্গের কীর্তনসঙ্গী, নবদ্বীপের চতুর্ভুজ পণ্ডিতের ছেলে। মহাভাগবতোত্তম নন্দন আচার্য। নইলে তার ঘরে নিত্যানন্দ অতিথি হয় ?

নানা তীর্থ ভ্রমণ করে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে এসেছে। বৃন্দাবনে এসে জানতে পেরেছে নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র প্রকাশিত হয়েছেন।

তবে আর এখন বৃন্দাবন কী, চলো যাই নবদ্বীপ।

নবদ্বীপে গিয়ে প্রথমেই ধরা দেব না। লুকিয়ে থাকব। এমন কার ঘর আছে যেখানে দু-দণ্ড আশ্রয় পেতে পারি? ভক্তির পরিবেশে পেতে পারি চিত্তের স্নিগ্ধতা?

পথই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। নিয়ে এল নন্দন আচার্যের ঘরে।

মহা-অবধূতবেশ, প্রকাণ্ড শরীর, নিত্যানন্দকে দেখে নন্দন অভিভূত হয়ে গেল। বিনয়-বচনে বললে, যদি দয়া করে আমার ঘরে ভিক্ষে করেন তো কৃতার্থ হই।

সেই মনে করেই তো এসেছি। মহাবদান্য নিত্যানন্দ ঘরে এসে বসল। কোনো নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করি নি।

এই নন্দন আচার্যের ঘরেই নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার।

নবদ্বীপে শিগগিরই এক মহাপুরুষ আসবেন। নিত্যানন্দের আসার দু-তিন দিন আগেই প্রভু বললেন ভক্তদের।

তারপর যেদিন এল তার পরদিন প্রভু বললেন, কাল রাতে এক অপরূপ স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম এক তালধ্বজ রথ আমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। ডান হাতে ধরা কাঁধের উপর বিরাট স্তম্ভ, বাঁ হাতে ধরা কমণ্ডলু, পরনে নীলাম্বর, মাথায়ও নীল কাপড়ের পাগড়ি, এক দীর্ঘায়তদেহ সন্ন্যাসী। আমাকে জিজ্ঞেস করল, এটা কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি? আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি কোন্ মহাজন? সন্ন্যাসী হেসে বললে, আমি তোমার ভাই। আজ যাই, কাল আমাদের পরিচয় হবে। বলে প্রভু শ্রীবাস আর হরিদাসকে আদেশ করলেন, দেখ তো কোথাও কোনো মহাপুরুষ এসেছে কিনা।

শ্রীবাস আর হরিদাস খুঁজতে বেরুল। কে জানে সংকর্ষণ এল কিনা।

কোথায় কে মহাপুরুষ সন্ধান পেল না। গৃহস্থ বৈষ্ণব সকলের ঘরে গিয়ে দুয়ার নাড়ল, তোমাদের বাড়িতে নতুন কোনো অতিথি এসেছে? সন্ন্যাসীদের আখড়ায় গিয়েও খোঁজ করল, এসেছে কোনো অবধূত? পাষণ্ডীদের বাড়িও বাকি রাখল না। তোমাদের বাড়িতে কেউ আসে নি তো ছদ্মবেশে?

কোথাও কোনো মহাপুরুষের দেখা পেলাম না।

সব বাড়ি দেখেছ ঘুরে ঘুরে?

তিন প্রহর ধরে ঘুরেছি, নদীয়ার কোনো ঘর আর বাকি নেই।

প্রভু মনে মনে হাসলেন। নিত্যানন্দ বড় গূঢ় বস্তু। তাকে সহজে ধরা যায় না।

প্রভু বললেন, দেখি আমি খুঁজে পাই কিনা।

প্রভু খুঁজতে বেরুলেন। ভক্তদলও সঙ্গে চলল। মুখে মুখে ধ্বনি চলল,

সব বাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রভু সটান নন্দন আচার্যের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আর—ঠিক, সেইখানেই কে এক পুরুষ-রতন বসে আছে।

হরিদাস আর শ্রীবাস বুঝি তাড়াতাড়িতে নন্দনের বাড়িটাই ছেড়ে গিয়েছিল। তাদের এই বিস্মৃতিটুকু না ঘটলে যে প্রভুর এই সাক্ষাৎ আবিষ্কার হয় না।

নন্দনের বাড়ি বুঝি এমনি লুকিয়ে থাকবারই জায়গা।

আরেকদিন প্রভু শ্রীবাসের ভাই রামাই পণ্ডিতকে ডাকলেন। ঈশ্বর-আবেশে বললেন, তুমি একবার অদ্বৈতের বাড়ি যাও। তাকে গিয়ে বলো, যার জন্যে এত কেঁদেছিলে, এত উপাসনা ও উপবাস করেছিলে, সে প্রকাশিত হয়েছে। সে যেন পূজার উপকরণ নিয়ে সস্ত্রীক চলে আসে।

রামাই হরি-হরি স্মরণ করতে করতে চলল অদ্বৈতের কাছে।

ভক্তিযোগের প্রভাবে অদ্বৈত বুঝতে পেরেছে রামাই কেন এসেছে। তাই নিজের থেকেই বলে উঠল, আমাকে নেবার জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছে বুঝি?

সবই তো আপনি জানেন, তবে চলুন তাড়াতাড়ি।

কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এসেছে এ মানি কি করে? অদ্বৈত আবার নতুন ভঙ্গি নিল : আমার অধ্যাত্মবিজ্ঞান এমন কথা বলে না।

মুখে যাই বলুক অদ্বৈত বিধিযোগ্য পূজার উপকরণ নিয়ে চলল। বললে, প্রভু যদি আমাকে তাঁর ঐশ্বর্য দেখান তবেই বুঝব তিনি আমার প্রাণধন।

কী ঐশ্বর্য দেখতে চান?

তিনি শুধু আমার মাথায় তাঁর শ্রীচরণ তুলে দেবেন।

কী জানি, রামাই ভাবল, এমন দৃশ্য দেখবার ভাগ্য করেছি কিনা।

অদ্বৈত বললে, আমি নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে থাকব তুমি প্রভুকে গিয়ে বলবে, আচার্য এল না। দেখি প্রভু কী বলেন।

রামাই এসে দাঁড়াল প্রভুর সামনে। তার মুখ খোলবার আগেই প্রভু বললেন, অদ্বৈত বুঝি নন্দন আচার্যের বাড়ি লুকিয়ে থেকে আমাকে পরীক্ষা করতে চাইছে। যাও তাকে এখানে নিয়ে এস। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব।

রামাই আবার গেল অদ্বৈতের কাছে। সব কথা ব্যক্ত করলে। আমাকে

প্রভু মিথ্যা কথা বলতে দিলেন না। আপনার জারিজুরি ধরে ফেললেন। এবার চলুন, আপনাকে ডেকেছেন প্রভু।

স্তব পড়তে পড়তে, অদ্বৈত সস্ত্রীক চলে এল।

অশেষ-বিশেষে প্রভুর চরণবন্দনা করল। প্রভু অদ্বৈতের মাথায় পা তুলে দিলেন। 'সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়॥'

আরেকবার প্রভুই নিজে লুকোলেন। সেই লুকোবার স্থানও নন্দন আচার্যের বাড়ি।

একদিন প্রভু নৃত্য করছেন, তাঁকে ঘিরে ভক্তদল কীর্তন করছে, কিন্তু কেন কে জানে নৃত্যে-কীর্তনে প্রেমানুভব হচ্ছে না।

কেন এমন হচ্ছে? কেন সমস্ত শুষ্ক লাগছে? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি নগরকীর্তনে কোনো পাষণ্ডীসম্ভাষ হয়েছে? নাকি তোমাদেরই কারু কাছে কোনো অপরাধ করে বসেছি?

অদ্বৈত বললে, অপরাধ করেছ বৈকি। তুমি সকলকে প্রেম দিলে, কেবল আমাকে আর শ্রীবাসকে দিলে না। তাই আমি তোমার সমস্ত প্রেম শুষে নিয়েছি।

তবে আমার দেহে যখন প্রেম নেই তখন তো এর প্রাণও নেই। প্রভু গঙ্গার দিকে ছুটলেন। এ প্রেমহীন দেহ দিয়ে তবে আর কী হবে?

প্রভু গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।

নিত্যানন্দ আর হরিদাসও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুলল প্রভুকে। নিত্যানন্দ বললে, ভক্ত অভিমানে কী বলল আর তাইতে তুমি মরতে ছুটলে?

প্রভু বললেন, কাউকে কিছু বোলো না, আমি নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে থাকব।

প্রভুর উদ্দেশ না পেয়ে সমস্ত নবদ্বীপ শোকাচ্ছন্ন হল। কারু বাড়িতে হাঁড়ি চড়ল না।

এদিকে প্রভু নন্দন আচার্যের বাড়িতে গিয়ে তার বিষ্ণুখট্টার উপর বসলেন। নন্দন দেখল প্রভুর বসন সিক্ত। নতুন বস্ত্র এনে দিল। প্রভু শুষ্ক বস্ত্র পরে আবার খাটে বসলেন।

বললেন, নন্দন, তুমি আমাকে লুকিয়ে রাখবে।

এ বড় দুষ্কর কাজ। নন্দন বললে, মানুষের সংসারের মধ্যে তুমি কোথায়

লুকোবে? হৃদয়ে পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারো না। বারে-বারেই বাইরে বেরিয়ে আস। ক্ষীরসিন্ধুই তোমাকে লুকিয়ে রাখতে পারল না আর এ তো মানুষের সমাজ!

সারা রাত কৃষ্ণকথারসে কাটালেন প্রভু। প্রভাতে নন্দনকে বললেন, নন্দন, একলা শ্রীবাসকে ডেকে নিয়ে এস।

শ্রীবাস এসে কাঁদতে লাগল।

অদ্বৈতের খবর বলো।

তার আর খবর কী। কাল থেকে সে উপোস করে আছে।

প্রভু অস্থির হয়ে চললেন অদ্বৈতসকাশে।

বললেন, অদ্বৈত, ওঠো। আমি বিশ্বম্ভর, তোমার ডাকে তোমার কাছে এসেছি।

মূর্ছাগত অদ্বৈত চোখ চাইল।

প্রভু বললেন, উঠে স্নান করো, খাও। কৃষ্ণ যদি কাউকে দণ্ড দেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে দাস্যও দেন। দণ্ডিত জনই কৃষ্ণদাস হয়ে যায়।

নন্দন আচার্য দেখল, বুঝল, দণ্ডই কৃষ্ণের কৃপা। প্রভু, আমাকে কবে দণ্ড দেবে?

কাজী-দমনের দিন কীর্তনের দলের একজন নন্দন আচার্য। রথযাত্রায় প্রভুকে দেখতে নীলচলের যাত্রীও নন্দন আচার্য।

॥ ২৬ ॥

নকুল ব্রহ্মচারী

শ্রীপাট কালনার কাছাকাছি পিয়ারিগঞ্জে নকুলের বাড়ি। আগে নাম ছিল প্রদ্যুম্ন। নৃসিংহের উপাসক। প্রভু তাই তার নাম দিয়েছিলেন নৃসিংহানন্দ।

কালনার অম্বিকায় নকুলের দেহে প্রভুর আবেশ হল।

জীবনিস্তারের তিন উপায়—সাক্ষাৎ-দর্শন, আবির্ভাব আর আবেশ।

নকুলে এই আবেশ উপস্থিত হল।

আবিষ্ট হয়ে গ্রহগ্রস্তের মত নকুল কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো

গান করে, কখনো বা নাচে উন্মত্ত হয়ে। প্রভুর মতই তার গায়ের রঙ গৌর হয়ে গেল। সর্বদাই প্রেমাবেশে প্রভুর মত সকলকে কৃষ্ণনাম নিতে বলছে, বলছে, নাম ছাড়া আর উপায় নেই। একেবারে ঠিক প্রভুর মতই বাচন-ভাষণ।

দেশের লোক নকুলকে দেখতে ভিড় করল। আর কী আশ্চর্য, যে দেখে সেই প্রেমোন্দাম হয়ে ওঠে।

শিবানন্দ সেনের ইচ্ছে হল পরীক্ষা করে দেখি সত্যিই এ প্রভুর আবেশ কিনা। প্রভু তো সর্বজ্ঞ। সত্যি-সত্যি প্রভুর আবেশ হলে নকুলও তো সর্বজ্ঞ হয়ে উঠবে। দেখি আমি লুকিয়ে থাকলে নকুল আমাকে আমার নাম ধরে ডাকতে পারে কিনা। দেখি বলতে পারে কিনা আমার ইষ্টমন্ত্র কী।

লোক আসছে যাচ্ছে জটলা পাকাচ্ছে, এত ভিড় যে সকলে দর্শনও পাচ্ছে না। এমন সময় নকুল বললে, শিবানন্দ দূরে অপেক্ষা করছে, তাকে কেউ গিয়ে ডেকে নিয়ে এস তো।

শিবানন্দ! শিবানন্দ! হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। শিবানন্দ কে? শিবানন্দ কোথায়? তোমাকে ব্রহ্মচারী ডাকছেন।

শিবানন্দ এসে নমস্কার করে নকুলের পাশে বসল হাসিমুখে।

পাশে বসে ভালোই করেছ। বললে নকুল, এখন, তোমার ইষ্টমন্ত্র কী, তাই তোমাকে কানে কানে বলে দিই। চারি অক্ষর গৌরগোপাল মন্ত্রেই তোমার দীক্ষা। কী, ঠিক নয়?

ঠিক। এতক্ষণে শিবানন্দের বিশ্বাস হল।

প্রভু নীলাচল হতে বৃন্দাবন যাচ্ছেন, গৌড়পথে এসেছেন কুলিয়ায়।

মনে মনে পথ তৈরি করছে নকুল, প্রভুর বৃন্দাবনে যাবার পথ। কল্পনার ছবি আঁকছে।

আগে মণিরত্ন দিয়ে পথ তৈরি করল। সে রত্নবাঁধা পথও বোধ হয় প্রভুর পায়ে কঠিন লাগবে। তাই তার উপর নির্বৃন্ত ফুলের শয্যা বিছিয়ে দিল। রাস্তার দু পাশে বকুল গাছ পুঁতে দিল, বকুল গাছের ছায়ায় পথ বেশ শীতল থাকবে। ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদ করে বেড়াবে। প্রভুর তত ক্লান্তি লাগবে না। রাস্তার কাছাকাছি কতগুলি পুকুরও কেটে দিল, স্বচ্ছ জল সুধার মত স্বাদু, প্রভু ইচ্ছেমত স্নান-পান করতে পারবেন। আর গাছে-গাছে কী সুন্দর পাখির কাকলি, তাতে প্রাণে আনন্দ জাগাবে, উৎসাহ জাগবে।

মনে হবে পাখির কণ্ঠেও কৃষ্ণনামের মধু ঝরছে।

কল্পনায় পথ করতে করতে কানাইর-নাটশালা পর্যন্ত এসেই থেমে গেল নকুল। তার বেশি আর মন অগ্রসর হল না।

নকুল বললে, প্রভুর এবার বৃন্দাবন যাওয়া হবে না। তাঁকে কানাইর-নাটশালা থেকেই ফিরতে হবে।

নকুল যা বলল তাই হল। কানাইর-নাটশালা থেকেই প্রভু ফিরে গেলেন।

নকুলে শুধু প্রভুর আবেশই হল না, নকুলের সামনে প্রভুর আবির্ভাবও হল।

শ্রীকান্ত শিবানন্দের ভাগনে, একবার রথযাত্রার অনেক আগেই প্রভুকে দেখবার উৎকণ্ঠায় চলে এসেছে নীলাচলে।

দু মাস থাকবার পর প্রভু তাকে বাংলা দেশে ফিরে যেতে বললেন। বললেন, সবাইকে বলে দিও, এ বছর কেউ যেন না আসে।

কেউ আসবে না? শ্রীকান্তের বুকে যেন ব্যথা বাজল।

না। কেননা আমিই যাব এবার পৌষ মাসে। তোমার মামা শিবানন্দের বাড়িতে উঠব।

সত্যি? শ্রীকান্ত উল্লাস করে উঠল।

সেখানে জগদানন্দ আছে, সে আমার জন্যে রান্না করতে পারবে।

শ্রীকান্ত ফিরে এসে সংবাদ রাষ্ট্র করে দিল। যারা যারা যাবার উদ্যোগ করছিল তারা সবাই স্থির হল।

প্রভু নিজে আসছেন এর মত আর সুখকর কী আছে!

পৌষ মাস পড়তেই শিবানন্দ প্রভুর ভিক্ষার উপাচার সংগ্রহ করতে বসল।

কিন্তু কই, মাস যে কেটে যায়, প্রভু এলেন কই?

শিবানন্দ ম্রিয়মাণ হয়ে রইল। জগদানন্দেরও এক অবস্থা। প্রভু তার হাতের রান্না খেতে চেয়েছিলেন। সে কি তবে রান্না করা ছেড়ে দেবে?

একদিন নকুল এসে হাজির।

এই যে নৃসিংহানন্দ এসেছ। শিবানন্দ সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করল।

কিন্তু তোমরা নিরানন্দ কেন?

শিবানন্দ বললে তাদের দুঃখের কথা। প্রভু আসবেন বলে এলেন না। খাবেন বলে খেলেন না।

নকুল বললে, চিন্তা করো না। আমি তিনদিনের মধ্যে প্রভুকে এখানে নিয়ে আসব।

দুদিন ধ্যান করার পর নকুল বললে, প্রভু পানিহাটি পর্যন্ত এসেছেন। কাল মধ্যাহ্নে এখানে আসবেন। ভিক্ষের যোগাড় করো। আমি রান্না করব।

বহুতর ব্যঞ্জন পিঠে ক্ষীর পায়েস রান্না করল নকুল।

তিনজনের জন্যে ভোগ সাজাল নকুল। প্রথম জন স্বয়ং প্রভু, দ্বিতীয় জন জগন্নাথ, তৃতীয় জন তার নিজের ইষ্টদেব নৃসিংহ।

তিনজনকে ভোগ সমর্পণ করে আবার ধ্যানে বসল নকুল।

'হাঁ, হাঁ, কী করো ? কী করো ?' নকুল চেঁচিয়ে উঠল : 'তুমি তিন থালাই খাও কী করে ? জগন্নাথের সঙ্গে তোমার ঐক্য, তুমি না হয় তার ভোগ খেলে, কিন্তু নৃসিংহের ভোগ তুমি খাও কী করে ?'

কিন্তু প্রভু আবির্ভূত হয়ে নকুলকে দেখালেন জগন্নাথের সঙ্গে যেমন তাঁর ভেদ নেই, নৃসিংহের সঙ্গেও তেমনি ভেদ নেই।

নকুল তা মনে মনে বুঝত এখন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করল।

তোমার প্রভুর ব্যবহার দেখ। শিবানন্দকে উদ্দেশ করে নকুল বললে, 'আমার নৃসিংহের ভোগও খেয়ে গেল। জগন্নাথেরটা খেয়েছেন, তা খান, কিন্তু আমার নৃসিংহেরটা খান কী বলে ? আমার নৃসিংহ আজ উপবাসী রইল।'

এ সব কী বলছে নকুল ? এ সব কি সে প্রেমাবেশে বলছে ? এ সব কি তার কল্পনার কারুকার্য ? নইলে শিবানন্দ দেখতে পেল না কেন ? জগদানন্দেরই বা কী অপরাধ ?

তবু নকুলকে শিবানন্দ অগ্রাহ্য করতে পারল না। নৃসিংহের জন্যে আবার সমস্ত যোগাড় করল। আবার ভোগ লাগাল নকুল।

শিবানন্দের সংশয়ের কথা প্রভু টের পেয়েছেন।

পরের বছর শিবানন্দ যখন নীলাচলে গেল তখন প্রভু বললেন, গত বছর পৌষ মাসে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কী সুন্দর খেলাম! নৃসিংহানন্দ কী সুন্দর রান্না করেছিল! কী সুন্দর খাওয়াল আমাকে!

এতক্ষণে শিবানন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাস হল। তার বুঝি মনে হল নকুলের যেমন আতীব্র ভক্তি তার বুঝি তেমন নেই।

সে গিয়ে প্রভুকে দেখে। প্রভু তো কই তার কাছে আবির্ভূত হন না ? তার প্রীতির রজ্জু বোধ হয় নকুলের মত শক্ত নয়।

॥ ২৭ ॥

নরহরি সরকার

শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্ম, নারায়ণদাস সরকারের ছেলে। গদাধর পণ্ডিতের মতই গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার সহচর। গদাধর থাকে গৌরাঙ্গের বাঁয়ে আর নরহরি ডাইনে। 'গদাধর নরহরি করে ধরি গৌরহরি প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।'

ব্রজলীলায় গদাধর শ্রীমতী রাধিকা আর নরহরি তার সখী মধুমতী। গদাধরে আর নরহরিতে অটুট বন্ধুত্ব।

কীর্তনানন্দের আবেশে যখন প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়েন তখন নরহরির গায়ে ঢ'লে প'ড়ে আর গদাধরে মুখখানি দেখতে-দেখতে।

খেনে নরহরি-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া।

গৌরকিশোর যখন গদাধরের সঙ্গে হোলি খেলছে তখন নরহরিও অংশীদার। 'হোলি খেলত গৌরকিশার। রসবতী নারী গদাধর কোর। ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে। মুকুন্দ মুরারি বাজু নাচত রঙ্গে।'

নরহরির শিষ্যই লোচনদাস। তার চৈতন্যমঙ্গলে সে লিখছে:

নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাসবিনোদিয়া ॥
গৌর দেহে শ্যামতনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন ॥
মধুমতী নরহরি হইলা সেই কালে
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥

নরহরির বড় ভাই মুকুন্দ সরকার, মুকুন্দের ছেলে রঘুনন্দন। শ্রীখণ্ডে এদের বাড়িতে গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। রঘুনন্দনের ভক্তিতে সে বিগ্রহ শুধু জাগ্রত হয় নি, ক্ষুধার্ত হাত বাড়িয়ে খেয়ে নিয়েছে থালার নৈবেদ্য। বিগ্রহের আবার সাজবার শখ, বলে, কদমফুলকে কর্ণভূষণ করবে। ওদের পুকুরের ধারে কদম গাছ, তাতে কৃষ্ণ নিত্যি ফুল ফুটিয়ে রাখে। তার থেকে প্রত্যহ দুটি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে রঘুনন্দন কৃষ্ণের কানে দুলিয়ে দেয়।

সে কৃষ্ণ কে? সে কৃষ্ণ কোথায়?

সে কৃষ্ণ গৌরহরি। সে কৃষ্ণ নবদ্বীপে।

গৌরাঙ্গজন্মের আগে থেকেই নরহরি পদকর্তা। তারও চেয়ে বেশি, নরহরি কবি। সে শ্রীখণ্ডে থাকে না, সে নবদ্বীপে থাকে। সমস্ত নবদ্বীপলীলা তার চোখের উপর, তার প্রাণমঞ্চে। সেই প্রথম নিমাইকে চিনল কৃষ্ণ বলে। শুধু চিনল না, গৌরমন্ত্রে সে-ই প্রথম দীক্ষা নিল।

রসে তনু ঢর ঢর গৌরকিশোরবর
নাম তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এ সব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে ব্যথা
ভক্ত বিনু নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গ বাক্য-ভাগবতে লিখি।
মনে করি অনুমান শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণতনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদভূত চৈতন্যের লীলা।
রাইসঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জবনে বিলাইতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কি জানি হয়ে
না কহিলে মনে বড় তাপ।
চিত্তে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ॥

শ্রীখণ্ডে আরো দুজন ভক্ত ছিল, সুলোচন আর চিরঞ্জীব সেন। তারাও চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত। তারা সবাই মিলে 'খণ্ডের সম্প্রদায়' নামে এক কীর্তনের দল গড়ল। রঘুনন্দনই সব চেয়ে বেশি উৎসাহী, সে সেই দল নিয়ে চলে আসে নবদ্বীপ, নরহরি তাতে যোগ দেয়। গৌরাঙ্গকে ঘিরে চলে নৃত্য-কীর্তন। রঘুনন্দনের উপর প্রভুর অপার স্নেহ। নরহরি প্রেমের গাগরি আর রঘুনন্দন প্রেমের শতদল।

গৌরাঙ্গ রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করছে। নরহরির কী সুন্দর বর্ণনা!

কি লাগিয়া মোর গৌরসুন্দর
বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন আসন রতন ভূষণ
সাজায়ে অঙ্গের সাজে॥
আপন বপুর ছাঁচ নেহারিয়া
চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ না মিলল পহুঁ
এত বিলম্ব কেনে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
ভাবিয়া রাইয়ের দশা।
সজল নয়ানে চাহে পথপানে
কহে গদগদ ভাষা॥

এই নরহরিই লিখছে : গৌরাঙ্গ নহিত তবে কি হইত কেমনে ধরিত দে। রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে।

শুধু নবদ্বীপেরই নয়, নীলাচলের ভাবমাধুরীর কথাও লিখেছে নরহরি।

দেখি গোরা নীলাচলনাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইলা গোপীভাবে।
বহে বাহু করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটি না চাহ তুমি ফিরি॥
করিলা পিরিতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছলছল অরুণ নয়ান।
রস রস বিরস বয়ান॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস॥

রামানন্দ আর স্বরূপের সঙ্গে বসে মনের কথা বলছেন প্রভু। কী সে

মনের কথা ? লিখছে নরহরি, সে আর কিছুই নয়, শুধু বাঁশির কথা। বাঁশিকে গালি দিচ্ছেন, আর বলছেন, স্বরূপ, বাঁশি আমার জাত-কুল সব নষ্ট করল। সেই যে ধ্বনি একবার কানে ঢুকল, আর বেরুল না। আমাকে বধির করে রাখল। বাঁশি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো ধ্বনিই আমি শুনতে পাচ্ছি না। এ কী হল আমার ? 'ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল, বধির সমান মোরে কৈল ॥'

গম্ভীরা-লীলারও মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছে নরহরি। গম্ভীর নির্জনে বসে গোরারায় কেঁদে-কেঁদে রাত ভোর করে দিচ্ছে।

খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে।
কোন নাহি রহু পহুঁ পাশে ॥
খেন্দে কান্দে তুলি দিই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাইপ্রেমে হইয়াছে ভোরা ॥

মুকুন্দ, নরহরি আর রঘুনন্দন তিন জনই নীলাচলে গিয়েছিল প্রভুর দর্শনে। তিন জনকে তিন রকম উপদেশ দিলেন প্রভু। মুকুন্দকে বললেন, ধর্মপথে থেকে ধন উপার্জন করো। রঘুনন্দনকে বললেন, কৃষ্ণসেবন করো। আর নরহরিকে বললেন, ভক্তসঙ্গে থাকো আর বলো কৃষ্ণকথা।

গৌরাঙ্গই পরম, গৌরাঙ্গই প্রথম, এই পারম্যবাদের প্রবর্তক তিন জন। কাঁচরাপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের মুরারি গুপ্ত আর শ্রীখণ্ডের নরহরি। এরা আগে গৌরাঙ্গকে দেখবে, পরে জগন্নাথকে।

নীলাচলে এক পণ্ডিত এসে হাজির। স্পর্ধা করে প্রভুকে বললে, আপনার জানা এমন কি কেউ আছে যে আমাকে বিচারে পরাস্ত করতে পারে ?

প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, পরাস্ত করতে পারলে কী হবে ?

আমি তার কাছ থেকে দীক্ষা নেব।

প্রভু নরহরির দিকে তাকালেন। বললেন, যাও, পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করো।

বিচারে নরহরির জয় হল। হেরে গিয়ে লোকানন্দ সরে পড়ল না। নরহরির কাছ থেকে দীক্ষা নিল। আর নরহরির কাছ থেকে দীক্ষা অর্থই গৌরমন্ত্রে দীক্ষা।

বর্ধমানের কুলাই গ্রামের কংসারি ঘোষ স্বপ্নে আদেশ পেল তার বাড়ির

নিমগাছের কাঠে গৌরাঙ্গমূর্তি নির্মাণ করা হোক।

কংসারি তার ভাই দৈত্যারিকে বললে।

দৈত্যারি বললে, আমিও অমনি স্বপ্ন দেখেছি।

তাদের বাড়ির নিমগাছের কাঠে তিন-তিনটি গৌরাঙ্গমূর্তি তৈরি হল। মূর্তি তিনটি তারা তাদের গুরু নরহরিকে দান করলে। নরহরি তাদের প্রতিষ্ঠা করল, ছোটটি শ্রীখণ্ডে স্বগৃহে, মাঝারিটি গঙ্গানগরে ও বড়টি কাটোয়ায়।

নরহরির কাজ কী? ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথা। নরহরির রচিত পদকথা থেকেই গৌরচন্দ্রিকার প্রথম সৃষ্টি। তার শুধু এক গান, গৌরগান। এক মন্ত্র, গৌরমন্ত্র।

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহুঁ॥
গৌরগদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥

আকুমার ব্রহ্মচারী নরহরি কীর্তন করতে করতে দেহ ছাড়ল।

গাও পুন পুন গৌরাঙ্গের গুণ
সরল হইয়া মন।
এ ভবসাগর এমন দয়াল
না দেখি যে একজন॥

গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে।
নরহরি হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে ॥

॥ ২৮ ॥

কেশব ভারতী

কণ্টকনগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর আশ্রম।

একদিন কী মনে করে সে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত। নবদ্বীপ মানে একেবারে নিমাইয়ের বাড়িতে।

কে এল ? নিমাই সচকিত হয়ে উঠল।

তাকিয়ে দেখল এক সন্ন্যাসী তার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে।

খানিক আগেই সে ভাবছিল সে সন্ন্যাসী হবে। সে সন্ন্যাসী হলেই পাষণ্ডীদের উদ্ধার হবে। উদ্ধার একমাত্র নমস্কারে। দুর্জনেরা তো আমাকে এমনি নমস্কার করবে না, আমি সন্ন্যাসী হলে পরেই করবে। প্রণত হলে পরেই ওদের অপরাধক্ষয় হবে। আর ওদের অপরাধের ক্ষয় হলেই ভক্তি জাগবে।

নিমাই তাকে প্রণাম করে ভিক্ষে করাল। বললে, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, কৃপা করে আমার সংসারমোচন করে দিন।

কেশব বলে, তুমিই তো অন্তর্যামী। তুমি যেমন করাবে, আমি তেমনি করব।

এখন আমাকে বলুন, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড় ?

সমস্ত মহাজন সবশেষে এই ভক্তিই চায়। এই ভক্তিই স্থির। ভক্তিই কুশল। সুতরাং ভক্তিই বড়।

হরি বলে গর্জন করে উঠল নিমাই। বললে, কবে আমি কৃষ্ণের উদ্দেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব ? কোথায় গেলে পাব আমার কৃষ্ণকে ?

গৌরসুন্দর গঙ্গা পার হলেন। চলে এলেন কাটোয়ায়। বটগাছের

নিচে কেশব ভারতীর আশ্রম খুঁজে পেতে দেরি হল না।

কেশবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন গৌরহরি।

এ গৌরবর্ণ অপূর্বসুন্দর পুরুষটি কে? দেখেও যেন চিনতে পারছে না কেশব।

আমি নিমাই। আপনার কাছ থেকে আমি সন্ন্যাস নিতে এসেছি।

যেমন করাবে তেমনি করব, কথা দিয়েছিল কেশব। কিন্তু এই কমনীয়কান্তি নবীন পুরুষকে কোন্ প্রাণে সন্ন্যাস দেব? কাকে আমি পুত্রহারা করব? কাকে বা স্বামীহারা?

কেশব বললে, নিমাই, তুমি অন্য গুরুর সন্ধান করো, আমি পারব না সন্ন্যাস দিতে।

কিন্তু গোসাঁই, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন আমার কথা রাখবেন। আমি বলছি আমাকে সন্ন্যাস দিন।

তা আমি দেব, কিন্তু এখন কেন? তুমি যখন পঞ্চাশ বছর বয়স পেরিয়ে যাবে তখন দেব।

তবে যারা অল্পায়ু তাদের কী হবে? তারা উদ্ধার পাবে না?

কিন্তু তোমার যে মা আছে, স্ত্রী আছে।

গোসাঁই, আমি তাদের সকলের অনুমতি নিয়ে এসেছি।

অনুমতি নিয়ে এসেছ? কেশব স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, কিন্তু তোমাকে মন্ত্র দিলে তুমি তো আমাকে গুরু বলবে, তাতে আমি অপরাধী হব।

না, না, অপরাধী হবেন না। স্বপ্নে এক মহাজন আমার কানে মন্ত্র দিয়ে গেছে। দেখুন তো এ-মন্ত্রের তাৎপর্য কী। বলে প্রভু কেশবের কানে মন্ত্র উচ্চারণ করে দিলেন। পরোক্ষে কেশবই তাঁর শিষ্য হয়ে গেল।

এবার তবে দীক্ষা দিন।

সে মন্ত্রেই কেশব প্রভুকে দীক্ষিত করল। নাম দিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বললে, কীর্তনপ্রকাশে সর্বলোকের কৃষ্ণে চৈতন্য জাগাবে বলেই তোমার এই নামকরণ।

আর প্রেমে তুমি সমস্ত বিশ্ব ভরবে বলেই তুমি বিশ্বম্ভর।

আর তুমি রাধাভাবদ্যুতিতে বিভাসিত বলেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

সে-রাত্রি কাটোয়ায় কাটালেন প্রভু। মুকুন্দকে বললেন, মুকুন্দ, কীর্তন করো।

মুকুন্দ কীর্তন ধরল। প্রভু প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে করতে কেশব ভারতীকে আলিঙ্গন করলেন। কোথায় দণ্ড গেল, কোথায় কমণ্ডলু, কেশবও হরি-হরি বলে নাচতে লাগল। যে ভক্তিকে সে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেই ভক্তিকে তার দেহমনে আবির্ভূত দেখল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল কেশব।

প্রভাতে কেশবের কাছ থেকে বিদায় নিলেন প্রভু। বললেন, আমি এবার কৃষ্ণ খুঁজতে পথে বেরুব। অরণ্যে প্রবেশ করে দেখব আমার কৃষ্ণ কোথায় লুকোল।

কেশব বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তোমার কীর্তনরঙ্গের সঙ্গী হব।

কেশবকে অগ্রণী করে প্রভু কাটোয়া ত্যাগ করলেন।

তারপর কেশব কোথায় গেল, কবে ফিরল, ফিরলই বা কিনা, কেউ জানে না।

॥ ২৯ ॥

গৌরীদাস-সারঙ্গ-বনমালী

গৌরীদাস পণ্ডিত

নবদ্বীপ থেকে পাঁচ-ছ ক্রোশ দূরে শালিগ্রামে গৌরীদাসের জন্ম। পিতা কংসারি মিশ্র, মাতা কমলাদেবী। অগ্রজ সূর্যদাস। সূর্যদাসের দুই কন্যা, বসুধা আর জাহ্নবী।

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার সঙ্গী। সখ্যভাবের উপাসক।

সূর্যদাস বললে, তুমি অম্বিকাকালনায় গিয়ে থাকো। সেখানে গঙ্গাতীরে নির্জনে সাধন-ভজন করো।

এর চেয়ে মনঃপূত কথা আর কী হতে পারে, গৌরীদাস অম্বিকায় চলে গেল।

একদিন গৌরাঙ্গ শান্তিপুর থেকে ফেরবার পথে হরিনদী গ্রামে নৌকো নিলেন। নিজেই বৈঠা চালিয়ে গঙ্গা পার হলেন, উঠলেন অম্বিকায়। হাতের

বৈঠা ছেড়ে দিলেন না, হাতে করেই গৌরীদাসের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন।

গৌরীদাস তো স্তম্ভিত।

তোমার জন্যে এই বৈঠা নিয়ে এলাম। বললেন গৌরাঙ্গ।

বৈঠা দিয়ে কী হবে ?

কী হবে ! এই বৈঠা দিয়ে তুমি মানুষকে ভবনদী পার করিয়ে দেবে।

দুহাত পেতে বৈঠাটি গ্রহণ করল গৌরীদাস।

প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, আমার সঙ্গে নবদ্বীপ চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেব।

প্রভুর আলিঙ্গন পেয়েই তো গৌরীদাস পরিপূর্ণ, সে ভেবে পেল না এর অতিরিক্ত আর কী জিনিস আছে !

এমন জিনিস যা তুমি কল্পনায়ও আনতে পার না।

সত্যিই অকল্পনীয়। প্রভুর স্বহস্তলিখিত গীতাখানি দিলেন গৌরীদাসকে।

প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর। আদ্যোপান্ত মুক্তার পঙক্তিতে সাজানো। এতে তাঁর অনিমেষ নয়নের সুধা সঞ্চিত হয়ে আছে, অবিরল ঢেলে দেওয়া হয়েছে তাঁর করস্পর্শের করুণা।

ওকে দেখতে সুখ, ধরতে সুখ, পড়তে সুখ, ভাবতে সুখ। তারপর চৈতন্যতন্ময়তার আনন্দের পারাবার।

গীতাখানা বুকে করে অম্বিকায় ফিরে এল গৌরীদাস।

কত কষ্ট করে লিখেছেন নিজের হাতে, তাই অকাতরে দিয়ে দিলেন। গৌরীদাস আর ধ্যান-আরাধনা করবে কী, এ কথাটা মনে করতেই সে কাঁদতে থাকে। এ কী প্রেম, কী লীলা, পারাপার খুঁজে পায় না।

সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুরে এলেন, গৌরীদাস অভিমান করে গেল না দেখতে। সংসার ছেড়ে চলে গেলেন তো, আমরা কী নিয়ে থাকব ? বড় ভাই নিত্যানন্দ তো আগে থেকেই সন্ন্যাসী, এও আবার সেই পথের পথিক হল। নয়নের দুটি তারাই যদি চলে যায়, তবে অন্ধকারের অরণ্যে দিন কাটবে কী করে ?

নিত্যানন্দকে নিয়ে প্রভু নিজেই গৌরীদাসের বাড়িতে এসে দাঁড়ালেন।

গৌরীদাস কাঁদতে কাঁদতে বললে, তোমাদের আর ছেড়ে দেব না। তোমরা দু ভাই এখানেই নিত্যবন্দী হয়ে বিরাজ করো। তোমাদের আমি প্রাণভরে সেবা করি।

প্রভু হাসলেন। বললেন, এক কাজ করো, আমাদের প্রতিমূর্তির সেবা করো।

প্রতিমূর্তির কি প্রাণ আছে?

আছে।

সে কি আসনপিঁড়ি হয়ে বসে?

বসে।

হাত দিয়ে খায়?

খায়। তুমি নবদ্বীপ থেকে নিম্ববৃক্ষ নিয়ে এস। বললেন প্রভু, তা দিয়ে আমাদের দু-ভাইয়ের বিগ্রহ তৈরি করো। তোমার অভিলাষ নিশ্চয়ই পূর্ণ করব।

গৌরীদাস চোখের জল মুছল। লোক পাঠিয়ে নবদ্বীপ থেকে নিমগাছ আনাল। তৈরি করাল দারুবিগ্রহ। এক বিগ্রহে নিত্যানন্দ, আরেক বিগ্রহে গৌরহরি।

অদ্বৈতের আদেশে তার ছেলে অচ্যুতানন্দ দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে অভিষেক করে দুই বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করল।

এই প্রথম নিতাই-গৌর বিগ্রহ। গৌরীদাসই এই বিগ্রহের সেবাপূজার প্রথম প্রবর্তক।

প্রভু বললেন, তবে এবার আমাদের চারজনকে খেতে দাও।

চারজন?

হ্যাঁ, আমরা দু-ভাই আর ঐ দুই বিগ্রহ। চারজনের জায়গা করো।

ঐ দুই বিগ্রহও খাবে?

নিশ্চয়। নইলে তুমি বিশ্বাস করবে কেন?

পরম আনন্দে প্রচুর রান্না করল গৌরীদাস।

চারখানা আসন পাতল। প্রভু আর নিত্যানন্দ ও তাঁদের দুই বিগ্রহ একসঙ্গে বসে আহার করলেন।

কে বিগ্রহ আর কে স্বরূপ কোনো তারতম্য নেই।

প্রভু বললেন, এদের মধ্যে দুজন অম্বিকায় থাকলেন আর দুজন চললেন নীলাচলে। তোমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হল। আমরাই থাকলাম তোমার কাছে।

একদিন গৌরীদাস গদাধরপণ্ডিতের কাছে এসে উপস্থিত হল

বলো তোমাকে কী দিয়ে তুষ্ট করি ? গদাধর খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল।

গৌরীদাস বললে, তোমার শিষ্য হৃদয়ানন্দকে দাও।

হৃদয়কে ডাকল গদাধর, বললে, আজ থেকে তুমি গৌরীদাসের হয়ে গেলে।

গদাধর গৌরীদাসের হাতে হৃদয়কে সমর্পণ করে দিল আর গৌরীদাস হৃদয়কে সমর্পণ করে দিল নিত্যানন্দ-চৈতন্যের যুগল-বিগ্রহের চরণে।

হৃদয়কে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাল গৌরীদাস, দিল মন্ত্রদীক্ষা। এবার তবে বিগ্রহসেবায় আত্মনিয়োগ করো।

প্রভুর জন্ম-উৎসবের দিন কাছিয়ে এসেছে, গৌরীদাস হৃদয়কে বললে, আমি সামগ্রী-সংগ্রহের জন্যে শিষ্যবাড়ি যাচ্ছি, তুমি সাবধান হয়ে বিগ্রহের সেবা কোরো।

গৌরীদাস সেই যে গেল আর ফেরবার নাম নেই। হৃদয় উদ্বিগ্ন হল। উৎসবের আর দুদিন বাকি, তবু গৌরীদাস অনুপস্থিত। এদিকে এখানেও বহু সামগ্রী এসে জমেছে। গৌরীদাসের জন্যে আর অপেক্ষা করা চলে না। হৃদয় নিজেই আয়োজনে প্রবৃত্ত হল ও নিজেই চতুর্দিকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল।

ঠিক তার পরদিনই ফিরল গৌরীদাস। হৃদয়ের আচরণে মনে মনে খুশি হলেও বাইরে ক্রোধ দেখিয়ে গৌরীদাস বললে, আমি থাকতে তোমার এই স্বতন্ত্রাচরণ কেন ? যাকে-তাকে যেখানে-সেখানে নিমন্ত্রণ করে পাঠালে ?

হৃদয়ের অভিমান হল। মনের দুঃখে গঙ্গাতীরে এক গাছের নিচে বসে কাঁদতে লাগল।

নিজেই উৎসব আরম্ভ করল গৌরীদাস। কিন্তু মন্দিরে বিগ্রহ কই ? বিগ্রহের সিংহাসন যে শূন্য !

নিশ্চয়ই হৃদয়ানন্দের কাণ্ড। গৌরীদাস একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে চলল গঙ্গাতীরে।

কিন্তু গিয়ে দেখল অভাবনীয় ব্যাপার। হৃদয় নাচছে, সঙ্গে দুই বিগ্রহও নাচছে।

হাতে-লাঠি ক্রুদ্ধ গৌরীদাসকে দেখে দুই বিগ্রহ যেন ভয় পেয়েই পালিয়ে গেল, আবার মন্দিরে ঢুকে চুপিচুপি সিংহাসন অধিকার করলে।

গৌরীদাসের হাতের লাঠি খসে পড়ল আচমকা। সে আরো দেখল। দেখল চৈতন্যচন্দ্র হৃদয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন।

গৌরীদাস দু-বাহু বাড়িয়ে হৃদয়ানন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বললে, আজ থেকে তোমার নাম হৃদয়চৈতন্য।

গৌরীদাসের উদ্দণ্ডা ভক্তি। দণ্ড দেখে দুর্জন যেমন দূরে পালায় তেমনি গৌরীদাসের ভক্তি দেখে দূরে পালায় ভগবৎবিমুখতা।

'কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি।' সেই কৃষ্ণপ্রেমেই গৌরীদাস তার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী বসুধা আর জাহ্নবীকে নিত্যানন্দের হাতে সমর্পণ করে দিল। 'নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি।' সামাজিক উৎপীড়নকে ভয় করল না। বরং সেই উদ্দণ্ডা ভক্তির কাছে সমাজ-বিচারই নত হল।

॥ ৩০ ॥

সারঙ্গ ঠাকুর

নবদ্বীপের কাছাকাছি জান্নগড় গ্রামে সারঙ্গ ঠাকুরের বাড়ি।

অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন, তবু কী করে খবর পেয়ে গৌরাঙ্গের চরণে আত্ম-সমর্পণ করেছেন।

সংসার-উদাসীন কৃষ্ণপ্রেমবিভোর বিষয়বিতৃষ্ণ সারঙ্গদেব।

তোমার গোপীনাথের সেবাপূজা কে করে? একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন গৌরহরি।

কে আর করবে। আমিই করি।

তুমি তো এখন বুড়ো হয়েছ, তোমার একজন শিষ্য নেওয়া উচিত।

না, শিষ্যে আমার দরকার নেই।

কিন্তু শিষ্য না নিলে সেবাপূজায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তুমি সব সময়ে সক্ষম ও মনোযোগী নাও থাকতে পারো। না, তোমার একজন শিষ্যের দরকার।

তেমন সৎশিষ্য পাব কোথায়? শেষকালে না বিপরীত ফল হয়। গোপীনাথ আছেন আর আমি আছি, আমাদের এই ভালো।

না, আমি বলছি, তুমি একজন শিষ্য নাও।

তুমি বলছ?

হ্যাঁ, আমি বলছি।

তাহলে কাল প্রভাতে উঠে যাকে প্রথম দেখব তাকেই শিষ্য করে নেব। সারঙ্গঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলে ফেললেন।

ঠিক বলেছেন! প্রভুর যখন এমন জেদ তখন তাই হবে। বাছাবাছি করতে পারব না। যাকে প্রথম দেখব তাকেই মন্ত্র দেব।

সারা রাত ঘুম হল না সারঙ্গ ঠাকুরের। প্রভাতে উঠে কাকে না জানি প্রথম দেখেন! কী না জানি অদৃষ্টে আছে!

রাত্রি প্রভাত হল। যথারীতি গঙ্গাস্নান করলেন ঠাকুর। তীরে বসে মালা জপ করতে লাগলেন।

হঠাৎ দেখলেন কী একটা জিনিস স্রোতে ভাসতে ভাসতে তাঁর কাছে এগিয়ে আসছে।

একেবারে যে তাঁর কোলের কাছটিতে এসে ঠেকল! দেখে চমকে উঠলেন সারঙ্গদেব। এ কী, এ যে মৃতদেহ!

একটি অনিন্দ্যকান্তি কিশোরের মৃতদেহ! আহা, কার ছেলে রে, এমন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে!

সারঙ্গ ঠাকুর লক্ষ্য করে দেখলেন ছেলেটি ব্রাহ্মণকুমার, মাথা সদ্যমুণ্ডিত, গলায় নতুন উপবীত, পরনে পট্টবস্ত্র। বুঝলেন ছেলেটির সদ্য পৈতে হয়েছে, কিন্তু কীভাবে তার প্রাণ গেল আর কী প্রাণে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হল ভেবে পেলেন না।

আহা রে! কার রে ছেলেটি! বৃদ্ধ সারঙ্গদেবের হৃদয়ে বাৎসল্য জেগে উঠল।

মনে পড়ল প্রতিজ্ঞার কথা। প্রভাতে উঠে যাকে দেখব তাকেই মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করে নেব। প্রভাতে উঠে এই কিশোরকেই তো প্রথম দেখলাম।

কিন্তু এ যে মৃত, একে মন্ত্র দেব কী!

কিন্তু প্রভুর কাছে তো জীবিত-মৃতের কোনো দ্বন্দ্ব রেখে আসিনি, যাকে প্রথম দেখব তাকেই শিষ্য করে নেব। তবে আর কথা নেই, দ্বিধা নেই, এই কিশোরের কানেই মন্ত্র দেব। অক্ষরে অক্ষরে প্রতিজ্ঞা রাখব। এই প্রতিজ্ঞাই তো প্রভুর প্রত্যাদেশ।

নুয়ে পড়ে কিশোরের কানে মন্ত্র দিলেন সারঙ্গদেব।

আশ্চর্যের আশ্চর্য, মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হল। ধীরে ধীরে চোখ মেলল

কিশোর। সারঙ্গদেবের গায়ে ভর রেখে ধীরে ধীরে উঠে বসল।

ঘাটে তখন স্নানার্থীদের ভিড় লেগে গিয়েছে। চোখের উপর এ দৃশ্য দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দিকে দিকে আপনা থেকেই জাগল হরিধ্বনি।

ছেলেটিকে কোলে করে সারঙ্গদেব তাঁর বাড়িতে এলেন।

ওদিকে প্রত্যূষে কীর্তন করতে করতে প্রভু বললেন, চলো সারঙ্গের নতুন শিষ্য দেখে আসি।

প্রভুকে দেখে সারঙ্গ ঠাকুর তাঁর পায়ে পড়লেন।

কি, শিষ্য পেয়েছ? জিজ্ঞেস করলেন প্রভু। কেমন শিষ্য? সৎশিষ্য বলে মনে হয়?

জলে-পাওয়া ছেলেটিকে প্রভুর চরণে এনে রাখলেন সারঙ্গ। বললেন, একে আপনি আশীর্বাদ করুন।

তুমি কে? কী করে এখানে এলে? যা তুমি জানো বলো। সকলে তোমার কথা জানবার জন্যে উৎসুক হয়েছেন।

বালক তখন সকলকে প্রণাম করে বললে, আমার নাম মুরারি, সরডাঙা গ্রামে আমার বাড়ি, গোস্বামী বংশে আমার জন্ম। সম্প্রতি আমার পৈতে হয়েছে, তাই আমার মাথা কামানো। রাতে আমাকে সাপে কামড়ায়। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। মনে হয় লোকেরা আমাকে মৃত ভেবে গ্রামের খড়ি নদীতে ফেলে দেয়। সাপে-কাটা মড়াকে না পুড়িয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়াই বুঝি নিয়ম। আমিও তেমনি ভেসে পড়ি। ভাসতে ভাসতে গঙ্গায় এসে পড়ি, তারপর এই আশ্রম।

তোমার তো মা-বাবা আছেন? প্রভু প্রশ্ন করলেন।

আছেন।

তাঁরা নিশ্চয়ই তোমার জন্যে শোক করছেন, তুমিও নিশ্চয় তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হয়েছ। চলো তোমাকে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিই।

না, আমি আমার এই গুরুর চরণ ছেড়ে কোথাও যাব না। বালক সারঙ্গদেবের পা চেপে ধরল।

আনন্দে কাঁদতে লাগলেন সারঙ্গদেব।

খবর পেয়ে সরডাঙা থেকে মুরারির বাপ-মা ছেলেকে দেখতে জান্নগড়ে চলে এল। সঙ্গে অনেক গ্রামবাসী। সকলে সারঙ্গের থেকে দীক্ষা নিলে। কিন্তু মুরারিকে ফিরিয়ে নিতে পারল না।

মুরারি জান্নগড়ের শ্রীপাটেই থেকে গেল। উদাসীন ব্রত নিয়ে গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবায় জীবন দিল।

॥ ৩১ ॥

বনমালী আচার্য

নিমাইয়ের প্রথম বিয়ের ঘটক এই বনমালী।

নবদ্বীপের বল্লভ আচার্যের মেয়ে লক্ষ্মী গঙ্গাস্নানে এসেছে, হঠাৎ নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

পরস্পর যেন পরস্পরকে চিনতে পারল নিমেষে।

সেই দিনই শচীদেবীর কাছে বনমালী ঘটক এসে হাজির।

ছেলের বিয়ে দেবে তো একটি ভালো পাত্রী আছে। বললে বনমালী, বল্লভ আচার্যের মেয়ে। কুলে শীলে সদাচারে বল্লভ সমাজের শিরোমণি আর তার মেয়ে লক্ষ্মী নামেও যেমন লক্ষ্মী তেমনি রূপেগুণেও লক্ষ্মী।

শচীদেবী বললেন, আমার বালক পিতৃহীন, আগে বাঁচুক, বড়ো হোক, তারপর বিয়ে।

কিন্তু এমন মেয়ে আর তুমি পাবে না নবদ্বীপে।

না, নিমাই লেখাপড়া করছে, তাই করুক।

বনমালী ফিরে যাচ্ছে পথে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

নিমাই জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলে?

তোমাদের বাড়িতে। তোমার মায়ের কাছে।

কেন?

তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে।

তা মা কী বললেন?

কথা কানেই তুললেন না। ফিরিয়ে দিলেন।

নিমাই বাড়ি এসে মাকে জিজ্ঞেস করলে, মা, বনমালী আচার্যকে ফিরিয়ে দিলে কেন?

শচীদেবী চমকে উঠলেন, নিমাই তবে কী বলতে চায়? এ তবে কিসের

ইঙ্গিত? বনমালীকে ডাকালেন শচীদেবী। বললেন, তোমাকে বৃথাই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তোমার প্রস্তাবে আমার সম্মতি আছে। তুমি বল্লভ আচার্যকে খবর দাও।

খবর শুনে বল্লভ লাফিয়ে উঠল।

বলো কী? পরমপণ্ডিত সর্বগুণসাগর বিশ্বম্ভর আমার জামাই হবে? কিন্তু বনমালী, আমি যে নির্ধন, আমি পাঁচটি হরিতকীর বেশি দিতে পারব না।

লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন হবে, তাই যথেষ্ট।

শুভদিনে গোধূলিলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর নিমাই গেল প্রবাসে, পদ্মাপারে, পূর্ববঙ্গে। কয়েক মাস পরে যখন প্রবাস থেকে ফিরল, দেখল বাড়ি-ঘর কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, কোথাও আনন্দের চিহ্ন নেই।

এ কি, মা কাঁদছেন!

কী হয়েছে, কাঁদছ কেন?

ঘর লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মী চলে গিয়েছে বৈকুণ্ঠে।

কী হয়েছিল?

সাপে কেটেছিল। কত ওঝা-বদ্যি ডাকলাম, কত ঝাড়ফুঁক, কত মন্ত্রতন্ত্র, কিছুতেই কোনো প্রতিকার হল না।

নিমাইয়ের দু চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল।

কিন্তু এখুনি এই আঘাতে তো সে সন্ন্যাস নেবে না। সে সন্ন্যাস নেবে জীবনের এক আনন্দিত মুহূর্তে। সে তো কেঁদে যাবে না, সে কাঁদিয়ে যাবে। না কাঁদালে লোকে তার হরিনাম নেবে কেন?

নিমাই মাকে সান্ত্বনা দিল: কে কার পতি? কে কার পুত্র? সমস্ত সংযোগ-বিয়োগ ঈশ্বর-ইচ্ছায়।

বনমালী আচার্য তো নিমিত্তমাত্র। ঈশ্বর-ইচ্ছায় সে শুধু সম্বন্ধ করে দিয়েছে।

সমস্তই প্রভুর ইচ্ছায়। প্রভুই তো সেই নন্দগোপালের ধেনুর রাখাল। সেই তো গোপবেশ বেণুকর শ্রীকৃষ্ণ।

আমি যে একদিন তাঁকে বলরামের আবেশে দেখলাম। বললে বনমালী, দেখলাম তাঁর হাতে সোনার লাঙল।

॥ ৩২ ॥

জগদীশ পণ্ডিত

জগদীশের বাপের নাম কমলাক্ষ, মায়ের নাম ভাগ্যবতী।

বাবা-মা মারা যাবার পর জগদীশ তার স্ত্রী দুখিনীকে নিয়ে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির কাছাকাছি এসে বাসা বাঁধে। তার আরেক প্রতিবেশী হিরণ্য-ভাগবত। হিরণ্যের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা।

গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের আগে থেকেই নবদ্বীপে এদের অবস্থিতি। অদ্বৈতের সভায় গিয়ে এরা বসে, শোনে কৃষ্ণকথা। বিষয়ী সংসারীদের বহির্মুখিতা দেখে মনে মনে পীড়িত হয়। প্রতিকারের উপায় কোথায়, তার প্রতীক্ষা করে।

এদিকে গৌরাঙ্গ-গোপালের হাতেখড়ি হল। দেখা মাত্রই সমস্ত অক্ষর লিখতে শিখল। দু-তিন দিনেই শিখে ফেলল রেফ-ফলা, সংযুক্তবর্ণ। আর নিরন্তর লিখতে লাগল কৃষ্ণনাম। রাম কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী। কেশব মাধব গোপাল গোবিন্দ বাসুদেব।

যা হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে না তারই জন্যে কান্না ধরে। আকাশে পাখি উড়ে যাচ্ছে তাই তাকে ধরে দাও। আকাশে ছড়ানো-ছিটানো এত-এত তারা, তাকে দাও না একমুঠো। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে হাত পা ছোঁড়ে নিমাই। এ কোলে নেয়, ও কোলে নেয়, তবু নিমাই ক্ষান্ত হয় না। দাও না পাখি ধরে, দাও না চাঁদ পেড়ে।

বাবা নিমাই, হরিনাম শুনবি ?

শুনব। নিমাই তখুনি শান্ত হয়।

তখন সবাই হাতে তালি দিয়ে হরিনাম করে। নিমাই স্নিগ্ধ চোখে হাসে।

জগন্নাথের গৃহ যে কৃষ্ণনিকেতন হয়ে উঠল। ক্ষণে-ক্ষণে নিমাই আবদার ধরে কাঁদে, আবার ক্ষণেকেই হরিনাম শুনে স্থির হয়।

কিন্তু সেদিনের কান্না আর কিছুতেই থামছে না নিমাইয়ের। হরিনামেও ফল হচ্ছে না। বল কী চাই, তাই এনে দেব।

নিমাই কিছুই বলছে না, কেবল কাঁদছে।

তবে কি নিমাইয়ের কোনো অসুখ করেছে ?

হ্যাঁ, কঠিন অসুখ। যদি আমাকে বাঁচাতে চাও তবে শিগগীর জগদীশ আর হিরণ্য-ভাগবতের বাড়ি যাও।

সেখানে কী ?

সেখানে কী ! আজ একাদশী না ? আজ একাদশীর দিনে জগদীশ আর হিরণ্য নানা উপাচারে বিষ্ণুর নৈবেদ্য করেছে। সে নৈবেদ্য যদি খেতে পাই তবেই সুস্থ হই। যাও সেই নৈবেদ্য আমাকে এনে দাও।

এ শিশু বলে কী ! চুপ কর বাপু, তাই দেব। কিন্তু জগদীশ আর হিরণ্য কি সত্যি বিষ্ণুর নৈবেদ্য করেছে ? আজ কি সত্যিই একাদশী ?

জগদীশ আর হিরণ্য, দুই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, এ অদ্ভুত কাহিনী শুনে চরিতার্থ হয়ে গেল। আজ যে হরিবাসর তা এই শিশু জানল কী করে ? আর আমাদের দুজনের বাড়িতেই যে বহুতর বিষ্ণুনৈবেদ্য করেছি তাই বা ওকে বললে কে ? সন্দেহ নেই, এই পরমসুন্দর শিশুর দেহেই গোপাল অধিষ্ঠিত আছেন, সেই গোপালই চাচ্ছেন নৈবেদ্য।

জগদীশ আর হিরণ্য দুজনেই প্রভূত নৈবেদ্য নিয়ে জগন্নাথের গৃহে এল। বললে, বাপ, খাও। তুমি খেলেই আমার কৃষ্ণের খাওয়া হবে।

অল্প-অল্প তুলে-তুলে খেল নিমাই। সকলকে বিতরণ করল। কিছু আবার খেলাচ্ছলে কারু গায়ে ছুঁড়ে মারল। কিছু বা ছিটিয়ে দিল মাটিতে। কেউ নালিশ করতে পেল না যে নিমাই কিছু অনাচার করছে। সে ইচ্ছে মতো নেবে, ইচ্ছে মতো বিলোবে, ইচ্ছে মতো ফেলে দেবে।

জগদীশ ক্রমে-ক্রমে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় যুক্ত হল। তাকে দেখা গেল প্রভুর নৈশকীর্তনে, কাজী-দলনের সন্ধ্যায়। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হচ্ছেন শুনে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল জগদীশ। প্রভু বললেন, দুঃখ কিসের ? তুমিও নীলাচলে যাবে আমাকে দেখতে।

প্রভুর সন্ন্যাসের পর জগদীশ নবদ্বীপ ছেড়ে দিয়ে যশড়ায় চলে গেল ছোট ভাই মহেশ আর স্ত্রী দুখিনীকে নিয়ে। প্রভু যখন শান্তিপুরে ফিরে এলেন, গেলেন যশড়া। মাতা দুখিনীর হাত থেকে খাবার চেয়ে নিয়ে খেলেন।

সেই ছেলেবেলার মত। কত দিন দুখিনী সংসারের কাজে ব্যস্ত আছে, নিমাই এসে খাবার চেয়েছে। হাঁটু গেড়ে বসেছে হাত পেতে।

বাল-গৌর-বিগ্রহ নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করল জগদীশ। কর্মরতা মাতা দুখিনীর সামনে যেমন বসত হাঁটু গেড়ে, বিগ্রহেরও সেই ভঙ্গি।

জগদীশ নীলাচলে গেল প্রভুকে দেখতে। প্রভু তাকে নিত্যানন্দের সঙ্গী করে গৌড়ে পাঠিয়ে দিলেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

নবদ্বীপে প্রভু যখন তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করলেন, হঠাৎ কেঁদে উঠলেন, পুণ্ডরীক, আমার বাপ, আমার বন্ধু, কবে আমি তোমাকে দেখব?

সবাই ভাবল প্রভু বুঝি পুণ্ডরীক বলতে পুণ্ডরীকাক্ষকে বোঝাচ্ছেন। এ কান্না তাঁর কৃষ্ণের জন্যেই কান্না।

কিন্তু আবার বিদ্যানিধি বলে কাঁদছেন। ও আমার বিদ্যানিধি, তুমি কবে আসবে, কবে দেখা দেবে?

তখন সবাই ভাবল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বোধ হয় কোনো ভক্তের নাম। কিন্তু তাকে এ তল্লাটে তো কই দেখিনি। কোনোদিন নামও শুনিনি। লোকটার বাড়ি কোথায়? করে কী?

প্রভু বললেন, তোমরা তার কথা জানতে চাইছ এও তোমাদের ভাগ্য। তার বাড়ি চট্টগ্রাম। সে বিষয়ীর মত থাকে, কিন্তু সে যে কত বড় বৈষ্ণব কেউ বুঝতে পারে না।

নবদ্বীপেও তার বাড়ি আছে। মাঝে মাঝে সে এখানে এসে থাকে। অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর হলেও বাইরে থেকে কাউকে চিনতে দেয় না। বিলাসীর ছদ্মবেশ পরে ঘুরে বেড়ায়।

মাধবেন্দ্র পুরীর মন্ত্রশিষ্য পুণ্ডরীক।

গঙ্গার প্রতি তার অচঞ্চল ভক্তি। অভিনব মনোভাব। গঙ্গায় পা লাগবে বলে গঙ্গাস্নান করে না। গঙ্গার জলে লোকে কুলকুচো করে দাঁত মেজে চুল ঝাড়ে বলে দিনের বেলায় সে গঙ্গা দেখে না পর্যন্ত। গঙ্গা দেখতে যায় রাত্রে, যখন ওসব অনাচারের সম্ভাবনা নেই। তখনই গঙ্গাজল আহরণ করে। আর এমন বিচিত্র বিশ্বাস, দেবার্চনা করার আগে সে গঙ্গাজল পান করে নেয়।

পুণ্ডরীক, বাপ, তুমি কবে আসবে? প্রভু আবার রব তুললেন।

ঈশ্বর-আকর্ষণে পুণ্ডরীক নবদ্বীপে চলে এল। এসে থাকতে লাগল সেই গুপ্তভাবে, সেই বিষয়-বিলাসীর ভূমিকায়। শুধু মুকুন্দ দত্ত জানল। সেই গদাধর পণ্ডিতকে খবর দিল, যদি অদ্ভুততম বৈষ্ণব দেখতে চাও, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে দেখে এস।

গদাধর-বিজয়ের পর পুণ্ডরীক রাত্রে একা-একা প্রভুর গৃহে চলে এল।

প্রভুকে দেখেই প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। দণ্ডবৎ করবারও অবকাশ পেল না। ক্ষণকাল পরে চেতনা ফিরে পেয়েই হুঙ্কার করে উঠল: কৃষ্ণ, আমার প্রাণ, অপরাধীকে আর কত কষ্ট দেবে? সমস্ত জগৎকে যে উদ্ধার করল সে শুধু আমাকে, একমাত্র আমাকেই বঞ্চিত করল কেন?

প্রভু তাকে কোলে টেনে নিলেন। বললেন, পুণ্ডরীক, বাপ, তোমাকে আজ দেখলাম। আমার দু-নয়ন আজ তৃপ্ত হল।

তখন সকলে বুঝল এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, এই প্রভুর প্রিয়তম। সকলের মনে তখন জাগল প্রিয়ত্ববোধ।

কিন্তু পুণ্ডরীক যে তার বক্ষ থেকে ঈশ্বরকে ছাড়ে না।

প্রভু বললেন, আজ আমার জীবনের শুভদিন। তাই তো প্রেমনিধির সাক্ষাৎ পেলাম। তোমরা একে চিনে রাখো। প্রেমভক্তি বিলোবার জন্যেই ঈশ্বর একে সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যায় কী হবে যদি প্রেম না জাগে! তাই এর আসল পদবী বিদ্যানিধি নয়, প্রেমনিধি।

এতক্ষণে বুঝি পুণ্ডরীকের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়েই প্রণাম করল প্রভুকে। পরে অদ্বৈতকে। পরে আর সকলকে।

গদাধর বললে, আমি এই মহাত্মার কাছ থেকে মন্ত্র নেব। আমি এঁর অগম্য ব্যবহার বুঝতে পারিনি, তাই আমার চিত্তে প্রথমে অবজ্ঞা এসেছিল। আমি যদি এঁর শিষ্য হই তবেই আমার অপরাধের ক্ষমা হবে।

প্রভু বললেন, এক্ষুনি নাও, দেরি কোরো না।

সেই থেকে পুণ্ডরীক গৌরাঙ্গলীলার সহচর। আছে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্তনে, জগাই-মাধাই-উদ্ধারের প্রসাদ-লীলায়।

প্রভু যখন জগাই-মাধাইকে তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে দরজা দিলেন তখন উপস্থিত বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে পুণ্ডরীক একজন। দুই দস্যু দুই মহাভাগবতে পরিণত হল, তার সাক্ষাৎদ্রষ্টাও পুণ্ডরীক।

তারপর যখন গঙ্গাস্নানের মহোৎসব হল, আনন্দ-আবেশে প্রভু-ভৃত্যের বুদ্ধি দূরে গেল, চারদিকে শুধু প্রীতি আর সখ্যের রঙ্গরস, সেই জলযুদ্ধে বিদ্যানিধিও একজন মহোৎসাহী।

তারপর শ্রীক্ষেত্রে নীলাচললীলায়ও যুক্ত হল পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীককে দেখলেই প্রভু বাপ-বাপ বলে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। প্রভু তো রাধাভাবাবিষ্ট আর রাধিকার বাপই তো রীকরূপ পুণ্ডরীক বৃষভানু। লোকে বলে, তারই জন্যে

প্রভু পুণ্ডরীককে বাপ বলে ডাকেন। তারই জন্যে পুণ্ডরীকের বাড়িতে রাধিকার জন্মোৎসব করান।

আজু কি আনন্দ বিদ্যানিধি ঘরে
রাধিকা-জনম-চরিত-গানে।
নাচে সে আবেশে শচীসুত গোরা
সে নবভঙ্গি কি উপমা আনে॥
বিবিধ মঙ্গল করে নারীকুল
পুলকিত চিত উ-লু-লু দিয়া।
বৃষভানু পুরসম শোভা ভণে
ঘনশ্যাম সুখে উথলে হিয়া॥

সেবার নীলাদ্রিতেই আছে বিদ্যানিধি, বন্ধু স্বরূপ দামোদরের ঘরে আশ্রয় নিয়ে, কৃষ্ণকথায় দিন কাটাচ্ছে। ওড়নষষ্ঠীতে জগন্নাথকে দেখতে গিয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীই ওড়নষষ্ঠী। সেদিন জগন্নাথকে নতুন শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। কিন্তু এ কী, পাণ্ডারা যে জগন্নাথকে 'মাড়ুয়া বসন' দিচ্ছে। মাড়ুয়া বসন মানে মাড়যুক্ত বসন, কোরা কাপড়। দেখে বিদ্যানিধির মন অপ্রসন্ন হয়ে গেল। ছি-ছি, পাণ্ডারা কি আচার জানে না? জগন্নাথকে আধোয়া কোরা কাপড় দেয় কেন?

রাত্রে ঘুমুচ্ছে পুণ্ডরীক, স্বপ্ন দেখল জগন্নাথ ও বলরাম তার কাছে এসেছে—দুজনেই খুব ক্রুদ্ধ। কী, 'মাড়ুয়া বসন'কে অপবিত্র মনে করো? আমার সেবকদের প্রতি তোমার ঘৃণা? বলে দু-ভাই, বলরাম আর জগন্নাথ, পুণ্ডরীকের দু-গালে সজোরে চড় মারতে লাগল। আমাদের পরিধানবস্ত্রের তুমি নিন্দা করো? এখনো তোমার দোষদৃষ্টি?

স্বপ্নে বিদ্যানিধি কেঁদে উঠল। শ্রীচরণে মাথা রেখে বললে, প্রভু, পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করো।

প্রভাতে স্বরূপ-দামোদর ডাকতে এল। ওঠো, চলো, জগন্নাথদর্শনে যাই।

কিন্তু বিদ্যানিধির মুখের চেহারা দেখে স্বরূপ-দামোদর স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কী, বিদ্যানিধির দুই গালই যে ফুলে আছে, দুই গালেই বিশাল চড়চিহ্ন।

এ কী, তোমাকে মারল কে?

বিদ্যানিধির চোখে জল মুখে হাসি। বললে, কাল রাত্রে কানাই-বলাই দুভাইএসে মেরে গেছে। আমার কী ভাগ্য, ওদের শ্রীহস্তের স্পর্শ পেয়েছি।

ভাই, বলো, এ কী শাস্তি, না, প্রসাদ ?

বন্ধুকে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে বিদ্যানিধি।

বন্ধুর সৌভাগ্যে স্বরূপ-দামোদরের উল্লাস হল। 'সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।' বললে, ভাই, এমন অদ্ভুত দণ্ডের কথা শুনিনি। স্বপ্নে এসে স্বহস্তে শাসন করে যায় ? শুনব কী, এ যে স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

॥ ৩৪ ॥

তপন মিশ্র

আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে, পদ্মাতীরের কোনো অখ্যাত গ্রামে। বিষ্ণুভক্ত কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সাধ্য-সাধনতত্ত্বের নির্ণয় করতে পারছে না। যা পাবার জন্যে লোকে ভজনা করে তার নাম সাধ্য আর সাধ্যবস্তুকে পাবার জন্যে যে অনুষ্ঠান বা আচরণ তার নাম সাধন। কিন্তু কে সাধ্য ? কী সাধন ?

পূর্ববঙ্গে বেড়াতে এসে নিমাই তপন মিশ্রের গ্রামে এসে উঠেছে।

রাত্রিশেষে তপন স্বপ্ন দেখল, এক দেবতা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে, তোমার গ্রামে নিমাই পণ্ডিত এসেছে, তার কাছে যাও, সে তোমাকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব বুঝিয়ে দেবে। জানবে সে মানুষ নয়, নররূপে সাক্ষাৎ ভগবান। কিন্তু এই শেষের সংবাদটুকু কিন্তু আগেই কোথাও প্রকাশ করে দিও না।

খুঁজতে খুঁজতে নিমাই পণ্ডিতের সন্ধান পেল তপন। দেখামাত্রই পড়ল দণ্ডবৎ হয়ে।

তুমি কে ?

আমি তপন মিশ্র।

কী চাই ?

সাধ্যসাধন বুঝতে চাই। বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে পথহারার মত হয়ে পড়েছি। আপনার কাছে তাই এসেছি আশ্রয়ের জন্যে।

আমি সাধ্যসাধনের কী জানি ?

আপনি জানেন না তো কে জানে ? আপনি সাক্ষাৎ ভগবান।

এসব কথা বলবে না। জীবে ভগবৎবুদ্ধি মহাপাপ।

ওসব শুনছি না। তপন উদ্বেল হয়ে উঠল : তুমি যদি গোবিন্দ না হবে, মাধব না হবে, তবে এই অখ্যাত দেশে আসবে কেন ? কেন দেখা দেবে এই অকিঞ্চনকে ?

তোমার কী ভাগ্য, তোমার কৃষ্ণভজনে মতি হয়েছে।

কৃষ্ণভজন ? তপন থমকে গেল।

হ্যাঁ, কৃষ্ণই সাধ্য, ভজনই সাধনা।

এ ভজন হবে কী করে ?

শুধু হরিনামে। কলির যুগধর্মই হরিনাম-সংকীর্তন। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
সাধ্যসাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্তনে মিলিবে সকল॥

কিন্তু নাম যে করব, মনের মধ্যে যে অনেক মল অনেক কুটিলতা।

তার প্রতিকারও নামেই। নাম করতে করতেই মন স্থির হবে স্বচ্ছ হবে স্বাদু হবে। পিত্ত বেশি হলে মিছরিও তেতো লাগে, ঐ তিক্ততার ওষুধও সেই মিছরিই। তেমনি নামে চিত্ত শুদ্ধ হবে, পরে জাগবে কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য। তখন বুঝবে কোন্ সাধ্যের জন্যে কী সাধন। কৃষ্ণপ্রেমের জন্যেই কৃষ্ণকীর্তন।

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে॥

তপন বললে, আমাকে আপনার সঙ্গে নবদ্বীপে নিয়ে চলুন।

না, নবদ্বীপে নয়, তুমি কাশী যাও।

কাশী ? তোমাকে ছেড়ে কাশী ?

হ্যাঁ, সেখানেই যথাসময়ে আমি তোমার সঙ্গে মিলব। কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করতে হবে।

তপন মিশ্র সপরিবারে কাশী চলে গেল।

ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাবার সময় কাশী এলেন প্রভু, মিললেন তপনের সঙ্গে। ফেরবার সময়ও তাই। প্রতিবারেই তপনের ঘরে ভিক্ষানির্বাহ করলেন। তপনের ছেলে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ

করল। এই রঘুনাথকেই প্রভু উপদেশ করলেন, পিতা-মাতার সেবা করবে, বৈষ্ণবের কাছে ভাগবত পড়বে আর বিয়ে করবে না।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের চৈতন্যনিন্দা সহ্য করতে না পেরে তপন আর চন্দ্রশেখর বৈদ্য প্রভুকে নির্বন্ধ করতে লাগল, এর একটা বিহিত করুন।

সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জন্যে প্রভুর কৃপা উদ্বুদ্ধ হল। গর্ব না চূর্ণ হলে তো কৃপা বর্ষিত হয় না। তাই সন্ন্যাসীদের গর্ব আগে খর্ব করলেন প্রভু, তারপরে ঢাললেন তাঁর করুণা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তপন মিশ্র।

॥ ৩৫ ॥

সদাশিব কবিরাজ

বৈদ্যবংশে জন্ম, বাপের নাম কংসারি সেন। সদাশিবেরই ছেলে পুরুষোত্তমদাস। পুরুষোত্তমদাসের ছেলে কানু ঠাকুর।

এরা তিন পুরুষের গৌরপার্ষদ।

এ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

গৌরাঙ্গ গয়া থেকে ফিরলে তাকে সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল। সে বিদ্যোদ্ধত নিমাই কেমন সুনম্র হয়ে গিয়েছে।

আপনাদের আশীর্বাদে গয়া থেকে এলাম। বলছে আর কাঁদছে নিমাই।

বয়োজ্যেষ্ঠেরা তার বুকে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করল। শীতলানন্দ গোবিন্দ প্রসন্ন হোন।

কিন্তু, যাই বলো, নিমাই এত কাঁদছে কেন? তার বন্ধুরা ভেবে আকুল হল। এমন তো কই তাকে দেখিনি কখনো। গয়ায় সে কী দেখে এল? কী নিয়ে এল সেখান থেকে? কৃষ্ণ কৃপা করলে এমনি কাঁদতে হয় নাকি দিন-রাত?

শ্রীমান পণ্ডিতকে নিমাই বললে, তোমরা আজ বাড়ি যাও। কাল তুমি আর সদাশিব শুক্লাম্বরের বাড়ি যেয়ো, মুরারিকেও সঙ্গে নিয়ো। সেখানে নির্জনে আমি তোমাদেরকে বলব আমার দুঃখের কথা।

সদাশিব নবদ্বীপলীলায় একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী।

গৌরাঙ্গের সান্ধ্যকীর্তন আসরে সদাশিব, সদাশিব আবার জগাই-মাধাই-উদ্ধার-যাত্রায়। গঙ্গাস্নান-মহোৎসবেও শ্রীমান আর মুরারির পাশে সেই সদাশিব। চন্দ্রশেখরের বাড়িতে গোপিকা-নৃত্যের দিন যে দুজনের উপর সাজসজ্জার ভার তাদের একজন সদাশিব।

পানিহাটিতে রঘুনাথদাস যে দই-চিড়ের উৎসব করেছিল, গঙ্গাতীরে পুলিনভোজনের রঙ্গ, সেখানে মুরারি কমলাকরের সঙ্গে সদাশিব বসে।

তারপর চৈতন্যদর্শনের কামনায় যে ভক্তদল চলল নীলাচলে তার মধ্যেও সদাশিব অন্তর্ভুক্ত।

সদাশিবের একমাত্র ছেলে পুরুষোত্তমদাস। দ্বাদশ গোপালের একজন। কেউ কেউ বলে, নাগর পুরুষোত্তম। সাত বছর বয়স থেকেই কৃষ্ণের জন্যে উন্মাদ।

পুরুষোত্তম দেবকীনন্দের গুরু। দেবকীনন্দন কে? নবদ্বীপের সেই দুর্দান্ত বৈষ্ণবদ্বেষী ব্রাহ্মণ, চাপাল-গোপালই দেবকীনন্দন।

গোপাল ডাকনাম আর চাপাল বোধ হয় চপল বা বাচালের অপভ্রংশ। লোকটা যেমন উদ্ধত তেমনি কটুভাষী।

রাত্রে শ্রীবাসের অঙ্গনে নিত্য কীর্তন হয়, গোপালের তা অসহ্য লাগে। একদিন চুপিচুপি শ্রীবাসের সদর দরজার সামনে ভবানীপূজার উপকরণ সাজিয়ে রেখে দিল। কলার পাতায় করে জবাফুল হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন —সঙ্গে এক ভাঁড় মদ। সকালে যে এখান দিয়ে যাবে সে দেখবে আর দেখে সিদ্ধান্ত করবে এ নৈবেদ্য শ্রীবাসেরই সাজানো। নৈবেদ্যে কে মদ দেয়? যে মাতাল তারই ঐ নির্বাচন। সুতরাং সন্দেহ কী, শ্রীবাসই মাতাল। মাতাল কি একলা শ্রীবাস? যতগুলো লোক দ্বার রুদ্ধ করে সারারাত উদ্দণ্ড কীর্তন করে তারা সবাই মদোন্মত্ত।

সকালে উঠে দরজা খুলে শ্রীবাসই প্রথম এই ভবানী-নৈবেদ্য আবিষ্কার করল। শিষ্ট-সজ্জন সবাইকে ডেকে এনে দেখাল অঘটন!

দেখুন, আমার কাণ্ড দেখুন। রোজ রাত্রে আমি মদ দিয়ে ভবানীপূজো করি!

সবাই হাহাকার করে উঠল। এ কোন্ দুরাচারের কাজ! তার অদৃষ্টে না জানি কী নিদারুণ দুর্ভোগ আছে!

দেখতে-দেখতে, তিন দিনের মধ্যে গোপাল-চাপালের কুষ্ঠ হল।

ভক্তিবিদ্বেষের বিষ ব্যাধি হয়ে দেখা দিল সর্বাঙ্গে।

গঙ্গার ঘাটে গাছের নিচে বসে আছে গোপাল। প্রভু যাচ্ছেন পাশ দিয়ে, গোপাল বলে উঠল, গ্রাম সম্পর্কে আমি তোমার মামা, একবার আমার দিকে তাকাও।

প্রভু বিমুখ হয়ে রইলেন।

গোপাল বললে, কুষ্ঠের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না, আমাকে উদ্ধার করো।

প্রভু ক্রোধকণ্ঠে গর্জে উঠলেন, তুই ভক্তদ্বেষী, তোর ত্রাণ নেই। কুষ্ঠকীটের দংশনে তুই জন্ম-জন্ম কষ্ট পাবি। তোকে কে উদ্ধার করবে? পাষণ্ড সংহার করব বলেই তো আমি অবতীর্ণ হয়েছি। পাষণ্ডসংহার না হলে ভক্তির প্রতিষ্ঠা হবে কী করে?

প্রভু গঙ্গাস্নান করতে চলে গেলেন।

প্রাণ আর প্রাণান্তকর কষ্ট নিয়ে পড়ে রইল গোপাল।

তারপর সন্ন্যাস নিয়ে প্রভু চলে গেলেন নীলাচলে। সেখান থেকে যখন বৃন্দাবনের পথে গৌড়ে এলেন, জননী ও জাহ্নবীকে দেখবার জন্যে, তখন থামলেন কুলিয়ায়, নবদ্বীপের ওপারে। তখন কুষ্ঠী গোপাল এসে প্রভুর পায়ে পড়ল।

এত দিনে প্রভুর কৃপা হল। বললেন, তোমার অপরাধ শ্রীবাসের কাছে, তার কাছে গিয়ে শরণ নাও। সে যদি প্রসন্ন হয় আর তুমি যদি ভবিষ্যতে আর ভক্তবিদ্বেষ না করো তাহলে তোমার কুষ্ঠ সেরে যাবে।

ভগবানকে বিদ্বেষ করলে ভগবানের কিছু যায় আসে না, কিন্তু তাঁর ভক্তকে বিদ্বেষ করলে ভগবান বিদ্বেষীকে শাস্তি দেন।

সেই চাপাল-গোপালের গুরু পুরুষোত্তম। চাপাল-গোপাল বা দেবকীনন্দন একজন পদকর্তা। তার পদাবলীর নাম 'বৈষ্ণববন্দনা'।

ইষ্টদেব বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
সাত বৎসরে যার শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ॥

পুরষোত্তমের ছেলে কানু ঠাকুর।

আগে এদের শ্রীপাট ছিল বেলডাঙায়, সেখান থেকে চলে আসে সুখসাগরে।

সুখসাগরে এক যোগীপুরুষের আস্তানা। কত কাল ধরে যে একাসনে

ধ্যাননিমগ্ন হয়ে বসে আছে কেউ জানে না। লোকের যখন এ বিষয়ে চেতনা হল তখন সেই যোগী আর কোথায়, বিরাট এক মৃত্তিকার পিণ্ড। কেউ কেউ বলে এ মাটির ঢিবির নিচেই সাধু ধ্যানস্থ হয়ে আছে।

কে এক কুম্ভকার মাটির খোঁজে এসেছিল এ অঞ্চলে। কিছু না জেনে-শুনেই ঢিবিতে মারল কোদালের ঘা। আঘাত সেই যোগীর কাঁধে লাগল। তার ধ্যান ভেঙে গেল।

কোথায় যায়, যোগী পুরুষোত্তমের গৃহে এসে অতিথি হল। কিছু ভিক্ষে দাও মা।

পুরুষোত্তমের স্ত্রী জাহ্নবী অতিথিকে প্রাণভরে সেবা করল। যোগী তাকে বর দিতে চাইল।

জাহ্নবী কোনো বরের প্রত্যাশী হয়ে সেবা করেনি।

তা আমি জানি, মা। দেখতে পাচ্ছি তোমার সন্তান নেই। তাই বর দিচ্ছি তোমার একটি পুত্র হোক।

জাহ্নবীর বুক ভরে উঠল।

কিন্তু কে সে পুত্র?

কে?

মা, আমিই তোমার পুত্র হয়ে জন্মাব। আমার কাঁধে এই অস্ত্রাঘাত, আমাকে দেখে চিনতে পারবে।

সত্যি? জাহ্নবী উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

কিন্তু এ কথা কারু কাছে প্রকাশ করবে না। প্রকাশ করলেই তুমি মরে যাবে।

যথাসময়ে জাহ্নবীর ছেলে হল।

সুস্থ হয়ে নিরিবিলিতে দেখতে গেল ছেলের কাঁধ। আশ্চর্য, সেখানে স্পষ্ট চিহ্ন। আপন মনে হাসল জাহ্নবী।

সে বড় পরিতৃপ্তির হাসি। ধাত্রীর চোখ এড়াতে পারল না। ধাত্রী বললে, হাসলে কেন?

অমনি।

অমনি কেউ এমন সুন্দর করে হাসে? তুমি যেন কী দেখলে লুকিয়ে। চিনলে ছেলেকে। বলো না কেন হাসলে?

পীড়াপীড়ির কাছে হার মানল জাহ্নবী। বললে, তোমাকে যা বলছি

কাউকে যেন বোলো না। বলে পূর্বকথা সে প্রকাশ করে দিল।

জাহ্নবীর অসুখ করল। ছেলের যখন বারো দিন বয়স তখন সে মারা গেল।

পুরুষোত্তমের স্ত্রী জাহ্নবী আর নিত্যানন্দের ঘরনী জাহ্নবী পরস্পর সই পাতিয়েছিল। খড়দায় যখন খবর পৌঁছুল পুরুষোত্তমের স্ত্রী মারা গেছে, তখন নিত্যানন্দ নিজে এসে ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন। মাতা জাহ্নবী অপার পুত্রস্নেহে পালন করতে লাগলেন শিশুটিকে।

নিত্যানন্দ তার নাম রাখলেন কৃষ্ণদাস।

মাতা জাহ্নবী যখন বৃন্দাবনে গেলেন তখন শিশু কৃষ্ণদাসকেও সঙ্গে নিলেন। কৃষ্ণদাসকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। দেখে তার দু'নয়নে এক মহা-অনুভব উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আর সংকীর্তনে যখন সে নাচে তখন কে বলবে সেই স্বয়ং মদনগোপাল নয়?

তারপর কৃষ্ণদাস কী সুন্দর বাঁশি বাজায়!

এই সব ভাবচেষ্টা দেখে ব্রজবাসীরা তার নাম রেখেছে কানাই ঠাকুর। জীব গোস্বামী বললে, কানু ঠাকুর।

বৃন্দাবনে কীর্তনানন্দে নাচছে কানু ঠাকুর, তার ডান পায়ের নূপুরটি খসে পড়ল হঠাৎ। কোথায় নূপুর? কেউ খুঁজে পেল না।

কানু ঠাকুর বললে, যেখানে নূপুর পাওয়া যাবে আমি সেখানে বসবাস করব।

খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল যশোর জেলার 'বোধখানা' গ্রামে। কানু ঠাকুর বোধখানায় বাসা বাঁধল।

॥ ৩৬ ॥

রামানন্দ বসু

কুলীন গ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভাব, বাপের নাম লক্ষ্মীকান্ত বসু, পিতামহ মালাধর বসু। মালাধরের রাজদত্ত উপাধি গুণরাজ খান। লক্ষ্মীনাথের রাজদত্ত উপাধি সত্যরাজ খান। রামানন্দ রাজার কাছ থেকে কোনো উপাধি পায়নি, পেয়েছে গৌরহরির কাছ থেকে। সে উপাধি 'বৈষ্ণবতম'।

রামানন্দ গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার সহচর। সে নিজেই পদরচনা করেছে, কেমন কীর্তনলীলায় মত্ত হয়েছেন প্রভু।

চৌদিগে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহুঁ হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ যার সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ।
ভুলিল কীর্তনরসে পায়া নিজবৃন্দ॥
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়ারসে ভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর॥

প্রভু সন্ন্যাস নিলে রামানন্দও নিদারুণ শোকে আচ্ছন্ন হল। মাঘ মাসে সন্ন্যাসগ্রহণ বলে মাঘকে রামানন্দ 'পাপী মাঘ' বললে আর এখন ফাল্গুনে সে যখন পদরচনা করছে তখন কিনা সুখময় বসন্ত! গদাধরের সঙ্গে প্রাণনাথকে আবার কবে দেখতে পাব নদীয়ায়?

পাপী মাঘে পহুঁ করিল সন্ন্যাস।
তবহি গেও মঝু জীবন-আশ॥
দিনে দিনে ক্ষীণতনু ঝরয়ে নয়ন।
গোরা বিনু কতদিন ধরিব জীবন॥
অবহু বসন্ত বসহু সুখময়।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয়॥
যত যত পীরিতি করল পহুঁ মোর।
সোঙরিতে জীউ পরে কাউকি ভোর॥
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ॥

নীলাচললীলার বৈশিষ্ট্যও ধরা আছে এই প্রত্যক্ষদর্শীর রচনায়ঃ

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা গাঁথুনি॥
প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায়॥

ঘন ঘন দেন পাক উর্দ্ধ বাহু করি।
পতিত জনারে পহুঁ বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দ তাহে প্রেমধন চায়॥

যারা কুলীনগ্রামের লোক তারা সকলেই চৈতন্যপ্রাণধন। বিশেষত মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে গ্রন্থ লিখেছেন, সে গ্রন্থ কতবার পড়েছেন প্রভু। বলছেন, এমন গ্রন্থ যে লিখেছে তার বংশের হাতে নিজেকে বিকিয়ে দেব এ আর বেশি কথা কী।

বলছেন, কুলীনগ্রামের লোকদের বিরাট ভাগ্য। এখানে সবাই কৃষ্ণ-নাম বলে। তাই, মানুষ বলছ কী, কুলীনগ্রামের কুকুরও আমার প্রিয়।

প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর।
সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহন না যায়।
শূকর চরার ডোম সেহ কৃষ্ণ পায়॥

সত্যরাজ ও রামানন্দ একসঙ্গে এসেছে নীলাচলে। 'খণ্ডের সম্প্রদায়ে'র মত কুলীনগ্রামেরও এক 'কীর্তনিয়া সমাজ' আছে, তারাও রথযাত্রায় প্রভুকে নিয়ে কীর্তন করে। সব মিলে সাত সম্প্রদায়, কুলীনগ্রামের সম্প্রদায়ে সত্যরাজ আর রামানন্দই অগ্রণী।

শ্রীবৈষ্ণব-ঘটামেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্তনামৃতসহ বর্ষে নেত্রজল॥

রামানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞেস করলে, প্রভু, আমরা গৃহস্থ ও বিষয়ী, আমাদের সাধন কী?

প্রভু বললেন, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা আর নিরন্তর কৃষ্ণনামকীর্তন।

সত্যরাজ বললে, বৈষ্ণব চিনব কী করে?

যে মুখে একবার কৃষ্ণনাম বলবে সেই বৈষ্ণব।

সেই বৈষ্ণব?

হ্যাঁ, সেই পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ।

একবার কৃষ্ণনাম?

শুধু একবার। প্রভু বললেন, এক কৃষ্ণনামে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়, নববিধা ভক্তির জাগরণ ঘটে। নামে দীক্ষা পুরশ্চর্যা কিছু লাগে না। জিভে স্পর্শ হওয়া মাত্রই আচণ্ডাল সমস্ত প্রাণী উদ্ধার হয়ে যায়। কিন্তু আসল ফল কী জানো? আসল ফল কৃষ্ণপ্রেম। আর যদি একবার কৃষ্ণপ্রেম জাগে সংসারবন্ধন আপনা থেকেই খসে পড়ে।

পরের বছর আবার এসেছে পিতা-পুত্র। পরের বছরও প্রভুর কাছে তাদের সেই জিজ্ঞাসা, গৃহস্থ বিষয়ীর কর্তব্য কী?

প্রভু মৃদু হেসে বললেন, শুধু দুটি। বৈষ্ণবসেবা আর নামসঙ্কীর্তন।

আবার প্রশ্ন হল : বৈষ্ণব কে?

বৈষ্ণব কে, তোমাদের আগে বলেছিলাম। এবার শোনো বৈষ্ণবতর কে? যার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজিত সেই বৈষ্ণবতর। তোমরা সেই বৈষ্ণবতরের সেবা করো।

কে বৈষ্ণবতম, তার উত্তরের জন্যে আরো এক বছর অপেক্ষা করল তারা।

তৃতীয় বৎসরে রামানন্দ জিজ্ঞেস করলে, প্রভু, বৈষ্ণবতম কে?

যাকে দেখামাত্রই মুখে কৃষ্ণনাম এসে যায় সেই বৈষ্ণবতম। 'যাঁহার দর্শনে মুখে আসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।'

তুমি—তোমরা কৃষ্ণের নামমূর্তি হয়ে ওঠো। হয়ে ওঠো বৈষ্ণবতম।

আরে মোর গৌরকিশোর।
সহচর স্কন্দে পহুঁ ভুজযুগ আরোপিয়া
নবমী দশায় হল ভোর॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি
তন্তুক দোসর ভেল দেহ॥
থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোয়ে পহুঁ হা-নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিলুঁ কিসের লাগিয়া॥

একবার পাণ্ডুবিজয়ের দিন একগাছি পট্টডোরী ছিঁড়ে গেল, আর বালিশ ফেটে গিয়ে তুলো পড়ল বেরিয়ে।

পাণ্ডুবিজয় কী ?

হাত ধরে শিশুকে যে হাঁটতে শেখানো হয় তার নাম পাণ্ডু। জগন্নাথকে মন্দির থেকে পথের উপর হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার নাম পাণ্ডুবিজয়। মন্দির থেকে রথ পর্যন্ত তুলোর বালিশ পাতা থাকে, তারই উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিগ্রহকে। সেবকদের কেউ ধরে কাঁধ, কেউ কটি, কেউ হাত, কেউ পা। কটিতট বাঁধা থাকে পট্টডোরী দিয়ে। সেবকেরা ডোরীর দুই দিক ধরে পাণ্ডুবিজয় করায়।

ডোরী ছিঁড়ে যাবার পর প্রভু ডাকালেন রামানন্দকে। বললেন, তোমরা এই পট্টডোরীর যজমান হও। প্রতি বৎসর তোমরাই ডোরী তৈরি করে আনবে। দেখো ডোরী যেন দৃঢ় হয়, ছিঁড়ে না যায়।

সেই থেকে প্রতি বছর রামানন্দ পাণ্ডুবিজয়ের পট্টডোরী নিয়ে আসে।

রামানন্দ গাইছে ঃ

কীর্তন রসময় অগম অগোচর
কেবল আনন্দকন্দ।
অখিল লোকগতি ভকত প্রাণপতি
জয় গৌর নিত্যানন্দ চন্দ ॥
হেয় পতিতগণ করুণাবলোকন
জগ ভরি করল অপার।
ভবভয়অঞ্জন দূরিত নিবারণ
ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার ॥
হরিসঙ্কীর্তনে মজিল জগজন
সুর নর নগ পশু পাখী।
সকল বেদসার প্রেমসুধাধার
দেয়ল কাহু না উপেখি ॥
ত্রিভুবনমঙ্গল নামপ্রেমবলে
দূর গেল কলি আঁধিয়ার।
শমন ভবন পথ সবে এক রোধল
বঞ্চিত রামানন্দ দুরাচার ॥

বুদ্ধিমন্ত খান

নবদ্বীপের সনাতন মিশ্র, পদবীতে 'রাজপণ্ডিত', ব্যবহারেও পরমসম্পন্ন। অতিথিপরায়ণ, অকৈতব বিষ্ণুভক্ত। তারই কন্যা পরমসুচরিতা বিষ্ণুপ্রিয়া।

রোজ গঙ্গার ঘাটে স্নানের সময় শচীদেবীর সঙ্গে দেখা হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া নম্র হয়ে শচীদেবীকে প্রণাম করে। শচীদেবী আশীর্বাদ করেন, কৃষ্ণ তোমাকে যোগ্য পতি জুটিয়ে দিন।

কিন্তু আমার নিমাইয়ের চেয়ে যোগ্যতর কে আছে? মনে মনে কামনা করলেন, 'এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা।'

ঘটক কাশী মিশ্রকে ডাকলেন শচীদেবী। বললে, সনাতন মিশ্রকে বলো, তার কন্যাটিকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনি। মেয়েটির উপর আমার বড় মায়া পড়েছে। দেখলেই ইচ্ছে করে কোলে করে রাখি।

কাশী মিশ্র তক্ষুনি চলল সনাতনের কাছে।

কী মনে করে?

একটি বিশেষ কথা আছে। তোমার মেয়েটিকে নিমাই পণ্ডিতের হাতে সমর্পণ করো।

প্রস্তাব শুনে সনাতন অভিভূত হল। এ কি সম্ভব? দাঁড়াও গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করি।

সনাতন ধনী, তার স্ত্রী মহামায়াও আশা করেছিলেন জামাই ধনী হবে। জিজ্ঞেস করল, নিমাই কি ধনী?

সনাতন বললে, নিমাই বিদ্বান। ধনবানের চেয়ে বিদ্বান বেশি বরণীয়। কৌলীন্য কাঞ্চনে নয়, কৌলীন্য বিদ্যায়।

আর বিদ্যা কী? 'হরিভক্তিরেব ন পুনর্বেদাদিনিষ্ণাততা।' হরিভক্তিই বিদ্যা, বেদপারঙ্গমতা বিদ্যা নয়। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি।' নিমাই সেই ভাগবতী বিদ্যায় গৌরকান্ত।

মহামায়া রাজী হল। তাকাল বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে। এগারো বছরের মেয়ে, যেন মূর্তিমতী শ্রী। 'বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখ বালা সোনা।'

শ্রী কী? 'তৎপ্রিয়তা ন ধনজনগ্রামাদিভূয়িষ্ঠতা।' ভগবৎপ্রীতিই শ্রী, ধনজনসম্পত্তিসমৃদ্ধি শ্রী নয়।

'সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী ॥'

নিমাইয়ের সঙ্গে কাশী মিশ্রের পথে দেখা।

আমি কোথায় যাচ্ছি জানো ?

কে কোথায় যায় তার আমি কী জানি ?

সনাতন মিশ্রের বাড়ি যাচ্ছি। তার মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে।

তা যাবে তো যাক, তাতে নিমাইয়ের কী। নিমাই পাশ কাটাতে চাইল।

কার সঙ্গে বিয়ে তা জানো তো ?

আমি কী করে জানব ?

বেশ বলেছ! কাশী মিশ্র অপ্রস্তুত হল: তোমার বিয়ে, আর তোমারই খবর নেই ?

আমার বিয়ে! নিমাই হাসতে লাগল: আর আমিই কিছু জানি না। বলে চলে গেল আপন মনে।

কাশী মিশ্রের মুখ ঘোরালো হয়ে উঠল। তবে বুঝি নিমাইয়ের এ বিয়েতে মত নেই।

সনাতনকে গিয়ে বললে, এ বিয়ে হবে না। নিমাই রাজী নয়।

বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া বিচলিত হল না। ভাবল এ তাঁর কৌশল, তিনি আমাকে উপেক্ষা করছেন। যাতে তাঁর প্রতি আমার ব্যাকুলতা বাড়ে। উপেক্ষাতেই তো শ্রীমতীর কৃষ্ণ-অপেক্ষা।

কাশী মিশ্র শচীদেবীকে খবর দিল।

শচীদেবী নিমাইকে ডেকে বললে, এ বিয়ে যে আমি ঠিক করেছি।

তুমি ঠিক করেছ ? নিমাই উল্লসিত হয়ে উঠল: তা হলে আর কথা কী। তুমি যা বলবে তাই করব। তাহলে উদ্যোগ শুরু করে দাও।

কিন্তু গরিবের ঘরের ছেলে তুই, কী উদ্যোগ করব ?

নবদ্বীপের জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান এগিয়ে এল। বললে, বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার আমি বহন করব।

মুকুন্দসঞ্জয়, যার বাড়িতে নিমাইয়ের টোল, বললে, সকল ভার তুমি নেবে কেন ? আমাকেও কিছু অংশ নিতে দাও।

রাখো। এ তোমার 'বামনাই' বিয়ে নয়, এ এক রাজপুত্রের বিয়ে।

প্রচণ্ড আয়োজন করব আমি। সাহায্য করতে চাও কোরো, কিন্তু তার দরকার হবে না।

বড় বড় চন্দ্রাতপ টাঙানো হল, চারধারে কলাগাছ পোঁতা, দুলল নিশান, দুলল আম্রপল্লব। সমস্ত ভূমিতলে আলপনা দিল মেয়েরা। আজ অধিবাস, সকাল হতেই বাজছে মৃদঙ্গ সানাই। ভাটেরা রায়বার পড়ছে। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে, অপরাহ্ণে এসে মালা-চন্দন নেবে, নেবে পান-সুপুরি। তারই জন্যে কী ভিড়! একবার নিয়েও আবার লুকিয়ে নিতে আসছে।

তিনবার করে নাও, সোজাসুজিই নাও, শাঠ্যের কী দরকার। যা খরচ লাগবে বুদ্ধিমন্ত দেবে।

পরদিন বিয়ে, সারা নবদ্বীপে ভোজ্যবস্তু বিতরণ করা হল। গঙ্গাস্নান করে বিষ্ণুপূজা সেরে নিমাই বসল নান্দীমুখ করতে। পুরনারীরা গঙ্গাপূজা ষষ্ঠীপূজা করলে, মন্দিরে-মন্দিরে আরো কত পূজা, ঘরে ঘরে কতশত স্ত্রী-আচার। খাদ্যদ্রব্যেরই আয়োজন কত। পাঁচ-সাতবার করে দিয়েও সে খাবারে অনটন হল না। এ প্রাচুর্য শুধু ঈশ্বরের প্রভাবে।

বুদ্ধিমন্তের উপরেও আছে একজন।

অপরাহ্ণে নিমাইয়ের বন্ধুরা নিমাইকে সাজাতে বসল। 'দিব্য সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধান।' কপালে অর্ধচন্দ্রের আকারে চন্দনের ফোঁটা, মধ্যস্থলে মৃগমদবিন্দু, নয়নে কাজল, গলায় ফুলের মালার উপরে আবার মতির মালা। কানে সোনার কুণ্ডল, বাহুতে রত্নবাজু। মাথায় মুকুট, গায়ে পট্ট-চাদর। মণিবন্ধে সুতো দিয়ে ধান-দুর্বা বাঁধা, হাতে দর্পণ। দেখ সকলে নবদ্বীপচন্দ্রকে দেখ।

বুদ্ধিমন্ত দোলা সাজিয়ে নিয়ে এল। এ দোলায় চড়ে গোধূলিলগ্নে নিমাই কন্যার বাড়িতে যাবে।

সর্বাগ্রে নিমাই মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল, তারপর ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের নমস্কার করে দোলায় গিয়ে বসল। তার বয়স্যেরাও তার সঙ্গ নিলে। বুদ্ধিমন্তের পদাতিকেরা আগে-আগে চলল, আশেপাশে পাটোয়ারের দল। নর্তক-বিদূষকই বা কত। আর বাজনাও বিচিত্র। 'জয়ঢাক বীরঢাক মৃদঙ্গ কাহাল। পটহ দগড় শঙ্খ বংশী করতাল॥' হাজার হাজার দীপ জ্বলে সঙ্গে, পুড়তে লাগল আতসবাজি।

সমস্তই বুদ্ধিমন্তের আনন্দ-নিবেদন। বিবাহান্তে নিমাই তাকে দিল তাই আলিঙ্গনের প্রসাদ।

তারপর যখন প্রভু গয়া থেকে ফিরলেন তাঁর কৃষ্ণ-উন্মাদনাকে অনেকে বায়ুব্যাধি বলে মনে করল। বললে, একে হাতে-পায়ে বেঁধে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখে দাও।

কেউ বললে, শুধু বেঁধে রাখলে সারবে না, কবরেজ ডাকিয়ে শিবাঘৃত প্রয়োগ করো।

শচীদেবী বুদ্ধিমন্তকে ডাকলেন। বললেন, আমার নিমাইয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও।

বুদ্ধিমন্ত ব্যবস্থা করে দিল। কোথায় কে বৈদ্য আছে ডেকে আনো। কোন ওষুধে কত খরচ পড়বে সব আমি দেব।

কিন্তু এ তো রোগ নয় এ প্রেম—এ মহাভাব। কবরেজ তার করবে কী। বুদ্ধিমন্তই শুধু কবরেজের জন্যে করবে।

তারপর চন্দ্রশেখর আচার্যের ঘরে প্রভু যখন অভিনয় করলেন, তারও সাজ-সরঞ্জামের খরচ বুদ্ধিমন্তের।

সেই থেকে বুদ্ধিমন্ত প্রভুর লীলাসঙ্গী। শুধু সঙ্গী নয়, সেবক, আজ্ঞাবহ।

তাই প্রভুর টানে বারেবারেই সে নীলাচলের অভিযাত্রী। যদি প্রভু তাকে আজ্ঞা করেন। যদি তার ধনসম্পদ প্রভুর কোনো কাজে লাগে।

॥ ৩৮ ॥

দেবানন্দ পণ্ডিত

কুলিয়া গ্রামের অধিবাসী, থাকে নবদ্বীপে মহেশ্বর বিশারদের জাঙালে। সুশান্ত, জ্ঞানবান, তপস্বী, আজন্ম-উদাসীন। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা মোক্ষের, ভক্তির নয়।

ভাগবতের অধ্যাপনা করে কিন্তু ভক্তির ধার ধারে না।

তখনো প্রভুর আবির্ভাব হয়নি, সমস্ত জগৎ প্রেমশূন্য, একদিন শ্রীবাস যাচ্ছে দেবানন্দের ঘরের দুয়ার দিয়ে। দেখল পড়ুয়াদের সভা বসেছে,

ভাগবত ব্যাখ্যা করছে দেবানন্দ। শ্রীবাস সভায় এক প্রান্তে গিয়ে বসল। মূল শ্লোক শুনেই দ্রবীভূত হয়ে গেল, তার শরীরে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হল, বিহ্বল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে।

এ আবার কোন্ জঞ্জাল এসে জুটল! পড়ুয়ারা তেড়ে এল শ্রীবাসকে।

তারা সবাই ভক্তিহীন, তারা ভাগবত-শ্রবণের মর্ম কী বুঝবে!

আমাদের অধ্যয়ন মাটি করে দিল। কে এই আপদ? পড়ুয়ারা শ্রীবাসকে ধরে বাড়ির বাইরে রেখে এল। কাঁদতে হলে এখানে বসে কাঁদো। আমাদের পড়ার না ক্ষতি হয়।

দেবানন্দ চুপ করে রইল। দুর্বৃত্ত ছাত্রদের নিরস্ত করবার চেষ্টাও করল না।

মনে দুঃখ নিয়ে শ্রীবাস ঘরে ফিরে গেল এবং বিরলে বসে ভাবতে লাগল ভাগবতের কথা।

প্রভু একদিন নগরভ্রমণে বেরিয়েছেন, হঠাৎ দেবানন্দের সঙ্গে দেখা হল। শ্রীবাসের কাছে দেবানন্দের অপরাধের কথা মনে পড়ে গেল। আমি তখনো আসিনি বটে কিন্তু আমার জানতে বাকি নেই।

প্রভু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, যে ভাগবত শুনে কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদে তাকে তুমি তোমার বাড়ি থেকে বের করে দিলে? তুমি শুধুই পড়াও, ভাগবতের অভিমত আয়ত্ত করতে পারো তোমার সাধ্য নেই। তুমি চিনি বহনই করতে পারো, তার স্বাদ জানো না।

দেবানন্দ ভর্ৎসনার প্রতিবাদ করল না। লজ্জিত মুখে চুপ করে রইল। স্তব্ধতা দ্বারা স্বীকার করল অপরাধ।

প্রভু যাকে বচনেও দণ্ড দেন সে নিঃসংশয় পুণ্যবান। আর সে দণ্ড যে মেনে নেয়, মাথায় তুলে নেয়, সে ভক্তির পথে চলে আসে।

দেবানন্দ কি তাই এবার ভক্তির পথ ধরবে?

প্রভুর ভগবত্তায় বিশ্বাস নেই দেবানন্দের। কিন্তু বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখে তার প্রাণ-মন মুগ্ধ হয়ে গেল। বুঝল কাকে বলে প্রেমাবেশ, কাকে বলে অশ্রু কম্প স্বেদ হাস্য, কাকে বলে আনন্দমূর্ছা! নাচতে নাচতে মাটিতে পড়ে গেলে বক্রেশ্বরকে দেবানন্দ নিজের কোলে টেনে নিল ও তার অঙ্গধূলি নিয়ে মাখতে লাগল নিজের শরীরে। ভক্তধূলি গায়ে মেখে তার ভক্তিতে বিশ্বাস হল। বিশ্বাস হল শ্রীচৈতন্যে। 'ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে। ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে॥'

তারপর প্রভু যখন কুলিয়ায় এলেন, মাধবদাসের বাড়িতে, দেবানন্দ এসে তাঁর চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল। জানাল তার তৃণদৈন্য।

বৈষ্ণবের কৃপায় বিশ্বম্ভরকে পেলাম। বুঝলাম, 'ভক্তি বিনা জপ-তপ অকিঞ্চিৎকর।' বুঝলাম মোক্ষের চেয়েও ভক্তি গরীয়সী। তোমার স্বভাব সর্বভূতকৃপালুতা, তোমাতে আমার অনুরাগ হোক।

প্রভু দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করলেন। বললেন, এবার থেকে তুমি ভাগবতের যথার্থ ব্যাখ্যাতা হবে। 'শুন বিপ্র, ভাগবতে এই বাখানিবা। ভক্তি বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা॥'

সেই থেকে দেবানন্দের নাম হল ভাগবতী দেবানন্দ। চলতি ভাষায় 'ভাগবতিয়া দেবানন্দ'।

দেবানন্দ বললে, প্রভু, আমাকে একটি বর দিন।

বলো।

এই কুলিয়ায় এসে যে কেউ শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে অপরাধভঞ্জনের প্রার্থনা করবেন তদ্দণ্ডেই তার সমস্ত অপরাধের ভঞ্জন হবে।

প্রভু বললেন, তথাস্তু।

সেই থেকে কুলিয়ার নাম হল অপরাধভঞ্জনের পাট। আর দেবানন্দ পরমভাগবত।

॥ ৩৯ ॥

অচ্যুতানন্দ

পিতা অদ্বৈত আচার্য, মা সীতা দেবী। অচ্যুতানন্দের ছ' ভাই, অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপালদাস, বলরাম আর যমজ স্বরূপ-জগদীশ।

ছ' ভাইয়ের মধ্যে অচ্যুতানন্দ শুধু জ্যেষ্ঠ নয়, শ্রেষ্ঠ। 'অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।'

যখন শ্রীমাই পণ্ডিত এসে অদ্বৈতকে খবর দিলে পূজার উপকরণ নিয়ে গৌরাঙ্গের সঙ্গে দেখা করতে, তখন অদ্বৈত দ্বিধা করলেও বালক অচ্যুত কাঁদতে বসল। সে যেন বুঝেছে কার আবির্ভাব হয়েছে, পৌঁচেছে এসে কার

আহ্বান। এ যেন সেই মহাবদান্যের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য।

শৈশব থেকেই তার গৌরাঙ্গে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

গৌরাঙ্গের জন্যে সীতা দেবী দুধ জ্বাল দিয়ে রেখেছেন, অচ্যুত তা খেয়ে ফেলেছে। তুই গৌরের দুধ খেয়ে ফেললি? ক্রুদ্ধ হয়ে সীতা দেবী ছেলেকে চড় মেরে বসলেন। যখন গৌরাঙ্গ এল, দেখা গেল তার গায়ে সেই চড়ের দাগ। বুঝিয়ে দিল অচ্যুত তার কত অন্তরঙ্গ, কত একাত্ম।

প্রভুর সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবার পর এক সন্ন্যাসী এল তাদের বাড়িতে। অদ্বৈতকে জিজ্ঞেস করলে, চৈতন্যগোসাঁইয়ের গুরু কে?

অদ্বৈত বললে, কেশব ভারতী।

বালক অচ্যুত আহত স্বরে বলে উঠল, বাবা, তুমি এ কী বললে? যিনি চতুর্দশ ভুবনের গুরু তাঁর আবার গুরু কে? কেশব ভারতী এই মর্তভুবনের একজন অধিবাসী মাত্র, সে চৌদ্দ ভুবনের গুরুর গুরু হয় কী করে? বাবা, তুমি সামান্য কথা ফিরিয়ে নাও, তুমি এরকম উপদেশ করলে দেশের ঘোর অনিষ্ট হবে।

ছেলের কথা শুনে তৃপ্ত হল অদ্বৈত। প্রশ্নকর্তা অধোবদন হল।

বয়সে যত বড় হতে লাগল ততই তীব্রতর হল তার সংসারবৈরাগ্য। নীলাচলে এসে উপস্থিত হল। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যত্ব নিয়ে লাগল চৈতন্যসেবায়।

অদ্বৈতের দ্বিতীয় ছেলে কৃষ্ণদাসও গৌরাঙ্গভক্ত। দাদার দেখাদেখি সেও যেতে চাইল নীলাচলে। সীতা দেবী বিচলিত হলেন। বড় ছেলে কুমার-বৈরাগ্য নিয়েছে, এও তার পদাঙ্ক অনুকরণ করবে নাকি? কৃষ্ণদাসকে বিয়ে দিলেন আর যাতে কৃষ্ণবিমুখ না হয় তারই জন্যে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শুধু কৃষ্ণ মিশ্রকে নয়, তার স্ত্রী বিজয়াকেও। কৃষ্ণদাসের নতুন নাম কৃষ্ণ মিশ্র প্রভুরই রটনা। 'কৃষ্ণ মিশ্র নাম আর আচার্যতনয়। চৈতন্য গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥'

তৃতীয় ছেলে গোপালদাস। সেও বাল্যাবধি গৌরানুরাগী। অন্নপ্রাশনের সময় সজ্জিত সম্ভার না ধরে ধরেছিল গৌরাঙ্গচরণ।

সেও গিয়েছে নীলাচলে। গুণ্ডিচামন্দিরে প্রভুর সামনে হরি-হরি বলে নাচতে নাচতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। এ কী, এ যে কোনো সম্বিৎ নেই।

অদ্বৈত উদ্বিগ্ন হয়ে নৃসিংহমন্ত্র পড়তে লাগল। তার বোধ হয় ধারণা হল

গোপালের উপর ভূতাবেশ হয়েছে, তাই ভাবল নৃসিংহমন্ত্রে কাজ হবে। কোনো মন্ত্রেই কিছু হল না। অদ্বৈত তখন হাহাকার করে উঠল।

প্রভু এগিয়ে এলেন। গোপালের বুকের উপর তাঁর পদ্মহাতখানি রাখলেন। বললেন, হরি হরি। গোপাল, এবার ওঠো।

স্পর্শে ও ধ্বনিতে গোপাল জেগে উঠল। চারদিকে পড়ে গেল হরিধ্বনি। হরি তো শুধু হরণ করেন না, পূরণ করেন।

নীলাচলে কীর্তনের দলের মধ্যে এক শান্তিপুরের সম্প্রদায় আছে, তার মধ্যে নর্তক হচ্ছে অচ্যুত। অচ্যুত শুধু নৃত্যে-গানেই মত্ত নয়, সে আবার তত্ত্বব্যাখ্যায় তৎপর। তার ব্যাখ্যায় স্বয়ং প্রভুই চমৎকৃত।

তোমার আবার চমৎকার কিসে? আমার সমস্ত ব্যাখ্যা তো তোমারই প্রসাদে।

সেই অচ্যুতের শৈশবে প্রভু একবার তাকে বলেছিলেন, অচ্যুত, আচার্য আমার বাপ আর সেই সম্পর্কে তুমি-আমি দুই ভাই। অচ্যুত বলেছিল, দৈবে তুমি জীবের বন্ধু, নইলে তোমার আবার বাপ কে?

তোমার আবার গুরু কে? তোমার আবার ব্যাখ্যাতা কোনজন?

প্রভুর তিরোধানের পর অচ্যুতানন্দ শান্তিপুরে ফিরে এল। নীলাচলের পথে নরোত্তম শান্তিপুরে এলে দেখল অচ্যুতকে। প্রভুবিচ্ছেদে কাতর, ম্লান মুখে বসে আছে। নরোত্তম তাকে প্রণাম করল। নরোত্তমকে বুকে জড়িয়ে ধরল, বললে, যাও নীলাচলচন্দ্রকে গিয়ে দেখে এস। তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।

তারপর নরোত্তমের খেতুরির মহোৎসবে যোগ দিল অচ্যুত। সেখানে মাতা জাহ্নবীকে নিয়ে এসেছিল বীরচন্দ্র। বৃন্দাবন যাচ্ছেন শুনে অচ্যুত এসেছিল বিদায় নিতে। বললে, আর হয়তো দেখা হবে না।

জগদানন্দ পণ্ডিত

গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার আরেক সঙ্গী, ব্রাহ্মণ, নিবাস কুমারহট্টে, শিবানন্দ সেনের বাড়ির কাছে। প্রভুর সমস্ত মুখ্য লীলায়, কাজী-দমনে, নগর-কীর্তনে বা জগাই-মাধাই-উদ্ধারে একজন পার্শ্বচর।

তারপর নীলাচলের সহযাত্রী।

রন্ধনে নিপুণ, জগদানন্দই পথে রান্না করে খাওয়ায় সকলকে। রন্ধনে যেমন পটু পরিবেশনেও তেমনি অজস্র।

সর্বক্ষণ কেবল প্রভুকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবার চেষ্টা। তার প্রীতির আধিক্যে প্রভু সংকুচিত। কখনো কখনো তার সেবার আড়ম্বরকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। আমি যে সন্ন্যাসী, এত আরাম-আয়োজনে থাকলে আমার বৈরাগ্য-ধর্ম নষ্ট হবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে লোকনিন্দা ভয়ের বস্তু।

এই জন্যে প্রায়ই প্রভুর সঙ্গে জগদানন্দের কলহ হয়। এ কলহ প্রেমকলহ।

জগদানন্দ প্রভুর দণ্ডখানি বয়ে বেড়ায়।

নিত্যানন্দের কাছে দণ্ড গচ্ছিত রেখে জগদানন্দ ভিক্ষার সন্ধানে বেরিয়েছে। ভিক্ষা সেরে এসে দেখল দণ্ড ভাঙা, তিন টুকরো।

দণ্ড কে ভেঙেছে? জগদানন্দ গর্জে উঠল।

নিত্যানন্দ হাসল: যাঁর দণ্ড তিনিই ভেঙেছেন।

আসলে নিত্যানন্দই ভেঙেছে। নিত্যানন্দ ছাড়া আর কে এমন শক্তিমান আছে যে প্রভুর দণ্ড ভেঙে ফেলতে পারে?

জগদানন্দ ভিক্ষেয় বেরিয়ে গেলে নিত্যানন্দ দণ্ডের সঙ্গে কথা বলতে বসল। দণ্ড, যাকে আমি হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, সে তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবে এ ঠিক নয়। তুমি এবার বিদায় হও। তোমাতে কারো প্রয়োজন নেই। বলে দণ্ডকে তিন টুকরো করে দিল।

সেই তিনটি টুকরো নিয়ে জগদানন্দ প্রভুর কাছে হাজির হল।

কে ভাঙল?

নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দকে ডাকো।

নিত্যানন্দ এলে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমার দণ্ড ভাঙলে ?

ও তো একটা বাঁশ মাত্র। ওটাকে ভাঙলে কী হয় ?

আমি আজ নিঃসঙ্গ হলুম। এই দণ্ডই আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমার সেই দণ্ডও আজ ভেঙে গেল।

দণ্ড তো শাসন করবার জন্যে, পীড়ন করবার জন্যে। প্রভুর সন্ন্যাস তো প্রেম-বিতরণের জন্যে। প্রেমে দণ্ড কোথায় ? ভয় কাকে ?

বাৎসল্য সখ্য দাস্য ও মধুর এই চার ভাবেই প্রভু বশীভূত। পরমানন্দ-পুরীর বাৎসল্য, রামানন্দের সখ্য, গোবিন্দের দাস্য আর জগদানন্দ গদাধর আর স্বরূপ দামোদরের মধুর।

জগদানন্দের প্রেমে আবার রাগ আছে, অভিমান আছে, তিরস্কার করতেও তা পরাঙ্মুখ নয়। যেমন তা অকপট তেমনি অকৃপণ। কথা যদি না শোনে, কথা কওয়া ছেড়ে দেব। প্রভুকে তাই ভয়ে-ভয়ে কথা শুনতে হয়। একবার তো প্রভুর উপর রাগ করে তিন দিন কথা বন্ধ করেছিল। কিন্তু প্রভুকে দিয়ে 'বিষয় ভুঞ্জানো' কি ভালো ?

প্রভুর আদেশে জগদানন্দ নবদ্বীপে এসেছে, শচীমাতা থেকে শুরু করে সবাই তার মুখে শুনছে চৈতন্য-কথা। জগদানন্দকে পেয়ে সবাই বলছে, এই তো আমরা চৈতন্যকেই পেলাম। যে গৌরের প্রেম-পাত্র সে গৌর ছাড়া আর কে !

জগদানন্দ শিবানন্দের বাড়ি এসেছে।

সেখানে এক কলস চন্দনাদি তেল প্রস্তুত করেছে। এ একরকম আয়ুর্বেদিক তেল, ব্যবহার করলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ প্রশমিত হয়। মনে করেছে এ তেল ব্যবহার করলে প্রভুর অনেক উপকার হবে। কত উপবাস করেন, রাত জাগেন, কীর্তনের মত্ততায় শরীরের উপর কত ক্লেশ সইতে হয় তাঁকে, এ তেল মাখলে হয়তো কিছু উপশম হবে। তেলে আবার সুগন্ধ মিশিয়ে নিল যাতে ব্যবহারে স্পৃহা জাগে।

যত্ন করে তেলের কলস নিয়ে গেল নীলাচল। দ্বারপাল গোবিন্দের কাছে জিম্মা করে দিল। বললে, এ তেল প্রভুর মাথায় অল্প অল্প মেখে দিও, বায়ু-পিত্তের শান্তি হবে।

গোবিন্দ তাই বললে প্রভুকে। গৌড় হতে বহু যত্নে নিয়ে এসেছে। এক কলসীতে প্রায় ষোল সের তেল।

প্রভু বললেন, সন্ন্যাসীর এমনিতেই তেলে অধিকার নেই, তায় আবার সুগন্ধি তেল। এ বিষম লজ্জার কথা।

তবে এ তেল কী করব?

জগন্নাথকে দিয়ে দাও। এ তেলে তাঁর মন্দিরে দীপ জ্বলবে। তাতেই জগদানন্দের সমস্ত শ্রম সার্থক হবে বলে দিও।

গোবিন্দ জগদানন্দকে জানাল প্রভু কী বলেছেন। জগদানন্দ কোনো উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

দিন দশেক বাদে গোবিন্দের কাছে গিয়ে আবার আবেদন করল। প্রভুকে বলো এ তেল যেন তিনি অঙ্গীকার করেন। কত কষ্ট করে তৈরি করে এনেছি গৌড় থেকে।

গোবিন্দ আবার জানাল প্রভুকে।

প্রভু রুষ্ট হলেন। সক্রোধে বললেন, তা হলে তেল মালিশ করবার জন্যে লোক রাখো। এই সুখের জন্যেই তো আমি সন্ন্যাস করেছি! হাসছ কী? তোমাদের পরিহাস আর আমার সর্বনাশ! পথে লোকে যখন আমার গায়ে তেলের গন্ধ পাবে, তখন কী ভাববে? আমাকে 'দারী সন্ন্যাসী' ভাববে। ভাববে আমি কোনো স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনের জন্যে গায়ে-মাথায় গন্ধ-তেল মেখেছি। লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে?

গোবিন্দ স্তব্ধ হয়ে রইল।

ভোরবেলা প্রভু নিজেই জগদানন্দের বাড়ি গেলেন। বুঝিয়ে বললেন, গৌড় থেকে তুমি যে তেল এনেছ তা দিয়ে জগন্নাথের দীপ জ্বালাও। আমি সন্ন্যাসী, আমি তা মাখি কী করে?

প্রণয়রোষে বক্রোক্তি করল জগদানন্দ। আমি গৌড় থেকে তেল এনেছি এ মিথ্যে কথা তোমাকে কে বললে? আমি কোনো তেল আনিনি। বলে তেলের কলসীটা প্রভুর সামনেই উঠোনে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলল।

প্রভুর কাজে যখন লাগল না তখন এ তেল আনা আর না-আনা সমান। কলসীতে থাকলেও যা, মাটিতে গড়িয়ে গেলেও তাই।

তারপর দরজায় খিল দিয়ে ঘরে শুয়ে রইল।

দুদিন পর প্রভু এসে দরজায় ঘা দিলেন। পণ্ডিত, ওঠো। আজ দুপুরে আমি এখানে খাব। তুমি উঠে রান্না করো। আমি মন্দিরে দর্শন সেরে আসি।

জগদানন্দ উঠে স্নান করে বিচিত্র ব্যঞ্জন রান্না করল। মধ্যাহ্নে প্রভু এসে

খেতে বসলে কলাপাতায় শালি-চালের সঘৃত অন্ন স্তূপ করে সাজিয়ে দিল। কলার ডোঙায় সাজিয়ে দিল ব্যঞ্জন। অন্ন-ব্যঞ্জনের উপর রাখল তুলসীমঞ্জরী।

প্রভু বললেন, আরেক পাতে ভাত বাড়ো। তুমিও আমার পাশে বসে খাবে। বলে হাত তুলে বসে রইলেন।

জগদানন্দ বললে, তুমি আগে খাও, পরে আমি খাব। তোমার আগ্রহ কি আমি উপেক্ষা করতে পারি ?

প্রভু তখন আশ্বস্ত হয়ে ভোজ্যদ্রব্যে হাত দিলেন। বললেন, ক্রোধ সত্ত্বেও তুমি এমন সুন্দর রান্না করেছ, তার মানেই তোমার উপর কৃষ্ণের প্রসাদ আছে। কৃষ্ণ নিজে খাবে কিনা, তাই তোমার হাত দিয়ে অমৃত ঢেলে দিল।

জগদানন্দ তৃপ্তমুখে বললে, এখানে যে খাবে সেই রাঁধুনে। কৃষ্ণ নিজে খাবেন বলে নিজেই রান্না করেছেন।

আর তুমি ?

আমি শুধু জোগানদার। আমার শুধু সামগ্রী-সংগ্রহ। 'পণ্ডিত কহে যে খাইবে সে-ই পাক-কর্তা। আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্তা।'

জগদানন্দ বারে-বারে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করতে লাগল। পাছে সে অসন্তুষ্ট হয় সেই ভয়ে প্রভু খেতে লাগলেন। অসন্তুষ্ট হলেই তো জগদানন্দ উপোস করে থাকবে। সে এক ত্রাসের ব্যাপার। তার চেয়ে জগদানন্দ যা খেতে দিচ্ছে খেয়ে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু না বলে পারলেন না। বিনয়-সম্মান করে বললেন, পণ্ডিত, এবার থামো। দশ গুণ বেশি খেলাম। আর কত খাওয়াবে ?

জগদানন্দ তখন নিবৃত্ত হল।

এবার তবে তুমি আমার সামনে বসে খাও, আমি দেখি।

আমার এখনো আরো কাজ আছে। যারা রান্নার কাজে সাহায্য করেছে, রামাই আর রঘুনাথকে খাওয়াতে হবে। তোমার গোবিন্দকেও বাদ দেব না। তুমি এখন গিয়ে বিশ্রাম করো।

প্রভু গোবিন্দকে বললেন, তুমি এখানে থাকো। পণ্ডিত খেতে বসলে আমাকে খবর দিও। বলে চলে গেলেন বিশ্রাম করতে।

সে কী, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। জগদানন্দ গোবিন্দকে তাড়া দিল : তুমি গিয়ে প্রভুর পা টেপো। জিজ্ঞেস করলে বোলো, পণ্ডিত এই ভোজনে বসল। আমি খেতে না বসলে তাঁর যে বিশ্রাম হবে না। যাও,

তোমার জন্যে প্রভুর প্রসাদ রেখে দেব। প্রভু ঘুমিয়ে পড়লে ফের চলে এস।

গোবিন্দ আবার প্রভুর কাছে যেতে প্রভু তাকে ফেরত পাঠালেন। দেখ দেখ জগদানন্দ খেল কিনা।

গোবিন্দ গিয়ে দেখল জগদানন্দ খেতে বসেছে। জগদানন্দের খেতে না বসা পর্যন্ত যে প্রভুর বিশ্রাম নেই।

এই প্রভুর অবশেষ তোমার জন্যেও রেখে দিয়েছি, তুমিও বসে পড়ো। তারপর প্রভুকে গিয়ে সংবাদ দাও।

ভোজনের সংবাদ পেয়ে প্রভু স্বস্তিতে শয়ন করলেন।

শুধু খাওয়া নয়, শোবার দিকেও জগদানন্দ মনোযোগ করল। দেখল প্রভু কলার শরলা পেতে শোন। কৃশ শরীর, শরলাতে হাড়ে নিশ্চয় ব্যথা লাগে। সে-ব্যথা লাগে গিয়ে ভক্তপ্রাণে। জগদানন্দের কাছে অসহ্য মনে হয়।

সে সূক্ষ্ম বস্ত্রে খোল তৈরি করাল। গৈরিকে রাঙাল সেই খোল। তারপর তাতে তুলো ভরল। দিব্যি তোষক বানিয়ে দিল। শুধু তোষক নয়, বালিশেরও ব্যবস্থা করল।

তোষক-বালিশ গোবিন্দের হাতে পৌঁছিয়ে দিল। প্রভুকে এতে শুইয়ো।

স্বরূপকে বললে, আপনি অনুরোধ করলে প্রভু 'না' করতে পারবেন না।

তোষক-বালিশ দেখে প্রভু চটে উঠলেন। গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কে করিয়েছে ?

গোবিন্দ নাম বললে। আর কে ? জগদানন্দ।

নাম শুনে সংকুচিত হলেন প্রভু। দান প্রত্যাখ্যান করলে জগদানন্দ আবার না অনশন শুরু করে। কিন্তু উপায় নেই। গোবিন্দকে দিয়ে তুলোর জিনিস দূর করে দিলেন। আগের মত শুলেন সেই কলার শরলায়।

স্বরূপ বললে, পণ্ডিতের শয্যা না নিলে পণ্ডিত দারুণ আহত হবে।

তাহলে সেই সঙ্গে একটা খাটও নিয়ে এস। প্রভু বিরক্ত হলেন : আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন। আমার জন্যে খাট, আমার জন্যে তোষক-বালিশ ?

তখন স্বরূপ এক উপায় বার করল। কলার শরলা নখ দিয়ে সরু করে-করে চিরল, পুরোনো বহির্বাস দিয়ে খোল বানাল, তারপর সেই খোলের মধ্যে সরু করে চেরা শরলা ঢুকিয়ে দিব্যি লেপ-তোষক তৈরি করল। কী,

এতে তো আপত্তি নেই! তোমারই বহির্বাস, তোমারই কলার শরলা।

অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর প্রভু সেই শয্যা অঙ্গীকার করলেন। সকলেই সুখী হল। কিন্তু জগদানন্দের অন্তরে সুখ নেই। অথচ ক্রোধ দেখাতে গেলেও তো প্রভু দুঃখিত হবেন। প্রভুকে স্বাস্থ্যে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই তো তার একমাত্র কাজ। প্রভু কম খাবেন, কষ্টে শোবেন, এ যে তার সহ্যের বাইরে। তার কথা কে বোঝে।

রামচন্দ্র পুরীর শাসনও তো সে মানেনি ।

রামচন্দ্র মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। সেই সূত্রে ঈশ্বর পুরীর গুরু-ভাই। সেই অর্থে প্রভুর গুরুস্থানীয়। একবার জগদানন্দের নিমন্ত্রণে তার বাড়ি খেতে এসেছিল রামচন্দ্র। নিজে প্রচুর খেল, পরে নিজে পরিবেশন করে জগদানন্দকেও প্রচুর খাওয়াল। তারপরে চৈতন্যের নিন্দা করতে বসল—চৈতন্যের দলের লোকগুলো নিজেরা যেমন বেশি খায়, তেমনি অন্য সন্ন্যাসীদেরও বেশি খাওয়ায়। অতিভোজন যে বৈরাগ্যের শত্রু এ খবর তারা রাখে না। তাদের মধ্যে বৈরাগ্যের বাষ্পও নেই।

রামচন্দ্রের এই নিন্দুক স্বভাব। নিজের ইচ্ছায় বেশি খেল, বেশি খাওয়াল, দোষ হল জগদানন্দের, দোষ হল শ্রীচৈতন্যের। কিন্তু সে নিন্দা প্রভু গ্রাহ্য করলেন না, তাঁর লৌকিক-লীলায় অতিভোজন করে জগদানন্দের সাধ মেটালেন।

এখন আবার ভক্তের সুখের জন্যে লেপ-তোষকে সম্মত হয়েছেন। স্বরূপ সুন্দর মীমাংসা করে দিয়েছে।

নীলাচলে সনাতন গোস্বামী এসেছে। তার গায়ে কণ্ডু। তা সত্ত্বেও প্রভু তাকে আলিঙ্গন করছেন। সেই কারণে সনাতন অত্যন্ত কুণ্ঠিত। সেই দুঃখের কথাই বলছে জগদানন্দকে। আমার গায়ের কণ্ডুরস প্রভুর শরীরে লাগছে, আমার এ অপরাধের বুঝি নিস্তার নেই। আমি দূরে সরে থাকতে চাইলেও দূরে থাকতে দিচ্ছেন না, বারে-বারেই বুকে টেনে নিচ্ছেন।

জগদানন্দ বললে, আপনি এক কাজ করুন, বৃন্দাবনে চলে যান।

প্রভুকে সেই কথাই বলতে এল সনাতন। অনুমতি করুন, রথযাত্রার পর আমি বৃন্দাবনে চলে যাই।

এ কার যুক্তি?

জগদানন্দের।

প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বাক্যে জগদানন্দকে তিরস্কার করতে লাগলেন।

সেদিনের ছোকরা জগা, তার এত অহঙ্কার সে তোমাকে উপদেশ দেয়। তুমি গুরুতুল্য সম্মানিত মহাজন, তোমাকে পরামর্শ! নিজের কদর জানে না, বালকের মত ব্যবহার করে। যে তুমি আমার উপদেষ্টা, সেই তোমাকেই কিনা উপদেশ!

সনাতন বললে, এতক্ষণে বুঝলাম জগদানন্দ তোমার কত আপনার জন! তার কী সৌভাগ্য, তোমার মুখের তিরস্কার পায়! তার জন্যে আত্মীয়তার সুধা, আমার জন্যে গৌরবস্তুতির তিক্ততা।

শেষ পর্যন্ত জগদানন্দই বৃন্দাবন চলল।

প্রভু বললেন, আমার উপরে রাগ করে যাচ্ছ?

না, তা কেন? বৃন্দাবন দেখিনি এখনো, দেখে আসি। তুমিই তো এত দিন যেতে দাওনি। এবার আর বাধা দিও না।

প্রভু হাসলেন। দিলেন অনুমতি। পথ-ঘাটের সুবিধে-অসুবিধে বুঝিয়ে দিলেন। আর বললেন, সনাতন মথুরায় আছে, তার সঙ্গে যেন সে থাকে।

সনাতনকে আরো বোলো, আমিও শিগগীরই যাচ্ছি।

জগদানন্দ সনাতনের সঙ্গে এসে মিলল মথুরায়।

একদিন সনাতনকে আহারে নিমন্ত্রণ করল জগদানন্দ।

সনাতন খেতে এল, মাথায় তার রক্তবর্ণ কাপড় বাঁধা। জগদানন্দ মনে করল এ বুঝি প্রভুর প্রসাদী বস্ত্র। মনে করতেই প্রেমাবেশ হল।

জিজ্ঞেস করল, এ রাতুল বসন কোথায় পেলে?

মুকুন্দ সরস্বতী দিয়েছে।

কে দিয়েছে?

মুকুন্দ সরস্বতী।

তার মানে তুমি অন্য সন্ন্যাসীর বহির্বাস মাথায় বেঁধেছ? আমার প্রভুর পরিহিত বসন নয়? জগদানন্দ ভাতের হাঁড়ি তুলে সনাতনকে মারতে গেল।

সনাতন লজ্জিত মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল। তার এই নতনম্র ভঙ্গি দেখে জগদানন্দও স্তব্ধ হল।

একেই বলে চৈতন্যনিষ্ঠা। বললে সনাতন। এ দেখবার জন্যেই অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র মাথায় বেঁধে এসেছি। পণ্ডিত, দেখলাম কাকে বলে প্রেম, কাকে বলে নিয়তস্থিতি।

দুজনে আহারে বসল। দুজনের এক তৃপ্তি। তারপর আহারান্তে

প্রভুমিলনক্ষুধায় দুজনে কাঁদতে বসল। দুজনের আবার এক বিরহ।

প্রভু এখানে আসবেন বলেছেন। তুমি তাঁর জন্যে জায়গা রেখো।

দু' মাস ব্রজমণ্ডলে থেকে জগদানন্দ নীলাচলে ফিরে চলল। সনাতন প্রভুর জন্যে কিছু উপহার পাঠাল। কিছু রাসস্থলীর বালি, গোবর্ধনের শিলা, পাকা শুকনো পীলু ফল আর গুঞ্জামালা।

তারপর প্রভু তাকে নবদ্বীপে পাঠালেন শচীদেবীকে তাঁর প্রণাম দেবার জন্যে। আমার হয়ে তুমি তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ কোরো। বোলো, আমি তাঁর সেবা ছেড়ে যে সন্ন্যাস নিয়েছি, এতে আমি পাগলের মত কাজ করেছি, আমার ধর্মনাশ হয়েছে। আরো বোলো, তিনি যেন তাঁর অবোধ ছেলের অপরাধ মার্জনা করেন। আমি তো চিরদিন তাঁরই অধীন। তাঁরই আদেশে আমি নীলাচলে আছি, যতদিন মর্তকায়ায় জীবন আছে, ততদিন নীলাচল ছাড়ব না। বোলো, রোজ আমাকে মা যেমন স্মরণ করেন, তেমনি আমিও রোজ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। মায়ের যেদিনই ইচ্ছে হবে আমাকে খাওয়াবেন সেদিনই আমি তাঁর হাতের রান্না খেয়ে আসব। আর আমার মায়ের জন্যে জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র নিয়ে যাও, নিয়ে যাও মহাপ্রসাদ।

মাতৃভক্তগণের প্রভু হয়ে শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥

জগদানন্দ এক মাস থাকল নবদ্বীপে, তারপর ফিরে যাবার সময় শচীদেবীর অনুমতি নিয়ে অদ্বৈতের কাছে অনুমতি চাইল। প্রভুকে জানাবার জন্যে অদ্বৈত দুই পয়ারে অর্থাৎ চারছত্রে একটি তর্জা রচনা করে দিল। সেই আউল-বাউলের তর্জা। জগদানন্দ মুখস্থ করে নিল, কিন্তু প্রভু ছাড়া সে প্রহেলিকার অর্থ কেউ বুঝল না।

সেই তর্জার মধ্যে আছে বুঝি প্রভুর তিরোধানের ইঙ্গিত।

বাউলকে বোলো, লোকে বাউল হয়েছে। হাটে আর চাল বিকোয় না। কারো আর কাজে ব্যস্ততা নেই। এ কথা আরেক বাউলই বলে পাঠাচ্ছে সেই বাউলকে।

জগদানন্দের মুখে তর্জা শুনে প্রভু অল্প একটু হাসলেন। বললেন, আচ্ছা, তাই হবে।

॥ ৪১ ॥

বাসুদেব সার্বভৌম

দণ্ডভঙ্গের পর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রভু একাই এগিয়ে চললেন। সর্বাগ্রে একাই ঢুকলেন পুরীতে। একাই মন্দিরের দিকে ছুটলেন।

একাকী না গেলে যে সার্বভৌমকে উদ্ধার করা হয় না।

নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র, নামে বাসুদেব, উপাধিতে সার্বভৌম। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ন্যায়ে ও বেদান্তে বিশেষ অধিকার। কুতর্ক-কর্কশ। অদ্বৈত-পন্থী, নির্বিশেষে ব্রহ্মবাদ স্থাপনই একমাত্র উপজীব্য। ভক্তিবাদের ধারও মাড়ায় না। যদি কেউ ভক্তির কথা তোলে তর্কে তার নিরসন করে।

প্রভু মন্দিরে ঢুকে জগন্নাথকে দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন। ছুটলেন আলিঙ্গন করতে। কিন্তু রত্নবেদীতে পৌঁছুবার আগে মন্দিরের মধ্যেই প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

ছড়িদাররা মারতে ছুটল।

দৈবক্রমে মন্দিরে তখন সার্বভৌম উপস্থিত। সে এগিয়ে এসে ছড়িদারদের বাধা দিল। রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত, গুরু ও মন্ত্রী সার্বভৌমের আদেশ অমান্য করা অর্থ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন্ করা। ছড়িদাররা তাই নিরস্ত হল।

কিন্তু সার্বভৌমের বারণ করার কারণ কী?

ভক্তিবাদের বিরোধী হলেও কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ কী তা সার্বভৌমের জানা ছিল। এই মূর্ছাপ্রাপ্ত লোকটির শরীরে যে সেই প্রেমলক্ষণ পরিস্ফুট।

তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল সার্বভৌম।

কিন্তু প্রভুর মূর্ছা যে ভাঙে না।

সার্বভৌম শিষ্যদের বললে, এঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো।

শিষ্যরা প্রভুকে বহন করে সার্বভৌমের বাড়িতে নিয়ে গেল। পবিত্র স্থানে শুইয়ে দিল। কিন্তু দেহ একেবারে নিস্পন্দ, শ্বাস আছে কি নেই বোঝা যায় না। সার্বভৌম প্রভুর নাকের সামনে তুলো ধরল, দেখল তুলো অল্প-অল্প নড়ছে। তাহলে প্রাণ আছে এখনো! ধৈর্য ধরল সার্বভৌম।

কিন্তু এই তরুণ সন্ন্যাসী কে? এত রূপ সে কোত্থেকে নিয়ে এল? এ তো শুধু রূপ নয়, এ ভাব, এ মহাভাব! সার্বভৌম জানে এ সুদীপ্ত মহাভাব

শুধু নিত্যসিদ্ধ ভক্তেই সম্ভব। তবে, সন্দেহ নেই, এ সন্নাসী মহাভক্ত।

কতক্ষণে বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে—সার্বভৌম অপেক্ষা করতে লাগল।

ওদিকে প্রভুর সঙ্গীরা চলে এসেছে মন্দিরে। কিন্তু প্রভু কোথায় ?

সিংহদ্বারে লোকের বলাবলি শোনা গেল, কে এক সন্ন্যাসী জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, তার জ্ঞান হয় না দেখে সার্বভৌম ভটচাজ তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে।

এ নিশ্চয়ই আমাদের গৌরহরি। সঙ্গীরা স্থির হল। কিন্তু সার্বভৌম কে ? তার বাড়ি কোথায় ?

এমন সময় মন্দিরে গোপীনাথ আচার্যকে দেখা গেল। গোপীনাথ আগে নবদ্বীপে থাকত, প্রভুর ভক্ত—ভক্ত শুধু নয়, তত্ত্বজ্ঞ। অর্থাৎ সে জানে ও বিশ্বাস করে প্রভুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাছাড়া সে সার্বভৌমের ভগ্নীপতি। মুকুন্দ তাকে চেনে। ভালোই হয়েছে, আপনার দেখা পেয়েছি। লোকমুখে শুনে অনুমান করছি প্রভু সার্বভৌমের বাড়িতে আছেন। আমাদের সেখানে নিয়ে চলুন। আমাদের আগে প্রভু পরে জগন্নাথ।

গোপীনাথ সবাইকে সার্বভৌমের বাড়িতে নিয়ে এল। সবাই দেখল ধূলিধূসর দেহে অচেতন হয়ে শুয়ে আছেন গৌরহরি। মুখ দেখে সকলের সুখ হলেও অবস্থা দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হল। সার্বভৌম যথারীতি সেবা করছে, কিন্তু কতক্ষণে প্রভু বাহ্যজ্ঞান ফিরে পাবেন কেউ বলতে পারে না।

প্রভুকে তো দেখলেন, এবার তবে জগন্নাথ দর্শন করে আসুন। সার্বভৌম তার ছেলে চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়ে দিল, ঠিকমত দেখিয়ে নিয়ে এস।

সঙ্গীরা ফিরে এসে দেখল প্রভু তেমনি সমাহিত, তাঁর ধ্যানমূর্ছা ভাঙেনি। সার্বভৌম ধ্যানভঙ্গের আশায় প্রভুর পায়ের কাছটিতে চুপ করে বসে আছে।

ভক্ত দল উচ্চকণ্ঠে নামকীর্তন আরম্ভ করল।

তৃতীয় প্রহরে প্রভুর ধ্যান ভাঙল। তিনি হরি-হরি বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠে বসলেন।

সার্বভৌম কাছে এসে নমস্কার করল প্রভুকে। বললে, নমো নারায়ণ।

সন্ন্যাসীকে এভাবে সম্ভাষণ করাই বিধেয়।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে প্রভু কী বললেন ? প্রভু বললেন, কৃষ্ণে মতিরস্তু।

তোমার কৃষ্ণে মতি হোক। মতি হলেই রতি জাগবে। আর রতি যদি জাগে তাহলে সর্বাবস্থায় আনন্দ। সর্বাবস্থায় কৃষ্ণস্ফূর্তি।

কৃষ্ণে মতিরস্তু শুনে সার্বভৌম বুঝলে এ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। মনে মনে স্থির করল একে বেদান্তবৈরাগ্য শেখাব, নিয়ে আসব অদ্বৈতমার্গে। যে সন্ন্যাসী সে বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত হবে না? বেদান্ত ছাড়া সন্ন্যাসকে কে রক্ষা করবে?

সার্বভৌম বললে, আজ আমার এখানেই আপনারা ভিক্ষে করবেন। আপনারা সমুদ্র-স্নান করে আসুন।

সঙ্গীদের নিয়ে প্রভু সমুদ্র-স্নান করে এলেন। বসলেন ভোজনে। সার্বভৌম বিরাট আয়োজন করেছে। পাছে প্রভু প্রত্যাখ্যান করে নিজেই লেগেছে পরিবেশনে।

আমি এত সব পিঠা-পানা খেতে পারব না। প্রভু হাত গুটোলেন। এসব আমার সঙ্গীদের দাও। আমাকে কিছু লাফরা তরকারি দিলেই চলবে।

তা কী করে হয়? সার্বভৌম বললে, এ সমস্তই জগন্নাথকে নিবেদন করা হয়েছে। আপনি আস্বাদ করে দেখুন জগন্নাথের মুখে রুচবে কিনা।

পরিপূর্ণ করে খাওয়াল প্রভুকে।

তুমি আর একা-একা মন্দিরে যেও না। সস্নেহে বললে সার্বভৌম, হয় আমাকে সঙ্গে নিয়ো, নয় আমাকে বোলো, আমি লোক দিয়ে দেব।

প্রভু বললেন, না, আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাব না, গরুড়স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে দর্শন করব।

তারপর প্রভুর জন্যে একটি নির্জন বাসস্থানও যোগাড় করে দিল সার্বভৌম।

গোপীনাথকে বললে, এবার তবে সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের কথা বলো।

সার্বভৌম যা জানল তা তার মতে এমন কী চমৎকার! নবদ্বীপে বাড়ি, নাম বিশ্বম্ভর, বাপ জগন্নাথ মিশ্র। নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। নীলাম্বর সার্বভৌমের পিতা বিশারদের সমধ্যায়ী। সন্ন্যাস নিয়েছে কেশব ভারতীর কাছে। এর সন্ন্যাস-নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

নামটি সুন্দর, সর্বোত্তম। বললে সার্বভৌম, কিন্তু ভারতী-সম্প্রদায়টা মধ্যম-শ্রেণীর।

গোপীনাথ বললে, প্রভুর সেই বাহ্যাপেক্ষা নেই। কোন্ সম্প্রদায় ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা মানী, কোনটা অমানী, এসব বিচার করবার তাঁর অবকাশ ছিল না। কোনোপ্রকারে সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাই সন্ন্যাস নেবার সময় সম্প্রদায় নিয়ে মাথা ঘামাননি। মিথ্যে গৌরবের প্রতি তাঁর একবিন্দু মোহ নেই।

কিন্তু ওর এখন পূর্ণ যৌবন, সার্বভৌম চিন্তিত মুখে বললে, এ সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করবে কী করে? চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে কী করে শাসন করবে? রক্ষণ-শাসনের একমাত্র উপায় বেদান্ত। আমি একে বেদান্ত পড়াব, বৈরাগ্য শেখাব, নিয়ে যাব অদ্বৈতমার্গে। আর যদি এ সম্মত হয়, অন্য কোনো ভালো সম্প্রদায়ের থেকে একে নতুন করে সন্ন্যাস নেওয়াব।

গোপীনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক বিতণ্ডা করল কিন্তু সার্বভৌম টলল না। বললে, তোমাদের সন্ন্যাসী কী বলে?

প্রভু সার্বভৌমকে উদ্দেশ করে বললে, আমি অজ্ঞ বালক, আপনি জগদগুরু, সর্বলোকের হিতসাধক। বেদান্ত পড়িয়ে সন্ন্যাসীদের কত উপকার করছেন। আপনাকেই আমি গুরু বলে মানছি। আপনিই তো আমাকে মন্দির থেকে তুলে আপনার বাড়িতে নিয়ে এলেন। আপনার সঙ্গ পাব বলেই তো আমার নীলাচলে আসা। আপনি এখন যা বলবেন তাই হবে।

তবে বেদান্তের পাঠ নাও। বেদান্তই সন্ন্যাসীর বিধি, সন্ন্যাসীর ধর্ম।

বিনীত ভঙ্গিতে তদ্গত-তন্ময় হয়ে প্রভু পাঠ শুনতে বসলেন।

দিনের পর দিন, সাত-সাতদিন পড়ানো হচ্ছে কিন্তু ছাত্রের মুখে একটিও কথা নেই। সার্বভৌম ভাবছে এ কি বদ্ধ পাগল না নির্বোধ? তবে হাঁ-না ভালো-মন্দ কিছুই বলছে না কেন? তবে কি এ দাম্ভিক? তাও তো মনে হয় না। এমন নম্র ও বিনয়ী ছাত্রই বা ক'জন আছে?

শেষে অসহিষ্ণু হয়ে সার্বভৌম জিজ্ঞেস করলে, সাতদিন ধরে পড়াচ্ছি, হাঁ-না কিছু বলছ না কেন? বুঝছ কি বুঝছ না অন্তত সেটুকু বলবে তো?

আমার শোনবার কথা আমি শুনে যাচ্ছি। বিনয়বচনে বললেন গৌরহরি।

আমার ব্যাখ্যা বুঝতে পারছ তো?

আমি মূর্খ, আমার পড়াশুনা কিচ্ছু নেই, তাই কিছুই বুঝছি না।

বুঝছ না তো জিজ্ঞেস করছ না কেন? চুপচাপ বসে থাকলে চলে কী করে?

বিনম্র মুখে প্রভু বললেন, বেদান্তসূত্রের অর্থ তো পরিষ্কার, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যাই মেঘাচ্ছন্ন।

সার্বভৌম স্তব্ধ হয়ে রইল। এ অর্বাচীন সন্ন্যাসী বলে কী?

অবশ্য আপনার ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্যকেই অনুসরণ করছে। আমি বলতে চাচ্ছি শঙ্করভাষ্যই বিপরীত। এখন আমার বক্তব্যটুকু শুনুন।

শঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নির্গুণ নিরাকার নির্বিশেষ উপাধি-বর্জিত। আর এই ব্রহ্মবস্তু একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা লভ্য। সুতরাং ভক্তি-উপাসনা অর্থহীন।

এখন, ব্রহ্ম-র অর্থ কী? যিনি বড়, বৃহত্তম তিনিই ব্রহ্ম। আবার যিনি অন্যকে বড় করেন তিনিও ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মে শক্তি আছে, শক্তি না থাকলে বড় করেন কী করে? তা হলে ব্রহ্ম শক্তিমান। আর যিনি বৃহত্তম তাঁর বৃহত্তমতা গুণ ছাড়া আর কী? তা হলে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ। যা সবিশেষ তাই সাকার। যেখানে শক্তি সেখানেই বৈভব, সেখানেই প্রকাশবৈচিত্র্য। তা হলে ব্রহ্ম ঐশ্বর্যবান। ব্রহ্মই তো ভগবান।

শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরাকার বলেও নিরাকারে ধরে রাখতে পারেনি। ব্রহ্মের হাত নেই পা নেই চোখ নেই বলছে, আবার সেই সঙ্গে বলছে, তিনি গ্রহণ করেন, তিনি চলেন, তিনি দেখেন। হাত না থাকলে ধরেন কী করে? পা না থাকলে চলেন কী করে? নিরিন্দ্রিয় হলে ইন্দ্রিয়ের কাজ থাকে কেন? আরো দেখুন। বলছে, এই আত্মা বহু অধ্যয়নে পাওয়া যায় না, না বা মেধায়, না বা বহুবেদশ্রবণে, এই আত্মা যাকে বরণ করেন কৃপা করেন, একমাত্র তারই কাছে তিনি নিজের তনু বা স্বরূপকে প্রকাশ করেন। তা হলে আত্মার তনু আছে, শরীর আছে। যদি তিনি অশরীরী তবে আবার তিনি সতনু হন কী করে? এর সমাধান কী? এর সমাধান হচ্ছে, ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নেই, প্রাকৃত আকার নেই, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নেই। ব্রহ্মের দেহ শুধু সত্ত্বময়, চিন্ময়, অপ্রাকৃত। 'তাঁহার বিভুতি দেহ—সব চিদাকার।' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত, অনন্তগুণসমন্বিত পূর্ণানন্দঘনমূর্তি।

শোনো আরো বলছি।

ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। বলতে পারো জগৎ যদি ঈশ্বরের পরিণাম হয় তবে তো ঈশ্বর বিকারী হলেন। না, নিজের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হয়েও অবিকৃত থাকেন। জগৎ ভ্রম নয়, মায়া নয়, মিথ্যা নয়, শুধু জীবদেহে আত্মবুদ্ধিই মিথ্যা। অদ্বৈতবাদীরা যে ভ্রম বলে সেটাই ভ্রম। চোখের সামনে, চারদিকে, যা দেখছি তার আদৌ অস্তিত্ব নেই এ হতে পারে না। অস্তিত্ব আছে তবে এ নশ্বর, বিনাশশীল। একমাত্র ঈশ্বরই অনশ্বর, অবিনাশী।

শঙ্কর জীবে-ব্রহ্মে অভেদ করতে চেয়েছে, তাই তত্ত্বমসি-র মানে করতে

চেয়েছে, তুমি জীব তুমিই সেই ব্রহ্ম। কিন্তু তত্ত্বমসি-র আরেক অর্থ বিধেয়। তস্য ত্বম—তত্ত্বম। অর্থাৎ তার তুমি। আর অসি, অর্থ, হও। তার মানে, হে জীব, তুমি ব্রহ্মের হও। তুমি ব্রহ্মের আছ। তুমি ব্রহ্ম নও, তুমি ব্রহ্মের একজন। তুমি তাঁর দাস, দাসানুদাস। আর এর অর্থই ভক্তি।

তবেই দেখতে পাচ্ছেন সম্বন্ধ বা প্রতিপাদ্য বিষয় হল ভগবান, অভিধেয় বা জীবের কর্তব্য হল সাধন-ভক্তি আর প্রয়োজন হল ভগবৎপ্রেম। এই তিন বস্তুর বাইরে শঙ্করাচার্য যা-যা বলেছে সমস্তই কল্পনাবলে। শঙ্করাচার্য মহাদেবের অবতার। মহাদেব হয়ে শঙ্কর বেদের কল্পিত অর্থ করবেন কেন? তাও ঈশ্বরের আদেশে। শ্রীকৃষ্ণ শিবকে বললেন, তুমি আগমশাস্ত্র দ্বারা সকলকে আমার থেকে বিমুখ করো আর আমাকেও গোপন করে রাখো, যাতে সকলে বিষয়সুখে মত্ত হয়ে প্রজাবৃদ্ধিরই চেষ্টা করে।

আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

সমস্ত শুনে সার্বভৌম জড়বৎ নিশ্চল।

নির্বিশেষবাদ খণ্ডন হল। স্থাপন হল সবিশেষবাদ। সম্বন্ধ ভগবান, অভিধেয় ভক্তি, প্রয়োজন প্রেম, সাব্যস্ত হল নতুন তত্ত্ব। সার্বভৌমের মুখে কথা সরে না। একেই আমি কিনা অর্বাচীন ভেবেছিলাম।

এই নবীন সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই মানুষ নয়।

জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকলেও, হে নাথ, আমি জানি, আমি তোমারই অধীন, আমি তোমার থেকেই জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তুমি আমার অধীন নও। তুমি আমার থেকে জন্মাওনি। ঢেউ আর সমুদ্রে ভেদ না থাকলেও এ নিশ্চিত যে সমুদ্রেরই ঢেউ, ঢেউয়ের সমুদ্র নয়।

অহঙ্কার ছাড়া আর কী আছে সন্ন্যাসে? দণ্ড ধরেই নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবে, কোথাও হাত জোড় করে না। ভগবান অন্তর্যামীরূপে সকল দেহেই অধিষ্ঠান করছেন তবু ধর্মধ্বজী সন্ন্যাসী তাদের প্রণাম করে না। জীবের স্বভাবধর্ম ঈশ্বরভজন, তা না করে নিজেকে নারায়ণ বলে মানে। গর্ভবাসে যে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করলেন, যার প্রসাদে তার জ্ঞানবৃদ্ধি হল, সে আর কেউ নয় সে নিজে। যে জগতের পিতা মাতা ধাতা পিতামহ তাকে যে ভক্তি করে সেই তো সুপুত্র! পুত্র কি নিজেই পিতা?

তবে প্রভু, তুমি সন্ন্যাসী কেন? জিজ্ঞেস করল সার্বভৌম।

আমি সন্ন্যাসী নই, আমি কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ।

সার্বভৌমের পাণ্ডিত্যগর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেল, আর গর্ব নষ্ট হতেই চিত্তে ভগবৎতত্ত্ব স্ফুরিত হল, নয়নে লাগল দিব্যস্পর্শ।

দেখল প্রভু তার সামনে ষড়ভুজ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

সার্বভৌম পদতলে লুটিয়ে পড়ল। তার হৃদয়ের উপর প্রভু তাঁর পাদপদ্ম রাখলেন। সার্বভৌমের দেহে সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। দীন-হীনের মত কাঁদতে লাগল সার্বভৌম।

খবর পেয়ে ছুটে এল গোপীনাথ। এ কী অসম্ভব কথা, সেই শুষ্কজ্ঞানী তার্কিক পণ্ডিত ভক্তিরসের ভাবুক হয়ে গিয়েছে!

তারপর একদিন প্রত্যুষে মন্দির থেকে প্রসাদ নিয়ে প্রভু সার্বভৌমের ঘরে পৌঁছুলেন।

ঘুম থেকে উঠে সার্বভৌম বললে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

এ কেমন হল? কোনোদিন ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণনাম বলিনি তো! এ কে বলাল?

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পেল প্রভুকে। পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল সার্বভৌম।

প্রভু তাকে প্রসাদ দিলেন।

সার্বভৌমের তখনো প্রাতঃকৃত্য হয়নি, মুখধোয়া হয়নি, স্নান-সন্ধ্যা হয়নি, তবু সে অকাতরে সেই প্রসাদান্ন খেয়ে নিল।

প্রসাদ তো সাধারণ অন্ন নয়, চিন্ময় বস্তু। কৃষ্ণের অধরস্পর্শে সুস্বাদুতম।

প্রসাদে সার্বভৌমের শ্রদ্ধা দেখে প্রভু সার্বভৌমকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, আজ আমার ত্রিভুবন জয় হল। সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয়েছে।

দুজনে বাহুবদ্ধ হয়ে নাচতে লাগল।

গোপীনাথ পরিহাস করে বললে, সে কী, তুমি নাচছ কী বলে? এ কি নাচ হচ্ছে, না, লাফাচ্ছ পাগলের মত? তোমার পড়ুয়ারা কী বলবে? বাইরের লোকই বা কী বলবে?

সার্বভৌম বললে, যার যা খুশি বলুক, নিন্দে করুক, আর তর্ক-বিচার করব না। হরিরসের মদিরা পান করেছি, এখন আমি নাচব লাফাব মাটিতে পড়ব ধুলোয় গড়াগড়ি দেব—কে আর আমাকে বাধা দেয়?

সার্বভৌমের সমস্ত অভিমান খণ্ডন হয়েছে। বুঝেছে চৈতন্যচরণ ছাড়া আশ্রয় নেই, ভক্তি ছাড়া নেই শাস্ত্রব্যাখ্যা।

॥ ৪২ ॥

রামানন্দ রায়

দাক্ষিণাত্য জয় করতে চলেছেন প্রভু।

সার্বভৌম বলে দিল, তুমি গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করো।

কে রামানন্দ রায় ?

বিদ্যানগরের অধিকারী, জেলাশাসক, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি। পিতার নাম ভবানন্দ রায়। বংশীয় পদবী পট্টনায়ক, রাজসম্মানে রায় হয়েছে।

সে বিষয়ীর সঙ্গে দেখা করব কেন ?

বিষয়ী বলে তাকে উপেক্ষা করো না। তার মত রসিক ভক্ত তুমি পাবে না কোথাও। পাণ্ডিত্য আর ভক্তি চূড়ান্ত হয়ে তার মধ্যে মিশেছে। তার কথাবার্তা আমি আগে কিছুই বুঝিনি, তাকে বৈষ্ণব বলে বিদ্রূপ করেছি। বললে সার্বভৌম, এখন তোমার কৃপায় তার তত্ত্ব আমার কাছে পরিস্ফুট হচ্ছে।

গোদাবরীতীরে এসে পৌঁছুলেন প্রভু। নদী পার হলেন। স্নান করে ঘাটের কিছু দূরে বসে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে লাগলেন।

চতুর্দোলায় চড়ে বাজনা বাজিয়ে কে একজন যেন আসছে স্নান করতে। সমারোহ দেখে মনে হয় কোন রাজপুরুষ। সঙ্গে লোকজনের মধ্যে কজন আবার বৈদিক ব্রাহ্মণ।

দেখে প্রভু বুঝলেন এই রামানন্দ রায়।

বিধিমত স্নান-তর্পণ করে উঠে রামানন্দের চোখ পড়ল—অদূরে কে ঐ সন্ন্যাসী বসে আছে ? বলবন্ত বিশাল দেহ, পরনে অরুণ বস্ত্র, শত সূর্যের মত দীপ্তিমান। বিস্ময়ে এক মুহূর্তে স্তব্ধ থাকল রামানন্দ, তারপর এগিয়ে গিয়ে

কেন কে জানে, সন্ন্যাসীকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করল।

উঠে দাঁড়ালেন প্রভু। বললেন, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রামানন্দ ?

হ্যাঁ, আমিই সেই পাপিষ্ঠ শূদ্রাধম।

প্রভু দু-হাত বাড়িয়ে রামানন্দকে সুদৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। প্রেমাবেশে দুজনেই অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

বৈদিক ব্রাহ্মণের দল ক্ষুণ্ণ হল। সন্ন্যাসী হয়ে শূদ্রকে আলিঙ্গন করে কে ? আর তুমি এমন একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ, তোমার কি এসব চাঞ্চল্য শোভা পায় ?

বিজাতীয় পরিবেশ বুঝে প্রভু ভাব সম্বরণ করলেন। বললেন, সার্বভৌম তোমার কথা বলে দিয়েছিল। তোমার জন্যেই আমার এখানে আসা।

সার্বভৌমের কৃপায় তোমার চরণদর্শন করতে পেলাম। আমার মনুষ্যজন্ম আজ সার্থক হল। রাজসেবী বিষয়ী জেনেও আমাকে তোমার আলিঙ্গন দিলে। বেদভয় মানলে না। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ছাড়া আর কে ? একমাত্র ঈশ্বরই তো পামরকে উদ্ধার করতে নিন্দ্যকর্ম করতে পারেন।

তুমি এসব কী বলছ ? আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমিই বরং তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ পেলাম। আমার কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত করবার জন্যেই তো সার্বভৌম আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমাকে কৃষ্ণকথা শোনাও।

সেদিন সন্ধ্যায়ই আবার দেখা হল নির্জনে।

প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, জীবের সাধ্যবস্তু কী ? কী তার অভীষ্ট ?

রামানন্দ বললে, বিষ্ণুভক্তি।

কী উপায়ে তা পাবে ?

শুধু স্বধর্ম আচরণ করে। যার যা স্বধর্ম তা পালন করলেই পরিণামে মিলবে হরিভক্তি।

প্রভু বললেন, এহ বাহ্য আগে কহ আর। এ তো বাইরের কথা। ভিতরের কথা, অন্তরের কথা বলো।

রায় বললে, কৃষ্ণে কর্মার্পণ। যা কিছু কাজ করো কৃষ্ণে অর্পণ করো। তোমার অধিকার—কর্মে, ফলে নয়।

প্রভু বললেন, এও বাইরের কথা, ভিতরের কথা বলো।

তাহলে স্বধর্মত্যাগ—সর্বধর্মত্যাগ। কর্ম করে ফল অর্পণ নয়, কর্ম করবার আগেই আত্মসমর্পণ। ফলদান নয়, আত্মদান।

এও বাহ্য আগে বলো।

রায় বললে, তাহলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। আগে জানতে হবে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আশ্রয়স্থল। আগে না জেনে নিলে সমর্পণ হবে কী করে? শুধু উপদেশ শুনে? শুধু পাপ-পুণ্য বিচার করে? শুধু মোক্ষ বা ভোগের আকাঙ্ক্ষায়?

প্রভু এও ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, এও বাহ্য, অন্য কথা বলো।

তাহলে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—শুদ্ধা ভক্তি। বললে রামানন্দ, কৃষ্ণকে ভগবান ভাবতে গেলেই ঐশ্বর্যবুদ্ধি জাগে। ঐশ্বর্যবুদ্ধি ভক্তিকে শিথিল করে দেয়। কিন্তু যদি ভাবা যায় কৃষ্ণ আপনজন, আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়, তবেই বুঝি তাঁকে পাওয়া যায় অন্তরঙ্গ করে।

প্রভু হেসে বললেন, এও হয়, তবে দেখ আরো কিছু পাও কিনা।

রামানন্দ উল্লসিত হয়ে বললে, প্রেমভক্তি। শুদ্ধা ভক্তির সঙ্গে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা মেশালেই প্রেমভক্তি। ক্ষুধা না থাকলে খাদ্য কী। বস্তু মেলে একমাত্র লোভে, একমাত্র ব্যাকুলতায়। আর্তিই টেনে আনে আর্তবন্ধুকে।

প্রভু হেসে বললেন, এও হয়। দেখ নিগূঢ়তর আরো কিছু আছে কিনা।

আছে। দাস্যপ্রেম। জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবক, কৃষ্ণানুজীবী।

এও হয়। আরো বলো।

সখ্যপ্রেম। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধের মধ্যে ব্যবধান থাকে। গৌরববুদ্ধিতে সেবার সঙ্কোচ আসে, সেবা সর্বাঙ্গীণ হতে পারে না। সখ্যপ্রেম অভেদ-বুদ্ধি। তখন কার বা গাত্র, কার বা চরণ। তখন কে কার কাঁধে ওঠে, কে কার উচ্ছিষ্ট খায়।

প্রভু বললেন, এহোত্তম। আরো বলো।

রামানন্দ বললে, বাৎসল্যপ্রেম। সখ্যে কৃষ্ণ সমান-সমান, বাৎসল্যে কৃষ্ণ ছোট দুর্বল দীনহীন। তখন তাকে তাড়ন-তর্জন করা যায়, বাঁধা যায় দড়ি দিয়ে। বাৎসল্যে বৃহত্তমকে ক্ষুদ্রতম মনে করা, সমর্থতমকে অক্ষমতম মনে করাই রীতি। বাৎসল্যে কৃষ্ণের সেই বালকভাব। নন্দের পাদুকা মাথায় নিয়ে চলেছে, গোষ্ঠের পথে। মায়ের হাতের প্রহার এড়াবার জন্যে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, মিথ্যে কথা বলছে, লজ্জিত-কুণ্ঠিত হচ্ছে। নিজে মুক্তিদাতা হয়ে বন্ধন মানছে।

এহোত্তম। প্রভু বললেন, প্রেমের আরো কোনো পরিপক অবস্থা থাকে তো বলো।

রামানন্দ বললে, কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার। কান্তারতি বা মধুরে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য সব আছে। তাই মধুরই পরাকাষ্ঠা। মধুরেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

আরো যদি থাকে, আরো বলো।

বলছি। কান্তাপ্রেমের মধ্যে রাধার প্রেমই শিরোমণি। রাধাই কৃষ্ণের জন্যে কাঁদছে না, কৃষ্ণও তার সমস্ত আরাধনার ধন রাধিকাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভগবানের সেবা করতে না পারলে ভক্ত যেমন উৎকণ্ঠিত তেমনি ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে না পারলে ভগবানও উৎকণ্ঠিত।

বলো আরো বলো। এবার রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করো।

তুমি যা বলাচ্ছ তাই বলছি। হৃদয়ে প্রেরণা দিচ্ছ তাই কথা হয়ে আসছে। ভালোমন্দ কী বলছি কিছুই জানি না।

প্রভু বললেন, তুমি আমাকে এত স্তুতি করছ কেন? আমি ব্রাহ্মণ বলে না সন্ন্যাসী বলে? শোনো, যে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু। তুমি কৃষ্ণজ্ঞ, তাই তুমি অব্রাহ্মণ হলেও, গৃহী হলেও, গুরু। সুতরাং শোনাও কৃষ্ণকথা।

রামানন্দ কৃষ্ণকথা বলতে লাগল। কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান। সমস্ত কারণের কারণ, সমস্ত অবতারের মূল। সচ্চিদানন্দতনু। রসে শক্তিতে ও ঐশ্বর্যে সর্বাতিশায়ী।

প্রভু থামিয়ে দিয়ে বললেন, এবার রাধাতত্ত্ব বলো।

রাধিকা সেই শক্তি যা কৃষ্ণকে আহ্লাদিত করে। আহ্লাদিনীর সার কথা প্রেম, আনন্দ-চিন্ময়রস। প্রেমের সার মহাভাব। আর মহাভাবের মহত্তমা প্রতিমাই রাধিকা। একা রাধিকাই কৃষ্ণের সমগ্র বাসনা পূর্ণ করতে সমর্থা, আর কেউ নয়। রাধিকার মাধ্যমেই কৃষ্ণ নিজেকে নিজে আস্বাদন করে। রাধা ছাড়া কৃষ্ণের গতি নেই। রাধার গুণের পার পাওয়াও কৃষ্ণের অসাধ্য।

এ তো প্রেমতত্ত্ব জানলাম। প্রভু বললেন, রাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ত্ব শোনাও।

কৃষ্ণের বিলাস হল নিরন্তর খেলা। রক্তকপত্রকের সঙ্গে দাস্যরসের খেলা যশোদা-রোহিণীর সঙ্গে বাৎসল্যরসের খেলা, শ্রীদাম-সুদামের সঙ্গে সখ্যরসের

খেলা আর রাধাচন্দ্রাবলীর সঙ্গে মধুর রসের খেলা। খেলাছুট নয় কখনো কৃষ্ণ। আর যে প্রেয়সীর যে রকম প্রেম সেই প্রেয়সীর প্রেমে সেই রকম বশীভূত।

যা বলছ তা ঠিক। তবু দেখ আরো কিছু আছে কিনা।

রামানন্দ কুণ্ঠিত হয়ে বললে, এর বাইরে আমার আর বিদ্যেবুদ্ধি নেই। তবে আমি একটি প্রেমবিলাসের গান লিখেছি, জানি না সেটি তোমার মনোগত হবে কিনা। তবু যদি বলো তো শোনাই।

প্রভুর সম্মতি পেয়ে রামানন্দ গান ধরল:

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
ও সখি! সেসব প্রেমকাহিনী
কানুধামে কহবি বিছুরহ জানি॥
না খোজঁলু দূতী, না খোজঁলু আন।
দুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥
অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি॥

তাকে দেখলাম কি না দেখলাম, চোখের পলকে অনুরাগ জন্মাল। সে অনুরাগ নিরবধি বেড়েই চলল, কোথাও সমাপ্তি খুঁজে পেল না। আমি রমণী সে পুরুষ এই সম্বন্ধ থেকে অনুরাগ নয়। তুমি-আমি কোনো ভেদবুদ্ধি নেই। প্রেমের পেষণে মীনকেতু দুজনকে একজন করে ফেলেছে। এক দেহ দুই প্রাণ। এক দেহে দুই মনের খেলা, কখনো কৃষ্ণ কখনো রাধা, কখনো ভগবান কখনো ভক্ত। এই মিলন ঘটাতে দূতী খুঁজতে হয় নি। জন্মের আগে থেকেই পরস্পরের যে নিদারুণ উৎকণ্ঠা তাই আমাদের মিলিয়ে দিয়েছে।

প্রভু বুঝি এবার ধরা পড়ে যান—সেই ভয়ে নয়, সেই আনন্দে প্রভু রামানন্দের মুখ চেপে ধরলেন। আর নয়, আর হবে না বলতে।

প্রভু বললেন, এই সাধ্যবস্তুর শেষসীমা। তোমার অনুগ্রহে আমার পুরোপুরি জানা হল।

এখন বলো তবে সাধনের কথা।

বলেই রামানন্দ তাকিয়ে দেখল প্রভুর আর সন্ন্যাসরূপ নেই। এক

শ্যামল কিশোর দাঁড়িয়ে আছে মুখে বাঁশি নিয়ে। সামনে এক সোনার প্রতিমা। আরো দেখল, প্রতিমার উজ্জ্বল গৌরকান্তিতে শ্যামল কিশোরের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

মনে প্রবল সংশয় জাগছে। বললে রামানন্দ, তোমাকে তো আগে সন্ন্যাসী দেখেছিলাম, এখন তোমার মধ্যে শ্যামগোপরূপ দেখছি কেন? দেখছি তোমার সামনে এক স্বর্ণপ্রতিমা আর প্রতিমার অঙ্গকান্তিতে তুমি ঢাকা পড়েছ। এর অর্থ কী?

প্রভু বললেন, এ কিছু নয়, এ তোমার চোখের ভুল। রাধাকৃষ্ণে তোমার প্রগাঢ় প্রেম, তাই আমার মধ্যেও তুমি তোমার সেই ইষ্টের প্রকাশ দেখছ। যারা মহাভাগবত, স্থাবরে জঙ্গমে সর্বত্রই তারা ইষ্টস্ফূর্তি দেখে। তাই যা দেখছ তা আমার রূপ নয় তোমারই প্রেমচক্ষুর প্রসাদ।

প্রভু, তোমার চতুরালি এবার ছাড়ো। রামানন্দ দৃঢ়স্বরে বললে, আর আত্মগোপন কোরো না। আমি এতক্ষণে নিঃসংশয় হয়েছি। তুমি রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকৃত করে অবতীর্ণ হয়েছ, গৌরকান্তিতে শ্যামকান্তিকে আবৃত করেছ নিজের মাধুর্য নিজে আস্বাদন করবে বলে। প্রেমভক্তি বিতরণ করে নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেমময় করবে বলে। তোমাকে বুঝতে আর আমার বাকি নেই। এবার তবে তোমার স্বরূপ উন্মোচন করো।

প্রভু দেখালেন তাঁর স্বরূপ। 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।' শৃঙ্গাররসরাজ কৃষ্ণ আর মহাভাবস্বরূপিণী রাধিকা। দুয়ে মেলামেশা এক অপরূপ মূর্তি।

মহানন্দে রামানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

গায়ে হাত বুলিয়ে প্রভু তাকে সচেতন করলেন, তুমি ছাড়া এ রূপ কেউ দেখতে পারে নি। আমার তত্ত্বলীলারস তোমার কাছে পরিস্ফুট, তাই তোমার কাছেই এ রূপ প্রকাশিত হল।

দশ দিন থাকলেন বিদ্যানগরে। প্রতি রাত্রে মিলিত হয়ে দুজনে বিচিত্র কৃষ্ণকথায় মত্ত হয়ে রইলেন।

এবারে আমি যাই। প্রভু বিদায় চাইলেন। তুমি বিষয়কার্য ছেড়ে দিয়ে নীলাচলে গিয়ে থাকো।

নীলাচলে থাকব?

আমি তীর্থ সাঙ্গ করে নীলাচলে ফিরব। বললেন প্রভু, সেখানে দুজনে থাকব একসঙ্গে। কৃষ্ণকথারঙ্গে দিন কাটাব।

তীর্থ সেরে প্রভু বিদ্যানগরে ফিরতেই রামানন্দ উল্লাস করে উঠল। বললে, রাজা আমাকে অনুমতি দিয়েছে, আমি পুরীতে গিয়ে থাকব, তোমার চরণসেবায়ও দিন কাটাব।

চলো দুজনে একসঙ্গে যাই।

না, তুমি আগে যাও। আমার সঙ্গে অনেক হাতি-ঘোড়া, সৈন্যসামন্ত থাকবে। সে সব কোলাহল তোমার ভালো লাগবে না।

বেশ, আমি তবে এগোই, তুমি এসো পিছু পিছু। আর এই দেখ তোমার জন্যে দুখানি পুঁথি নিয়ে এসেছি—ব্রহ্মসংহিতা আর কৃষ্ণকর্ণামৃত।

রামানন্দ পুরীতে এসে মিলল প্রভুর সঙ্গে।

মন্দিরে কমললোচনকে দেখে এলে? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।

এবার যাই, দেখে আসি।

সে কী, তুমি জগন্নাথ দর্শন না করে এখানে এসেছ?

কী করব, মন আগে আমাকে এখানেই টেনে এনেছে। চরণ তো রথ মাত্র, হৃদয় সারথি। সারথি যে রথকে প্রথম এখানেই টেনে আনল।

না, না, যাও, শিগগির দর্শন করো।

দর্শন সেরে এসে রামানন্দ বসল প্রভুর কাছে। বললে, আমার সঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্র এসেছেন।

প্রভু উদাসীন হয়ে রইলেন।

আমি রাজাকে বললাম, বিষয়কর্ম আমার ভালো লাগছে না, যদি অনুমতি করেন পুরীতে গিয়ে চৈতন্যচরণে অবস্থিত হই। রাজা এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। তোমার নামে তাঁর প্রেমাবেশ হল। আমাকে বললেন, তুমি যে বেতন পেতে তাই পাবে, বিষয়কর্ম থেকে ছুটি দিলাম তোমাকে। তুমি গিয়ে সেই পরমকৃপালু ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করো। আরো বললেন, আমি ছার, আমি অধম, এ জন্মে আমার অধিকার নেই তাঁকে দর্শন করি। কিন্তু বলো, কোনো জন্মেও কি আমি ধন্য হব না দর্শনে? প্রভু, রাজার সে কী আর্তি!

রায়, ভক্তের প্রতি যার প্রীতি, তার প্রতিই ভগবান প্রসন্ন। বললেন প্রভু, তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ। রাজা যখন তোমাতে প্রীতিমান তখন তাঁকে ভাগ্যবান বলতে হয়। ভক্তের আরাধনা করে সে কৃষ্ণের প্রসাদ অর্জন করবে।

একবার প্রতাপরুদ্রকে সাক্ষাৎ করতে দিন।

না। প্রভু দৃঢ়স্বরে বললেন, রাজার সঙ্গে সন্ন্যাসীর দেখা হওয়া উচিত নয়।

। ৪৩ ।

রাজা প্রতাপরুদ্র

উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্র যেমন পরাক্রান্ত তেমনি গুণগ্রাহী। তার রাজধানীতে, কটকে, কালক্রমে তার কানে এল কোন এক মহাপুরুষ বাসুদেব সার্বভৌমকে কৃপা করেছে। প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে ডেকে পাঠাল।

তোমাকে কৃপা করেছে কে সে মহাপুরুষ? সার্বভৌমকে সসম্মান আসন দিয়ে রাজা জিজ্ঞেস করল।

তিনি এক সংসারত্যাগী বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী।

আমার সঙ্গে দেখা হয় না?

বোধ হয় না।

কেন?

বিষয়ীর সংস্পর্শের ভয়ে তিনি নির্জনে থাকেন, স্বপ্নেও রাজদর্শন করেন না। তা ছাড়া সম্প্রতি তিনি এখানে নেই। তীর্থ করতে দক্ষিণে গিয়েছেন।

তাঁর তীর্থ করবার দরকার কী?

মহাপুরুষদের তীর্থভ্রমণ তীর্থকে পবিত্র করবার জন্যে। আর সেই ছলে সংসারীদের উদ্ধার করা।

রাজা উদ্বিগ্ন বোধ করল। বললে, তুমি তাঁকে যেতে দিলে কেন? কেন পায়ে পড়ে তাঁকে নিবৃত্ত করলে না?

তাঁকে নিবৃত্ত করব কী। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ।

রাজা ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। সার্বভৌমের প্রত্যয়কে মর্যাদা দিল। বললে, তুমি বিজ্ঞতম, তোমার কথা আমি সত্য বলে মানছি, কিন্তু আমি আমার চোখ সার্থক করব কবে?

প্রভু অল্পকালের মধ্যেই ফিরবেন। বললে সার্বভৌম, কিন্তু তাঁকে রাখতে হলে তাঁর জন্যে একটি নির্জন স্থান দরকার।

রাজা বললে, কাশী মিশ্রের বাড়ি মন্দিরের কাছে, বেশ নির্জন জায়গা, সেখানে ব্যবস্থা করো।

নীলাচলে ফিরে প্রভু কাশী মিশ্রের বাড়িতেই উঠলেন। সার্বভৌম দেখা করতে গেল। বললে, যদি অভয় দাও একটা কথা নিবেদন করি।

প্রভু বললেন, করো। কিন্তু প্রার্থনা যোগ্য হলেই পূরণ করব নচেৎ নয়।

রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন।

কানে হাত দিলেন প্রভু, নারায়ণ স্মরণ করলেন। বললেন, অন্যায় কথা বলো কেন? আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে রাজদর্শন বা স্ত্রীদর্শন দুইই বিষতুল্য।

তুমি যা বললে তা সত্য। কিন্তু প্রতাপরুদ্র রাজা হলেও ভক্তোত্তম। সে জগন্নাথের সেবক।

হোক। তবু সে রাজা, সে বিষয়ী। কাঠের তৈরি নারীমূর্তি ছুঁলেও মনের বিকার ঘটে—তেমনি বেশে-বাসে নানা আয়োজনে-আড়ম্বরে রাজার চিত্তচাঞ্চল্য অসম্ভব নয়। প্রভু রুষ্ট হলেন: অমন কথা আর মুখে আনবে না। যদি আনো তো আমি নীলাচল ছেড়ে চলে যাব।

সার্বভৌম ভয় পেল। রাজাকে জানাল প্রভু রাজদর্শনে অনিচ্ছুক।

প্রতাপরুদ্র কটক ছেড়ে সোজা পুরীতে এসে উপস্থিত হল। রামানন্দকে সঙ্গে নিল। রামানন্দ যদি পারে প্রভুর মন গলাতে!

রামানন্দ কৌশলে জানাল প্রভুর প্রতি রাজার কী গভীর প্রীতি, দর্শন পাবার কী আকুল আকাঙ্ক্ষা! কিন্তু প্রভু যেমন বিমুখ ছিলেন তেমনি বিমুখই রইলেন।

রাজা বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বললে, প্রভু জগৎ উদ্ধার করবেন কিন্তু প্রতাপরুদ্র জগৎছাড়া। তাঁর কৃপা থেকে জগাই মাধাই বাদ পড়বে না বাদ পড়বে শুধু প্রতাপরুদ্র। কিন্তু এও আমি তোমাদের বলে রাখছি তাঁর যেমন প্রতিজ্ঞা রাজদর্শন করবেন না, আমারও তেমনি প্রতিজ্ঞা তাঁর দর্শন না পেলে আত্মহত্যা করব। যদি প্রভুর কৃপা না পাই তবে আমার রাজ্য দিয়ে কী হবে, শরীর দিয়েই বা কী হবে?

সার্বভৌম আশ্বস্ত করতে চাইল। বললে, তুমি অধীর হয়ো না। প্রভু নিশ্চয়ই তোমাকে কৃপা করবেন। যিনি প্রেমাধীন তিনি তোমার এই গাঢ় প্রেম অস্বীকার করবেন কী বলে?

মনে হচ্ছে রাজবেশটাই বাধা। সার্বভৌম পরামর্শ দিল, প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ছেড়ে বৈষ্ণববেশ ধারণ করুক। তারপর স্নানযাত্রার দিন প্রভু যখন রথের সামনে প্রেমাবেশে নৃত্য করবেন তখন একাকী ভাগবতের শ্লোক পড়তে পড়তে এগিয়ে গিয়ে রাজা প্রভুকে প্রণাম করবে আর প্রভু তখন বৈষ্ণবজ্ঞানে রাজাকে আলিঙ্গন করে ধরবেন।

স্নানযাত্রার আর দেরি কত ?

তিন দিন।

সেই উপলক্ষ্যে গৌড় থেকে প্রায় দুশো ভক্ত পুরীতে এসেছে। নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে সকলের থাকবার-খাবার যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজা বলে দিয়েছে সবার যেন স্বচ্ছন্দ হয়।

রাজা তার প্রাসাদের ছাদে উঠল বৈষ্ণবদের শোভাযাত্রা দেখতে। সার্বভৌমকে বললে, বৈষ্ণবের এত তেজ কখনো দেখিনি, শুনিনি এমন প্রেম-সংকীর্তন। এ কী করে সম্ভব হল ?

সার্বভৌম বললে, এই প্রেম-সংকীর্তন শ্রীচৈতন্যের সৃষ্টি। এই কৃষ্ণনাম-কীর্তনই কলিকালের ধর্ম।

কিন্তু এরা আগে মন্দিরের দিকে না গিয়ে কাশী মিশ্রের বাড়ির দিকে ছুটেছে কেন ? রাজা চঞ্চল হয়ে উঠল।

এই তো স্বাভাবিক। বললে সার্বভৌম, যেখানে প্রাণের টান বেশি সেখানেই তো মানুষ আগে যাবে। এরা আগে প্রভুকে দেখে নিয়েই যাবে জগন্নাথ দর্শনে।

রাজা অট্টালিকা থেকে নেমে এল। সমবেত লোকদের বললে, আপনারা কাশী মিশ্রের বাড়িতে গিয়ে বৈষ্ণবমিলন দেখে আসুন।

সবাই যেতে পারব সেখানে ?

সবাই যেতে পারবেন। রাজার স্বর অভিমানে ভরে এল : একমাত্র প্রতাপরুদ্রের প্রবেশ নিষেধ।

রাজার আর্তি স্পর্শ করল নিত্যানন্দকে। নিত্যানন্দ প্রভুকে অনুরোধ করতে গেল। বললে, প্রতাপরুদ্র বলেছে, তোমার চরণদর্শন না পেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী হয়ে রাজাকে দর্শন দেওয়া বিধি নয়। প্রভু তাঁর নিজের বক্তব্যে অচল রইলেন।

কিন্তু যে তোমাকে স্নেহ করে তার প্রতি তুমি স্নেহশীল হবে না ? কোনো কোনো অনুরাগী তার ইষ্ট না পেলে দেহ ছেড়ে দেয়। রাজা সেইরকম অনুরাগী। এখন তুমি জানো তুমি তোমার সন্ন্যাসের না ভক্তবাৎসল্যের মর্যাদা রাখবে। প্রীতিও যদি তোমার করুণা না আকর্ষণ করতে পারে তবে হতাশ্বাস জীব যাবে কোথায় ?

প্রভু তবুও উদাসীন।

তখন নিত্যানন্দ এক উপায় বার করল। তাতে প্রভুকেও রাজদর্শন করতে হয় না, রাজারও প্রাণরক্ষা হয়।

কী উপায়?

তুমি কৃপা করে তোমার একখানা বহির্বাস রাজাকে পাঠিয়ে দাও। বহির্বাসকে রাজা নিশ্চয়ই তোমার কৃপার নিদর্শন বলে মনে করবে আর তার উপর তোমার কৃপা আছে এই আশ্বাসে সে হয়তো আত্মহত্যা করবে না। একদিন চরণলাভের সৌভাগ্য হবে এই আশায় বেঁচে থাকবে।

যা ভালো বোঝো করো।

নিত্যানন্দ পরিচারক গোবিন্দের কাছ থেকে প্রভুর একখানি বহির্বাস চেয়ে নিয়ে সার্বভৌমকে পাঠিয়ে দিল। সার্বভৌম পৌঁছে দিল রাজার হাতে। প্রতাপরুদ্র আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। বস্ত্রই স্বয়ং প্রভু, এই ভেবে পূজো করতে লাগল। রামানন্দকে ডাকিয়ে বললে, রামানন্দ, এ বিরহ আর সহ্য হয় না। তুমি আরেকবার প্রভুকে বলো। তাঁর বস্ত্র পেয়ে আমার উৎকণ্ঠা আরো বেড়েছে।

রামানন্দ আবার গিয়ে ধরল প্রভুকে। বললে, তুমি তো স্বাধীন স্বতন্ত্র, তোমার আবার কিসের বিধি-নিষেধ?

আমি মানুষ, সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেছি। বললেন প্রভু, আমার কেউ বিরুদ্ধ আলোচনা করে এতে বড় ভয় পাই। সাদা কাপড়ে বিন্দু পরিমাণ কালির দাগের মতন সন্ন্যাসীর সামান্য দোষও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। তাই খুব বেশি সতর্ক হওয়া দরকার।

কিন্তু প্রতাপরুদ্র তোমার ভক্ত, জগন্নাথের সেবক, তার উপর তুমি কেন বিরূপ হবে?

পূর্ণ দুধের কলস একবিন্দু সুরাস্পর্শে অপবিত্র হয়ে যায়, তেমনি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান হলেও এক 'রাজা' নাম তাকে মলিন করেছে। বললেন, প্রভু, তবে তোমাদের যদি আগ্রহ হয় রাজার ছেলেকে আমার কাছে ডেকে আনো। পিতা ও পুত্রে স্বরূপতঃ ভেদ নেই, রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা হলে রাজা অনায়াসেই ভেবে নিতে পারবে তার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে।

প্রতাপরুদ্রের বদলে প্রতাপরুদ্রের ছেলে এল দেখা করতে।

কিশোরবয়স্ক রাজপুত্র, শ্যামবর্ণ কমলনয়ন, পরনে পীতাম্বর গায়ে রত্ন-

আভরণ—দেখেই প্রভুর কৃষ্ণস্মরণের উদ্দীপন হল। প্রেমাবেশে তিনি রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রেরও কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত হল। সে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে নাচতে লাগল, কাঁদতে লাগল।

তারপর পিতার কাছে, রাজার কাছে এসে উপস্থিত হল।

রাজা দু বাহু বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সে-আলিঙ্গনে সে আস্বাদ করল গৌরহরির স্পর্শ।

কিন্তু এতে যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই।

রথযাত্রার দিন এল। রথ বেরুবে—বেজে উঠল বাদ্যভাণ্ড। কিন্তু ও কে পথে ঝাড়ু দিচ্ছে? ধুলোতে চন্দন-জল ছিটোচ্ছে?

তাকিয়ে দেখ। এ আমাদের রাজা প্রতাপরুদ্র।

রাজা হয়ে তুচ্ছ-সেবা করছে। তাহলে আর কথা নেই। জগন্নাথ রাজাকে কৃপা করবেন। আর জগন্নাথের কৃপার অর্থই তো গৌরহরির কৃপা।

রথাগ্রে মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করছেন। তিন মণ্ডলে পার্ষদেরা প্রভুকে ঘিরে রয়েছে, ভিড় সামলাচ্ছে, যাতে তাঁর নৃত্যের না ব্যাঘাত হয়, যাতে তাঁর ভাবময় পবিত্র দেহে কোনো না আঘাত লাগে।

তৃতীয় মণ্ডলের অধিপতি প্রতাপরুদ্র নিজে।

মহাপাত্র হরিচন্দনের কাঁধে হাত রেখে প্রভুকে সে দেখছে তন্ময় হয়ে। হঠাৎ সামনে শ্রীবাস এসে দাঁড়াল। হরিচন্দন তার গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললে সরে যেতে। শ্রীবাসও তন্ময়, গাত্রস্পর্শ বুঝি অনুভবও করল না। হরিচন্দন আবার ঠেলা দিল। ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীবাস হরিচন্দনকে চড় মেরে বসল। হরিচন্দনও উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছিল রাজা তাকে নিবৃত্ত করল। বললে, তুমি ভাগ্যবান তাই এই স্পর্শ পেলে। আমি ভাগ্যহীন। আমি অপদার্থ।

নৃত্য করতে করতে প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাছে এসে পড়েছেন আর তখুনি তাঁর প্রেমবিবশ দেহ মাটিতে ঢলে পড়বার উপক্রম করল। সসম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র তাঁকে ধরে ফেললেন, যেন আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে না আহত হন।

রাজার স্পর্শে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হল। বাহ্যজ্ঞান হতেই ধিক্কার দিয়ে উঠলেন: ছি ছি, আমার বিষয়স্পর্শ হল। আমার সঙ্গীরা গেল কোথায়?

দেহরক্ষী নিত্যানন্দ নিজেই প্রেমবিহ্বল। আর গোবিন্দ আর কাশীশ্বর

সে মুহূর্তে কোথায় না জানি সরে গিয়েছিল। নইলে প্রতাপরুদ্র ধরতে যাবে কেন ?

প্রভুর ধিক্কারে রাজার ভয় হল আরো না জানি কী ঘোরতর অপরাধ হল তার !

সার্বভৌম বললে, আপনি ভাববেন না। আপনার উপর প্রভু প্রসন্ন আছেন। মনে হচ্ছে লোকশিক্ষার জন্যেই তাঁর এই তিরস্কার।

গুণ্ডিচাবাড়ির পথে রথ এসে দাঁড়াল বলগণ্ডিতে। এখানে জগন্নাথকে ভোগ দেওয়া হবে। নর্তনক্লান্ত প্রভু পাশের বাগানে ঢুকে ঘরের দাওয়ায় পড়ে রইলেন। শরীরে ঘন ঘর্ম ঝরছে, সুগন্ধি শীতল বাতাস তাঁকে স্নিগ্ধ সেবা করতে লাগল। এখানে ওখানে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করতে বসল ভক্ত আর কীর্তনিয়ার দল।

সার্বভৌমের উপদেশে প্রতাররুদ্র রাজবেশ ছেড়ে দীনহীন বৈষ্ণববেশ পরল। তারপর হাতজোড় করে সমস্ত ভক্তের নীরব সম্মতি নিয়ে সাহস করে প্রভুর পায়ে গিয়ে পড়ল, করতে লাগল পদসেবা। সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে লাগল ভাগবতের শ্লোক। প্রভু প্রেমাবেশে চোখ বুজে শুয়ে আছেন, অনুভব করছেন কে তাঁর পা টিপছে। শুধু পা টিপছে না, রাসলীলার শ্লোক শোনাচ্ছে।

বলো বলো আরো বলো। প্রভু আনন্দে ধ্বনিত হলেন।

রাজা তখন কথামৃতের শ্লোক পড়ল। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছে, তোমার কথাই অমৃত। তা তাপিতজনের জীবনপ্রদ, কবিদের দ্বারা প্রশংসিত, কলুষ-নাশক, শ্রবণমাত্রই মঙ্গলদায়ক, সর্বত্র সর্বকল্যাণহেতু। তোমার কথা যাঁরা কীর্তন করেন প্রচার করেন তাঁরাই বহুদাতা।

যেই এই শ্লোক শোনা অমনি প্রভু উঠে বসে রাজাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দিলে। আলিঙ্গন ছাড়া আমার দেবার কী আছে ? তুমি নাও আমার আলিঙ্গন।

জানলেনও না এ ছদ্মবেশী বৈষ্ণব কে। অনুসন্ধান বিনাই কৃপা করে বসলেন। ভগবানের কৃপা এত শক্তিমান যে ভগবানকেও বিচার করতে দিল না, আলিঙ্গন করিয়ে ছাড়ল।

এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল ॥

জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি আমার এমন উপকার করলে? আচম্বিতে পান করালে কৃষ্ণামৃত?

রাজা বললে, আমি তোমার দাসানুদাস। আমাকে তোমার ভৃত্যের ভৃত্য করো।

তবে এই তুমি আমার ঐশ্বর্য দেখ। তবে কাউকেও বোলো না।

কী দেখল তা রাজাই জানে। প্রভুও জানেন কাকে দেখালেন। ভাব করলেন যেন রাজাকে দেখালেন না, বৈষ্ণবকে দেখালেন।

প্রতাপরুদ্রের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল এতদিনে। প্রভুকে প্রণাম করল প্রাণ ভরে। তারপর যুক্তকরে ভক্তদের বন্দনা করে বিদায় নিল।

রথযাত্রার ঠিক পরেই যে পঞ্চমী তার নাম হোরাপঞ্চমী। এদিন লক্ষ্মী জগন্নাথকে দেখবার জন্যে বাইরে যান—তাই কেউ এ পঞ্চমীকে হেরাপঞ্চমী বলে।

প্রতাপরুদ্র আদেশ জারি করল এ উৎসব যেন আর-আরবারের চেয়েও বেশি আড়ম্বরে করা হয়। রথযাত্রার চেয়েও বেশি। বাদ্য-নৃত্য দোলা-ছত্র সজ্জা-সম্ভার সমস্ত দ্বিগুণ করো। উপহারও দ্বিগুণ করে দাও। প্রভুর যেন চমৎকার লাগে। 'দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার।'

জন্মাষ্টমীতে গোপবেশ ধরলেন প্রভু। কাঁধে করে দই-দুধের ভাঁড় নিয়ে বসেছেন উৎসবক্ষেত্রে। কানাই খুটিয়া নন্দ সেজেছে, জগন্নাথ মাহিতী যশোদা। প্রতাপরুদ্রও গোয়ালা সেজেছে। সার্বভৌম আর কাশী মিশ্রেরও সেই সাজ। সবাইকে নিয়ে নৃত্য করছেন প্রভু। দইয়ে-দুধে হলুদের জলে উঠেছে সবাই স্নান করে।

কয়েকমাস পরে প্রভু ঘোষণা করলেন বৃন্দাবনে যাবেন। শুনে প্রতাপরুদ্র বিমর্ষ হল। সার্বভৌম আর রামানন্দকে ডাকিয়ে বললে, তোমরা প্রভুকে ধরে রাখবার ব্যবস্থা করো। তিনি নীলাচল ছেড়ে চলে গেলে বাঁচব কী করে?

আজ নয় কাল এ-মাস নয় ও-মাস—এমনি নানা যুক্তি দেখিয়ে সার্বভৌম আর রামানন্দ প্রভুর যাত্রা স্থগিত রাখতে লাগল। এমনি করে দু বছর। কিন্তু এবার বিজয়াদশমীর দিন তিনি যাত্রা করবেনই করবেন।

কটকে এসে নগরের বাইরে এক বকুল গাছের তলায় আসন পাতলেন প্রভু। রাজভবনে রামানন্দ খবর দিতে ছুটল।

প্রতাপরুদ্র ব্যাকুল হয়ে এসে প্রণাম করল প্রভুকে। প্রভু তাকে তুলে

বুকে জড়িয়ে ধরলেন, সেই থেকে নাম ধরলেন 'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা'। কিন্তু কিছুতেই গাছতলা ছাড়তে রাজী হলেন না।

রাজ্যের যে-যে স্থান দিয়ে প্রভু যাবেন সে-সে স্থানের শাসকদের কাছে রাজা পত্র পাঠাল : প্রভুর জন্যে নতুন আবাস তৈরি করবে আর সে সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ রাখবে। তোমরা নিজেরা সব তদারক করবে আর রাত্রিদিন প্রভুর সেবায় তৎপর থাকবে। আর তোমরা দুই মহাপাত্র, হরিচরণ আর মর্দরাজ, নতুন নৌকো মজুত রাখো, স্নানান্তে ঐ নৌকোতে প্রভু নদী পার হবেন। আর যেখানে প্রভু স্নান করবেন সেখানে স্তম্ভ পুঁতে রাখো, সে মহাতীর্থে আমি নিত্য স্নান করব। 'নিত্যস্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি।'

প্রভুর পথ রাজার আদেশে সুসজ্জিত করা হল। দু'পাশে লোক দাঁড়িয়ে গেল সার বেঁধে। রাজমহিষীরা হাতির উপর তাঁবু খাটিয়ে বসল। চিত্রোৎপল নদীতে স্নান করলেন প্রভু। মহিষীরা প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করল। সকলেই প্রেমময় হয়ে উঠল—সাশ্রুনেত্রে বলে উঠল, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

এ যাত্রায় প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হল না। গৌড় থেকে প্রভু ফিরে এলেন নীলাচলে। বললেন, চার মাস পরে যাব। এবার যাব ঝাড়খণ্ডের বনপথ দিয়ে।

প্রভু ফিরে এসেছেন, আরো চার মাস থাকবেন নীলাচলে, খবর পেয়ে প্রতাপরুদ্র আনন্দ করে উঠল।

প্রতাপরুদ্র রাজত্ব ছাড়ে নি, রাজত্বে আসীন থেকেও সমস্ত দেহ-মন চৈতন্য-চরণে বিকিয়ে দিয়েছে। পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে বিষয়বিহীন ভক্তের মত জীবন কাটিয়েছে সার্বভৌম আর রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যচরিত কীর্তন করে। চৈতন্যের তিরোভাবের পর চলে গেল নীলাচল ছেড়ে। কিন্তু সেবা-অধিকারে রথযাত্রার সময় আসতে হত একবার—বছরে অন্তত একবার।

শ্রীনিবাস যখন নীলাচলে এল তখন রাজার দর্শন পেল না।

প্রভুর বিয়োগ রাজা সহিতে না পারে।
নীলাচল হইতে রহিল কত দূরে॥
ইহা শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রজলে।
না হইল রাজার দর্শন নীলাচলে॥
ঐছে কতজন সঙ্গে না হইল দেখা।
মানে নিজ দুর্দৈব—দুঃখের নাই লেখা॥

প্রদ্যুম্ন মিশ্র

জগন্নাথের ভক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র।

একদিন প্রভুকে এসে বললে, আমাকে কিছু কৃষ্ণকথা শোনান। কত জন্মের পুণ্যে আপনার দুর্লভ চরণ পেয়েছি, অধম গৃহী বলে আমাকে বিমুখ করবেন না।

কৃষ্ণকথা! প্রভু বললেন, কৃষ্ণকথার আমি কী জানি!

আপনি না জানেন তো কে জানে! প্রদ্যুম্ন বললে, কৃষ্ণকথা জানতে আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, আমার ইচ্ছা পূরণ করুন।

তোমার কী ভাগ্য, কৃষ্ণকথায় তোমার রুচি হয়েছে। যদি সত্যি শুনতে চাও তো রামানন্দের কাছে যাও।

কে, রামানন্দ রায়? সে আপনার চেয়েও বেশি জানে?

প্রভু হাসলেন। ভক্তের মহিমা স্থাপন করবার জন্যে বললেন, আমিও তো কৃষ্ণকথা রামানন্দের মুখেই শুনে থাকি।

অগত্যা প্রদ্যুম্ন রামানন্দের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। ভৃত্য বসতে আসন দিল। রায়মশায়কে ডাকো। তাঁর সঙ্গে কথা আছে।

তিনি তো বাড়িতে নেই।

কোথায় আছেন?

তাঁর বাগানে আছেন। সেখানে দুটি কিশোরী দেবদাসীকে তিনি অভিনয় শেখাচ্ছেন।

অভিনয়—কিসের অভিনয়?

তিনি নিজে যে নাটক লিখেছেন—'জগন্নাথবল্লভ' নাটক—তাতে অভিনয়ের জন্যে ঐ দুটি দেবদাসী নির্বাচিত হয়েছে। আপনি একটু বসুন, রায়মশাই এখুনি এসে পড়বেন।

অভিনয় শেখাচ্ছে তো নিভৃতে-নির্জনে কেন? শুধু তো অভিনয়ই শেখাচ্ছে না, তারও চেয়ে বেশি কিছু করছে। নিজের হাতে তাদের গায়ে তেল-হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছে, তেল-হলুদ মাখিয়ে তাদের দেহের কমনীয়তা বাড়াচ্ছে। তাদের একজন রাধিকা সাজবে, আরেকজন মদনিকা। কিংবা, কে বলবে, এরাই হয়তো রাধাকৃষ্ণ। এদের দেহ স্নিগ্ধলাবণ্যে কান্তোজ্জ্বল

করে না তুললে চলবে কেন? তেল-হলুদ মাখাবার পর রামানন্দ তাদের নিজের হাতে স্নান করিয়ে দিচ্ছে, কাপড় পরিয়ে মালা-চন্দনে সাজিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু রামানন্দের মনে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। বিকারের ছায়া পর্যন্ত নেই। রামানন্দের ভাব এ যেন কোনো তরুণীর দেহ নয়, এ নিতান্তই কাষ্ঠপাষাণ।

মুনিদেরও ধ্যান ভেঙে যায় কিন্তু রামানন্দ নির্বিচল।

রামানন্দ নিজেকে রাধারাণীর দাসী বলে ভাবছে। সেবাকে পূজা বলে মানছে। ব্রজলীলায় বিশাখার যে কৃষ্ণরতি-মহাভাব তাই এখন রামানন্দে প্রকাশিত।

সাজগোজের পর দুই দাসীকে নাচ শেখাল রামানন্দ, নাটকে যে সমস্ত গান আছে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিল। তাৎপর্য না বুঝলে অঙ্গভঙ্গি নিখুঁত হবে কী করে?

তারপরে দুজনকে প্রসাদ খাওয়াল। প্রসাদ খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

ভৃত্য খবর দিল প্রদ্যুম্ন মিশ্র বসে আছে।

আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। অপরাধ মার্জনা করুন। রামানন্দ নমস্কার করে বললে নম্রস্বরে, আপনার পায়ের ধুলোয় আমার ঘর পবিত্র হল। বলুন, আদেশ করুন, কী করতে হবে?

কিছুই করতে হবে না। আমি শুধু আপনাকে দর্শন করতে এসেছিলাম। প্রদ্যুম্ন উঠে পড়ল: আপনার দর্শন পেলাম তাতেই আমি পরিতৃপ্ত।

প্রভুর কাছে ফিরে গেল প্রদ্যুম্ন।

কি, শুনলে কৃষ্ণকথা?

কী কৃষ্ণবক্তার কাছেই পাঠিয়েছিলেন আমাকে! বলে রামানন্দের উদ্যানের বিরলে বসে তরুণী দেবদাসীদের অভিনয় শেখানোর কাহিনী বিবৃত করলে প্রদ্যুম্ন। এমন লোকের থেকে কৃষ্ণকথা শোনে কে?

প্রভু গম্ভীর হলেন। বললেন, এত বড় দুরূহ ও বিপজ্জনক কাজ করবার অধিকার একমাত্র রামানন্দের আছে। আমি তো সন্ন্যাসী, নিজেকে বিরক্ত ও অনাসক্ত বলে মনে করি কিন্তু দেখা দূরের কথা স্ত্রীলোকের নামমাত্র শুনলেও আমার দেহে-মনে বিকার জাগে। কিন্তু রামানন্দের কথা আলাদা। দর্শন-স্পর্শনেও তার বিন্দুমাত্র বিকার নেই। গৃহস্থ হয়েও সে ষড়রিপুকে বশীভূত করেছে, রাগানুগা ভক্তিতে নিজের দেহকে অপ্রাকৃত, সিদ্ধদেহ করে তুলেছে।

বিষয়ী হয়ে তাই সে সন্ন্যাসীকেও শোনাতে পারে কৃষ্ণকথা। সেই একমাত্র অধিকারী। যদি তুমি কৃষ্ণকথাই শুনতে চাও তবে রামানন্দের কাছেই ফিরে যাও। বোলো আমিই তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

প্রদ্যুম্ন দ্রুতপায়ে রামানন্দের কাছে এসে উপনীত হল। বললে, প্রভু আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, আমাকে কৃষ্ণকথা শোনান।

আমার এত বড় ভাগ্য! রামানন্দ অভিভূত হল: বলুন কোন্ কথা শুনতে চান?

আমি বলব? যে প্রভুকে শোনায় তাকে আমি উপদেশ দেব?

রামানন্দ বলতে লাগল কৃষ্ণকথা। সকাল গেল দুপুর গেল বিকেলও যায়-যায়, কৃষ্ণকথার অন্ত হয় না। শ্রোতা-বক্তা কারুরই ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, নেই কোনো আত্মস্মৃতি। শুধু অচ্ছিন্ন প্রেমাবেশ।

দিন যে শেষ হয়ে এসেছে শেষকালে ভৃত্য এসে মনে করিয়ে দিল।

আনন্দে প্রভুর পায়ের উপর উছলে পড়ল প্রদ্যুম্ন।

প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, কেমন শুনলে কৃষ্ণকথা?

আমাকে কৃষ্ণকথার সুধাসমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে রামানন্দ মানুষ নয়, কৃষ্ণভক্তিরসের প্রতিমূর্তি। আমাকে আরো সে কী বলেছে জানো? বলেছে কৃষ্ণকথার আসল বক্তা তুমি, তার মুখ দিয়ে তুমিই কথা কইছ। সে তোমার হাতের বীণাযন্ত্র মাত্র, তুমিই আসল বীনকার।

প্রভু হেসে বললেন, রামানন্দ বিনয়ের খনি। যে মহানুভব সে কখনো আত্মশ্লাঘা করে না।

॥ ৪৫ ॥

অমোঘ

সার্বভৌমের মেয়ের নাম ষাঠী, জামাইয়ের নাম অমোঘ। কুলীন ব্রাহ্মণ, শ্বশুরবাড়িতে ঘর-জামাই হয়ে আছে। অমোঘের একমাত্র কাজ, একমাত্র আনন্দ পরনিন্দা।

সার্বভৌমের বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ নিয়েছেন প্রভু। এসে দেখলেন

বিরাট আয়োজন। উৎকলে-বঙ্গে যত রকম ভক্ষ্য আছে সমস্ত একত্র করা হয়েছে। নিমশুকতো থেকে শুরু করে চাঁপাকলাসহ ঘন দুধ। কত রকমের শাক আর ঘণ্ট আর ভাজা আর বড়ি। বড়া আর ঝোল। কত রকম পুলি আর পিঠে। ঘৃতসিক্ত পরমান্ন। সন্দেশ আর দই।

কী সর্বনাশ! প্রভু আঁতকে উঠলেন : এত খাদ্য আমি খাব কী করে?

তোমার খাদ্যের পরিমাণ কী তা আমার জানা আছে। বললে সার্বভৌম, নীলাচলে তুমি রোজ বাহান্ন বার খাও, দ্বারকাতে ষোল হাজার মহিষীর মন্দিরে আর ব্রজধামে তোমার তো আত্মীয়ের ছড়াছড়ি। তারপর তোমার সখী গোপিনীরা। প্রত্যেকের ঘরে রোজ দুবেলা তোমার বাঁধা আহার। গোবর্ধন-যজ্ঞে তুমি যত ভাত খেয়েছ এখানকার অন্ন তার এক গ্রাসেরও কম হবে। দয়া করে এক গ্রাস মাধুকরী তুমি গ্রহণ করো।

স্মিতমুখে প্রভু বসলেন আসনে। অলৌকিক ভোজন করাবার জন্যেই বুঝি এই একক নিমন্ত্রণ।

এমন সময় অমোঘের আবির্ভাব।

এই আশঙ্কায় হাতের কাছে একটা লাঠি রেখেছিল সার্বভৌম। বসেছিল দ্বাররক্ষা করে। যাতে অমোঘ এদিকে না আসে, কোনো উৎপাত না বাধায়। দরকার হলে লাঠির সাহায্যেই তাকে দূরে রাখবে, তাড়িয়ে দেবে।

স্ত্রীলোক বলে যাঠীর মা তো কাছে আসতে পারে না, তাই সার্বভৌমকেই পরিবেশন করতে হচ্ছিল। সেই পরিবেশনের ফাঁকে, সার্বভৌম যখন অন্যমনস্ক, তখন অমোঘ ঘরে ঢুকে পড়ল। বলে উঠল, বাপ রে বাপ! একা একটা সন্ন্যাসী এত ভাত খাবে! এ যে অন্তত দশ-বারোজনের খোরাক!

সার্বভৌম চকিতে লাঠি কুড়িয়ে নিল। নিমেষে ছুট দিল অমোঘ।

লাঠি হাতে পিছু নিল সার্বভৌম, কিন্তু অমোঘকে ধরতে পারল না। গাল দিতে দিতে ফিরে এল। এসে দেখল প্রভু নিন্দা শুনেও হাসছেন আনন্দে।

কিন্তু যাঠীর মার কাছে এ অপমান অসহ্য হল। বুকে-মাথায় করাঘাত করতে করতে বললে, 'যাঠী বিধবা হোক। অমোঘ মরুক।'

না, না, তোমরা এত কাতর হচ্ছ কেন? শান্তস্বরে বললেন প্রভু, অমোঘ বালক। বালকস্বভাবে সরল কৌতুকে যা বলেছে তাতে এত ক্ষুব্ধ হবার কী আছে? আর কী আছে দাও, আমি খাচ্ছি।

সার্বভৌম আর তার স্ত্রীর সাধ মিটিয়ে খেলেন প্রভু।

প্রভু আমাকে মার্জনা করো। প্রভুর আচমনের পর সার্বভৌম বললে, তোমাকে নিন্দা শোনাবার জন্যেই আমার গৃহে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম।

কেন, অমোঘ তো অন্যায় কিছু বলে নি। প্রভু স্বচ্ছমুখে বললেন, আমার পাতের অন্নে সত্যি-সত্যিই তো দশ-বারোজনের পেট ভরতে পারত। আর অমোঘের কথায় তোমার অপরাধ কী।

প্রভু তাঁর গৃহে চললেন, সার্বভৌম পিছু নিল। অসাবধানতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। আমার যদি ভক্তিলেশ থাকত তবে প্রভুর নিন্দা শুনে আমার প্রাণত্যাগ হল না কেন?

প্রভু তাকে শান্ত করে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরে ফিরে এসে সার্বভৌম স্ত্রীকে বললে, যার মুখ থেকে চৈতন্য-গোসাঁইয়ের নিন্দা শুনতে হয় তাকে হত্যা করা উচিত, নয়তো যে শোনে তার আত্মহত্যা। কিন্তু ব্রাহ্মণদেহ বলে দুটোই অশাস্ত্রীয়। একমাত্র প্রতিকার ঐ পাষাণ্ডের মুখ না দেখা, তার নাম না করা। তুমি যাঠীকে বলে দাও সে যেন ঐ অপদার্থটাকে ত্যাগ করে।

কিন্তু অমোঘ কোথায়?

অমোঘ পালিয়েছে। কিন্তু ব্যাধির থেকে, মৃত্যুর থেকে, চৈতন্যচন্দ্রের করুণা থেকে সে পালাবে কী করে?

যেখানে গিয়ে রাত্রিবাস করেছিল সেখান থেকে পরদিন সকালে খবর এল অমোঘের ওলাউঠা হয়েছে।

খবর শুনে সার্বভৌম বিচলিত হল না। বললে, এ হতেই হবে। দৈবই এসেছে আমাকে সাহায্য করতে। যে মহতের অপমান করে তার আয়ু শ্রী যশ ধর্ম সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। আর এ তো ঈশ্বরে অপরাধ। অমোঘ মরতে বসেছে এ আর বিচিত্র কী।

গোপীনাথ আচার্য প্রভুর কাছে ছুটল।

সার্বভৌম শান্ত হয়েছে তো? জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

কই আর শান্ত হল। স্বামী-স্ত্রী সেই থেকে উপোস করে আছে। তার উপর অমোঘের ওলাউঠা হয়েছে, জীবনের আশা নেই।

আশা নেই? সে কী কথা? প্রভু চঞ্চল হলেন: আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।

প্রভু এসে অমোঘের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়ালেন। তার বুকে রাখলেন তাঁর শ্রীহস্ত। বললেন, তুমি সার্বভৌমের সঙ্গ করেছ, তোমার আর পাপ কোথায়? আমোঘ, চোখ চাও, ওঠো, কৃষ্ণনাম বলো, ভগবান তোমাকে কৃপা করবেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ। অমোঘ উঠে বসল। প্রেমোন্মাদে নাচতে লাগল। কোথায় ব্যাধি, কোথায় মৃত্যুভয়!

প্রভুর চরণ ধরে বললে, দয়াময়, আমার অপরাধ মার্জনা করো। যে ছার মুখে তোমার নিন্দে করেছি সেই মুখ আর রাখব না। বলে নিজের দু গালে দুহাতে চড় মারতে লাগল।

গোপীনাথ হাত চেপে ধরল।

অমোঘের গায়ে প্রভু ব্যথাহরণ স্নেহস্পর্শ রাখলেন। বললেন, সার্বভৌমের সম্পর্কে তুমি আমার স্নেহপাত্র। সার্বভৌমের বাড়ির দাসদাসী এমন কি কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়। তোমার তাই কোনো অপরাধ নেই, তুমি শুধু কৃষ্ণনাম করো।

তারপর সার্বভৌমের বাড়ি এসে সার্বভৌমকে আলিঙ্গন করে বললেন, কেন উপোস করে আছ? অমোঘ শিশুতুল্য, পুত্রতুল্য, তার প্রতি কেন ক্রুদ্ধ হও? ওঠো, স্নান করো, জগন্নাথ দেখে এসো। পরে প্রসাদ খাও। যতক্ষণ না খাবে ততক্ষণ আমি এখানে বসে থাকব।

অমোঘকে তুমি কেন বাঁচালে? ওর মরে যাওয়াই উচিত ছিল।

তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই। প্রভু করুণকোমল চোখে তাকালেন: অমোঘ কৃষ্ণনাম নিয়েছে। অমোঘ বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে। তার আর পাপ কোথায়?

॥ ৪৬ ॥

কালাকৃষ্ণদাস

শ্রীগৌরাঙ্গের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের একক সঙ্গী। বর্ধমান জেলার আকাইহাট গ্রামে এর আবির্ভাব।

দাক্ষিণাত্যে একা যাবেন এমনি মনস্থ করেছিলেন প্রভু, একাকী না হলে যথোচিত বৈরাগ্য-আচরণে অসুবিধে হয়। সঙ্গে ভক্তজন থাকলে তারা শুধু প্রভুর আরাম-বিধানে তৎপর হয়ে ওঠে।

বেশ, যাব না কেউ তোমার সঙ্গে। বললে নিত্যানন্দ, তোমার আদেশ আমরা পালন করব। তাতে আমাদের সুখ হবে কি দুঃখ হবে সে বিচারে দরকার নেই। কিন্তু ক্ষুদ্র একটি নিবেদন করি যদি বিচার করে দেখ।

প্রভু দাঁড়ালেন।

তোমার দু হাত তো নামগণনায় আবদ্ধ থাকবে, বহির্বাস আর জলপাত্র বইবে কী করে আর প্রেমাবেশে যখন পথে অচেতন হবে তখন পাত্র-বস্ত্র কে রক্ষা করবে? তাই অনুনয় করছি সরল ব্রাহ্মণ এই কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নাও। কৃষ্ণদাস তোমার কোনো কিছুতেই 'না' করবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার সমস্ত করণীয় পালন করতে পারবে।

প্রভু রাজী হলেন। জলপাত্র ও বহির্বাস বহন করে কৃষ্ণদাস চলল তাঁর পিছে-পিছে।

অনেক তীর্থ সেরে প্রভু উপনীত হলেন মল্লারে। সেখানে বামাচারী ভট্টমারিদের আস্তানা।

কৃষ্ণদাস ভট্টমারিদের খপ্পরে পড়ল। তারা কামিনী আর কাঞ্চন দেখিয়ে কৃষ্ণদাসকে প্রলুব্ধ করলে। ঘরের মধ্যে রাখলে বন্দী করে।

প্রভু দেখলেন, কৃষ্ণদাস অনুপস্থিত।

সোজা ভট্টমারিদের ডেরায় এসে হাজির হলেন। ডাক দিলেন সন্ন্যাসীদের: আমার লোককে তোমরা ধরে এনেছ কেন?

ভট্টমারিরা মারমুখো হয়ে উঠল।

সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের এ কী ব্যবহার?

ভট্টমারিরা অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এল।

কিন্তু কাকে আক্রমণ করবে? প্রভু প্রতিরোধে স্থির, দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন। ভট্টমারিদের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল। খসে পড়ল নিজের নিজের

শরীরে। নিজেদের অস্ত্রে নিজেরাই ঘায়েল হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে তুমুল কান্নার রোল উঠল। প্রভু ঘরের মধ্যে ঢুকে কৃষ্ণদাসকে চুল ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন। উদ্ধার করলেন।

তারপরে আরো বহু তীর্থ সেরে ফিরলেন নীলাচল।

সার্বভৌমকে বললেন, আর সকলে থাকুক শুধু এই কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিয়ে দাও।

কেন, কী হল?

আমার সঙ্গী হয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিল। কিন্তু আমাকে ছেড়ে সে গেল ভট্টমারি হতে। ওকে আমি উদ্ধার করে এনেছি বটে কিন্তু ওকে আর আমার প্রয়োজন নেই। ও যেখানে শি সেখানে চলে যাক।

আমি তবে কোথায় উদ্ধার পেলাম! কালাকৃষ্ণদাস কাঁদতে বসল।

এখন তবে উপায় কী?

উপায় নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দকে ধরল কৃষ্ণদাস।

নিত্যানন্দ বললে, অপেক্ষা করো, দেখি কী করতে পারি।

তারপর প্রভুকে গিয়ে বললে, তুমি যে দাক্ষিণাত্য থেকে শুভেলাভে ফিরে এসেছ এ খবর শচীমাতাকে পাঠানো দরকার। কত তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন! অদ্বৈত শ্রীবাসও কত না জানি উৎকণ্ঠিত।

ভালো কথা। কাউকে পাঠিয়ে দাও। কাকে পাঠাবে?

কালাকৃষ্ণদাসকে। সেই তো একমাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

এতক্ষণে ত্রাণ পেল কৃষ্ণদাস। মহাপ্রসাদ সঙ্গে নিয়ে সে চলল নবদ্বীপ। প্রথমে শচীমাতার সঙ্গে দেখা করল। প্রণাম করে মহাপ্রসাদ দিল। বললে, প্রভু দক্ষিণ থেকে নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন, পথে আমিই তাঁর সেবক ছিলাম।

শচীমাতা আনন্দিত হলেন। খবর দিলেন শ্রীবাসকে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভক্ত এসে জুটল।

কৃষ্ণদাস তারপর গেল অদ্বৈতকে খবর দিতে।

অদ্বৈতের ঘরে ক্রমে-ক্রমে সবাই এসে সমবেত হল। হরিদাস আর বক্রেশ্বর। বাসুদেব আর শিবানন্দ। গদাধর আর মুরারি। আচার্যরত্ন আর আচার্যনিধি। আরো অনেকে।

সবাই সোল্লাসে নৃত্যকীর্তন শুরু করল।

কালাকৃষ্ণদাসের জীবনে কালিমার লেশটুকুও রইল না।

কৃষ্ণদাস রাজপুত

মথুরাবাসী রাজপুত ব্রাহ্মণ। পরম বৈষ্ণব অথচ গৃহস্থ। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে সংসার করে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে এসেছেন কিন্তু তাঁর কথা তখনো কিছু শোনে নি কৃষ্ণদাস।

একদিন কেশীঘাটে স্নান করে কালিদহের পথে যাচ্ছে কৃষ্ণদাস, দেখল আমলিতলায় কে এক সন্ন্যাসী বসে আছে। সন্ন্যাসীর এত রূপ! বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হল কৃষ্ণদাস। ভাবল বাইরের রূপ শুধু অন্তরের প্রেমের প্রতিচ্ছবি। বাইরে যার এত রূপ অন্তরে না জানি তার কত প্রেম!

কাছে গিয়ে প্রভুকে প্রণাম করল কৃষ্ণদাস।

কে তুমি? জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

আমি এক নরাধম গৃহস্থ।

বাড়ি কোথায়?

ওপারে মথুরায়।

তোমার বাসনা কী?

বাসনা তোমার কিঙ্কর হই। বললে কৃষ্ণদাস। আমি কাল রাতে এক সন্ন্যাসীকে স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন দিনের আলোয় দেখছি তুমিই সেই স্বপ্নের সন্ন্যাসী।

প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। প্রেমাবেশে কৃষ্ণদাস নৃত্যকীর্তন করতে লাগল।

মধ্যাহ্নে প্রভু তাকে নিয়ে এলেন অক্রুর তীর্থে। দিলেন তাকে তাঁর পাত্রের প্রসাদ।

কৃষ্ণদাস আর বাড়ি যেতে চাইল না। প্রভুর সঙ্গেই থেকে গেল। স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে দিয়ে প্রভুর জলপাত্র বহন করে বেড়াতে লাগল পিছু-পিছু।

যমুনা পেরিয়ে মহাবনের দিকে চলেছেন প্রভু। পথশ্রান্ত হয়ে গাছের নিচে বসেছেন। দেখলেন সামনে গরু চরছে, শোনা যাচ্ছে রাখালের বাঁশি। কৃষ্ণের গোচারণ-লীলার কথা মনে হল—প্রভু প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

এমন সময় সেখানে দশজন পাঠান ঘোড়সোয়ার এসে উপস্থিত।

তারা দেখল একজন সন্ন্যাসী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর তার আশেপাশে চারটে লোক বসে আছে চুপচাপ। তারা ঠিক করল ঐ চারটে লোক ডাকাত ছাড়া কেউ নয়। সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিশ্চয়ই মোহর ছিল, সেই মোহরের লোভে ধুতরো খাইয়ে সন্ন্যাসীকে খুন করেছে। ডাকাতদের ছেড়ে দেওয়া নয়।

ঘোড়া থেকে নেমে পাঠানেরা চারজনকে বেঁধে ফেলল। কেটে ফেলবার ভয় দেখাল।

এই চারজনের মধ্যে একজন কৃষ্ণদাস আরেকজন বলভদ্র ভট্টাচার্য। আর দুজন ভৃত্য-ব্রাহ্মণ। একজন মথুরার, অন্যজন গৌড়ের।

তোমার বাদশার দোহাই, আমরা ডাকাত নই। মাথুর ব্রাহ্মণ গর্জে উঠল: এ সন্ন্যাসী আমাদের গুরু। আমরা এঁকে খুন করিনি। এঁর এক ব্যাধি আছে, মাঝে মাঝে মূর্ছিত হয়ে পড়েন, আবার নিজের থেকেই সুস্থ হন। উনি এখন অসুস্থ আছেন, জ্ঞান ফিরে পেলে ওঁকে জিজ্ঞেস কোরো আমরা সত্যিই ডাকাতি করেছি কিনা। উনি যদি বলেন, করেছি, তা হলে আমাদের মেরে ফেলো, নচেৎ নয়। সুতরাং উনি যতক্ষণ না জাগেন ততক্ষণ অপেক্ষা করো।

আমরা বুঝতে পারছি তোমরা দুজন পশ্চিমা, তোমরা সাধু। পাঠান-সর্দার মাথুর ব্রাহ্মণ আর কৃষ্ণদাস রাজপুতকে চিহ্নিত করল। বললে, আর ঐ দুটো বাঙালি—ওরা ঠক, বাটপাড়, নইলে ওরা অমন ভয়ে কাঁপছে কেন? তাই তোমাদের দুজনকে ছাড়লেও ওদের ছাড়ব না।

তুমি কাকে বাটপাড় বলছ? কৃষ্ণদাস হুঙ্কার ছাড়ল: বাটপাড় তো তুমি—তোমরা। তীর্থবাসীদের উপর হামলা করো, তাদের বেঁধে রাখো, তাদেরকে মেরে ফেলবার ভয় দেখাও। কিন্তু আমাকে তোমরা চেন না। আমি বাদশার লোক, এই গ্রামেই আমার বাড়ি, আমার অধীনে একশো তুর্কি সৈন্য আর দুশো কামান আছে। যদি আমি ডাক ছাড়ি, তারা বিদ্যুদ্বেগে এসে পড়বে, তোমরা বা তোমাদের ঘোড়া কাউকেই আস্ত রাখবে না। কী, বলো, হাঁক দেব?

তার আগেই প্রভু উঠলেন মূর্ছা থেকে। উঠেই হরিনামের হুঙ্কার তুললেন। পাঠানেরা ভয় পেল। তাড়াতাড়ি চার সঙ্গীর বাঁধন খুলে দিল।

প্রভু সব শুনে বললেন, এরা কেউই চোর-ডাকাত নয়, এরা আমার সঙ্গী, সন্ন্যাসী-ভিক্ষুক। আর আমারও কোনো ধন নেই। আমার মূর্ছারোগ আছে, আমি মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাই, তখন এরা আমার সেবা করে এখনো আমার তেমনি হয়েছিল—

প্রভুকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে পাঠানেরা নরম হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন পীর ছিল। তাঁর সঙ্গে প্রভু ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। পীরের অদ্বয়বাদ খণ্ডন করে তার মধ্যে জাগালেন কৃষ্ণভক্তি। নতুন নাম দিলেন—রামদাস।

দলের নেতা বিজুলি খাঁও প্রভুর শরণ নিয়ে 'পাঠান বৈষ্ণব' হয়ে গেল।

সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করে প্রভু বললেন, আমি এবার তীর-পথে প্রয়াগ যাব। কৃষ্ণদাস, তুমি তোমার ব্রাহ্মণকে নিয়ে এবার ফিরে যাও।

আমাদের প্রয়াগ পর্যন্ত যেতে দাও। ধরে পড়ল কৃষ্ণদাস। বললে, ম্লেচ্ছদেশে আবার কী উৎপাত হয় কে জানে। তোমার সঙ্গের দুই বামুন এ দিককার ভাষায় কথা কইতে পারে না, আমাদের তাই সঙ্গে রাখো।

প্রভু রাজী হলেন।

প্রয়াগে আড়ৈলগ্রামে বল্লভ ভট্টের বাড়িতে কৃষ্ণদাস রূপ আর অনুপমের দেখা পেল। সেই পেল শেষ প্রসাদ। প্রভু কাশী চললেন, কৃষ্ণদাস ফিরে এল বৃন্দাবনে। গদাধরের শিষ্য ভূগর্ভ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিলে। শ্রীচৈতন্যকে হৃদয়-মণ্ডলে চৈতন্যস্বরূপ করে রাখলে। নাম হল প্রেমী কৃষ্ণদাস।

॥ ৪৮

শিবানন্দ সেন

নিবাস কুমারহট্টে বা হালিসহরে, জাতিতে বৈদ্য। রথযাত্রার আগে প্রতি বৎসর ভক্তেরা নীলাচলে যায় গৌরাঙ্গদর্শনে, তাদের দলপতি শিবানন্দ। শিবানন্দই ঠিক-ঠিক পথ চেনে, ঘাঁটি সামলায়। শিবানন্দই বহন করে ব্যয়ভার।

শিবানন্দের তিন ছেলে। চৈতন্যদাস, রামদাস আর পরমানন্দদাস বা পুরীদাস। পরমানন্দদাসই কবি কর্ণপুর।

নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হল, শিবানন্দ ভেবে পাচ্ছিল না কী বলে নিজের পরিচয় দেবে। প্রভু নিজের থেকেই বলে উঠলেন, তোমার সঙ্গে আমার কত কালের চেনা, সেই কত আগে থেকেই অনুরাগ—কী, তাই না ?

এ কী দয়া ! এ কী ভালোবাসা !

শিবানন্দ প্রেমাবেশে প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল। বললে, আমি অতল সংসারসমুদ্রে ডুবে ছিলাম, আজ এতদিনে আমি কূল পেলাম, আর তুমিও পেলে তোমার কৃপাপাত্র।

এত কৃপা নিয়ে তুমি করবে কী ? রাখবে কোথায়, ঢালবে কোথায় ? দেখ আমিই সেই শূন্যপাত্র।

সেবার সবাইকে নিয়ে শিবানন্দ চলেছে নীলাচল। শিবানন্দকে পেয়ে সবাই নিশ্চিন্ত। সেই ঘাঁটি সামলাবে, থাকবার-খাবার ব্যবস্থা করবে। গৌড় থেকে নীলাচল কত রাজার রাজ্য পার হয়ে যেতে হবে, সীমান্তে সীমান্তে দিতে হবে পথকর। পথকর আদায়ের কাছারির নামই ঘাঁটি। কত দিতে হবে, কিছু ছাড় পাওয়া যাবে কিনা, কী হিসেব কত টাকা—শিবানন্দই সব ঝামেলা পোয়াবে। কোথায় থাকা হবে, কী খাবার মিলবে, তাও শিবানন্দের দায়িত্ব। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। তোমরা শুধু গৌরচরণচিন্তা বুকে ধরে পথ চলো।

এ কী, এ কুকুর এসে জুটল কোত্থেকে ? এও দেখি চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।

এ কুকুর বুঝি গৌরভক্ত।

শিবানন্দ একে তাড়িয়ে দেবার কথা ভাবতেও পারে না। আর সকলকে সে যেমন খাওয়ায়, কুকুরটাকেও খেতে দেয়। আর সকলে যখন রাত্রে ঘরে গিয়ে শোয়, শিবানন্দ দেখে কুকুরটাও দাওয়ায় উঠে শুয়েছে কিনা।

কিন্তু নদী পার হবার সময় বিপদ বাধল। খেয়ার মাঝি কুকুর পার করতে রাজী হল না। বললে, ওটাকে নিয়ে চলেছ কোথায় ? ওটাকে তাড়িয়ে দাও, যেখানে খুশি চলে যাক।

শিবানন্দের ভীষণ লাগল। জিজ্ঞেস করলে, ঠিক কত পেলে পার করবে ?

দশ পণ কড়ি দাও তো রাজী হতে পারি।

তাই দেব। তবু ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না। ও-ও আমাদের মত গৌরদর্শনে চলেছে।

একদিন ঘাটিয়ালের কাছারিতে শিবানন্দকে আটকে রাখল। রাত হয়ে গেল তবু ছাড়ান পেল না।

কাছাকাছিই ভক্তদের বাসস্থান ঠিক করা ছিল, সেখানে তারা যথারীতি আশ্রয় ও আহার পেল। কিন্তু কেউই কুকুরের খোঁজ করল না।

শিবানন্দ যখন ছাড়ান পেল তখন অনেক রাত। খেতে বসবে, সেবককে জিজ্ঞেস করল, কুকুরকে ভাত দিয়েছিলে?

না।

সে কী? তাকে খেতে দাও নি?

মনে ছিল না।

দেখ দেখ কোথায় আছে। তাকে খুঁজে নিয়ে এস। সে না খেলে আমিও খাব না।

ভক্তদল সেই রাত্রে কুকুর খুঁজতে বেরুল, কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। শিবানন্দ উপোস করে রইল।

আশা ছিল সকালে বুঝি আসবে। কিন্তু না, সকালেও তার দেখা নেই।

নীলাচল আর বেশি দূরে নয়, সবাই তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে পথ চলতে লাগল। এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল যদি দেখা মেলে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

নীলাচলে পৌঁছুবার পরদিন সকালে প্রভুদর্শনে গিয়েছে সবাই, দেখল প্রভুর কাছে একটু দূরে বসে আছে সেই কুকুর। প্রভু তাকে প্রসাদী নারকেলখণ্ড ছুঁড়ে দিচ্ছেন আর হাসিমুখে বলছেন, বলো কৃষ্ণ রাম হরি।

কুকুর সেই নারকেলখণ্ড খাচ্ছে আর বলছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

স্বচক্ষে সেই অঘটন দেখে সবাই অভিভূত হয়ে গেল। শিবানন্দ দণ্ডবৎ হয়ে কুকুরকে প্রণাম করল। তোমাকে অনাহারে রেখেছিলাম বলে যে অপরাধ হয়েছে তা মার্জনা কোরো।

সন্দেহ কী, এই কুকুরের দেহে কোনো ভক্ত অবস্থিত।

পরে আর তাকে দেখা গেল না। প্রভুর হাতের প্রসাদ পেয়ে তার প্রারব্ধের খণ্ডন হয়ে গেছে, সে সিদ্ধদেহে চলে গিয়েছে বৈকুণ্ঠে।

ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।
কুকুরকে 'কৃষ্ণ' কহাই করিলা মোচন॥

আরেকবার চলেছে নীলাচলে, সঙ্গে স্ত্রী আছে, প্রভুর জন্যে ঝালি সাজিয়ে নিয়েছে। আছে শ্রীবাসেরা চার ভাই, শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী। আছে আরো অনেকে। আছে স্বয়ং নিত্যানন্দ।

এবারের ঘাটিয়াল সব ভক্তকেই আটক করেছে। শিবানন্দ বলছে, সমস্ত পথকর আমি দেব, এদেরকে মিছিমিছি ধরেছ কেন?

শিবানন্দের প্রতিশ্রুতি পেয়ে আর-সকলকে ছেড়ে দিল ঘাটিয়াল। তারা গ্রামের মধ্যে গাছতলায় শিবানন্দের অপেক্ষা করতে লাগল। শিবানন্দ ছাড়া কে বা বাসস্থান যোগাড় করবে, কোথায় বা হবে আহারের ব্যবস্থা।

ঘাটিয়ালের হিসেব আর শেষ হয় না। শিবানন্দের দেরি করিয়ে দিতে লাগল।

এদিকে ভক্তদল খিদেয় কাতর হয়ে পড়েছে। কতক্ষণ এমনি আর বসিয়ে রাখবে শিবানন্দ? এতক্ষণ কাছারিতে ও করছে কী?

নিত্যানন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবানন্দকে গাল দিতে লাগল। থাকবার জায়গা তো ঠিক করেইনি, খাদ্যেরও ব্যবস্থা নেই। নিজেও এখনো ফিরলো না। মরুক, শিবার তিন ছেলেই মরুক।

কঠিন অভিশাপ শুনে শিবানন্দের স্ত্রী কাঁদতে বসল।

তিন ছেলে! আগে একবার বড় ছেলে চৈতন্যদাসকে প্রভুর কাছে নিয়ে এসেছিল শিবানন্দ। প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

চৈতন্যদাস।

প্রভু বুঝি একটু কুণ্ঠিত হলেন। বললেন, আহা, কী নামই ধরেছ, অর্থ হয় না।

শিবানন্দ বললে, যিনি জানবার তিনিই ধরবেন।

শিবানন্দ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করল। গুরু ভোজনের ব্যবস্থা করল। আধিক্যে-আড়ম্বরে প্রভু মোটেই প্রসন্ন নন তবু শিবানন্দের গৌরবে তিনি সব খেলেন।

বালক চৈতন্যদাস লক্ষ্য করল সমস্ত। সে একদিন নিমন্ত্রণ করল প্রভুকে। প্রভু রাজী হলেন।

কী আয়োজন করল চৈতন্যদাস? দই নেবু আদা নুন আর ভাত।

আয়োজন দেখে প্রভু দারুণ খুশি হলেন। বললেন, এই বালক আমার মনের কথাটি ঠিক বুঝেছে।

তৃপ্তি করে খেলেন সেই দই-ভাত। ভুক্তাবশেষ কিছু রেখে দিলেন বালকের জন্যে।

নিত্যানন্দের শাপে সেই চৈতন্যদাস নাকি মরে যাবে।

দ্বিতীয় ছেলে রামদাস। তাকেও চৈতন্যচরণ দেখিয়ে নিয়েছে শিবানন্দ। আর তৃতীয় ছেলের জন্মাবার আগে সর্বজ্ঞ প্রভু বলেছিলেন শিবানন্দকে, এবার তোমার যে ছেলে হবে, তার নাম পুরীদাস রেখো, ভালো নাম পরমানন্দদাস। নীলাচলেই মাতৃগর্ভে আসে পুরীদাস, দেশে ফিরে এলে ভূমিষ্ঠ হয়। নিত্যানন্দের শাপে রামদাস পুরীদাস কেউ বাঁচবে না।

ঘাঁটি থেকে ফিরে এসে শিবানন্দ দেখল স্ত্রী কাঁদছে।

কী ব্যাপার, কাঁদছ কেন?

ছেলেদের লক্ষ্য করে গোসাঁই শাপ দিয়েছেন। স্ত্রী বললে সব কথা।

এর জন্যে কাঁদছ কেন? শিবানন্দ প্রসন্নকণ্ঠে বললে, নিতাইচাঁদের বালাই নিয়ে আমার তিন ছেলে মরুক না, তাতে কার কী ক্ষতি?

বলে শিবানন্দ নিজেই নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সামনে এসে দাঁড়াতেই শিবানন্দকে লাথি মারল নিত্যানন্দ।

লাথি খেয়ে শিবানন্দের আনন্দ আর ধরে না। বললে, প্রভু, আজ থেকে তুমি আমাকে তোমার শ্রীচরণের দাস করলে। শাস্তির স্থলে কৃপা করলে। তোমার যে চরণরেণু ব্রহ্মার পক্ষেও দুর্লভ তা আমার এই অধম শরীর আজ লাভ করল। আমার কুলকর্মজন্ম সমস্ত সার্থক হল। তোমার পদস্পর্শে আজই আমার জাগল কৃষ্ণভক্তি।

নিত্যানন্দ শিবানন্দকে আলিঙ্গন করে ধরলেন।

নিত্যানন্দের এই বিচিত্র চরিত্র। ক্রুদ্ধ হয়ে লাথি মারে অথচ পদধূলি দিয়ে হিত করে।

শ্রীকান্ত সেন শিবানন্দের ভাগনে। মামার লাথি খাওয়ায় সে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হল। শিবানন্দকে না জানিয়েই সে ছুটে চলল গৌরহরির কাছে নালিশ করতে। চৈতন্যের পার্ষদ বলে যার এত খ্যাতি, তাকে কিনা নিতাই গোসাঁই লাথি মারল।

তর সয় না, চৈতন্যসকাশে পৌঁছেই গায়ের জামা না খুলেই দণ্ডবৎ করল প্রভুকে।

গায়ে জামা রেখে ভগবৎপ্রণাম সেবাপরাধ। তাই প্রভুর সেবক গোবিন্দ থমকে উঠল : আগে জামা খোলো, পরে—

প্রভু বললেন, শ্রীকান্ত মনে কষ্ট পেয়ে এসেছে, ওর দোষ ধোরো না।

শ্রীকান্ত অবাক মানল। প্রভু এখানে বসেই সমস্ত জানতে পেরেছেন। এমন কি তারও গোপন মনঃক্ষোভ!

প্রভু বৈষ্ণবদের সমাচার জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীকান্ত একে একে সকলের নাম বলল কিন্তু যে নালিশ করতে এসেছিল তা আর করল না। নালিশের আর কোনো প্রয়োজন নেই। কে জানে হয়তো আর কারণও নেই।

রঘুনাথদাস যখন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, তখন তার বাবা গোবর্ধন-দাস মনে করল শিবানন্দের দলের সঙ্গেই সে নীলাচলের যাত্রী হয়েছে। দশজন লোক পাঠাল ছেলেকে ধরে আনবার জন্যে। তাদের সঙ্গে শিবানন্দকে পত্র দিল, রঘুনাথকে দয়া করে ফেরত পাঠিও।

গোবর্ধনের লোক ধরল শিবানন্দকে। রঘুনাথ কোথায়?

আমাদের সঙ্গে তো আসে নি। বললে শিবানন্দ। আমরা তো কিছুই জানি না।

কী করে জানবে। পাছে ধরা পড়ে রঘুনাথ দক্ষিণের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ, পূবের পথ ধরেছে। খ্যাত পথ ছেড়ে দিয়ে উপপথ ধরেছে।

গোবর্ধনের লোক আরো খানিকটা এগোল। শেষে হতাশ হয়ে ফিরে গেল সপ্তগ্রামে।

চার মাস পরে ফিরল শিবানন্দ।

গোবর্ধন আবার তাকে পত্র পাঠাল : মহাপ্রভুর কাছে রঘুনাথ নামে কোনো বৈরাগী দেখলে? তার সঙ্গে কি তোমার পরিচয় হয়েছে? তাকে কেমন দেখলে? কেমন আছে সে?

শিবানন্দ উত্তর পাঠাল : নীলাচলে রঘুনাথকে কে না চেনে? ক্ষণমাত্র প্রভুর চরণ ছাড়ে না, রাত্রি-দিন শুধু নামকীর্তন করে। ভক্ষ্যে-পরিধানে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই, কোনোদিন প্রসাদ যদি জোটে তো খায়, না জোটে তো উপোস করে থাকে। কতদিন তো শুধু ছোলা চিবিয়েই দিন কাটায়। এমন বৈরাগ্য কেউ দেখে নি নীলাচলে।

গোবর্ধন ও তার স্ত্রী দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে রইল। ঠিক করল রঘুনাথের পরিচর্যার জন্যে দুজন ভৃত্য ও একজন ব্রাহ্মণ পাঠাবে। আর তাদের সঙ্গে চারশো মুদ্রা। শিবানন্দের কাছে লোক এল পথের নিশানা জানতে। বলো কোন্ পথ সংক্ষিপ্ত ও নিরাপদ।

শিবানন্দ বললে, তোমরা পথ চিনে যেতে পারবে না। আমি যখন যাব, তখন তোমরা আমার সঙ্গ নিও। এখন বাড়ি যাও, সময় হলে আমিই খবর পাঠাব।

নীলাচলের পথের নিশানদার শিবানন্দ। যাত্রীদের অধ্যক্ষও শিবানন্দ।

বাসুদেব দত্তেরও সেই সরখেল। উদারহস্ত বাসুদেব সঞ্চয় করতে পারত না। গৃহস্থ মানুষ, সঞ্চয় না করলে চলবে কেন? প্রভু শিবানন্দকে বলে দিলেন, তুমি বাসুদেবের আয়-ব্যয়ের ভার নেবে, সরখেল হয়ে তার সমস্ত কাজকর্মের সমাধান করবে।

শিবানন্দ সানন্দে সম্মতি জানাল।

অথচ এই শিবানন্দেরই প্রথমে একবার সংশয় জেগেছিল। নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ হয়েছে এ খবর পেয়ে সে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি। নিজেই গেল পরীক্ষা করতে। ব্রহ্মচারীর সামনে না গিয়ে লুকিয়ে রইল, ভাবল, নকুল যদি আমার নাম ধরে ডেকে উঠতে পারে আর বলে দিতে পারে আমার ইষ্টমন্ত্র কী, তাহলেই মানব সত্যি ওতে গৌরসুন্দরের আবেশ হয়েছে।

নকুল শিবানন্দের নাম ধরে ডেকে উঠল আর শিবানন্দ তার কাছে গিয়ে বসতেই কানে কানে বলে দিল তার ইষ্টমন্ত্র।

শিবানন্দও একজন পদকর্তা। সে লিখল :

দয়াময় গৌরহরি নৈষ্ঠালীলা সাঙ্গ করি
হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে এ দাসেরে একা ফেলে
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ ॥
আদেশ করিল যাহা নিচয় পালিব তাহা,
কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত লাগিবে বিষের মত
তোমা বিনা কি মতে গোঙাব ॥

গৌড়ীয় যাত্রিকসনে বৎসরান্তে দরশনে
কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব সম্বৎসর কাটাইব
যুগশত জ্ঞান করি তিলে॥
হও প্রভু কৃপাবান কর অনুমতি দান
নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব।
যদি না আদেশ কর, অহে প্রভু বিশ্বম্ভর
আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ॥

॥ ৪৯ ॥

পরমানন্দদাস সেন বা কবি কর্ণপুর

কবি কর্ণপূরের সংস্কৃতে লেখা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে প্রভুর জন্মক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রভু চন্দ্রগ্রহণের আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। বর্ণনাটি কী অভিনব।

'রাহু এই বলে চন্দ্রকে গ্রাস করতে লাগল—সুধানিধি, তুমি আর কেন বৃথা উদয় হচ্ছ? তোমার চেয়েও সুন্দর আরেক চন্দ্র পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি করছেন :

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥

পুরীদাসের শৈশবে শিবানন্দ তাকে প্রভুর কাছে কোলে করে নিয়ে আসে। প্রভুরই আশীর্বাদে তার সঞ্চার। হয়তো বা তার জন্মে পরমানন্দ পুরীরও আশীর্বাদ ছিল। প্রভুই বলে দিয়েছিলেন ছেলের নাম যেন পুরীদাস বা পরমানন্দদাস রাখা হয়।

ছেলেকে প্রভুর কাছে নামিয়ে দিতেই সে প্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ মুখে দিয়ে চুষতে লাগল।

এবার শিবানন্দের সঙ্গী ছিল শ্রীনাথ, অপূর্বসুন্দর এক ভক্তিমান ব্রাহ্মণ। অদ্বৈত তাকে আশ্বাস দিয়েছিল নির্জনে প্রভুর সঙ্গে তার দেখা করিয়ে

দেবে। তাই তার নীলাচলে আসা। প্রভুকে দেখে তার মনে হল প্রভুর দর্শনই বুঝি নির্জন দর্শন।

এই শ্রীনাথই পুরীদাস বা কর্ণপূরের গুরু।

পুরীদাস আবার কর্ণপূর হল কী করে?

কৃষ্ণের শ্লোক রচনা করে প্রভুর কর্ণ স্পর্শ করেছিল বলেই সে কর্ণপূর।

আকেবার যখন শিবানন্দ এল, তখন পুরীদাসের বয়স সাত।

পুরীদাস প্রভুকে প্রণাম করল।

প্রভু বললেন, কৃষ্ণ বলো।

কিন্তু বালক পুরীদাস কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করল না।

শিবানন্দও আদেশ করল ছেলেকে, কৃষ্ণ বলো।

তবুও বালক স্তব্ধ, নিরুত্তর।

প্রভু বললেন, আমি জগৎকে কৃষ্ণনাম নেওয়ালাম, স্থাবর পর্যন্ত কৃষ্ণনাম বলল, অথচ এই বালকের মুখে কৃষ্ণনাম আনতে পারলাম না!

স্বরূপ দামোদর বললে, পুরীদাস কী করে কৃষ্ণ বলে? তুমি যে-মুহূর্তে ওকে কৃষ্ণ বলতে বললে, সেই মুহূর্তে ও স্থির করল এই 'কৃষ্ণ' শব্দই ওর দীক্ষামন্ত্র। দীক্ষামন্ত্র সে প্রকাশ্যে উচ্চারণ করে কী করে? দেখছ না মুখে না বললেও ছেলে মনে মনে কৃষ্ণনাম জপ করছে।

কিন্তু আরেক দিন—আরেক দিন কী হল?

প্রভু পুরীদাসকে বললেন, কিছু পড়ে শোনাও তো?

কোথায় পুঁথি, কী পড়বে পুরীদাস? সাত বছরের ছেলে, তার তো তখন লেখা-পড়াই শুরু হয় নি, তবু সে মনে-মনেই এক শ্লোক রচনা করে ফেলল। আবৃত্তি করে শোনাল প্রভুকে:

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো
রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।

মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

যিনি বৃন্দাবনরমণীদের শ্রবণযুগলের কুবলয়, নয়নযুগলের কজ্জল, বক্ষস্থলের ইন্দ্রনীলমণির মালা, সেই নিখিলভূষণ শ্রীহরির জয় হোক।

সাত বছরের ছেলের মুখে এই অপরূপ শ্লোক—উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। বুঝল এই শ্লোকরচনা প্রভুরই কৃপাশক্তির ফল।

অদ্বৈত শ্রীনাথকে নিয়ে এল প্রভুর নির্জন সান্নিধ্যে। শ্রীনাথের হাতে পূজোর উপকরণ।

সেখানে শ্রীনাথ পেল প্রভুর স্পর্শ, প্রেমালাপকৃপার কোমলকটাক্ষ। সেই কটাক্ষেই তার পুরীদাসের গুরু হবার ভূমিকা।

শ্রীনাথের বাড়িও কুমারহট্টে। পুরীদাস তার কাছে অধ্যয়ন শুরু করল। অল্পদিনেই সুশিক্ষিত হয়ে উঠল। শ্রীনাথের ঘরে কৃষ্ণবিগ্রহ। নাম কৃষ্ণরায়। পুরীদাস সেই কৃষ্ণরায়ের সেবক হয়ে দাঁড়াল।

ধীরে ধীরে সে উন্মীলিত হল কবিত্বে।

প্রভুর তিরোভাবের পর প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে তার সান্ত্বনার জন্যে নাটক লিখিল—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। তার অন্যান্য গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, আর্যাশতক ও অলঙ্কার-কৌস্তভ। পাণ্ডিত্যে শুধু নয়, কবিত্বে ও ভক্তিসম্পদে গ্রন্থগুলি অতুলনীয়। উদ্ধবদাস লিখছে :

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় স্তবাবলী গ্রন্থচয়
রচিলেন কবি কর্ণপূর।
যা শুনি ভক্তি উদয় নাস্তিকতা নষ্ট হয়
অবৈষ্ণব ভাব হয় দূর॥
কর্ণপূর গুণ যত এক মুখে কব কত
চৈতন্যের বরপুত্র যেঁহ।
উদ্ধবেরে দয়া করি জ্ঞানচক্ষু দান করি
কবিত্ব লওয়ায় জানি তেঁহ॥

কবি কর্ণপূর নিজে কী বলছে? বলছে :

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

বৈরাগ্যবিদ্যা ও ভক্তিযোগ শেখাবার জন্যে যে দয়ানিধি পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন আমি তাঁর শরণ নিই।

পরমানন্দ পুরী

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, ঈশ্বর পুরীর গুরুভাই। জন্ম ত্রিহুতে। দাক্ষিণাত্য জয় করতে এসে ঋষভ পর্বতে প্রভু তার দেখা পেলেন। দেখা হতেই প্রভু তাকে প্রণাম করলেন। পুরীগোসাঁই প্রভুকে আলিঙ্গন করল।

গুরুস্থানীয় অথচ পরমানন্দের মধ্যে গুরুত্বের একবিন্দু অভিমান নেই। তার মধ্যে শুধু ভক্তি, শুধু প্রীতি, শুধু দীনতা।

তিনদিন একসঙ্গে কাটালেন দুজনে। দুজনের মধ্যে কথা কী? শুধু এক কথা, কৃষ্ণকথা। যে কথার শেষ নেই, যে কথায় কেউ ক্লান্ত হয় না।

পুরীগোসাঁই বললে, আমি নীল্যচলে যাব, সেখান থেকে যাব গৌড়ে, গঙ্গাস্নান করতে।

তারপর আবার নীলাচলে ফিরে এস। বললেন প্রভু, আমি সেতুবন্ধন দেখে শিগগিরই ফিরে যাব। বড় ইচ্ছে তোমার কাছটিতে থাকি।

আমারও সেই বাসনা। বললে পরমানন্দ, তোমার কাছটিতে থাকি।

পরমানন্দ নীলাচল হয়ে চলে এল নবদ্বীপ, একেবারে শচী-গৃহে। শচীর মন্দিরেই বিশ্রাম করল সন্ন্যাসী, ভিক্ষে নিল। সেখানেই শুনল গৌরহরি নীলাচলে ফিরে এসেছেন আর তাই শুনে গৌড়ভক্তেরা সেখানে যাবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছে।

আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। গৌড়ভক্তেরা পরমানন্দকে অনুরোধ করল।

আমিও যাচ্ছি ঘটে কিন্তু তোমাদের সঙ্গে নয়।

আমাদের সঙ্গে নয় কেন?

পুরীগোসাঁই হাসল। বললে, তোমাদের যেতে দেরি হবে। আমি কালই রওনা হব।

প্রভুর বাল্যসঙ্গী ভক্ত কমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করল পুরীগোসাঁই।

তোমার নবদ্বীপের ভক্তেরাও আসছে। প্রভু এসে চরণ বন্দনা করতেই বললে পরমানন্দ। কিন্তু ওদের কদিন দেরি হবে। কিন্তু আমার তর সইল না, তুমি ফিরেছ শুনেই প্রাণ উচাটন হল।

প্রভু বললেন, আমিও তোমার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি। তুমি নীলাচল ছেড়ে আমাকে ছেড়ে যেও না কোথাও।

কাশী মিশ্রের বাড়িতে একটি নিভৃত ঘরে তার আশ্রয় হল। তাকে সেবা করবার জন্যে প্রভুই একটি লোক ঠিক করে দিলেন।

প্রভু জগন্নাথ দর্শনে যাচ্ছেন, তাঁর অগ্রবর্তী হয়ে চলেছে পরমানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী। এক পাশে অদ্বৈত আরেক পাশে স্বরূপ দামোদর। পিছনে জলকরঙ্গ হাতে গোবিন্দ। মন্দিরে ঢোকবার আগে প্রভু পা ধোবেন যাতে তাঁর পায়ের ধুলো মন্দির-প্রাঙ্গণে না লাগে, তারই জন্যে জল।

অবশ্য সকলের আগে বলবান কাশীশ্বরকে দেখা যাচ্ছে, সে যাচ্ছে ভিড় সরিয়ে-সরিয়ে। পথ দাও, কথা শোনো, সরে যাও বলছি।

প্রভু যখন গৌড়ে যান তখনো সঙ্গী পরমানন্দ। যখন নীলাচলে ফিরে আসেন তখনো পরমানন্দ সহচর। প্রভুর নীলাচল-জীবনের সঙ্গে পরমানন্দ ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছে। ব্রহ্মানন্দ ভারতীর বরং গোড়াতে সন্ন্যাসের অহঙ্কার ছিল কিন্তু পরমানন্দ আত্যন্ত বিনয়ী, স্নেহদ্রব। প্রভুর প্রতি তার বাৎসল্যভাবই প্রধান। প্রভু চারভাবে বশীভূত। তার মধ্যে সখ্য রামানন্দের, দাস্য গোবিন্দের, মধুর জগদানন্দ, গদাধর, আর স্বরূপের, আর বাৎসল্য পুরী গোসাঁইয়ের।

একদিন নীলাচলে রামচন্দ্র পুরী এসে উপস্থিত।

রামচন্দ্রও মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। পরমানন্দের আগেই দীক্ষা নিয়েছিল বলে সে পরমানন্দের জ্যেষ্ঠস্বরূপ। কিন্তু নিদারুণ নিন্দুক।

মাধবেন্দ্র যখন অন্তর্ধান করছেন, পরমানন্দ তাঁকে কৃষ্ণনাম শোনাচ্ছে, মাধবেন্দ্র কেঁদে উঠলেন : আমি এখনো মথুরা পেলাম না, কবে আমি মথুরা পাব ?

পদাবলীর সেই শ্লোকই বুঝি আবৃত্তি করলেন, হে দীনদয়ার্দ্র নাথ, হে মথুরানাথ, আমি কবে তোমার দেখা পাব ? তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় কাতর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হে দয়িত, তুমি বলে দাও আমি কী করব, কোথায় যাব ?

রামচন্দ্র পুরী কাছেই ছিল, সে শিষ্য হয়ে গুরুকে উপদেশ দিতে গেল। বললে, তুমি কাঁদছ কেন ? তুমি তো নিজেই পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, সেই কথা স্মরণ করো। নিজে ব্রহ্ম হয়ে কে কবে কাঁদে ?

এ তো জ্ঞানমার্গের কথা—মাধবেন্দ্র তো ভক্তির ভিখারি। মাধবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে রামচন্দ্রকে তিরস্কার করলেন, বললেন, পাপিষ্ঠ, দূর হয়ে যা। আমি কৃষ্ণ না পেয়ে মথুরা না পেয়ে দুঃখে মরে যাচ্ছি আর তুই আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দিচ্ছিস? তোর মুখদর্শন করাও পাপ।

সেই থেকে কৃষ্ণসম্বন্ধশূন্য শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী রামচন্দ্র পুরী পরমনিন্দুক হয়ে উঠল।

নীলাচলে এসে পৌঁছুতেই প্রভু আর পরমানন্দ দুজনেই তাঁকে প্রণাম করলেন। প্রভু উপরন্তু তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

জগদানন্দ পণ্ডিত রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করল।

খেতে বসে রামচন্দ্র বললে, আরো দাও।

জগদানন্দ নিজেই পরিবেশন করছে, রামচন্দ্র বেশি খাচ্ছে—এতে জগদানন্দেরই যেন বেশি সুখ।

তারপর নিজে খেয়ে উঠে রামচন্দ্র জগন্নাথকে খাওয়াতে বসল। নিজে যেমন বেশি খেয়েছে তেমনি খাওয়ালও বেশি করে। রামচন্দ্রের সে কী আগ্রহ, কী অনুরাগ!

তারপর লাগল নিন্দা করতে। বললে, চৈতন্যের লোকগুলো অতি-ভোজী। নিজেরা যেমনি বেশি খায় তেমনি অতিথি-সন্ন্যাসীদেরও বেশি খাওয়ায়। বেশি খাইয়ে ধর্মনাশ করে। যারা বেশি খায় তাদের কিসের বৈরাগ্য?

দেখ কাণ্ড! নিজে ইচ্ছে করে রাশ-রাশ খেল, যত্ন করে খাওয়াল, তারপরে কিনা অতি-ভোজনের নিন্দা করতে বসল!

রামচন্দ্রের এমনিতে বৈরাগ্যস্বভাব, কোথায় থাকবে কী খাবে কোনো স্থিরতা নেই। বিনা নিমন্ত্রণেই অতিথি হয়। কোনো অনুসন্ধানই নেই, কার বাড়ি, কী বা খেতে দেবে। তার শুধু একমাত্র সন্ধান যার বাড়ি সে কী ভাবে থাকে আর কী খায় ও কতটা খায়। বিশেষ করে তার লক্ষ্য প্রভুর উপর। প্রভু কোথায় থাকেন, কী ভাবে শয়ন করেন, কোথায় খান বা কী খান—সমস্ত রীতিনীতির উপর তার কড়া চোখ। কোনো একটি ছিদ্র পেলেই হয়—নিন্দা করে আনন্দিত হতে পারে।

প্রভুর কোনো গুণ তো স্পর্শ করতেই পারল না, কোনো দোষও পেল না খুঁজে পেতে।

তবু রামচন্দ্র প্রত্যহ প্রভুকে দেখতে আসে, আর ইতি-উতি তাকায় কোনো ত্রুটি ধরতে পারে কিনা।

সেদিন রামচন্দ্র সকালে এসেছে, এসে দেখল প্রভুর ঘরের মেঝেতে কটা পিঁপড়ে হাঁটছে। আর যায় কোথা। রামচন্দ্র তিরস্কার করে উঠল: নিশ্চয়ই কাল রাত্রে ঘরে মিষ্টদ্রব্য আনা হয়েছিল, তাই পিপীলিকারা বিচরণ করছে। ছি ছি, বৈরাগী সন্ন্যাসীদের এমনি ইন্দ্রিয়লালসা!

রাগ করে উঠে চলে গেল রামচন্দ্র। প্রভুর নিন্দা করে বেড়াতে লাগল—সন্ন্যাসী হয়ে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে। মিষ্টান্ন ভক্ষণ করলে ইন্দ্রিয়বারণ হয় কী করে?

নিন্দা ভিত্তিহীন—পিপীলিকা তো এমনিতেই যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়—তবু পরম্পরায় নিন্দা শুনে প্রভু সংকুচিত হলেন। গোবিন্দকে ডেকে বললেন, আগে যা খেতে দিতে, এখন থেকে তার চার ভাগের এক ভাগ দেবে। যদি বেশি দাও তো আমি এখান থেকে চলে যাব।

সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসল। রামচন্দ্রকে ধিক্কার দিয়ে উঠল। পিঁপড়ে থেকে মিষ্টান্নের অনুমান! আর সে মিষ্টান্নের জন্যে সন্ন্যাসীর স্পৃহা!

সেদিন এক ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষে নিতে গিয়ে প্রভু বললেন, এক চৌঠি ভাত দাও আর সামান্য ব্যঞ্জন।

ব্রাহ্মণ হাহাকার করে উঠল। এত অল্প?

এই অল্পেরও আবার অর্ধেক। অর্ধেক আবার প্রভু রেখে দিলেন গোবিন্দের জন্যে।

কাশীশ্বর আর গোবিন্দকে বলে দিলেন, তোমরা অন্যত্র খাবার ব্যবস্থা করো। আমার সঙ্গে খেতে গেলে তোমাদের প্রায় উপোস করে থাকতে হবে।

কদিন পরে রামচন্দ্র এসে হাজির।

প্রভু যথারীতি তাকে প্রণাম করে আদেশের অপেক্ষা করে রইলেন।

তোমাকে যে ক্ষীণ দেখছি, বললে রামচন্দ্র, অর্ধাশন করছ বোধ হয়। এই শুষ্ক বৈরাগ্যও তো সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়।

প্রভু কথা বললেন না।

যে পরিমাণ আহার করলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় বা শরীর রক্ষা হয় সন্ন্যাসী সেই পরিমাণ মাত্র খাবে। বললে রামচন্দ্র, তার অতিরিক্ত ভোগই বিষয়ভোগ।

বিষয় ভোগ না করে যথাযোগ্য উদরভরণেই সন্ন্যাসীর জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয়। গীতা কী বলছে? যার আহার বিহার কর্মচেষ্টা নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, সেই সত্যিকার যোগী।

প্রভু বললেন, আমি অজ্ঞ, শাস্ত্রের বিধিনিষেধ কিছুই জানি না। আমি তোমার শিষ্যতুল্য, তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ এ আমার মহাভাগ্য।

পরমানন্দ পুরী ভক্তদের নিয়ে প্রভুর কাছে দরবার করতে এল। দৈন্য-বিনয় করে বললে, রামচন্দ্রের কথায় তুমি খাওয়া কমাবে কেন? ওর তো স্বভাবই শুধু পরের নিন্দা করা, যেখানে দোষ নেই সেখানেও দোষ দেখে বেড়ানো। শাস্ত্র বলছে সমস্ত বিশ্বকে প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গে একাত্ম মনে করে পরের স্বভাব বা কর্মকে প্রশংসাও করবে না, নিন্দাও করবে না। রামচন্দ্র প্রশংসা করা ছেড়েছে কিন্তু নিন্দা করা ছাড়ে নি। তাই তুমি ওর কথা ধোরো না। তুমি আগের মতই ভোজন করো।

প্রভু বললেন, সবাই রামচন্দ্রের প্রতি রোষ করছ কেন? তিনি তো ঠিকই বলেছেন, সন্ন্যাসীর জিহ্বালম্পট হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। প্রাণ রাখতে যেটুকু দরকার সে শুধু সেটুকুই খাবে।

কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সে উপদেশের অবকাশ কোথায়? তুমি তো সামান্যই গ্রহণ করো।

পরমানন্দ গুরুস্থানীয়, তার কথাও প্রভু ফেলতে পারেন না, আবার রামচন্দ্রও গুরুস্থানীয়, তার কথাও উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া ভক্তদের কাতরতা তো আছেই।

তখন প্রভু নিজেই নিষ্পত্তি করলেন। এক-চতুর্থাংশ খাচ্ছিলেন, বললেন, এবার থেকে অর্ধেক খাবেন। এতে করে দুই পুরীগোসাঁইয়েরই মর্যাদা রইল।

তারপর রামচন্দ্র নীলাচল ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু পরমানন্দ প্রভুকে ছাড়ল না। গুরুস্থানীয় হয়েও অন্তরঙ্গ আপনজনের মত পাশে লেগে রইল। শেষদিকে প্রভুর দক্ষিণে-বামে শুধু দুজনেই মর্মসহচর—স্বরূপদামোদর আর পরমানন্দ।

প্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস যখন নীলাচলে এল, দেখল পরমানন্দ তখনো জেগে আছে।

। ৫১ ।

ছোট-হরিদাস

নীলাচলে প্রভুর দুপাশে দুই কীর্তনিয়া—দুইই হরিদাস, বড় হরিদাস আর এই ছোট-হরিদাস। এদের সেবা কীর্তনসেবা। এরা প্রভুকে নিত্য কীর্তন শুনিয়ে তুষ্ট রাখে।

ভগবান আচার্য বিষয়বিমুখ সরলভক্ত। মহাপ্রভুকে তার ঘরে আহারের নিমন্ত্রণ করেছে। ভগবান ছোট-হরিদাসকে বললে, শিখি মাহিতীর বোন মাধবী দাসীর কাছ থেকে কিছু ভালো চাল নিয়ে এস। সরু শালিধানের চাল। আমার ঘরের চাল অত ভালো নয়।

শিখি মাহিতী জগন্নাথের মন্দিরের হিসাবলেখক। প্রভুর মরমী ভক্ত। তার বোন মাধবী বয়সে বৃদ্ধা, তপস্বিনী, পরম বৈষ্ণবী। শিখি আর মাধবী দুজনেই রাধিকার পরিকর।

প্রভুর মতে পৃথিবীতে রাধিকার সেবার অধিকারী মাত্র সাড়ে তিনজন। এক স্বরূপদামোদর, দুই রামানন্দ রায় আর তিন শিখি মাহিতী। আর অর্ধজন মাধবী। স্ত্রীলোক বলে অর্ধজন। কিন্তু রাগানুগা সাধনায় সে কারো চেয়ে খাটো নয়। তপস্যার কঠোরতায়ও সে অনন্যা।

চাওয়ামাত্রই মাধবী ছোট-হরিদাসকে চাল দিল।

চাল দেখে উল্লসিত হল ভগবান। চিত্তের সমস্ত স্নেহ ঢেলে সে নিজের হাতে রান্না করল।

মধ্যাহ্নে প্রভু খেতে এলেন। ভাতের থালা সামনে নিয়ে আসনে বসে জিজ্ঞেস করলেন, এই সরু শালিধানের চাল তুমি কোথায় পেলে ?

ভগবান বললে, মাধবী দাসীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।

কে গিয়েছিল চাইতে ?

ছোট-হরিদাস।

আহারান্তে প্রভু ঘরে ফিরলেন। গোবিন্দকে বললেন, আজ থেকে আমার এখানে ছোট-হরিদাসকে আসতে দেবে না।

ছোট-হরিদাসের দ্বারমানা হয়ে গেল। কিন্তু কেন, কী অপরাধে তার এই শাস্তি কেউ বুঝতে পারল না।

ছোট-হরিদাস অন্তরের নির্জনে বসে কাঁদতে লাগল। আহার-নিদ্রা ঘুচে

গেল। তিন দিন উপবাসে কাটল। প্রভুর কাছে যেতে পারব না, তবে আর কার কাছে যাব? জীবনে যাবার আর জায়গা কোথায়? পথ কোথায়?

স্বরূপ দামোদর প্রভুকে জিজ্ঞেস করল, হরিদাসের কী হল? তিন দিন ধরে সে উপোস করে আছে।

আমি তার দ্বারমানা করে দিয়েছি।

কেন, কী অপরাধে?

কী অপরাধে! বৈরাগী হয়ে যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলে আমি তার মুখদর্শন করি না। ইন্দ্রিয় দুর্বার, তার বিষয় পেলেই সে তা গ্রহণ করে বসে, কাঠের স্ত্রীমূর্তিও মুনির মনে চাঞ্চল্য আনে। সন্ন্যাসী স্ত্রী-সম্ভাষণ করে ইন্দ্রিয় উপভোগ করছে, তার সেই মর্কট বৈরাগ্যকে প্রশ্রয় দিতে পারি না।

বলে প্রভু অভ্যন্তরে চলে গেলেন। তাঁর ক্রোধ দেখে স্বরূপ আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

আরেকদিন ভক্তেরা গেল দল বেঁধে। বললে, ছোট-হরিদাসের অপরাধ সামান্য, এবারের মত তা মার্জনা করো।

অপরাধ সামান্য—তাকি আর প্রভু জানেন না? ছোট-হরিদাসের মন তো আবিল নয়, তার মনের সুদূর কোণেও কোনো উপভোগের বাসনা ছিল না। আর চাল আনতে গিয়েছিল তো সে নিজের প্রেরণায় নয়, ভগবানের অনুরোধে। তাও প্রভুরই সেবার জন্যে।

তা প্রভু জানেন না তা নয়। ছোট-হরিদাসের অপরাধ তো শুধু শাস্ত্র-লঙ্ঘন। হ্যাঁ, শাস্ত্রলঙ্ঘনের জন্যেই প্রভুকে কঠোর হতে হবে। হ্যাঁ, লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যেই এই কঠোরতা।

প্রভু বললেন, আমার নিজের মনই আমার বশীভূত নয়। সে মন প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং বৃথা কথা ছাড়ো, নিজের নিজের কাজে গিয়ে মন দাও। আবার যদি এমন কথা বলো তো আমি চলে যাব।

ভক্তেরা হাত দিয়ে কান ঢেকে পালিয়ে গেল।

ধরল পরমানন্দ পুরীকে। আপনি প্রভুর সুহৃদ, আপনি তাঁকে প্রসন্ন করুন।

পরমানন্দ প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল।

প্রভু তাকে প্রণাম করে সবিনয়ে বললেন, আদেশ করুন কী করতে হবে।

পরমানন্দ বলেন, ছোট-হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হও।

প্রভুর কণ্ঠে এতটুকুও সন্তোষ নেই। বললেন, গোসাঁই, তুমি বৈষ্ণবদের নিয়ে এখানে থাকো, আমি গোবিন্দকে নিয়ে আলালনাথে চলে যাই। বলে তখুনই গোবিন্দকে ডাকলেন আর পরমানন্দকে প্রণাম করে যাত্রার জন্যে পা বাড়ালেন।

পরমানন্দ বললে, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার কথার উপরে কার কথা খাটবে? তোমার সমস্ত আচরণ লোকহিতের জন্যে, তোমার হৃদয়ের গূঢ় অভিপ্রায় আমরা কী করে বুঝব বলো? তুমি এখানেই থাকো, আমরা আর কিছু বলতে আসব না।

সবাই তখন ছোট-হরিদাসের কাছে গেল।

স্বরূপ বললে, পরমদয়াল প্রভু নিশ্চয়ই তোমাকে কৃপা করবেন। এখন ক্রুদ্ধ আছেন, পরে নিশ্চয়ই নরম হবেন। তুমি যদি জেদ করে উপবাস চালাও তা হলে তাঁরও জেদ বাড়বে। তুমি স্নানাহার করো, তা হলেই প্রভুর আর ক্রোধ থাকবে না।

আশ্বস্ত হয়ে ছোট-হরিদাস স্নানাহার করল। কিন্তু কই প্রভু তাকে ডাকছেন কোথায়? কই দ্বারমোচন করছেন?

প্রভু যখন জগন্নাথদর্শনে যান ছোট-হরিদাস দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে ছায়ার মত কাছাকাছি থাকত, কত গান শোনাত, কীর্তন করত। কত চরণস্পর্শ পেত, পেত কত নেত্রামৃত। আজ সে পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত।

উপায় নেই। লোকশিক্ষার জন্যেই প্রভুর এই ভক্তবর্জন। এই ভক্তকে দণ্ড দিয়ে বহু ভক্তকে শেখাচ্ছেন। 'প্রিয়ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম বুঝাইতে।'

সকলেই ভয় পেল। স্বপ্নেও আর কেউ স্ত্রী-সম্ভাষণ করে না।

এক বছর কেটে গেল, তবু ছোট-হরিদাসের উপর প্রভুর দয়া হল না। সকলের চোখের আড়ালে দূর থেকে প্রভুকে রোজ একবার দেখে যায় কিন্তু প্রভু ভুলেও একবার ডেকে পাঠান না। চোখে চোখ রাখেন না।

কতদিন আর এমনি করে চলে? প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করে একদিন রাত্রিশেষে ছোট-হরিদাস বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

চলল প্রয়াগের দিকে। প্রভুর চরণ পাবার সংকল্প করে ত্রিবেণীতে ঝাঁপ দিল।

ছেড়ে দিল মরদেহ। দিব্যদেহ ধরে চলে এল প্রভুর কাছে। কোথায় আর দ্বারমানা? কে আর তার পথরোধ করে?

দেহ ছেড়ে দিলেও সেবা ছাড়ল না আগে নরদেহে গান শোনাত, এখন দিব্যদেহে গান শোনাতে লাগল।

ছোট-হরিদাস কোথায়? প্রভু একদিন জিজ্ঞেস করলেন ভক্তদের। বললেন, তাকে এখানে ডেকে আনো।

ভক্তেরা বললে, এক বছর অপেক্ষা করে একদিন রাত্রে উঠে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না।

প্রভু অল্প একটু হাসলেন। যেন বলতে চাইলেন, তিনি জানেন কোথায় ছোট-হরিদাস। তিনিই তাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। সে আগের মতন গান গেয়ে শোনাচ্ছে।

একদিন ভক্তদল সমুদ্রস্নান করতে এসে শুনতে পেল দূরে কোথায় ছোট-হরিদাস গান করছে। অবিকল সেই স্বর সেই পদ। কিন্তু কাছে-দূরে কোথাও তো মানুষ নেই। এ যে শূন্যে গান হচ্ছে।

গোবিন্দ ভয় পেল। বললে, ছোট-হরিদাস নিশ্চয়ই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই সে এখন ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে অশরীরী গান ধরেছে।

এ হতে পারে না। বললে, স্বরূপ দামোদর, সে আজীবন কৃষ্ণকীর্তন করেছে, প্রভুর সেবা করেছে। তার এমন দুর্গতি সম্ভব নয়।

প্রয়াগ থেকে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে এসে ছোট-হরিদাসের কথা জানাল সবাইকে।

শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্ত বিমূঢ় হয়ে গেল। তারপর যথারীতি সবাই যখন গিয়েছে নীলাচলে, শ্রীবাস প্রভুকে জিজ্ঞেস করলে, আমাদের ছোট-হরিদাস কই?

প্রভু বললেন, স্বকর্মফলভুক পুমান। যে যেমন কর্ম করে সে তেমনি ফল ভোগ করে।

শুনেছি সে ত্রিবেণীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

প্রকৃতিসম্ভাষণ করলে এই প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু দিব্যদেহে সে আমাকে কীর্তন শোনাচ্ছে।

ত্রিবেণী-প্রভাবেই ছোট-হরিদাস প্রভুপদ লাভ করেছে। পূর্ণ করেছে সংকল্প।

এই এক লীলায় প্রভু কত কাজ করলেন। দেখালেন কারুণ্য, প্রকাশ করলেন ভক্তের অনুরাগ। প্রতিষ্ঠিত করলেন তীর্থের মহিমা। দিলেন

বৈরাগ্যশিক্ষা। সর্বোপরি দেহত্যাগের পরেও ভক্তকে আপনার বলে অঙ্গীকার করলেন। তাকে দিলেন দিব্যদেহে সেবাধিকার। তার কণ্ঠে শুনলেন বিরতিহীন কৃষ্ণকীর্তন।

॥ ৫২ ॥

গোপীনাথ আচার্য

মহেশ্বর বিশারদের জামাই, সার্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা প্রত্যক্ষ করে চলে যায় নীলাচল। সেখানে সে আগে থেকে গিয়ে না রইলে প্রভুর উড়িষ্যা-বিজয়ের পথ প্রস্তুত হবে কী করে?

সেই তো সার্বভৌমকে চেনাবে কাকে সে মূর্ছিত দেখে মন্দির থেকে তুলে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে। সার্বভৌম চিনলেই তো রামানন্দ চিনবে। চিনবে প্রতাপরুদ্র।

এই যে গোপীনাথ। নবদ্বীপে থাকতেই পরিচয়, মুকুন্দ দত্ত এগিয়ে এসে আচার্যকে নমস্কার করল।

তোমরা এখানে? গোপীনাথ অবাক মানল।

মুকুন্দ দত্ত বললে, প্রভু আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা-একা চলে এসেছিলেন মন্দিরে। শুনতে পাচ্ছি জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, সার্বভৌম তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে। সার্বভৌমের বাড়ি কোন্ দিকে আমরা কিছুই জানি না। আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।

গোপীনাথ মুকুন্দ ও তার সঙ্গীদের, সার্বভৌমের বাড়ির পথ দেখাল।

আবার সার্বভৌমকে দেখাল চৈতন্যের বাড়ির পথ।

গোপীনাথ তো শুধু ভক্ত নয়, গোপীনাথ তত্ত্বজ্ঞ। সেই জানে চৈতন্যের আসল ঠিকানা।

সার্বভৌমের প্রশ্নের উত্তরে গোপীনাথ চৈতন্য সম্পর্কে যাবতীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করল। নাম ধাম আত্মীয়-স্বজন সংসারাশ্রম সন্ন্যাসাশ্রম—কোনো প্রসঙ্গই বাকি রাখল না। শেষ পর্যন্ত চৈতন্যকে 'পরম-ঈশ্বর' বলে বসল।

ভট্টাচার্য, তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞস্থানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর ॥

সার্বভৌমের শিষ্যেরা প্রতিবাদ করল, প্রমাণ কী?

গোপীনাথ বললে, তত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞজনদের অনুভবই প্রমাণ।

শিষ্যেরা উপহাস করে উঠল, অনুমানকেই তবে প্রমাণ বলে মানতে হবে?

না, অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যাবে। কিন্তু কৃপা ছাড়া সে জ্ঞান সম্ভব নয়। গোপীনাথ সার্বভৌমকে লক্ষ্য করল, তুমি পণ্ডিত হতে পারো কিন্তু তোমাতে ঈশ্বরের কৃপা নেই, তাই কিছু বুঝতে পারছ না। তোমার শাস্ত্রই তো বলেছে শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে জানা যাবে না ঈশ্বরকে।

সার্বভৌম ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, তত্ত্ব নিয়ে তর্ক করছ তত্ত্বেই আবদ্ধ থাকো, ব্যক্তিকে টানছ কেন? আমার প্রতি তো ঈশ্বরের কৃপা নেই কিন্তু তোমাতে তাঁর কৃপা হয়েছে তারই বা প্রমাণ কী?

প্রমাণ, আমি বস্তুকে বস্তু বলে জেনেছি। গোপীনাথ গাঢ়তপ্ত স্বরে বললে, চৈতন্যের শরীরে মহাপ্রেমাবেশ দেখেও তোমার চিনতে দেরি হচ্ছে? এ মহাপ্রেমাবেশ কি ঈশ্বরলক্ষণ নয়? কী বলব, তোমাতে কৃপা নেই, শুধু মায়া—তুমি মায়াচ্ছন্ন।

সার্বভৌম বিদ্রূপের হাসি হাসল। বললে, আমি শাস্ত্রদৃষ্টে কথা বলি। তত্ত্বনির্ণয়ের খাতিরে তর্ক-বিচার করি। শুধু ভাবাবেগে চালিত হই না।

বেশ তো, বলো না তোমার কী বিচার!

শাস্ত্রে আছে কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নেই। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগেই তাঁর অবতার হয়, তাই তো বিষ্ণুর নাম ত্রিযুগ। সুতরাং তোমার চৈতন্য অবতার হতে পারেন না। তবে, হ্যাঁ, তিনি যে মহাভাগবত তাতে সন্দেহ নেই।

শাস্ত্রজ্ঞ বলে তোমার দেখি অভিমানের শেষ নেই। গোপীনাথ পাল্টা বললে, মহাভারত আর ভাগবত এই দুই শাস্ত্রের কথা কি ভুলে গিয়েছ? তারা বলছে কলিতে লীলাবতার না হতে পারে কিন্তু যুগাবতার হতে বাধা নেই। চৈতন্য যুগাবতার নন, তিনি স্বয়ং ভগবান। তোমাকে কী বোঝাব

উষর ভূমিতে বীজ-বপন নিষ্ফল। যখন তোমার উপর তাঁর কৃপা হবে তখন বুঝবে আমার সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা।

এদিকে সার্বভৌমের অনুরোধে অভ্যাগতদের থাকবার-খাবার ব্যবস্থা গোপীনাথই সম্পন্ন করছে। প্রভুকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দর্শনও করাচ্ছে গোপীনাথ।

তারপর একদিন সার্বভৌমের পাণ্ডিত্য চূর্ণ হল। নির্মম লৌহপিণ্ড নবনীতে পরিণত হল। কঠিন বস্তু অমৃতসরস হল।

সার্বভৌম কাঁদছে, সার্বভৌম নাচছে—দেখে গোপীনাথ যত না মূঢ়, তার চেয়ে বেশি আনন্দিত। প্রভুকে গিয়ে খবর দিল, সেই শুষ্কজ্ঞানী তার্কিক পণ্ডিত ভক্তিরসের ভাবুক হয়ে গিয়েছে।

প্রভু বিনয় করে বললেন, সে একমাত্র তোমারই সঙ্গগুণে। তুমি ভক্ত, তোমার সান্নিধ্যহেতু জগন্নাথ সার্বভৌমকে কৃপা করলেন।

তারপর প্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করলেন, বস্ত্র আর প্রসাদ গোপীনাথই নিয়ে এল। এগিয়ে গেল আলালনাথ পর্যন্ত। আলালনাথে নিজে খাওয়াল প্রভুকে, খাইয়ে শেষ প্রসাদান্ন সকলকে ভাগ করে দিল।

তারপর প্রভু যখন আবার ফিরে এলেন, গৌড় থেকে ভক্তদল তাঁকে দেখতে এল। ভক্তদের দেখতে প্রতাপরুদ্র তার প্রাসাদের ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশে সার্বভৌম আর গোপীনাথ। রাজা সার্বভৌমকে বললে, ভক্তদের চিনিয়ে দাও।

সার্বভৌম বললে, আমি কাউকে চিনি না, গোপীনাথ চেনে—সেই চিনিয়ে দেবে।

বেশ, চলো। এই যে দুজন মালা আর প্রসাদ নিয়ে বৈষ্ণবদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যাচ্ছে, এরা কারা? রাজা জিজ্ঞেস করল।

গোপীনাথ বললে, প্রথম জন স্বরূপদামোদর। উনি প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর।

আর দ্বিতীয় জন?

উনি গোবিন্দ। প্রভুর পরিচারক। আগে ঈশ্বরপুরীর সেবক ছিল, ঈশ্বরপুরীর আদেশে প্রভুকে পরিচর্যা করতে এসেছে।

কিন্তু এরা মালা দিচ্ছে কাকে? তেজোময় পুরুষ কে এই মহান্ত?

ইনি অদ্বৈত আচার্য। প্রভুর মান্যপাত্র, সকলের পূজনীয়।

ক্রমে ক্রমে আরো সকলকে চিনিয়ে দিল গোপীনাথ। এই শ্রীবাস, এই বক্রেশ্বর, গদাধর, বিদ্যানিধি, মুরারি গুপ্ত। এই তিন কীর্তনিয়া ভাই, গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব। এই কুল নগ্রামের সত্যরাজ খান, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব। শ্রীমান শ্রীকান্ত শুক্লাম্বর। রামানন্দ, রাঘব, রঘুনন্দন। আর এই সেই ভুবনপাবন হরিদাস ঠাকুর।

কতেক কহিবে এই দেখ যতক্ষণ।
শ্রীচৈতন্য-গণ সব চৈতন্য জীবন ॥

গোপীনাথই সকলের বাসা-ব্যবস্থা করে দিল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ভক্তদের জলকেলি শুরু হল। অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ পরস্পর জল ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সঙ্গে। শ্রীবাসের সঙ্গে খেলছে গদাধর। সব চেয়ে আশ্চর্য, দুই গম্ভীর পণ্ডিত রামানন্দ আর সার্বভৌম জলে নেমে শিশুর চাপল্য করছে।

প্রভু গোপীনাথকে বললেন, ঐ দুই সম্ভ্রান্ত পণ্ডিতকে বাল্যচাঞ্চল্য বর্জন করতে বলো।

গোপীনাথ বললে, তোমার কৃপাসিন্ধুর এক বিন্দুও যদি উথলে ওঠে, সু-উচ্চ মেরুমন্দর পর্বতই ডুবে যেতে পারে আর ও দুটো তো গণ্ডশৈল—ছোট পাহাড়। শুষ্ক তর্কের জাবর কাটত, তাকে তুমি লীলামৃত পান করালে।

গোপীনাথই বাঁচিয়ে দিলে অমোঘকে। গোপীনাথই প্রভুকে খবর দিলে যে অমোঘের ওলাওঠা হয়েছে। তারপর অমোঘ যখন নিজের গালে চড় মারতে লাগল গোপীনাথই তাকে নিরস্ত করলে।

প্রভু যখন গৌড়ে যান তখন অনুগামী ভক্তদলে গোপীনাথ ছিল। পথিমধ্যে গদাধরকে ফিরিয়ে দিলেন, রামানন্দকে ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু গোপীনাথকে ফেরালেন না।

মহাপ্রভুর বিরহে ভক্তদের তখন নিশ্চল দশা, নীলাচলে এল শ্রীনিবাস। এল নরোত্তম। দুজনেই গোপীনাথ আচার্যের দেখা পেল।

গোপীনাথ বললে, তোমাদের হৃদয়ে প্রভুর নিরন্তর বিলাস। তোমাদের দেখব বলে এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দেহেও প্রাণটুকু ধরে রেখেছি।

। ৫৩ ।

গোপীনাথ পট্টনায়ক

ভবানন্দ রায়ের ছেলে আর রামানন্দ রায়ের ছোট ভাই। প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠা প্রদেশের শাসনকর্তা।

প্রজাদের কাছ থেকে বৈধ খাজনা যথারীতি আদায় করছে কিন্তু রাজার রাজস্ব ষোল আনা জমা দিচ্ছে না। বাকি পড়ে-পড়ে দু লক্ষ কাহনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হুকুম হল বকেয়া বাকি শোধ করে দাও।

গোপীনাথ বললে, নগদ টাকা হাতে নেই। একটু সবুর করুন। ক্রমে-ক্রমে জিনিসপত্র বেচে দেনা শোধ করে দেব। দশ-বারোটা ঘোড়া আছে, তাই আপাতত নিতে পারো।

তাই সই। কিন্তু ঘোড়াগুলোর দাম কত হবে ?

রাজা বড় ছেলে পুরুষোত্তমকে পাঠাল ঘোড়ার দাম কষতে। পুরুষোত্তমের মুদ্রাদোষ ছিল কথা বলতে বলতে ঘাড় বাঁকায়, থেকে থেকে মুখ উঁচু করে তাকায় এদিক-ওদিক। সে একটা অকথ্য কম দাম বললে।

এত কম ? গোপীনাথ দারুণ বিরক্ত হল। শ্লেষ মিশিয়ে বললে, আমার ঘোড়া তো ঘাড় বাঁকায় না, মুখ উঁচু করেও তাকায় না, তাই মাপ করুন, বেচতে পারব না।

পুরুষোত্তম ভীষণ ক্রুদ্ধ হল। রাজার কাছে গিয়ে অনেক কথা বাড়িয়ে বললে। বললে, রাজকোষের প্রাপ্য অর্থ আত্মসাৎ করেছে, তারপর মিথ্যে করে বলছে, হাতে টাকা নেই। অনুমতি করেন তো ব্যাটাকে চাঙ্গে চড়াই। তা হলেই টাকা দিয়ে দেবে।

চাঙ্গে চড়ানো মানে মঞ্চে তুলে নিচে উন্মুক্ত খড়্গের উপর নিক্ষেপ করে বধ করা।

ছেলের প্রস্তাবে রাজা সম্মত হল। বললে, প্রাপ্য আদায় করতে যা ভালো বোঝো তাই করো।

তবে আর কথা কী, পুরুষোত্তম গোপীনাথকে চাঙ্গে তুলল। নিচে খড়্গ পাতল।

প্রভুর কাছে খবর পৌঁছুল গোপীনাথকে রাজা খড়্গের উপর বিসর্জন দেবে। ভবানন্দ রায় সবংশে প্রভুর সেবক, তার ছেলের কিনা এই বিধিলিপি।

প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, রাজা তাকে তাড়না করছে কেন?

তখন সবাই বললে কী ব্যাপার। তারপর কাতর কণ্ঠে অনুনয় করলে, আপনি যদি কৃপা করেন তবেই গোপীনাথ বাঁচে।

রাজার ন্যায্য প্রাপ্য ফাঁকি দিলে রাজা যদি শাস্তি দেয় রাজাকে মন্দ বলতে পারো না। বললেন প্রভু, রাজার জিনিস নিজে খেল, নৃত্যে-গীতে উড়িয়ে দিল, এ তার কেমন দায়িত্ববোধ? রাজা যদি শাস্তি বিধান করে, অন্যায় করে না।

এমন সময় আরেকটা লোক এল ছুটতে ছুটতে। গোপীনাথের আরেক ভাই বাণীনাথকেও বেঁধে নিয়েছে।

প্রভু উদাসীন রইলেন। বললেন, রাজা শর্ত-মত তার প্রাপ্য আদায় করে নেবে, আমি নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী, আমার কী করবার আছে?

স্বরূপ দামোদর ও অন্যান্য পার্ষদেরা কাকুতি করে বললে, রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীবর্গ সকলেই আপনার অনুগত। তাদের এই সংকটে আপনার ঔদাসীন্য উচিত নয়।

তবে তোমরা কি বলতে চাও আমি রাজার কাছে গোপীনাথের জন্যে দয়া ভিক্ষা করব? প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন: আঁচল পেতে কাহন মেগে নেব? রাজার কাছে সন্ন্যাসীর দাম কী? পাঁচ গণ্ডার সন্ন্যাসীর কথায় দু লক্ষ কাহন ছেড়ে দেবে?

এমন সময় আরো একজন ছুটে এল।

গোপীনাথকে এক্ষুনি খড়োর উপর ছুঁড়ে ফেলবে। প্রভু, তাকে বাঁচান।

প্রভুর পার্ষদেরা আবার একবার মিনতি করল।

প্রভু বললেন, আমি ভিক্ষুক, আমার বলাতে কিছু হবার নয়। তবে যদি তাকে বাঁচাবার ইচ্ছে তোমাদের সত্যিই হয়ে থাকে, তবে তোমরা সকলে মিলে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করো। জগন্নাথই ইচ্ছাময়, সমস্ত করণ-অকরণের কর্তা। তাঁর হাতেই সমস্ত অর্থ।

ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাতে সর্ব অর্থ।
কর্তুমকর্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥

তখনই মন্দিরের সেবক হরিচন্দন পাত্র ছুটল রাজার কাছে। গিয়ে রাজাকে বললে, গোপীনাথ তোমার সেবক, তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া তোমার শোভা পায় না। তার প্রাণ নিলে কি তোমার টাকা মিলবে? রাজকোষের

ঘাটতির পূরণ হবে ? তার চেয়ে ন্যায্য দামে ঘোড়াগুলো কিনে নাও, বাকি যা থাকবে কিস্তিবন্দি করে শোধ করতে বলো। প্রাণ নিয়ে নিলে সুরাহাটা কোথায় ?

সত্যি প্রাণ নিয়ে কী হবে? রাজাও যুক্তি মানল। বললে, আমার টাকার দরকার, প্রাণ নিলে তো টাকাও গেল প্রাণও গেল। বেশ তো, যাতে আমার প্রাপ্যটা পাই তুমি তার ব্যবস্থা করো।

হরিচন্দন ছুটে গেল বড়জানা বা পুরুষোত্তমের কাছে। রাজার কথাটা বললে বুঝিয়ে। পুরুষোত্তমও নরম হল। বেশ, তবে তাই হোক, যথার্থ মূল্যে ঘোড়া দাও আর বাকি টাকা মেয়াদি কিস্তিতে পরিশোধ করো।

মঞ্চ থেকে গোপীনাথকে নামানো হল। বাঁধন থেকে ছুটি পেল বাণীনাথ।

প্রভু সংবাদদাতা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, বাণীনাথকে যখন বেঁধে নিয়ে গেল তখন সে কী করল, কী বলল ?

লোকটি বললে, বাণীনাথ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল। দুই হাতের আঙুলে সংখ্যা রাখছে আর সহস্র পূর্ণ হলে গায়ে দাগ কাটছে।

তবে আর কথা কী—প্রভু আনন্দ করে উঠলেন।

কাশী মিশ্র এলে বললেন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে, আমার আর এখানে থাকা চলবে না। ভবানন্দ রায়ের বৃহৎ গোষ্ঠী, প্রায় সবাই কাজকর্ম করে। কে কখন অন্যায়ভাবে রাজার বিত্ত আত্মসাৎ করবে, রাজা দণ্ড দেবে আর আমাকে তখন ডাকবে সেই দণ্ড মকুবের সুপারিশ করতে—এ অসহ্য। আমি তাই ভাবছি আলালনাথে চলে যাব। এখানে বিষয়ীদের কোলাহল শুনতে আমার প্রবৃত্তি নেই।

তুমি এতে ক্ষুব্ধ হচ্ছ কেন ? প্রভুর পা ধরে বললে কাশী মিশ্র, যে বিষয়ের জন্যে তোমার কাছে আসে সে মহামূর্খ। তোমার কাছে আসা, সে শুধু সব ছেড়ে তোমারই জন্যে আসা। তোমার জন্যে রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করল, সনাতন বিষয় ছাড়ল, রঘুনাথ পথের ভিখিরি হল। গোপীনাথ পট্টনায়কও তোমার কাছে বিষয়বাঞ্ছা করে নি, তোমার কাছে চায় নি প্রাণভিক্ষা। ভক্তেরা নিজের প্রেরণাতেই তোমার কাছে এসেছে, বলেছে তার কষ্টের কথা। যে শুদ্ধভক্ত সে তোমার জন্যেই তোমাকে ভজনা করে, সুখ দুঃখ যা আসে তাই নির্বিচারে মেনে নেয়। তুমি কেন আলালনাথে যাবে ? তুমি এখানেই থাকো। কেউ আর তোমাকে বিষয়কথা বলবে না।

প্রবোধ দিয়ে কাশী মিশ্র বাড়ি গেল। সেখানে স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র হাজির।

রাজা যতদিন নীলাচলে থাকে, রোজ গুরু কাশী মিশ্রের বাড়ি গিয়ে তার পা টিপে দেয় আর জগন্নাথের সেবা কী ভাবে নির্বাহ হল তার বিবরণ শোনে।

যথারীতি পা টিপছে রাজা, কাশী মিশ্র বললে, প্রভু তো আলালনাথে যাবার উদ্যোগ করেছেন।

কেন, কী হল? রাজা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কাশী মিশ্র সমস্ত প্রকাশ করল। বললে, প্রভু গোপীনাথের উপর রুষ্ট হয়েছেন। বলছেন রাজার থেকে মাইনে পায় আবার কিনা রাজার ধনই চুরি করে। রাজার দ্রব্য আত্মসাৎ করে আবার কিনা আমার কাছে রাজার বিচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। আমি আর এই বিষয়ীসঙ্গে থাকব না, আলালনাথে চলে যাব। এখন বলো প্রভুকে কী করে ঠেকাই।

প্রতাপরুদ্র মরমে মরে গেল। বললে, সমস্ত প্রাপ্য আমি ছেড়ে দেব, প্রভু শুধু নীলাচলে থাকুন। তাঁকে এক মুহূর্তের দর্শনে কোটি চিন্তামণি লাভ হয়, তার কাছে দুই লক্ষ কাহন কোন্ ছার। যাও তুমি গিয়ে প্রভুকে নিরস্ত করো।

কাশী মিশ্র গম্ভীর মুখে বললে, প্রাপ্য ছেড়ে দেওয়ায় প্রভুর সমর্থন নেই। তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রাপ্য ছেড়ে দিলে তিনি দুঃখিত হবেন।

না, না, প্রভুর দিকে তাকিয়ে আমি প্রাপ্য ছাড়ব না, ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য, তার ছেলেরা আমার প্রীতিভাজন, শুধু এই বিবেচনাতেই আমি প্রাপ্য ছাড়ব। তুমি যাও, প্রভুকে আটকাও।

মিশ্রকে প্রণাম করে রাজা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরল। গোপীনাথ আর বড়জানাকে ডাকাল সামনে। গোপীনাথকে বললে, তোমার সমস্ত ঋণ মকুব করে দিলাম। মালজাঠার শাসনভার তোমার উপরেই রইল। আর যাতে রাজধন না আত্মসাৎ করতে হয় তোমার মাইনে দ্বিগুণ করে দিলাম। বলে রাজা গোপীনাথের মাথায় নতুন করে সম্মানের শিরোপা দিল। বললে, প্রভুর থেকে আদেশ নিয়ে নিজের কাজে যোগ দাও।

পরমার্থ-ব্যাপারে প্রভুর কৃপার ফল অন্তহীন। এমন কি বিষয়-ব্যাপারেও তাঁর কৃপা গণনার বাইরে। কোথায় মঞ্চের থেকে ছুঁড়ে খড়্গের উপর ফেলে প্রাণ নেবে, তা নয়, উল্টে সমস্ত প্রাপ্য ছেড়ে দিচ্ছে। সর্বস্ব কিনে নিলেও

যার ঋণ শোধ হয় না, তারই মাইনে দ্বিগুণ করে দিচ্ছে। মাথায় পরিয়ে দিচ্ছে সম্মানের শিরোপা।

প্রভু তো গোপীনাথকে বিষয়-সুখের কৃপা দিতে চান নি, তবু শুধু গোপীনাথের নিবেদনের ফলেই এই বিষয়-কৃপা এসে পড়ল।

এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল ॥

কাশী মিশ্র এসে খবর দিতেই প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি এ কী করলে ? রাজার কাছ থেকে আমাকে দান গ্রহণ করালে ? গোপীনাথ আমার সেবক, তাকে ছেড়ে না দিলে আমি অসন্তুষ্ট হব, তারই জন্যে রাজার এই অনুগ্রহ! তাহলে তো প্রকারান্তরে আমাকেই দান করা হল।

কাশী মিশ্র বললে, তোমার মুখ চেয়ে রাজা গোপীনাথকে ছেড়ে দেয় নি। ভবানন্দের ছেলেরা তার প্রিয়পাত্র শুধু এই জ্ঞানেই ছেড়ে দিয়েছে।

রাজার আন্তরিকতায় প্রভু তৃপ্ত হলেন।

ভবানন্দ রায় তার পাঁচ ছেলে নিয়ে প্রভুর চরণে উপস্থিত হল। দণ্ডবৎ হয়ে বললে, আমার বংশের সমস্ত লোকই আপনার কিঙ্কর। আপনার কৃপাতেই গোপীনাথ বিপদ থেকে উদ্ধার পেল।

ভবানন্দকে প্রভু আগে একবার বলেছিলেন, তুমি পাণ্ডু, তোমার পত্নী কুন্তী, তোমার পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব।

দগ্ধ জতুগৃহ থেকে কৃষ্ণ পঞ্চ পাণ্ডবকে উদ্ধার করেছিল, গৌরহরিও তেমনি ভবানন্দের পঞ্চ পুত্রকে উদ্ধার করলেন। দেখালেন ভক্তবাৎসল্য।

ভবানন্দ বললে, গোপীনাথের শুধু প্রাণরক্ষাই হয় নি, পদোন্নতি হয়েছে। রামানন্দ আর বাণীনাথ আপনার চরণ আশ্রয় করে নির্বিষয় হয়েছে, বাকি ছেলেগুলোকেও আপনার পদপ্রান্তে রেখে যাব।

প্রভু ঈষৎ হেসে বললেন, পাঁচ ছেলেই যদি বৈরাগী হয়ে যায়, তোমার বহু কুটুম্বকে খাওয়াবে কে ? পাঁচ ভাইয়ের দিকে তাকালেন প্রভু: তোমরা বিষয়কর্মই করো বা নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসীই হও, জন্মে-জন্মে তোমরা আমার সেবক ছাড়া কেউ নও। শুধু আমার একটি উপদেশ মনে রেখো। যার যা ন্যায্য তাকে তা দিয়ে দিও, সঙ্গত উপায়ে নিজের যা লভ্য থাকে তাই নিজের বলে গ্রহণ কোরো। নিজের ধন ধর্মে-কর্মে ব্যয় কোরো আর কখনো অসদ্ব্যয় কোরো না।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী

পরমানন্দ পুরীর মত ব্রহ্মানন্দ ভারতীও মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ বা গুরুভাই। সেই সম্বন্ধে গৌরাঙ্গের গুরুস্থানীয়।

একদিন মুকুন্দ দত্ত এসে প্রভুকে বললে, নীলাচলে ব্রহ্মানন্দ ভারতী এসেছেন। তোমাকে দর্শন করতে চান। বলো তো তাঁকে নিয়ে আসি।

তাকে এখানে আনবে কী, আমি নিজে তাঁর কাছে যাব। প্রভু বললেন সশ্রদ্ধ কণ্ঠে, তিনি আমার গুরুর গুরুভাই, আমার নমস্য। চলো আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

ভক্তদল সঙ্গে নিয়ে প্রভু ব্রহ্মানন্দের স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম পরে বসে আছে।

ভারতী গোসাঁই কোথায় ? প্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞেস করলেন।

সে কী ? তিনি তো তোমার সামনেই বসে আছেন। মুকুন্দ অবাক মানল।

না, না, ইনি নন, তুমি অজ্ঞান, তুমি এককে অন্য মনে করছ।

ইনিই তো ভারতী গোসাঁই।

ইনি তো চামড়া পরে বসে আছেন। ভারতী গোসাঁই চামড়া পরতে যাবেন কেন ?

চকিতে ব্রহ্মানন্দের জ্ঞান হল। বুঝল গৌরহরি চর্মাম্বর পছন্দ করছেন না। চর্মে দম্ভই প্রকাশ করা হচ্ছে—ত্যাগের দম্ভ। যেন জাঁক করে দেখানো হচ্ছে, আমি কত বড় সাধু, পশুচর্ম পরিধান করেছি। যেখানে দম্ভ সেখানে আর যেই থাক, ভগবান নেই। সত্যিই তো চর্মাম্বর পরে কী ফল হল, এখনো তো সংসার থেকে উদ্ধার পেলাম না। আর পরব না চর্মাম্বর।

প্রভু ব্রহ্মানন্দের অন্তর বুঝে নিলেন। সুতোর বহির্বাস আনালেন। ব্রহ্মানন্দ চামড়া ছেড়ে বসন পরল। অহমিকার ভার থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

প্রভু তখন তাকে প্রণাম করলেন।

ব্রহ্মানন্দ বললে, তোমার আচরণ লোকশিক্ষার জন্যে, তাই তুমি আমাকে, আমি শুধু গুরুস্থানীয় বলে, প্রণাম করলে। কিন্তু দ্বিতীয়বার তুমি নতি স্বীকার কোরো না। তোমার প্রণাম নিতে আমার ভয় হচ্ছে।

কেন, ভয় কেন ?

বর্তমানে নীলাচলে দুই ব্রহ্ম প্রকট—অচল আর সচল। অচল ব্রহ্ম মন্দিরে আর সচল ব্রহ্ম তুমি, আমার চোখের সামনে। অচল ব্রহ্ম শ্যামলবরণ আর সচল ব্রহ্ম গৌরবরণ। দুই ব্রহ্মই জগৎত্রাতা।

প্রভু বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ অচল আর তুমি গৌরবর্ণ, নামেও ব্রহ্মানন্দ, সুতরাং তুমিই সচল গৌরব্রহ্ম। নীলাচলে দুই ব্রহ্ম আবির্ভূত হয়েছেন তাতে আর সন্দেহ কী।

ব্রহ্মানন্দ সার্বভৌমকে সাক্ষী মানল : তুমি মীমাংসা করে দাও। আমি ওঁকে ব্রহ্ম বলেছি, উনি আমাকে ব্রহ্ম বলছেন। এখন দেখ কে কাকে শাসন করল। আমি চর্মাম্বর পরেছি বলে উনি আমাকে শাসন করলেন, আমি সে-শাসন মেনে নিলাম। এখন বলো কে নিয়ন্তা আর কে নিয়মিত। কে শাসক আর কে শাসিত। কে ব্রহ্ম আর কে জীব।

সার্বভৌম বললে, ভারতী, তোমার যুক্তিই যথার্থ। সুতরাং তোমারই জয়।

ভারতীরই তো জয় হবে। স্মিতমুখে বললেন গৌরহরি, কেননা ভারতী গুরু আর আমি শিষ্য। তর্কবিচারে চিরকালই গুরুর জয় আর শিষ্যের পরাজয়।

ব্রহ্মানন্দ বললে, তুমি যে পরাজিত হয়েছ, তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সে-পরাজয় তুমি আমার শিষ্য বলে নয়, সে-পরাজয় তুমি ব্রহ্ম বা ভগবান বলে। ভক্তের কাছে ভগবান তো চিরপরাজিত। আশ্রিত-বাৎসল্যই তো ভগবানের —তোমার চিরন্তন স্বভাব। সেই স্বভাবগুণেই তুমি হারলে আমার কাছে। আমি আজন্ম নিরাকার ধ্যান করেছি। কিন্তু কী আশ্চর্য, তোমাকে দেখা-মাত্রই আমার অদ্ভুত অনুভব হচ্ছে। অনুভব হচ্ছে যেন স্বয়ং কৃষ্ণ আমার সামনে উপনীত হয়েছেন। মনে আর চোখে—দু' জায়গায়ই কৃষ্ণ দেখছি আর মুখে আপনা থেকেই কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হচ্ছে। 'কৃষ্ণ-নাম মুখে স্ফুরে, মনে নেত্রে কৃষ্ণ। তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥' আমার বুঝি বা সেই বিল্বমঙ্গলের দশা হল।

কী বলেছিল বিল্বমঙ্গল ? বলেছিল, আমরা অদ্বৈতপথের পথিকদের আরাধ্য ছিলাম, তাদের আনন্দের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা পূজা পেতাম, কোন গোপীজনবল্লভ শঠ বলপ্রয়োগ করে আমাদের তার দাস করে ফেলেছে।

অদ্বৈতপথে সকলের পূজা পেয়ে যে আনন্দ পেতাম, কৃষ্ণদাস্যের আনন্দের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। কৃষ্ণদাসের কত বড় ভাগ্য। যিনি অজিত, যিনি সর্ববিশ্বের অধীশ্বর, অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম যাঁর অঙ্গকান্তিমাত্র, তাঁকে জয় করতে পারে—বশীভূত করতে পারে—একমাত্র তার দাস। স্বতন্ত্র হয়ে কৃষ্ণ তাঁর দাসের কাছে পরাজিত, দাসের কাছে পরাধীন।

প্রভু বললেন, তুমি যে আমাকে কৃষ্ণের তুল্য দেখছ, সে আমার মহিমা নয়, তোমারই মহিমা, তোমারই কৃতিত্ব। কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রীতি, তাই সর্বত্র তোমার কৃষ্ণস্ফুরণ। যাদের ইষ্টে অনুরাগ, তারা বস্তুতে বস্তুর স্বরূপ দেখে না, ইষ্টেরই স্ফূর্তি দেখে।

সার্বভৌম মীমাংসা করে দিল। বললে, প্রভু তুমি কৃষ্ণরূপে ভারতীকে দর্শন দিচ্ছ বলেই ভারতী তার কৃষ্ণপ্রেমের গুণে তোমাকে দেখছে কৃষ্ণরূপে। একদিকে তোমার কৃপা আরেকদিকে ভারতীর প্রেম। তুমি যদি কৃপা না করো কে তোমাকে দেখে! আর যদি দর্শকের প্রাণে প্রেম না থাকে, তাহলে কৃষ্ণ সামনে এসে দাঁড়ালেও তাকে দেখে তার সাধ্য কী!

বিষ্ণু, বিষ্ণু! উচ্চারণ করলেন প্রভু। বললেন, এ যে তুমি অতিস্তুতি করছ। অতিস্তুতি নিন্দারই নামান্তর।

ভারতীকে প্রভু নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। রাখলেন নিজের কাছে।

যখন মন্দিরে যান জগন্নাথদর্শনে, তখন তাঁর আগে আগে চলে পরমানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী।

॥ ৫৫ ॥

বলভদ্র ভট্টাচার্য

নিবাস নবদ্বীপ। প্রভু যখন কানাইর-নাটশালা থেকে নীলাচলে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গ নেয় দামোদর পণ্ডিত আর বলভদ্র ভট্টাচার্য।

এবার প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা।

নিভৃতে স্বরূপ আর রামানন্দের সঙ্গে যুক্তি করতে বসলেন প্রভু। বললেন, বনপথ দিয়ে যাব। যাব রাত্রে এবং একাকী। দেখো কেউ যেন পিছু-পিছু

না ছোটে, গোলমাল না করে। তোমরা প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দাও। তোমাদের প্রসন্নতাই আমাকে সারাপথ প্রসন্ন রাখবে।

আমাদের সুখেই যখন তোমার সুখ, তখন আমাদের সুখের জন্যে তুমি আমাদের একটি কথা শোনো। বললে রামানন্দ।

কী কথা ?

সঙ্গে একজন ভালো ব্রাহ্মণ নাও। নইলে কে তোমার জন্যে ভিক্ষে সংগ্রহ করবে, তোমাকে রেধে দেবে ? আমাদের এই অনুরোধটুকু শুধু রাখো। অন্তত এইটুকু সুখী করো আমাদের।

এখানে যারা আমার সঙ্গে আছে তাদের মধ্য থেকে বাছাই করব ? একজনকে নিলে আরেকজনের কষ্ট হবে। তবে এমন যদি একজন নতুন সঙ্গী পাই, স্নিগ্ধ ও সরল স্বভাব, তাহলে নিতে পারি।

তেমন শুধু একজনই আছে। বললে স্বরূপ, সে বলভদ্র ভট্টাচার্য। সে তোমাতে প্রীতিমান। যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধু। তাকে তো তুমিই নিয়ে এসেছ গৌড় থেকে। তার সঙ্গে এক বিপ্র-ভৃত্য আছে, তাকেও নাও। বলভদ্র সেবা-ভিক্ষা করবে আর বিপ্রভৃত্য বস্ত্র-পাত্র বহন করবে। তুমি এতে আপত্তি কোরো না।

প্রভু সম্মতি দিলেন। গভীর রাতে গোপনে ত্যাগ করলেন নীলাচল।

কটক ডাইনে রেখে গ্রাম্য পথ দিয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে ঢুকলেন। শ্বাপদসংকুল দুর্গম অরণ্যে। কী অস্ত্র তাঁর সম্বল ? সম্বল একমাত্র কৃষ্ণনাম।

বাঘ আসছে, হাতি আসছে, দেখে বলভদ্রের তো মহা আতঙ্ক, কিন্তু না, প্রভুর প্রতাপে তারা সরে-সরে যাচ্ছে। নামশক্তিতে স্থাবর-জঙ্গমে জেগেছে প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দ জাগলে আর হিংসা কোথায় ? যেখানে অখণ্ড মৈত্রী সেখানে স্বভাববৈরিতাও অসম্ভব।

প্রভু যে-গ্রাম দিয়ে যান, যেখানে থামেন, সেখানকার লোকমাত্রই প্রেম-ভক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়। একবার কৃষ্ণনাম শুনে অন্য কথা কানে নিতে চায় না। শুধু দর্শনে শ্রবণেই সর্বদেশ বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছে। আদিবাসী পাহাড়িরাও ভাসল নামপ্রেমে। জনতার ভয়ে যদিও প্রভু প্রেম গোপন করে রাখতে চান, তবু আপনা হতেই যেন তা দিকদিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

বলভদ্র তো কাণ্ড দেখে অবাক। কী আনন্দ প্রভুর সেবা করতে। তাঁর জন্যে শাক ফল মূল অন্ন দুধ সংগ্রহ করতে, রেঁধে দিতে বন্য ব্যঞ্জন।

বন্য ভোজনে প্রভুর মহানন্দ। শীতের আভাস জেগেছে, নির্ঝরের উষ্ণ জলে স্নান ও সকালে সন্ধ্যায় কাঠ জেলে আগুন পোহানো—এর মত সুখ কোথায়?

ভট্টাচার্য, বহু দেশ আমি ঘুরেছি, বললেন প্রভু, কিন্তু বনপথের মত সুখ আর কোথাও পাই নি। কৃপালু কৃষ্ণ আমাকে কী অপরিসীম কৃপা করলেন, নিয়ে এলেন বনপথে। কৃষ্ণকৃপা ছাড়া সুখের লব-লেশ নেই। আর কে না বলবে তোমার প্রসাদেই আমার এত সুখ।

বলভদ্র বললে, আমার আবার মূল্য কী। আমি কাক, তুমি আমাকে গরুড় বানালে। তুমিই মূককে বাচাল করলে, খঞ্জকে দিয়ে পাহাড় ডিঙোলে। নইলে আমার সাধ্য কী তোমার কাছে থাকি, তোমার সেবা করি। তোমার কৃপাতেই পেয়েছি সেবার অধিকার।

প্রথমে কাশী, পরে প্রয়াগ। যমুনা দেখে প্রভু ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। বলভদ্র জল থেকে তুলে আনল।

প্রয়াগে তিনদিন থেকে চললেন মথুরায়। নীলাচলে প্রভুর যে প্রেমাবেশ ছিল, বৃন্দাবনের পথে তা শতগুণ বাড়ল আর মথুরাদর্শনে বাড়ল সহস্র গুণ।

ময়ূরকণ্ঠ দেখে কৃষ্ণস্ফূর্তি হতেই প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বলভদ্র তাড়াতাড়ি প্রভুর বহির্বাস খুলে নিল, তা ভিজিয়ে জল এনে প্রভুর চোখে-মুখে সিঞ্চন করতে লাগল, হাওয়া করতে লাগল বস্ত্র দিয়ে। প্রভুর কানে কৃষ্ণনাম বলতে লাগল জোরে-জোরে। চেতনা পেয়ে প্রভু মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। কণ্টকে ক্ষত হল শ্রীঅঙ্গ। বলভদ্র তখন প্রভুকে তার কোলে নিয়ে বসল, সেবায়-সান্ত্বনায় সুস্থ করে তুলল।

আরিটগ্রামে এসে রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করলেন প্রভু। কুণ্ডের মৃত্তিকা নিয়ে ললাটে তিলক করলেন। বলভদ্রকে বললেন, কিছু মৃত্তিকা নিয়ে রাখো।

কুণ্ডের মৃত্তিকায় রাধিকার চরণরেণু আছে। 'রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাব গিরিধারী।'

দিকে দিকে গুজব রটল বৃন্দাবনে আবার কৃষ্ণ প্রকট হয়েছে।

কোথায়? উদ্‌ভ্রান্ত জনতার একজনকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

কালীদহে। কালিয়ের মাথার উপর নাচছে।

বুঝলে কিসে?

সাপের ফণায় মণি জলছে, তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

বলভদ্র প্রভুর কাছে এসে মিনতি করল, অনুমতি দিন কৃষ্ণদর্শন করে আসি।

মূর্খের বাক্যে তুমিও মূর্খ হলে? প্রভু বিরক্তি প্রকাশ করলেন: কলিকালে কৃষ্ণ কেন দর্শন দেবেন? লোকেরা দৃষ্টির ভুলে কোলাহল করছে। তুমি ঘরে চুপ করে বসে থাকো, কাল দেখো কৃষ্ণ কে।

পরদিন সকালে ক'জন ভব্য-বিজ্ঞ লোক প্রভুর কাছে এল। প্রভু তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কালীদহে কৃষ্ণ দেখে এলেন? কেমন কৃষ্ণ?

এক কৈবর্ত রাত্রে মশাল জ্বেলে নৌকো করে মাছ ধরছে। বললে ভব্য-বিজ্ঞেরা, তাতেই সকলের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে। নৌকোকে ভাবছে কালিয় নাগ, মশালকে ফণার মণি, আর জেলেকে কৃষ্ণ। বলে তারা হাসতে লাগল।

বলভদ্র লজ্জিত হল। হয়তো বা প্রবোধ পেল অন্তরে।

কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয় নি। বললে ভব্য-বিজ্ঞের দল। কৃষ্ণ সত্যই বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সে কী কথা! কোথায় কৃষ্ণ?

আর কোথায়! এইখানে। তুমি, তুমিই সেই জঙ্গম-নারায়ণ। বিগ্রহ-নারায়ণ তো নিশ্চল, চরাচরে তুমিই বিচরণশীল।

বিষ্ণু, বিষ্ণু! প্রভু যেন দোষ খণ্ডন করতে চাইলেন: ও-কথা বোলো না। জীবকে কখনো কৃষ্ণ বলে ভেবো না। কৃষ্ণ সূর্য আর জীব সেই সূর্যের ক্ষুদ্র কিরণ-কণা। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গ।

অক্রূরঘাটে বসে প্রভু বিচার করছেন, এই ঘাটে বসে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখেছিল, ব্রজবাসীরা দেখেছিল গোলোক। সমস্ত দর্শন হয়েছিল যমুনার জলে ডুবে। জলের মধ্যেই বৈকুণ্ঠ-গোলোক।

প্রভু যমুনায় ঝাঁপ দিলেন।

কৃষ্ণদাস রাজপুত চেঁচিয়ে উঠল। ছুটে এল বলভদ্র। পলক না পড়তেই সেও ঝাঁপ দিল। তুলল প্রভুকে। সেবাযত্ন করে প্রকৃতিস্থ করে তুলল।

স্থির করল এখান থেকে প্রভুকে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে। লোকের সংঘট্ট, নিমন্ত্রণের জঞ্জাল আর প্রভুর নিরন্তর আবেশ—প্রভুর স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল হচ্ছে না। তাই একদিন সাহস করে বলভদ্র বললে, নিত্য ভিড়, নিত্য নিমন্ত্রণের তাগিদ। চলো আমরা অন্যত্র যাই।

তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে? প্রভু স্নেহনেত্রে তাকালেন।

হ্যাঁ, আমারই কষ্ট। সকালে লোক আসে তোমাকে পায় না, আমার মাথা খায়।

কিন্তু যাবে কোথায় ?

চলো প্রয়াগে যাই, মাঘী পূর্ণিমায় মকরস্নান করে আসি।

প্রভু এককথায় সম্মত হলেন। বলভদ্র যেন এতটা আশা করতে পারে নি। সত্যি যাবে ?

ভক্তবাসনা পূর্ণ করতে যাব বৈকি। তুমি আমাকে এনে বৃন্দাবন দেখালে, এই ঋণ শোধ হবে না কোনোদিন। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাও সেখানে যাব।

প্রয়াগে এসে রূপ আর অনুপমের সঙ্গে দেখা হল। বলভদ্র তাদের দু' ভাইকে নিমন্ত্রণ করে এনে নিজের হাতে রেঁধে প্রভুর প্রসাদ-শেষ খাওয়াল। বল্লভ ভট্টের বাড়িতে নিমন্ত্রণ হলে সেখানেও রাঁধল বলভদ্র।

প্রয়াগ থেকে কাশীতে এসে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধারলীলা দেখল। নীলাচলে ফেরবার পথে প্রভু আঠারনালাতে পৌঁছে প্রভু বলভদ্রকে পাঠিয়ে দিলেন ভক্তদের সংবাদ দিতে। সে কী আনন্দ কোলাহল। যেন সকলের মৃতদেহে প্রাণ ফিরে এল! যেন বলভদ্রই সেই প্রাণদাতা।

॥ ৫৬ ॥

ভগবান আচার্য

আবির্ভাব হালিশহরে। পিতা শতানন্দ খান ঘোর বিষয়ী কিন্তু ভগবান বিষয়-বিমুখ বৈরাগ্য-প্রধান। প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর নীলাচলে এসে প্রভুর চরণ আশ্রয় করল। আর কোনো বিষয়ই তাকে টেনে নিতে পারল না।

সরল, উদার, পরমভক্ত ভগবান। সখ্যভাবে সমাসীন। 'সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত গোপ-অবতার।'

তার ছোট ভাই গোপাল কাশীতে বেদান্ত পড়ে নীলাচলে এসেছে, ভগবান তাকে প্রভুর কাছে নিয়ে গেল। গোপালকে দেখে প্রভু অন্তরে খুশি হলেন না, শুধু ভগবানের ভাই সেই খাতিরে বাইরে প্রীতির আভাসটুকু বজায় রাখলেন।

কী করে খুশি হবেন প্রভু ? গোপাল যে মায়াবাদী শঙ্করভাষ্যের সমর্থক। শঙ্করভাষ্য ভক্তিবাদের পরিপন্থী। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর কিছুতেই প্রভুর উল্লাস নেই। গোপাল শঙ্করভাষ্য পড়ে জীবে-ব্রহ্মে এক করেছে, কৃষ্ণভক্তির লেশমাত্রও সেখানে সে খুঁজে পাবে না।

ভগবান স্বরূপকে বললে, গোপাল বেদান্ত শিখে এসেছে। এস একদিন আমরা সবাই ওর ব্যাখ্যা শুনি।

তার মানে ? স্বরূপ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, তোমারও শঙ্করভাষ্যে অনুরাগ হয়েছে নাকি ? শঙ্করভাষ্য তো ভক্তির প্রতিকূল, তবে তোমার ওতে আগ্রহ কেন ? গোপালের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও বুদ্ধিভ্রংশ হল দেখছি। বৈষ্ণব যদি শঙ্করভাষ্য মানে, তাহলে তার সেব্যসেবক ভাব দূর হয়ে যেতে পারে, নিজেকেই ভাবতে পারে ঈশ্বর বলে। তখন তার সমস্ত বৈষ্ণবত্বই মাটি।

ভগবান বললে, আমরা কৃষ্ণনিষ্ঠ। কোনো ভাষ্যের সাধ্য নেই আমাদের মন ফেরায়।

তবু মায়াবাদ শুনে কোনো লাভ নেই। বললে স্বরূপ, ঐ ভাষ্যে একবারও কৃষ্ণনাম শোনা যায় না, শোনা যায় কেবল চিৎ ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এইসব শব্দ। শঙ্করভাষ্য বলছে যারা সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের কল্পনা করেছে, তারা অজ্ঞ ও অজ্ঞান। এসব কথা শুনলে ভক্তের বুক ফেটে যায়।

ঘোরতর লজ্জা পেল ভগবান। হয়তো বা প্রভুর কৃপা হতে বঞ্চিত হবে সেই ভয় ঢুকল। গোপালকে তাড়াতাড়ি দেশে পাঠিয়ে দিল।

বাঙলা দেশ থেকে এবার এক কবি এসেছে নীলাচলে। সে মহাপ্রভুর জীবনলীলা নিয়ে এক নাটক লিখেছে, ইচ্ছা প্রভুকে পড়ে শোনায়।

ভগবান আচার্যের সঙ্গে চেনা, তাকেই ধরল। তোমরা আগে একবার শুনে দেখ। শুনব যে, এতে আছে কী ? গৌরচন্দ্রের মহিমা-বর্ণনা আছে। তবে পড়ো শুনি।

ভক্তেরা শুনে একবাক্যে প্রশংসা করল। কিন্তু এ-প্রশংসায় কবির মন উঠল না। স্বয়ং প্রভু যদি প্রশংসা করতেন !

ভগবান বললে, দাঁড়াও, আগে তবে স্বরূপ দামোদরকে শোনাও। সে যদি অনুমতি করে, তবেই প্রভু শুনতে সম্মত হবেন। রসাভাস বা শাস্ত্রবিরোধ সহ্য করতে পারেন না প্রভু, তাই পূর্বাহ্ণেই রচনা যাচাই করে নেওয়া দরকার। স্বরূপের মত রূপদক্ষ আর কে আছে ? তাকে যে মর্যাদা

দেওয়া হয়েছে প্রভু চান না সে-মর্যাদার ব্যতিক্রম হয়।

ভগবান তাই স্বরূপের কাছে গিয়ে সুপারিশ করল। বললে, আমি শুনেছি। খুব সুন্দর হয়েছে।

তুমি তো সারল্যের অবতার, যা শোনো তাই তোমার কাছে সুন্দর। কিন্তু যে ব্যাকরণ জানে না, অলঙ্কার বোঝে না, রসবিচারে যার নৈপুণ্য নেই, সে কৃষ্ণলীলা লিখবে কী! স্বরূপ বিরক্ত হল: চৈতন্যলীলা তো আরো দুরূহ। আর শুধু শাস্ত্রে-ব্যাকরণে বিজ্ঞতা থাকলেই চলে না, ভগবৎকৃপার প্রয়োজন। যে গৌরগতচিত্ত, গৌরপাদপদ্ম যার প্রিয়ধন, শুধু সেই কৃষ্ণলীলা বর্ণনে সমর্থ।

সবই ঠিক। বললে ভগবান, তবু তুমি একবার শুনে দেখ না।

আরো অনেকে অনুরোধ করতে স্বরূপ শুনতে রাজী হল।

কবি প্রথমে যে নান্দীশ্লোক পড়লে, তার ভাবার্থ হল—যে স্বর্ণবর্ণকান্তি কৃষ্ণচৈতন্য কমলনয়ন জগন্নাথের দেহে ইহলোকে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

তার মানে জগন্নাথ দেহ আর কৃষ্ণচৈতন্য আত্মা? স্বরূপ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল: তার মানে জগন্নাথ থেকে কৃষ্ণচৈতন্য আলাদা? ঈশ্বরে তুমি দেহ-দেহী ভেদ করলে? ঈশ্বরের স্বরূপ ও বিগ্রহ, আত্মা ও দেহ, দুইই চিদঘন বস্তু। শুধু জীবাত্মাতেই তো দেহ-দেহী আলাদা। তাহলে যিনি পূর্ণষড়ৈশ্বর্য স্বয়ং ভগবান সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তুমি ক্ষুদ্র এক দেহধারী জীব বানালে?

স্বরূপের বিচারে সবাই চমৎকৃত হল। কী করে যে তারা কবির প্রশংসা করেছিল, তাই ভেবে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল। বঙ্গকবি অধোমুখে কাঁদতে বসিল। ছি ছি, কী পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা নিয়ে কৃষ্ণকথা বলতে বসেছি!

স্বরূপের দয়া হল। কবিকে বললে, কোনো বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়ো। চৈতন্যচরণে শরণ নাও। ভক্তসঙ্গ করো। তাহলেই কৃষ্ণলীলা নির্মল করে বর্ণনা করতে পারবে। তবে অন্যভাবে তোমার শ্লোকের একটা নির্দোষ ব্যাখ্যা হতে পারে।

কী? বঙ্গকবি উৎসুক হল।

বলতে পারো কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব—স্থাবর-ব্রহ্ম জগন্নাথ আর জঙ্গম-ব্রহ্ম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই দুই রূপে সংসারাসক্ত জড়বুদ্ধি জীবকে ত্রাণ করছেন। স্বরূপ আরো বিশদ হল : শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে এক তত্ত্ব, কিন্তু রূপে দুই। এক স্থিতিশীল বিগ্রহ বা জগন্নাথ আর-এক গতিশীল গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ নীলাচলের বাইরে দেশে-দেশে গিয়ে জঙ্গম-ব্রহ্ম হয়ে ত্রাণ করলেন আর যারা নীলাচলে এল তারা জগন্নাথদর্শনে উদ্ধার পেল। যাই হোক, নিন্দাচ্ছলে কৃষ্ণনাম করলেও যেখানে ভবক্ষয় সেখানে তোমার ব্যাখ্যাও তোমাকে মুক্তি এনে দেবে।

কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ ॥

শুধু কবি নয়, ভগবান আচার্যও আশ্বস্ত হল।

চটক পর্বত দেখে প্রভুর গোবর্ধন-আবেশ হল। দিব্য বিরহ-উন্মাদে তিনি পর্বতের দিকে ধাবমান হলেন। গোবিন্দ চিৎকার করে উঠল। স্বরূপ গদাধর শঙ্কর সবাই প্রভুর উদ্দেশে ছুটল তীরবেগে।

ভগবান আচার্য খঞ্জ। সেও চলল ধীরে ধীরে। তার খঞ্জতা তার পৌঁছুনোর পক্ষে বাধা হল না। সে পায়ে খঞ্জ কিন্তু সে অন্তরে বেগবান।

॥ ৫৭ ॥

স্বরূপ দামোদর

নবদ্বীপে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য। 'প্রভুর অত্যন্ত মর্ম রসের সাগর।'

প্রভু যখন সন্ন্যাস নিলেন, পুরুষোত্তম দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেল। ছুটল কাশীতে, সন্ন্যাসী চৈতন্যানন্দকে আশ্রয় করল। বললে, আমিও সন্ন্যাস নেব।

পুরুষোত্তম গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিল কিন্তু শিখাসূত্র ত্যাগ করল না, নিল না যোগপট্ট। স্বরূপে অবস্থান করল বলে নাম হল স্বরূপ দামোদর।

গুরু আদেশ করল, বেদান্ত পড়ো। পড়ে আর সকলকে পড়াও।

স্বরূপ বললে, নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ-ভজনা করব বলেই আমার সন্ন্যাস। কৃষ্ণ

ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, জানবার আছে বলেও মনে করি না। যদি অনুমতি করেন তো আমি নীলাচলে চলে যাই।

চৈতন্যানন্দ সম্মতি দিল।

স্বরূপ প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, প্রেমময় দেহ, কৃষ্ণরসতত্ত্বের জাগ্রত বিগ্রহ। এদিকে আবার পণ্ডিতের চূড়ামণি, কিন্তু থাকে নিঃশব্দে, নির্জনে, কৃষ্ণ-তন্ময়তার আনন্দে। স্বরূপ সঙ্গীতে গন্ধর্ব, শাস্ত্রজ্ঞানে বৃহস্পতি।

দাক্ষিণাত্য পর্যটন করে প্রভু নীলাচলে ফিরেছেন, স্বরূপ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। শ্লোকবন্ধে বললে, হে শ্রীচৈতন্য, হে দয়ানিধি, আমাতে তোমার দয়া হোক। যে দয়ায় সমস্ত খেদ দূরে যায়, যা নির্মল, বিশদ, যা আনন্দবর্ধন, যা সমস্ত শাস্ত্রবিবাদ নিরস্ত করে, যা অখণ্ড ভক্তিসুখের উৎস, যার চিরন্তন মর্যাদা একমাত্র মাধুর্যে, সেই অসামান্য কৃপা আমার জীবনে প্রকাশিত করো।

'ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল।' প্রভু স্বরূপকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম তুমি আসবে। তুমি না এলে কৃষ্ণকথার আনন্দ আস্বাদ করি কী করে?

তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ জেনেও আমি তোমার সঙ্গে না এসে কাশী গিয়েছিলাম। বললে স্বরূপ, আমার অপরাধের মার্জনা নেই। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়লেও তুমি আমাকে ছাড়ো নি, কৃপার রজ্জু গলায় বেঁধে আমাকে এখানে টেনে এনেছ।

প্রভু স্বরূপের জন্যে নিভৃত বাসস্থান ঠিক করে দিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন পার্ষদদের সঙ্গে।

নীলাচলবাসী ভক্তদের মধ্যমণি স্বরূপ। প্রভুর এক দিকে গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের মত সেবক, আরেক দিকে রামানন্দ ও সার্বভৌমের মত ভক্ত, স্বরূপ এক অঙ্গে দুই রূপ, কখনো ভৃত্য কখনো অন্তরঙ্গ, কখনো পরিচারক কখনো সাধ্য-সাধনসঙ্গী। স্বরূপ পার্ষদদের শিরোমণি।

'সন্ন্যাসী পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদর স্বরূপ সমান কেহো নয়॥'

স্বরূপের পাণ্ডিত্যে শুধু নয়, তার রসবোধ ও ভক্তিসিদ্ধান্তেও প্রভুর সবিশেষ শ্রদ্ধা। কেউ কোনো গ্রন্থ বা গীত বা শ্লোক রচনা করে প্রভুকে শোনাতে এলে প্রথমেই স্বরূপ পরীক্ষা করে দেখবে এতে ভক্তির কোনো

বিরুদ্ধ কথা আছে কিনা, আছে কিনা রসাভাস, রচনা শুনে প্রভু আনন্দিত হবেন কিনা। যদি স্বরূপ বোঝে রচনা শুদ্ধ, ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল, তবেই প্রভুকে শোনাবার অনুমতি দেয়। বিপরীত হলে প্রত্যাখ্যান করে।

তাই ভগবান আচার্যের ভাই গোপালের বেদান্তভাষ্য শুনতে চায় নি স্বরূপ, বঙ্গকবির নান্দীশ্লোকের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে।

গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে পৌঁছুলে প্রভু স্বরূপ আর গোবিন্দকে বললেন, তোমরা ওদের মালা-প্রসাদ দিয়ে অভ্যর্থনা করো।

তাই করল দুজনে। এমনি প্রতি বৎসর। মালা-প্রসাদ নিয়ে ভক্ত-সংবর্ধনার অধিকারী গোবিন্দ আর স্বরূপ।

ভক্তদের প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশনের ভারও স্বরূপের উপর। গুণ্ডিচা-মার্জনলীলার সঙ্গীও স্বরূপ।

'মন্দিরমার্জন তোমার কাজ নয়।' প্রভুকে বললে মন্দিরের পড়িছা।

'না, আমারই যোগ্য কাজ।' প্রভু উত্তর দিলেন।

প্রভুর তো শুধু ভগবদভাব নয়, তাঁর আবার ভক্তভাব। তিনি মন্দির-মার্জন করবেন জগন্নাথের জন্যে, জগন্নাথ আসবে বলে। এই সেবাই তো ভজন। জীবকে ভজন শেখাবার জন্যেই তো প্রভুর ভক্তভাব। যেখানে প্রীতি, সেখানে শ্রম শ্রম নয়, কষ্ট কষ্ট নয়, সে কাজে হীনতাও নেই, মলিনতাও নেই।

আর ভগবদভাবে ভগবান কি শুধু সেবা নেবেনই, দেবেন না এক-আধটু? সেবা পাওয়ার চেয়ে সেবা করায় কি বেশি আনন্দ নয়? তাই অধিকতর আনন্দ পাবার লোভে প্রভু হীনসেবা মেগে নিলেন। যে বড় সেই পারে হীনতম সেবা করতে। প্রভুকে দেখে শেখো সকলে।

সুতরাং একশো নতুন ঘট আর একশো নতুন ঝাঁটা নিয়ে এস। প্রভু পড়িছাকে আদেশ করলেন।

বুঝছি এও তোমার এক লীলা। বললে পড়িছা, রাজা হুকুমজারি করেছেন প্রভু যা ইচ্ছা করেন তাই হবে।

প্রভু নিজের হাতে ঝাঁট দিতে লাগলেন। বললেন, তৃণধূলির পরিমাণে বুঝব কে কত পরিশ্রম করেছে।

দেখা গেল প্রতিযোগিতায় কেউ প্রভুর সঙ্গে পারে নি। প্রভুর সংগৃহীত আবর্জনার ভারই সকলের চেয়ে বেশি।

বিরুদ্ধ কথা আছে কিনা, আছে কিনা রসাভাস, রচনা শুনে প্রভু আনন্দিত হবেন কিনা। যদি স্বরূপ বোঝে রচনা শুদ্ধ, ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল, তবেই প্রভুকে শোনাবার অনুমতি দেয়। বিপরীত হলে প্রত্যাখ্যান করে।

তাই ভগবান আচার্যের ভাই গোপালের বেদান্তভাষা শুনতে চায় নি স্বরূপ, বঙ্গকবির নান্দীশ্লোকের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে।

গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে পৌঁছুলে প্রভু স্বরূপ আর গোবিন্দকে বললেন, তোমরা ওদের মালা-প্রসাদ দিয়ে অভ্যর্থনা করো।

তাই করল দুজনে। এমনি প্রতি বৎসর। মালা-প্রসাদ নিয়ে ভক্ত-সংবর্ধনার অধিকারী গোবিন্দ আর স্বরূপ।

ভক্তদের প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশনের ভারও স্বরূপের উপর। গুণ্ডিচা-মার্জনলীলার সঙ্গীও স্বরূপ।

'মন্দিরমার্জন তোমার কাজ নয়।' প্রভুকে বললে মন্দিরের পড়িছা।

'না, আমারই যোগ্য কাজ।' প্রভু উত্তর দিলেন।

প্রভুর তো শুধু ভগবদভাব নয়, তাঁর আবার ভক্তভাব। তিনি মন্দির-মার্জন করবেন জগন্নাথের জন্যে, জগন্নাথ আসবে বলে। এই সেবাই তো ভজন। জীবকে ভজন শেখাবার জন্যেই তো প্রভুর ভক্তভাব। যেখানে প্রীতি, সেখানে শ্রম শ্রম নয়, কষ্ট কষ্ট নয়, সে কাজে হীনতাও নেই, মলিনতাও নেই।

আর ভগবদভাবে ভগবান কি শুধু সেবা নেবেনই, দেবেন না এক-আধটু? সেবা পাওয়ার চেয়ে সেবা করায় কি বেশি আনন্দ নয়? তাই অধিকতর আনন্দ পাবার লোভে প্রভু হীনসেবা মেগে নিলেন। যে বড় সেই পারে হীনতম সেবা করতে। প্রভুকে দেখে শেখো সকলে।

সুতরাং একশো নতুন ঘট আর একশো নতুন ঝাঁটা নিয়ে এস। প্রভু পড়িছাকে আদেশ করলেন।

বুঝছি এও তোমার এক লীলা। বললে পড়িছা, রাজা হুকুমজারি করেছেন প্রভু যা ইচ্ছা করেন তাই হবে।

প্রভু নিজের হাতে ঝাঁট দিতে লাগলেন। বললেন, তৃণধূলির পরিমাণে বুঝব কে কত পরিশ্রম করেছে।

দেখা গেল প্রতিযোগিতায় কেউ প্রভুর সঙ্গে পারে নি। প্রভুর সংগৃহীত আবর্জনার ভারই সকলের চেয়ে বেশি।

এবার তবে ঘটে করে জল আনো। জল আনা-ঢালা অধিকতর পরিশ্রমের কাজ, প্রভু পাঁচজনকে রেহাই দিলেন। অদ্বৈত, পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, নিত্যানন্দ আর স্বরূপ। অন্যে জল এনে ঢেলে দেবে আর তা দিয়ে তোমরা প্রক্ষালন করবে। তোমাদের পরিশ্রমের কিছু লাঘব হোক।

কে একজন এসে হঠাৎ প্রভুর পায়ে জল ঢেলে সেই জল পান করে ফেলল। প্রভু রুষ্ট হলেন, যেন সমস্ত দায়-দায়িত্ব স্বরূপের, স্বরূপকে ডেকে বললেন, দেখ এর ব্যবহার। ঈশ্বরমন্দিরে কিনা আমার পা ধোয়াল আর সেই জল নিজে পান করল! এই অপরাধে আমার কী গতি হবে?

লোকটার ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিল স্বরূপ।

কোথায় যাবে, সুবুদ্ধি-সরল সেই লোক ফিরে এল প্রভুর কাছে। বললে, আমি অজ্ঞ, মূর্খ, ব্যবহার জানি না, আমাকে ক্ষমা না করলে চলে কী রে?

প্রভু তুষ্ট হলেন। ক্ষমায় ও করুণায় তার আঘাতের উপশম করে দিলেন।

প্রভু যখন মন্দিরে যান, স্বরূপ তাঁর পার্শ্বচর। রথযাত্রায় কীর্তনের প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্তনিয়া স্বরূপ। শুধু গানে নয় মৃদঙ্গবাদনেও স্বরূপ অদ্বিতীয়। কীর্তনের উন্মাদিনী সুরনির্ঝরিণীর উৎসও এই স্বরূপ। সবার উপরে, প্রভুর মনোমত শাস্ত্র-শ্লোক উদ্ধার করে প্রভুর কর্ণপিপাসা তৃপ্ত করার অধিকারও এই স্বরূপের।

রথের সামনে তাণ্ডব নৃত্য করছেন প্রভু। নৃত্যের শেষে স্বরূপকে বললেন, স্বরূপ গান গাও।

প্রভুর মনোগত ভাব কী, বুঝতে পেরেছে স্বরূপ। সে গান ধরল:

'সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ॥'

এ রাধিকার কথা। কুরুক্ষেত্রে যখন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হল তখন শ্রীমতী ভাবল, এই আমার সেই প্রাণনাথ, যার বিরহে বৃন্দাবনে দগ্ধ হচ্ছিলাম, এখন তাকে পেয়ে আমার দেহ-মন শীতল হল।

রাধিকার বুঝি আরো কিছু কথা আছে। প্রভু হাত তুলে শ্লোক আবৃত্তি করলেন: যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ। একবার নয়, বার বার বললেন। যেন রাধাভাবে বলছেন, সখি, সেই আমিও আছি, কৃষ্ণও আছে, আমাদের মিলনও হয়েছে, কিন্তু বৃন্দাবনে নিভৃতে নিকুঞ্জে সেই যে আমাদের প্রেম-

কৌশলকেলি হত, আমার চিত্ত তারই জন্যে পিপাসিত। এই কুরুক্ষেত্রের মিলনে সে আনন্দ অনুপস্থিত। 'সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম। তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ॥'

এই শ্লোকের অর্থ স্বরূপ ছাড়া আর কারু কাছে স্বচ্ছ নয়। একমাত্র স্বরূপই জানে প্রভু কেন এ কথা বলছেন, কী ইঙ্গিত করছেন! স্বরূপই প্রভুর নিকটতম অন্তরঙ্গ, যেমন ব্রজলীলায় ললিতা রাধিকার।

স্বরূপ প্রভুতে আবিষ্ট হয়ে গান করে আর প্রভু রাধাবেশে মাটিতে বসে আধোমুখে নখের আঁচড় কাটেন। পাছে আঙুলে ক্ষত হয় স্বরূপ বাধা দেয়। কতক্ষণ বসে থাকবেন, উন্মাদ ঝঞ্ঝায় প্রভুর হৃদয়স্থ আনন্দসিন্ধু উত্তাল হয়ে ওঠে। ভাবপুষ্প ফুটে ওঠে শরীরে। যে দেখল সেই কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হল। অন্যে পরে কা কথা, জগন্নাথও প্রেমসুখে টলমল করতে লাগল।

স্বরূপের মুখে লক্ষ্মী আর গোপীর কথা শুনছেন প্রভু। বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবনের কথা।

বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্যের, বৃন্দাবন মাধুর্যের ধাম। বৃন্দাবনলীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নেই। সে অহঙ্কৃতা, ঐশ্বর্যরূঢ়া। তাই প্রেমিকা প্রেয়সী হয়েও সে রাসবিলাসে কৃষ্ণসঙ্গ পেল না। কী করে পাবে? শুধু কি রাণী হলেই চলে? শ্রীচরণের দাসীও হতে হয়।

বৃন্দাবন-লীলার সহায় ব্রজগোপী। সে শুধু কৃষ্ণসুখে সুখী। তার প্রেমে আশা নেই আকাঙ্ক্ষা নেই অভিমান নেই। তার তৃপ্তি কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী। তার সুখের পর্যাবসান কৃষ্ণসুখে।

স্বরূপ আবার মানের কথা বলে। লক্ষ্মীর মানে রোষ, সত্যভামার ঈর্ষা, কিন্তু রাধিকার মানে শুধু কৃষ্ণপ্রীতি। কৃষ্ণ রাধিকার কুঞ্জে না গিয়ে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়েছে। তাতে রাধিকার মান হয়েছে। কিন্তু এ মান চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যে ঈর্ষার মান নয়, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে মনোমত সেবা করতে পারবে না, সুখ দিতে পারবে না, সেই শঙ্কার মান। এ মানের তুলনা নেই। এ রসের নিধান। এই শুদ্ধতম প্রেমের প্রকাশক।

শ্রীবাস পরিহাস করে বললে, বৃন্দাবনে সম্পদ বলতে আছে কী! শুধু ফুল আর কিশলয়, গিরিমাটি আর শিখিপুচ্ছ। সেখানে কে যায় নীলাচল ছেড়ে? এই ভেবেই লক্ষ্মীর অস্বস্তি। জগন্নাথের রুচির এমন বিকৃতি হল কী করে? তাঁকে উপহাস করবার জন্যেই সে নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত

করেছে। আমাকে ছেড়ে কোথায় গেল সেই বনবাদাড়ে? তাছাড়া তোমার গোপীরা কী করে? দুধ জ্বাল দেয়, দধি মন্থন করে। আর আমার লক্ষ্মী-ঠাকরুনকে দেখ, কেমন রাণীর মত বসেছে রত্ন-সিংহাসনে।

স্বরূপ বললে, বৃন্দাবনে সম্পদের যে সিন্ধু আছে তার এক বিন্দু বৈকুণ্ঠ, এক বিন্দু দ্বারকা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মী, কান্ত পরম পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, সব বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ, সব ধেনুই কামধেনু। ভূমি চিন্তামণিময়, জল অমৃত, সহজ কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য। চিদানন্দই চন্দ্র-সূর্য। চিদানন্দই খাদ্য, চিদানন্দই আস্বাদ।

প্রভুই যে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণ এ তত্ত্বের সার্থক বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা বুঝি এই স্বরূপ দামোদর।

প্রভু যখন গৌড়ে যাচ্ছেন তখনও স্বরূপ তাঁর সঙ্গী। যখন ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাত্রার কথা ভাবছেন তখনও পরামর্শ এই স্বরূপের সঙ্গে। সকালে উঠে প্রভুকে না দেখে ভক্তরা যখন ব্যাকুল হয়ে অন্বেষণ করতে ছুটল তখন স্বরূপই তাদের নিবৃত্ত করলে। প্রভুর ইচ্ছা নয় কেউ তাঁকে অনুসরণ করে। স্বরূপ ছাড়া আর কার কথায় ব্যাকুল ভক্তদল নিবৃত্ত হবে?

বৃন্দাবন থেকে প্রভু নীলাচলে ফিরলে স্বরূপই নবদ্বীপে খবর পাঠাল।

তারপর চালে-গোঁজা তালপাতায় লেখা রূপ গোস্বামীর শ্লোক যখন আবিষ্কার করলেন তখন প্রভু তা পড়তে দিলেন স্বরূপকে।—দেখ তো কী সুন্দর লিখেছে!

'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি—' কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাধিকা সহচরীকে বলছে, দেখ, এ সেই বৃন্দাবন-বিহারী কৃষ্ণ আর আমিও সেই রাধা। আমাদের এই মিলনও সুখদায়ক, তবু আমার মন যমুনাপুলিনচারী কৃষ্ণকেই শুধু কামনা করছে আর কুরুক্ষেত্রের বদলে চাইছে সেই মধুবন, যেখানে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাত আর যেখানে বাঁশির পঞ্চম স্বরে পুলিনকানন শিহরিত হত, ধারণ করত মধুরিমা।

আশ্চর্য, রূপ আমার অন্তর-বার্তা কী করে জানতে পারল? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।

শুধু তোমার কৃপাশক্তিতে। বললে স্বরূপ, তোমার কৃপা ছাড়া তোমার মনের ভাব বোঝে এমন কার সাধ্য? শ্লোকের বাচ্যার্থ প্রাঞ্জল হলেও তার নিহিত অর্থ বুঝতে তোমার কৃপা দরকার।

হ্যাঁ, প্রভু বললেন, প্রয়াগে যখন রূপকে দেখি তখন মনে হল এ যোগ্য পাত্র। তাই আমি একে কৃপা করে শক্তি সঞ্চার করেছি, ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছি। রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যেখানে যে বিশেষত্ব আছে তুমি তাকে বুঝিয়ে দিও।

শুধু তত্ত্ব জেনে কী হবে, তোমার কৃপা ছাড়া প্রতিভা অসম্ভব।

বারো দিন পায়ে হেঁটে—তার মধ্যে তিন দিন মোটে খেতে পেয়ে রঘুনাথ পৌঁছুল নীলাচলে। স্বরূপকে বললেন প্রভু, এর বাপ আর জেঠা একমাত্র বিষয়কেই সুখসেব্য মনে করে। তাদের অনেক দান-ধ্যান আছে বটে কিন্তু কৃষ্ণকামনা নেই, নেই কৃষ্ণভক্তি। বিষয়ের এমনি স্বভাব মানুষকে অন্ধ করে রাখে, এমন কর্ম করায় যাতে ভববন্ধন আরো দৃঢ় হয়। রঘুনাথকে কৃষ্ণ সেই বিষয় থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু দেখেছ, ছেলেটা কী-রকম কৃশ হয়ে গিয়েছে, মুখখানি ম্লান। স্বরূপ, তুমি এর ভার নাও, একে তুমি তোমার ছত্র-ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করো। আজ থেকে এর নাম হল 'স্বরূপের রঘুনাথ'। বলে রঘুনাথের হাত ধরে স্বরূপের হাতে তুলে দিলেন।

স্বরূপ বললে, তাই হবে।

প্রভু রঘুনাথকে গোবর্ধনের শিলা উপহার দিলেন। বললেন, শুধু জল আর তুলসী শ্রদ্ধায় ও শুদ্ধভাবে শিলাকে নিবেদন করো, তা হলেই পাবে কৃষ্ণপ্রেম।

স্বরূপই সব যোগাড় করে দিল। শিলা বসাবার জন্যে একখানি পিঁড়ি, আচ্ছাদনের জন্যে আধ হাত বস্ত্র আর জল রাখবার একটি কুঁজো।

শিলাকে কিছু ভোগ দেবে না? স্বরূপ জিজ্ঞেস করল রঘুনাথকে।

রঘুনাথ ব্যস্ত হয়ে তাকাল। ভোগ দেবার মত তার সঙ্গতি কোথায়?

স্বরূপ বললে, আট কড়ির খাজা সন্দেশ শিলাকে নিবেদন কোরো। যদি শ্রদ্ধা করে দাও সেই খাজা সন্দেশই অমৃত হয়ে উঠবে।

স্বরূপের আদেশে গোবিন্দই নিয়ে আসছে সেই খাজা সন্দেশ। রাজৈশ্বর্যে পালিত রঘুনাথ সর্বস্বত্যাগের পরমদৈন্যে সেই খাজা সন্দেশ দিয়েই বিগ্রহের ভোগ দিচ্ছে।

ছত্রে গিয়ে মেগে খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে রঘুনাথ। কেননা তাতেও পরাপেক্ষা। কতক্ষণে ভিক্ষান্ন নিয়ে আসে তার জন্যে চাঞ্চল্যভোগ!

রঘুনাথ ফেলে-দেওয়া বাসি পচা প্রসাদান্ন খেতে লাগল কুড়িয়ে।

কিন্তু প্রসাদ কি কখনো পচে, না, দুর্গন্ধ হয়? প্রাকৃতজনের কাছে যাই হোক, রঘুনাথের কাছে এ প্রসাদ বাসিও নয় বিকৃতও নয়। এ চিদবস্তু, সাত্ত্বিক সম্পদ।

একদিন স্বরূপ দেখতে পেল রঘুনাথের প্রসাদ খাওয়া।

বাঃ, আমাকে কিছু দাও। স্বরূপ হাত বাড়াল। খেয়ে বললে, তুমি প্রত্যহ এই অমৃত-খাও, আমাদের দাও না কেন? এ তোমার কেমন স্বভাব?

বল্লভ ভট্টকে স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন প্রভু, স্বরূপ দামোদর মূর্তিমান প্রেমরস। ব্রজের মধুর রসের সংবাদ আমি স্বরূপের কাছেই জেনেছি। জেনেছি কাকে বলে গোপীপ্রেম। কামগন্ধের লেশমাত্র নেই, কৃষ্ণসুখই একমাত্র উদ্দেশ্য আর কৃষ্ণকে माननीয় বা মর্যাদাবান বলতে অসম্মতি। এই তো গোপী-প্রেমের লক্ষণ। ভালোবাসায় ভর্ৎসনা করতে পর্যন্ত তারা প্রস্তুত। এই সর্বাতিশয়ী প্রেমের কথা স্বরূপ আমাকে বলেছে।

ভিতর-প্রকোষ্ঠে—গম্ভীরায়—প্রভু শুয়েছেন। দ্বারপ্রান্তে শুয়েছে গোবিন্দ আর স্বরূপ। রোজ রাত্রে কৃষ্ণনামকীর্তন করে প্রভু জেগে থাকেন, আজ নিঃশব্দ কেন? কী হল?

দরজা খুলে দুজনে ভিতরে গিয়ে দেখল, প্রভু নেই। ভিতর দিকের তিন দরজা বন্ধ, প্রভু অন্তর্হিত।

মশাল জ্বেলে খুঁজতে বেরুল স্বরূপ। সঙ্গে আরো অনেকে। দেখল জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে সিংহদ্বারের উত্তরে প্রভু পড়ে আছেন।

কিন্তু এ কী বিস্ময়! প্রভুর দেহ পাঁচ-ছ হাত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে, হাত-পা প্রায় তিন হাত করে লম্বা। সমস্ত অস্থি-গ্রন্থি শিথিল, দু-অস্থির মাঝে প্রায় এক বিঘৎ করে ব্যবধান। শুধু গায়ের চামড়াই দুই বিচ্ছিন্ন গ্রন্থির মধ্যে সংযোগ রেখেছে। দেহ নিশ্চেতন, নিশ্বাস পড়ছে না। চোখ শিবনেত্র হয়ে আছে, লালা ঝরছে মুখ দিয়ে।

দেখে সকলে শোকে-দুঃখে বিমূঢ় হয়ে গেল।

স্বরূপ প্রভুর কানে কৃষ্ণ-নাম বলতে লাগল। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ—অন্যান্য ভক্তরাও যোগ দিল উচ্চারণে।

ধীরে ধীরে অনেক পরে কৃষ্ণনাম প্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করল। ফিরে এল বাহ্যজ্ঞান। অমনি 'হরিবোল' বলে প্রভু গর্জন করে উঠলেন।

কোথায় আর অস্থিসন্ধির ব্যবধান, কোথায় আর অতিমানুষিক দেহদৈর্ঘ্য?

প্রভু স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন, এ আমরা কোথায়?

বাড়ি চলো। সব বলছি তোমাকে।

প্রভুকে ধরাধরি করে সবাই বাড়ি নিয়ে এল। বললে তাঁর অন্তর্ধানের কথা, দেহবিস্তারের কথা।

কী আশ্চর্য, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। বললেন প্রভু, শুধু এইটুকু মনে আছে, যেন দেখলাম কৃষ্ণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যুৎপ্রায় দেখলাম। দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল।

আরেকদিন প্রভু চটক পর্বতকে গোবর্ধন ভেবে ছুটলেন প্রেমাবেশে। শীতল জলে ও শীতলতর কৃষ্ণনামে স্বরূপ প্রভুকে সুস্থ করল।

গোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এল কে? স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু। বললেন, আমার কৃষ্ণলীলা দেখা শেষ হল না। কেন তোমরা অনর্থক কোলাহল করে উঠলে? আমাকে এখন উপায় বলে দাও, কী করলে কোথায় গেলে পাব আমার কৃষ্ণকে?

আরেকদিন উদ্যান দেখে বৃন্দাবন ভাবলেন। স্বরূপকে বললেন, আমাকে গান শোনাও, যাতে আমার বিরহ-দুঃখের উপশম হয়।

স্বরূপ গীত-গোবিন্দ শোনাতে বসল। কখনো বা শোনায় বিদ্যাপতি, কখনো বা চণ্ডীদাস।

আরেকদিন মধ্যরাত্রে প্রভুর কোনো শব্দ না পেয়ে গোবিন্দ স্বরূপকে ডেকে আনল, মশাল জ্বেলে খুঁজতে লাগল দুজনে।

দেখল তিন-দুয়ার পেরিয়ে সিংহদ্বারের বাইরে যেখানে কতগুলো গরু ছিল সেখানে প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু এ তাঁর কী আকৃতি! সমস্ত হাত-পা শরীরের মধ্যে ঢোকানো, কূর্মের আকার হয়ে পড়ে আছেন। গরুগুলো প্রভুর গা শুঁকছে, প্রভুকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেও তাঁর সঙ্গ ছাড়ছে না। প্রভুর মুখে ফেনা, অঙ্গে পুলকরোমাঞ্চ, নয়নে অশ্রুধারা।

অনেক কৃষ্ণকীর্তনের পর প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা বেরিয়ে এল গা থেকে। যথাযোগ্য শরীর পেয়ে প্রভু ইতি-উতি তাকাতে লাগলেন, স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে তোমরা এ কোথায় নিয়ে এলে? বেণুধ্বনি শুনে আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধিকাকে সঙ্কেতধ্বনিতে কুঞ্জঘরে নিয়ে যাচ্ছে, শুনতে পেলাম তার ভূষণশিঞ্জন। সখীদের সঙ্গে আমিও পিছু পিছু যাচ্ছিলাম, তোমরা কোলাহল করে উঠলে।

তোমার ঐ ওঝা পারবে না। আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি। মন্ত্র পড়ে স্বরূপ জেলের মাথায় হাত রেখে তিন চাপড় দিল। বললে, ভূত আর নেই। তোমার ভয়ের অস্থিরতা কেটে গেল। কিন্তু তোমার আর এক অস্থিরতা যাবার নয়।

সে আবার কী?

সে প্রেমের অস্থিরতা। স্বরূপ বিহ্বল কণ্ঠে বললে, তুমি যাঁকে জালে টেনে তুলেছ তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।

না, না, তিনি নন। জেলে জোর গলায় বললে, আমি প্রভুকে দেখেছি, তিনি এমন বিকৃত আকার নন।

এ তাঁর প্রেমবিকার। এ বিকারে শরীর দীর্ঘ হয়, অস্থিসন্ধি শিথিল হয়ে যায়। তিনি নিশ্চয়ই প্রেমাবেশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন, আর তোমার এমন ভাগ্য—

বলেন কি! আমি প্রভুকে স্পর্শ করেছি?

তিনিই কৃপা করে এ স্পর্শ ঘটিয়েছেন আর তার ফলে তোমার কৃষ্ণ-প্রেমোদয় হয়েছে। এখন চলো প্রভুর কাছে আমাকে নিয়ে চলো।

চলুন, ছুটে চলুন। সমুদ্রতীরে একা শুয়ে আছেন প্রভু। প্রেমোৎফুল্ল হয়ে ছুটল জেলে।

স্বরূপ দেখল দীর্ঘ শিথিল দেহে উত্তান-নয়নে শুয়ে আছেন প্রভু। অনেকক্ষণ জলে থাকায় দেহ সাদা হয়ে গিয়েছে, বালি লেগে আছে অন্ত্যোপান্ত। কিছু ভয় নেই, উচ্চকণ্ঠে প্রভুকে সবাই কৃষ্ণনাম শোনাও।

কৃষ্ণনাম প্রবেশ করতেই প্রভু সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

প্রভুর মরমী ভক্ত স্বরূপ, ভাবাবেশে কখনো প্রভু তাকে সখী বলে মনে করেন। স্বরূপের নিজের ইন্দ্রিয়ে প্রভু তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় আবিষ্ট করে স্বরূপের গীতসুধা আস্বাদন করেন। স্বরূপের কায়-বাক্য-মনও প্রভুতে আবিষ্ট। স্বরূপ প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর।

প্রভুর শেষলীলার কড়চাকর্তা স্বরূপ।

প্রভুর অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

॥ ৫৮ ॥

বেঙ্কটভট্ট

শ্রীরঙ্গম-নিবাসী বৈষ্ণব, লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক।

প্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পৌঁছুলে বেঙ্কটভট্ট তাঁকে বহুমানে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। স্ববংশে তাঁর পাদোদক খেল। ভিক্ষা গ্রহণ করে প্রভু কিছুটা সুস্থ হলে ভট্ট বললে, চাতুর্মাস্য কাছে এসে পড়েছে, কৃপা করে এই চার মাস অধীনের গৃহে থাকুন। কৃষ্ণকথা শুনিয়ে আমাকে নিস্তার করুন।

প্রভু রাজী হলেন। ভট্টগৃহে শুরু হল কৃষ্ণনামগান, কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গ। প্রভু প্রত্যহ কাবেরীতে স্নান করে শ্রীরঙ্গ দর্শন করেন, নৃত্য করেন প্রেমাবেশে। হাজার হাজার লোক এসে সমবেত হয় প্রভুকে দেখতে, নামকথায় লুব্ধ হয়ে। প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমাবেশ দেখে শোক-দুঃখ ভুলে যায়। কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কোনো কথা তাদের মুখে আসে না।

একদিন শ্রীরঙ্গের মন্দিরে গিয়েছেন প্রভু, দেখলেন এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তন্ময় হয়ে গীতা পড়ছে। অর্থ বা ব্যাকরণের ধার ধারছে না, উচ্চারণও অশুদ্ধ। যারা শুনছে উপহাস করছে কিন্তু ব্রাহ্মণের চাঞ্চল্য নেই। সে আন্তরিক আনন্দরসে ভরপুর।

দেখে প্রভুও আনন্দে ভরে উঠলেন। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ শ্লোকের কোন্ অর্থ জেনে তোমার এত সুখ?

ব্রাহ্মণ মুগ্ধের মত তাকাল প্রভুর দিকে। বললে, আমি মূর্খ, আমি শব্দার্থও জানি না। আমার পাঠ শুদ্ধ হচ্ছে না অশুদ্ধ হচ্ছে সে বিচারেরও আমার ক্ষমতা নেই। আমার গুরু আমাকে গীতা পাঠ করতে বলেছেন তাই পাঠ করে যাচ্ছি। যতক্ষণ পড়ছি দেখছি অর্জুনের রথে শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণ একহাতে রজ্জু আরেক হাতে চাবুক নিয়ে বসে অর্জুনকে হিতোপদেশ শোনাচ্ছেন। পড়লেই কৃষ্ণকে দেখতে পাই বলে পড়া ছাড়তে পারি না।

প্রভু বললেন, গীতাপাঠে তোমারই সত্যিকার অধিকার। তুমিই গীতার সার অর্থ বুঝতে পেরেছ। বলে প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রভুর পা ধরে ব্রাহ্মণ বললে, অর্জুনের রথে কৃষ্ণকে দেখে আমার যে সুখ, তোমাকে দেখে তার দ্বিগুণ সুখ হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে তুমিই সেই রথের কৃষ্ণ।

আমার সেই বিহার-হাস-পরিহাস শোনা হল না, শোনা হল না সেই মুরলী-আলাপ। প্রভু বিলাপ করতে লাগলেন: আমাকে তবে এবার কর্ণরসায়ন শ্লোক শোনাও।

স্বরূপ ভাগবতের শ্লোক পড়ল।

যমুনা ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন প্রভু।

স্বরূপ মাথায় হাত দিয়ে বসল, প্রভু কোথায়? কখন মনোবেগে চলে গিয়েছেন কেউ টের পায় নি। কিন্তু যাবেন কোথায়? জগন্নাথের টানে মন্দিরে, নাকি চটক পাহাড়ে, নাকি কোনারকে? চলো নানা দল নানা দিকে বেরিয়ে পড়ি। কোথায় প্রভু?

স্বরূপের দল গেল সমুদ্রের দিকে।

কতক্ষণ পরে দেখল এক জেলে কাঁধে জাল ফেলে এদিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু লোকটা হাসছে কেন, কাঁদছে কেন, হরি-হরি বলে অকারণে নাচছেই বা কেন?

তোমার কী হল? স্বরূপ জিজ্ঞেস করল।

আমাকে ভূতে ধরেছে। জাল টানতে গিয়ে দেখি বেজায় ভারী, ভাবলাম কত বড় মাছ না জানি পড়েছে। ও হরি, মাছ কোথায়, এ যে দেখি একটা মরা মানুষ। এটাকে না ছুঁয়ে তো জাল থেকে ছাড়ানো যায় না, কিন্তু যেমনটি ছোঁয়া অমনি মড়ার ভূতটা আমার কাঁধে চেপে বসল। এমন ভূতের কথা তো শুনিনি কোনোদিন। এ আমার কী হল?

সেই দেহ তুমি কোথায় রেখে এসেছ? স্বরূপ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

ওরে বাবাঃ, সে কী দেহ, পাঁচ-সাত হাত লম্বা হবে। হাড়ের জোড় সব আলগা হয়ে গিয়েছে, চামড়ার সঙ্গে লেগে থেকে নড়বড় করছে, দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। এ কোন্ ধরনের ভূত তা কে বলবে?

আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

ওরে বাবাঃ। জেলে আঁতকে উঠল: সেইখানে আবার আমি যাব? চোখ উল্‌টে পড়ে আছে, আবার মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে। এ ভূত একেবারে মামুলী নয়, অসাধারণ ভূত।

তা তুমি চলেছ কোথায়?

ওঝার বাড়িতে। ভূতটাকে কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিতে। তবে ভূত প্রচণ্ড, ওঝা পারে কিনা কে জানে।

আমার সেই বিহার-হাস-পরিহাস শোনা হল না, শোনা হল না সেই মুরলী-আলাপ। প্রভু বিলাপ করতে লাগলেন : আমাকে তবে এবার কর্ণরসায়ন শ্লোক শোনাও।

স্বরূপ ভাগবতের শ্লোক পড়ল।

যমুনা ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন প্রভু।

স্বরূপ মাথায় হাত দিয়ে বসল, প্রভু কোথায় ? কখন মনোবেগে চলে গিয়েছেন কেউ টের পায় নি। কিন্তু যাবেন কোথায় ? জগন্নাথের টানে মন্দিরে, নাকি চটক পাহাড়ে, নাকি কোনারকে ? চলো নানা দল নানা দিকে বেরিয়ে পড়ি। কোথায় প্রভু ?

স্বরূপের দল গেল সমুদ্রের দিকে।

কতক্ষণ পরে দেখল এক জেলে কাঁধে জাল ফেলে এদিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু লোকটা হাসছে কেন, কাঁদছে কেন, হরি-হরি বলে অকারণে নাচছেই বা কেন ?

তোমার কী হল ? স্বরূপ জিজ্ঞেস করল।

আমাকে ভূতে ধরেছে। জাল টানতে গিয়ে দেখি বেজায় ভারী, ভাবলাম কত বড় মাছ না জানি পড়েছে। ও হরি, মাছ কোথায়, এ যে দেখি একটা মরা মানুষ। এটাকে না ছুঁয়ে তো জাল থেকে ছাড়ানো যায় না, কিন্তু যেমনটি ছোঁয়া অমনি মড়ার ভূতটা আমার কাঁধে চেপে বসল। এমন ভূতের কথা তো শুনিনি কোনোদিন। এ আমার কী হল ?

সেই দেহ তুমি কোথায় রেখে এসেছ ? স্বরূপ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

ওরে বাবাঃ, সে কী দেহ, পাঁচ-সাত হাত লম্বা হবে। হাড়ের জোড় সব আলগা হয়ে গিয়েছে, চামড়ার সঙ্গে লেগে থেকে নড়বড় করছে, দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। এ কোন্ ধরনের ভূত তা কে বলবে ?

আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

ওরে বাবাঃ। জেলে আঁতকে উঠল : সেইখানে আবার আমি যাব ? চোখ উল্‌টে পড়ে আছে, আবার মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে। এ ভূত একেবারে মামুলী নয়, অসাধারণ ভূত।

তা তুমি চলেছ কোথায় ?

ওঝার বাড়িতে। ভূতটাকে কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিতে। তবে ভূত প্রচণ্ড, ওঝা পারে কিনা কে জানে।

তোমার ঐ ওঝা পারবে না। আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি। মন্ত্র পড়ে স্বরূপ জেলের মাথায় হাত রেখে তিন চাপড় দিল। বললে, ভূত আর নেই। তোমার ভয়ের অস্থিরতা কেটে গেল। কিন্তু তোমার আর এক অস্থিরতা যাবার নয়।

সে আবার কী?

সে প্রেমের অস্থিরতা। স্বরূপ বিহ্বল কণ্ঠে বললে, তুমি যাঁকে জালে টেনে তুলেছ তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।

না, না, তিনি নন। জেলে জোর গলায় বললে, আমি প্রভুকে দেখেছি, তিনি এমন বিকৃত আকার নন।

এ তাঁর প্রেমবিকার। এ বিকারে শরীর দীর্ঘ হয়, অস্থিসন্ধি শিথিল হয়ে যায়। তিনি নিশ্চয়ই প্রেমাবেশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন, আর তোমার এমন ভাগ্য—

বলেন কি! আমি প্রভুকে স্পর্শ করেছি?

তিনিই কৃপা করে এ স্পর্শ ঘটিয়েছেন আর তার ফলে তোমার কৃষ্ণ-প্রেমোদয় হয়েছে। এখন চলো প্রভুর কাছে আমাকে নিয়ে চলো।

চলুন, ছুটে চলুন। সমুদ্রতীরে একা শুয়ে আছেন প্রভু। প্রেমোৎফুল্ল হয়ে ছুটল জেলে।

স্বরূপ দেখল দীর্ঘ শিথিল দেহে উত্তান-নয়নে শুয়ে আছেন প্রভু। অনেকক্ষণ জলে থাকায় দেহ সাদা হয়ে গিয়েছে, বালি লেগে আছে আদ্যোপান্ত। কিছু ভয় নেই, উচ্চকণ্ঠে প্রভুকে সবাই কৃষ্ণনাম শোনাও।

কৃষ্ণনাম প্রবেশ করতেই প্রভু সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

প্রভুর মরমী ভক্ত স্বরূপ, ভাবাবেশে কখনো প্রভু তাকে সখী বলে মনে করেন। স্বরূপের নিজের ইন্দ্রিয়ে প্রভু তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় আবিষ্ট করে স্বরূপের গীতসুধা আস্বাদন করেন। স্বরূপের কায়-বাক্য-মনও প্রভুতে আবিষ্ট। স্বরূপ প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর।

প্রভুর শেষলীলার কড়চাকর্তা স্বরূপ।

প্রভুর অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

বেঙ্কটভট্ট

শ্রীরঙ্গম-নিবাসী বৈষ্ণব, লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক।

প্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পৌঁছুলে বেঙ্কটভট্ট তাঁকে বহুমানে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। স্ববংশে তাঁর পাদোদক খেল। ভিক্ষা গ্রহণ করে প্রভু কিছুটা সুস্থ হলে ভট্ট বললে, চাতুর্মাস্য কাছে এসে পড়েছে, কৃপা করে এই চার মাস অধীনের গৃহে থাকুন। কৃষ্ণকথা শুনিয়ে আমাকে নিস্তার করুন।

প্রভু রাজী হলেন। ভট্টগৃহে শুরু হল কৃষ্ণনামগান, কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গ। প্রভু প্রত্যহ কাবেরীতে স্নান করে শ্রীরঙ্গ দর্শন করেন, নৃত্য করেন প্রেমাবেশে। হাজার হাজার লোক এসে সমবেত হয় প্রভুকে দেখতে, নামকথায় লুব্ধ হয়ে। প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমাবেশ দেখে শোক-দুঃখ ভুলে যায়। কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কোনো কথা তাদের মুখে আসে না।

একদিন শ্রীরঙ্গের মন্দিরে গিয়েছেন প্রভু, দেখলেন এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তন্ময় হয়ে গীতা পড়ছে। অর্থ বা ব্যাকরণের ধার ধারছে না, উচ্চারণও অশুদ্ধ। যারা শুনছে উপহাস করছে কিন্তু ব্রাহ্মণের চাঞ্চল্য নেই। সে আন্তরিক আনন্দরসে ভরপুর।

দেখে প্রভুও আনন্দে ভরে উঠলেন। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ শ্লোকের কোন্ অর্থ জেনে তোমার এত সুখ?

ব্রাহ্মণ মুগ্ধের মত তাকাল প্রভুর দিকে। বললে, আমি মূর্খ, আমি শব্দার্থও জানি না। আমার পাঠ শুদ্ধ হচ্ছে না অশুদ্ধ হচ্ছে সে বিচারেরও আমার ক্ষমতা নেই। আমার গুরু আমাকে গীতা পাঠ করতে বলেছেন তাই পাঠ করে যাচ্ছি। যতক্ষণ পড়ছি দেখছি অর্জুনের রথে শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণ একহাতে রজ্জু আরেক হাতে চাবুক নিয়ে বসে অর্জুনকে হিতোপদেশ শোনাচ্ছেন। পড়লেই কৃষ্ণকে দেখতে পাই বলে পড়া ছাড়তে পারি না।

প্রভু বললেন, গীতাপাঠে তোমারই সত্যিকার অধিকার। তুমিই গীতার সার অর্থ বুঝতে পেরেছ। বলে প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রভুর পা ধরে ব্রাহ্মণ বললে, অর্জুনের রথে কৃষ্ণকে দেখে আমার যে সুখ, তোমাকে দেখে তার দ্বিগুণ সুখ হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে তুমিই সেই রথের কৃষ্ণ।

প্রভু বললেন, এমন কথা মুখেও এনো না।

কিন্তু তার মনের কথা বাইরে কারু কাছে প্রকাশ না করলেও ব্রাহ্মণ প্রভুর সঙ্গ ছাড়ল না, ছায়ার মত ফিরতে লাগল।

ভট্টের গৃহে অন্তরঙ্গ অতিথি হয়ে নিরন্তর থাকার দরুন প্রভুর সঙ্গে ভট্টের সখ্যভাব জন্মাল। আর সখ্যভাবের লক্ষণই হাস্য-পরিহাস।

ভট্টের মতে নারায়ণই স্বয়ং ভগবান আর লক্ষ্মী পতিব্রতা-শিরোমণি। তাই লক্ষ্মী-নারায়ণই তার একমাত্র উপাস্য।

কিন্তু এই লক্ষ্মীই বৃন্দাবনে কৃষ্ণসঙ্গ পাবার জন্যে বৈকুণ্ঠের সুখৈশ্বর্য ছেড়ে কঠোর তপস্যা করেছিল। সেই প্রসঙ্গের ইঙ্গিত করে প্রভু একদিন ভট্টকে প্রশ্ন করলেন, তোমার লক্ষ্মী নারায়ণের বক্ষ-বিলাসিনী, সাধ্বী-শিরোমণি আর আমার কৃষ্ণ গয়লা, গরু চরায়। তোমার লক্ষ্মী সেই কৃষ্ণের সঙ্গমলাভের ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠের সুখভোগ ছেড়ে কেন ব্রতনিয়ম ধারণ করে তপস্যা করতে বসল?

ভট্ট বললে, কৃষ্ণ আর নারায়ণ স্বরূপে অভিন্ন। কৃষ্ণে রূপ-লীলা বৈদগ্ধ-মাধুর্য বেশি। লক্ষ্মী যদি কৌতুকচ্ছলে সেই কৃষ্ণের সঙ্গ-সান্নিধ্য অভিলাষ করে, তাহলে তার পারিব্রত্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

ক্ষুণ্ণ যে হয় না তা আমি মানি। বললেন প্রভু, কিন্তু শাস্ত্র বলে লক্ষ্মী তপস্যা করেও রাসলীলায় কৃষ্ণসঙ্গ পেল না। কেন পেল না? তপস্যা করে দেবতারা পর্যন্ত পেল কিন্তু তোমার লক্ষ্মী পেল না কেন? বলো কারণ কী?

আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি তার কী জানি। তুমিই বলতে পারো কেন তুমি লক্ষ্মীকে সঙ্গ দাও নি। তোমার লীলামর্ম বুঝি আমার এমন সাধ্য কী।

প্রভু মৃদু হেসে বললেন, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। নারায়ণ তার বিলাসমূর্তি। কৃষ্ণের এই এক অদ্ভুত স্বভাব সে নিজের মাধুর্যে সকলকে সব সময়ে আকর্ষণ করে থাকে, মানুষ থেকে স্থাবর-জঙ্গম পর্যন্ত—এমন কি নিজেকেও। এ বৈশিষ্ট্য নারায়ণে নেই। কৃষ্ণকে ব্রজজনেরা ঈশ্বর মনে করে না, আপনজন মনে করে। গোপীভাব ভজন করে গোপীদেহ প্রাপ্ত না হলে কৃষ্ণের প্রেয়সী হওয়া যায় না। কৃষ্ণের মাধুর্য লক্ষ্মীকেও আকৃষ্ট করেছে—নারায়ণের সাধ্য নেই সেই আকর্ষণ থেকে লক্ষ্মীকে বিরত করে। কিন্তু লক্ষ্মী গোপী-দেহে না চেয়ে দেবী-দেহেই কৃষ্ণসঙ্গম চেয়েছিল। তাই তার সে আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল হল।

ভট্টের গর্ব পরিহাসচ্ছলে খর্ব করলেন প্রভু। দেখালেন লক্ষ্মী-নারায়ণের ভজন নয়, কৃষ্ণভজনই সর্বোচ্চ ভজন।

দেখলেন ভট্টের মুখখানি ম্লান হয়ে গিয়েছে। তখন প্রভু তাঁর সিদ্ধান্তের গূঢ়ার্থ উন্মোচন করলেন। বললেন, তুমি দুঃখিত হয়ো না, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শোনো। কৃষ্ণ আর নারায়ণ যেমন এক, গোপী আর লক্ষ্মীও তেমনি এক। লক্ষ্মী দেবী-দেহে কৃষ্ণসঙ্গ পায় নি বটে কিন্তু গোপী-দেহে পেয়েছে। গোপী-দেহে লক্ষ্মীই তো রাধিকা। নারায়ণ যেমন কৃষ্ণের বিলাস, লক্ষ্মীও তেমনি রাধিকার বিলাস। তাই রাধা যখন কৃষ্ণসঙ্গ পেল, তখন লক্ষ্মীও কৃষ্ণসঙ্গই পেল। ঈশ্বরত্বে কোনো ভেদ নেই। একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ একই বিগ্রহে নানা রূপ ধরেন। ভক্তের ধ্যানভেদে বিগ্রহের রূপভেদ হলেও অচ্যুত অচ্যুতই থাকেন, নিজেকে ন্যূন করেন না।

ভট্ট প্রসন্ন হল। বললে, ঈশ্বরের অগাধ লীলার আমি কী জানি। তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমি যা বলছ তাই সত্য বলে মানছি। বুঝতে পারছি লক্ষ্মী-নারায়ণ আমাকে পূর্ণ কৃপা করেছেন, তাই তোমার চরণ-দর্শন পেলাম। বুঝলাম কৃষ্ণভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন।

চাতুর্মাস্য পূর্ণ হলে প্রভু শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে চললেন দক্ষিণে। সঙ্গে সঙ্গে চলল বেঙ্কটভট্ট আর তার কিশোর পুত্র গোপাল।

বেঙ্কটকে অনেক বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিলেন প্রভু কিন্তু গোপাল ফিরতে চায় না। সে কাঁদতে লাগল। আমি আপনার সঙ্গে যাব। সন্ন্যাসী হব।

এত দিন প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেছে গোপাল। প্রভুর কৃপায় তার মধ্যে জেগেছে প্রেমভক্তি। পিতৃব্য প্রবোধানন্দের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেছে। প্রবোধানন্দকেই প্রভু বলে দিয়েছিলেন যথাকালে গোপালকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিও।

কিন্তু তা এখন কী!

প্রভু তাকে বুঝিয়ে বললেন, যতদিন বাবা-মা বেঁচে আছেন ঘরে থেকে তাঁদের সেবা করো। পরে কোরো সংসার ত্যাগ।

এই গোপালই ছয় গোস্বামীর এক গোস্বামী—গোপালভট্ট গোস্বামী।

বল্লভ ভট্ট

প্রয়াগের কাছাকাছি আড়েল গ্রামে থাকে—বল্লভ ভট্ট বালগোপালের ভক্ত। প্রভু প্রয়াগে এসেছেন শুনে দেখা করতে এল। লোকমুখে এত কথা শুনি, স্বচক্ষে দেখে আসি।

দেখেই চক্ষুস্থির। এ কে সানন্দসুন্দর লাবণ্যপ্রদীপ! তক্ষুনি দণ্ডবৎ করল বল্লভ। প্রভু তাকে অলিঙ্গন করলেন।

প্রভু কিশোর-কৃষ্ণের ভক্ত। শুরু করলেন কৃষ্ণকথা। বল্লভ নতুন লোক তাই সঙ্কোচ হওয়ায় প্রেমোচ্ছ্বাস সংবরণ করলেন। কিন্তু এই অন্তরমন্থন প্রেম কি রাখা যায় প্রচ্ছন্ন করে?

বল্লভ বিস্ময় মানল। এমনটি দেখবে যেন কল্পনাও করে নি। প্রভুকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করল।

রূপ আর অনুপম এসে হাজির। প্রভু ওদের দু ভাইয়ের সঙ্গে বল্লভের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দু ভাই দূর থেকে পরম দৈন্যে বল্লভকে দণ্ডবৎ করল। বল্লভ ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই ওরা দুজন দূরে পালাল। বললে, আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদের ছুঁয়ো না।

সে কী কথা! বল্লভ তাকাল প্রভুর দিকে।

দু ভাইয়ের দৈন্য দেখে প্রভু কিন্তু আনন্দিত। বললেন, ওরা ঠিকই বলেছে। তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক কুলীন, তুমি ওদের ছুঁয়ো না। ওরা হীন জাতি।

হীন জাতি! বল্লভ অবাক হল: এদের মুখে যে কৃষ্ণনাম। যার জিভে নিরন্তর কৃষ্ণনাম নৃত্য করে সে অধম হয় কী করে, অস্পৃশ্য হয় কী করে? এরা নরোত্তম।

বল্লভের কথায় প্রভু আরো আনন্দিত হলেন। বললেন, তুমি আমার প্রাণের কথাই বলেছ। যে নীচকুলে জন্মেছে সদ্ভক্তির দীপ্ত আগুনে তার সমস্ত হীনতা দগ্ধ হয়ে গেছে। ভক্তিহীন বেদজ্ঞের চেয়েও সে পূজনীয়। যার ভগবানে ভক্তি নেই তার কৌলীন্য বা শাস্ত্রজ্ঞান বা জপতপ সমস্ত নিরর্থক। প্রাণহীন দেহের বসন-ভূষণের মতই অসার।

প্রভুর প্রেমাবেশ ও ভক্তিপ্রভাব দেখে বল্লভ মুগ্ধ হয়ে গেল। নৌকো করে প্রভুকে নিয়ে চলল বাড়িতে।

যমুনার উপর দিয়ে নৌকো যাচ্ছে। যমুনার শ্যামল চিক্কণ শীতল জল দেখে প্রভু ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জল দেখে বুঝি কৃষ্ণকে মনে পড়ল, ঝাঁপ দিলেন রাধাবেশে।

বল্লভ ভয়ে কাঁপতে লাগল। নৌকোর লোকজন তুলল প্রভুকে। কিন্তু এ কী, নৌকোতে উঠেই প্রভু নাচতে লাগলেন। নৌকো টলমল করতে লাগল, জল উঠল ঝলকে ঝলকে। সবাইকে নিয়ে নৌকো বুঝি এবার ডোবে। প্রভু চাইছেন ধৈর্য ধরতে, কিন্তু দুর্বার প্রেম শাসন মানছে না। কোনো রকমে ঘাটে এসে নৌকো লাগল।

বল্লভ সাবধানে প্রভুকে মধ্যাহ্নস্নান করিয়ে ঘরে নিয়ে এল। নতুন কৌপীন আর বহির্বাস পরাল। দিব্যাসনে বসিয়ে পা ধুইয়ে চরণামৃত সবংশে মাথায় ধরল। দীপে-ধূপে গন্ধে-পুষ্পে প্রভুর পূজা করল—মহাপূজা। রূপ আর অনুপম পেল প্রভুর অবশেষ-পাত্র। মুখবাস দিয়ে শয়ন করাল প্রভুকে। বল্লভ পা টিপতে বসল।

প্রভুকে নিজের লেখা কৃষ্ণলীলা পড়ে শোনাল বল্লভ। ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল গ্রাম্য জনতা। বল্লভ প্রভুকে আবার নৌকো করে প্রয়াগে পৌঁছিয়ে দিল।

তারপর প্রভু যখন নীলাচলে, কয়েক বছর পর বল্লভ একদিন তাঁর চরণে এসে উপস্থিত হল। চরণবন্দনা করতেই প্রভু তাকে ভক্তজ্ঞানে আলিঙ্গন করলেন।

বহুদিন থেকে বাসনা তোমাকে আবার দেখি। বল্লভ বললে, জগন্নাথ সে বাসনা পূর্ণ করলেন। এই বলে বল্লভ প্রভুর স্তুতি করতে আরম্ভ করল। তুমিই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তোমাকে স্মরণ করলেই লোকে পবিত্র হয়, দর্শন করলে যে হবে তা আর বিচিত্র কী। তুমিই সংসারে কৃষ্ণনাম আনলে। তোমাকে যে দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমিক হয়ে ওঠে। একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমদানে সমর্থ। তুমি যখন সকলের জন্যে সেই কৃষ্ণনাম এনে দিচ্ছ তখন তুমিই শ্রীকৃষ্ণ।

প্রভু বুঝলেন বল্লভ কৃষ্ণভক্তির অভিমান নিয়ে এসেছে, এই সব স্তুতি সেই অভিমানেরই ভূমিকা। তিনি তাই দৈন্য প্রকাশ করে বললেন, তোমার ভুল হচ্ছে, আমি কৃষ্ণভক্ত নই, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। যদি কৃষ্ণভক্ত কেউ থাকে সে হচ্ছে অদ্বৈত আচার্য। তাঁর সঙ্গ করেই আমার মন নির্মল হয়েছে। আর নিত্যানন্দের কথা কী বলব? সে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সর্বদাই

কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তির কথা সে বলতে পারে। আর বলতে পারে সার্বভৌম। ষড়দর্শনে সে পণ্ডিত, আবার সে ভাগবতোত্তম। সেই আমাকে বোঝাল কৃষ্ণভক্তিই সমস্ত সাধনের সার কথা। আরেক ভক্ত রামানন্দ। সে বোঝাল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান আর প্রেমভক্তিই জীবের পুরুষার্থ। আর এই প্রেমভক্তি শুধু রাগমার্গে। সে আমাকে রাগমার্গের ভজন শেখালে। কিন্তু শিখলাম কই?

বল্লভ সবিস্ময়ে তাকাল। প্রভুর আবার শিখতে কিছু বাকি আছে নাকি?

প্রভু বললেন, রামানন্দ শেখাল ঐশ্বর্যজ্ঞানে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং লক্ষ্মী বক্ষবিলাসিনী হয়েও ব্যর্থ হল। সে তো গয়লার মেয়ে নয় সে সম্রাজ্ঞী। একমাত্র ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ প্রেমই কৃষ্ণকে বাঁধতে পারে। সে প্রেমের কথাই রামানন্দ আমাকে শিখিয়েছে। রামানন্দ তো শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সে রসবেত্তা।

বল্লভ মাথা হেঁট করল। এ বুঝি তারই প্রতি ইঙ্গিত। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞানে কিছু হবার নয়, চাই রসানুভূতি।

আর স্বরূপ দামোদর? প্রভু বললেন বিহ্বল স্বরে, সে মূর্তিমান প্রেমরস। তার কাছ থেকেই আমি জেনেছি গোপীপ্রেম। কাম-গন্ধের লেশমাত্র নেই, শুধু কৃষ্ণসুখে আনন্দিত। কৃষ্ণকে মর্যাদা দিতে অসম্মতি, ভালোবাসায় ভর্ৎসনা করতেও প্রস্তুত। এই সর্বাতিশয়ী প্রেমের কথাই স্বরূপ আমাকে বলেছে।

বল্লভ মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল।

আর হরিদাস আমাকে নাম শিখিয়েছে। দিনে তিন লক্ষ নাম করে হরিদাস। তার প্রসাদেই আমি জানলাম নামের কী মহিমা। তারপর বৈষ্ণব ভক্তের দল—আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, গদাধর, দামোদর, জগদানন্দ, শঙ্কর, চক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, বাসুদেব, মুরারি—এরাই জগতে অকুণ্ঠকণ্ঠে নাম প্রচার করল, এদের থেকেই শিখলাম কৃষ্ণভক্তি।

আশ্চর্য, বল্লভের নাম তো কোনো প্রসঙ্গেই উল্লেখ করছেন না। শুধু তাঁর পার্ষদদেরই গৌরব দিচ্ছেন। যেন বলছেন, আমি কোন্ ছার, আমার থেকে আমার পার্ষদেরা বেশি রসিক।

আপনার সে-সব বৈষ্ণবেরা থাকে কোথায়? বল্লভ ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল।

এখানে যখন এসেছ তখন দেখতে পাবে।

দেখা পেতে দেরি হল না। প্রভুর কাছে বৈষ্ণবেরা এসে পড়ল। প্রভু

সকলের সঙ্গে বল্লভের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কী তাদের দেহ-জ্যোতি, দেখে বল্লভ বিশীর্ণ হয়ে গেল। ওদের কাছে নিজেকে মনে হল সূর্যের কাছে জোনাকি।

তবু বিদ্যার অভিমান যায় না। বল্লভের মনে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সে ভালো জানে, ভাগবতের অর্থও তার মত কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। বস্তুত নিজের বিদ্যাবত্তা প্রচার করতেই তার নীলাচলে আসা। সে কথাটা কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না। প্রভু যে তার মনের কথাটা প্রারম্ভেই টের পেয়েছেন এও তার ধারণায় নেই।

বল্লভ বললে, ভাগবতের কিছু টীকা লিখে এনেছি, আপনাকে শোনাতে চাই।

প্রভু বললেন, ভাগবতের অর্থ বুঝি আমার এমন সামর্থ্য নেই। আমি শুধু কৃষ্ণনাম নিই, তা-ও রাত্রিদিনে আমার সংখ্যাপূরণ হয় না।

সর্বজ্ঞ প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন বল্লভের টীকা সারশূন্য। বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে সে টীকা লিখেছে, ভজনান্বিত ভক্তির থেকে নয়। ভক্তিতে চিত্ত যদি নির্মল না হয় তা হলে ভাগবতের অর্থ তাতে স্ফুরিত হবে কী করে?

আমার টীকায় আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করেছি। বল্লভ অনুরোধ করল, আপনি একবার দয়া করে শুনুন।

প্রভু দৃঢ়স্বরে বললেন, আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি না। আমি শুধু এক অর্থ মানি। সে হচ্ছে শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন। আর যদি কোনো অর্থ থাকেও, তাতে আমার দরকার নেই।

যেহেতু প্রভু উপেক্ষা করেছেন, নীলাচলজন কেউ বল্লভের টীকা শুনতে রাজী হল না।

বল্লভ তখন গদাধরের শরণ নিল।

তুমি কৃপা করে আমাকে বাঁচাও। আমার নামব্যাখ্যা শোনো। অন্তত তুমি যদি শোনো তাহলেও আমার এ কলঙ্কের স্খালন হয়।

গদাধর সঙ্কটে পড়ল। কেউ যখন শুনল না তখন আমি শুনি কী করে? তার হাঁ-না কিছু বলবার আগেই বল্লভ পড়তে শুরু করে দিল।

গদাধরের সঙ্কট গুরুতর হল। অথচ শালীনতার খাতিরে বাধাও দিতে পারল না। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, হে কৃষ্ণ, রক্ষা করো। প্রভুকে আমার ভয় নেই। তিনি অন্তর্যামী, তিনি বুঝবেন আমার অবস্থা—আমি

শুনতে না চাইলেও আমাকে জোর করে শোনাচ্ছে, আমার অনিচ্ছাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি বিনয়ী বলেই চুপচাপ আছি।

কেন চুপচাপ থাকবে? পার্ষদরা ক্ষমা করল না। কেন তুমি নিষেধ করবে না? নিষেধ করতে না পারো স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে কী বাধা ছিল? এ কেমনতর বিনয়?

গদাধর জানে এ তাদের প্রণয়রোষ, সত্যিকারের ক্রোধ নয়। তারা ছাড়া আর কে বেশি জানে প্রভুর প্রতি তার কী গভীর ভালোবাসা!

বল্লভ তবু নিরস্ত হয় না। একদিন প্রভুর সকাশেই পার্ষদদের তর্কে আহ্বান করে বসল। এস বিদ্যাবিচার করা যাক। ভক্তির কথা পরে হবে, আগে যুক্তির কথা হোক।

অদ্বৈত আচার্যকে লক্ষ্য করে বল্লভ প্রশ্ন করল, জীব তো কৃষ্ণের প্রকৃতি বা স্ত্রী। তাই জীব কৃষ্ণকে পতি বলে মানে। সে স্ত্রী পতিব্রতা যে পতির নাম নেয় না। তোমরা কোন্ ধর্মে তবে কৃষ্ণের নাম নাও?

অদ্বৈত প্রভুর দিকে ইঙ্গিত করে বললে, তোমার সামনে যে মূর্তিমান ধর্ম বসে আছেন তিনিই এর উত্তর দেবেন।

প্রভু বললেন, পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্মই হচ্ছে স্বামী-আজ্ঞা পালন করা। এখানে স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করেছে, নিরন্তর আমার নাম নাও। পতিব্রতা স্ত্রী সেই আদেশ পালন করছে আর তার ফল পাচ্ছে। কী ফল? ফল প্রেমফল।

বল্লভের মুখে আর কথা নেই। দুঃখিত হয়ে সে আবার বাড়ি ফিরল।

তবু তার অহঙ্কার যায় না। আরেক দিন এসে বললে, আমি ভাগবতের শ্রীধর-ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি। আমি যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছি তার সিদ্ধান্তে দোষ হয়েছে। পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই।

শ্রীধর স্বামী ভাগবতের শ্রেষ্ঠ টীকাকার, ভক্তিপ্রেমের প্রচারক। ভক্তি-প্রেমই তার একমাত্র সিদ্ধান্ত।

গর্বভরে বল্লভ বলে উঠল, আমি স্বামী মানি না।

প্রভু উপেক্ষার হাসি হেসে বললেন, যে স্বামী মানে না সে তো গণিকার মধ্যেই গণনীয়া।

অর্থাৎ যে শ্রীধর স্বামীর টীকা মানে না, শাস্ত্রার্থের দিক থেকে সে ব্যভিচারী।

বল্লভ স্তব্ধ হয়ে গেল।

তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন প্রভু। মঙ্গলে-মাধুর্যে জগতের শোধন করবেন বলেই গৌর অবতীর্ণ। তাই নানা অবজ্ঞা-উপেক্ষায় বল্লভের অভিমান নাশ করলেন। বল্লভ বুঝল আঘাতই প্রভুর হিতস্পর্শ। আগে প্রয়াগে প্রভু আমাকে কত কৃপা করেছিলেন। এখন আমার প্রতি তাঁর কেন এই বৈরূপ্য ঘটল? শুধু বিদ্যাবিচার করে আমি জয়ী হব আমার এই অন্ধ ঔদ্ধত্যের জন্যেই এই শাসন। ঠিক হয়েছে, আমাকে তিনি অপমান করেছেন। এই অপমানই আমার মঙ্গল-মহৌষধ।

বল্লভ প্রভুর চরণে এসে পড়ল। বললে, তোমার সামনে পাণ্ডিত্য প্রকট করতে চেয়েছিলাম, তোমার কৃপার অঞ্জনে আমার অন্ধতার মোচন হল। আমার মাথায় তোমার চরণ রাখো।

প্রভু তাকে কৃপা করলেন। বললেন, তুমি একাধারে পণ্ডিত ও মহাভাগবত। পাণ্ডিত্য আর ভাগবততা এই দুই গুণ যার মধ্যে বর্তমান, সে গর্বিত হয় কী করে? শ্রীধর স্বামীর টীকায় আনুগত্য স্বীকার করেই ভাগবত-ব্যাখ্যা সম্ভব। তুমি তাঁকে নিন্দা কোরো না, অতিক্রমও কোরো না। অভিমান ছেড়ে কৃষ্ণ-ভজন করো, নিরপরাধে করো কৃষ্ণকীর্তন।

যদি আমার উপরে প্রসন্ন হলে, বললে বল্লভ, তবে আরেকদিন আমার নিমন্ত্রণ নাও।

প্রভু নিলেন নিমন্ত্রণ।

তারপর তিনি গদাধরকে নিয়ে পড়লেন। কেন সেদিন সে বল্লভ ভট্টের টীকা শুনেছিল? ভেবেছিলেন গদাধর বুঝি স্বপক্ষে সাফাই দেবে—আমি কী করব, জোর করে শোনালে আমার উপায় কী। কিন্তু, না, গদাধর চুপ করে রইল।

গদাধরকে বল্লভ বললে, আমাকে কিশোরগোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দাও।

আমি পরতন্ত্র, প্রভুর অধীন। বললে গদাধর, আমার প্রভু গৌরচন্দ্রের আদেশ ছাড়া দীক্ষা দিতে পারব না। তুমি যে আমার এখানে আস তাতেই তাঁর অসন্তোষ।

স্বরূপ বুঝিয়ে দিল, তোমার প্রতি প্রভুর যে রোষ সেটা কৃত্রিম। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তুমিও ক্রুদ্ধ হও কিনা।

আমি তাঁর সঙ্গে বিবাদ করব? তাঁকে দেখাব আমার ক্রোধ? বললে গদাধর, তিনি যা দেন, প্রেম বা উপেক্ষা, ক্রোধ বা অনুরাগ, সবই শিরোধার্য

করি। তিনি জানেন আমার অন্তরে কী আছে।

গদাধর প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াতে প্রভু হাসিমুখে বললেন, আমি তোমাকে খেপাতে চাইলাম, তুমি একটুও খেপলে না। কিছু বললেও না রাগ করে। সরল ভাবেই কিনে নিলে আমাকে।

এর জন্যেই তো প্রভুর এক নাম 'গদাধর-প্রাণনাথ'। আরেক নাম 'গদাইয়ের গৌরাঙ্গ'।

গদাধর বল্লভের প্রস্তাবের কথা জানাল প্রভুকে। প্রভু সম্মতি দিলেন। বল্লভ গদাধরের কাছ থেকে কিশোর-গোপালের মন্ত্র নিল।

বল্লভ সপরিবারে বৃন্দাবনে চলে গেল। সেখানে প্রভুর শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে নিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করলে।

॥ ৬০ ॥

রাঘব পণ্ডিত

পানিহাটিতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভাব। তার কৃষ্ণসেবার পারিপাট্যে প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট। 'তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি হই তোমার বশ।'

যত দূর দেশেই হোক, যত দামই লাগুক, ভালো ফল-পাকড়ের কথা শুনলেই রাঘব তা সংগ্রহ করে আর লাগায় কৃষ্ণসেবায়। তার নিবেদনে যেমন প্রীতি তেমনি শুচিতা। তেমনি পারিপাট্য।

তার বাড়িতে অসংখ্য নারকেল গাছ। কত যে ফল ধরে তার লেখা-জোখা নেই। তবু যদি রাঘব শোনে কোথাও মিষ্টি নারকেল পাওয়া যায় অমনি সে তা কিনতে ছোটে। এমনিতে টাকায় পাঁচগণ্ডা নারকেল পাওয়া যায়, দশ ক্রোশ দূরের সে মিষ্টি নারকেল সে একেকটা চার আনা দরে কিনে আনে। তার কৃষ্ণ খাবে যে। কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্যে ব্যয়ে বা শ্রমে রাঘব কুণ্ঠিত নয়।

প্রত্যহ পাঁচ-ছটা নারকেল ছাড়িয়ে জলে ডুবিয়ে রেখে ঠাণ্ডা করে। ভোগের সময় সেগুলোকে সযত্নে ছুলে শঙ্খাকৃতি করে। তারপর মুখে ছিদ্র করে নিবেদন করে কৃষ্ণকে। কোনো কোনো দিন কৃষ্ণ নারকেলের জলটুকু

খেয়ে নেয়, কোনো কোনো দিন খাবার পর ফল আবার জলে ভরে রাখে। জলশূন্য ফলের শাঁস বার করে পরিচ্ছন্ন পাত্রে কৃষ্ণকে নিবেদন করে রাঘব ধ্যানে বসে, কৃষ্ণ এসে সেই শাঁস খেয়ে যায়। কখনো বা খেয়ে নিয়ে আবার নতুন শাঁসে থালা সাজিয়ে দেয়।

একদিন রাঘবের এক সেবক কতগুলো নারকেল ভোগের জন্যে তৈরি করে একটি পাত্রে সাজিয়ে তা হাতে নিয়ে মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। রাঘব মন্দিরের মধ্যে সেবায় ব্যস্ত ছিল বলে তক্ষুনি হাত বাড়িয়ে তা নিতে পাচ্ছিল না। এদিকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার দরুন ক্ষণকালের বিশ্রামের আশায় সেবক তার দুই হাতের এক হাতে ফলপাত্র রেখে আরেক হাত মন্দিরের দাওয়ার উপর রাখল। আবার সেই হাতে ধরল সেই ফলপাত্র।

রাঘব সেবককে তেড়ে গেল। বললে, তুমি দাওয়াতে হাত ঠেকিয়ে সেই হাতে আবার ফল ছুঁলে? কত লোক এখান দিয়ে যাতায়াত করে, কত লোকের পায়ের ধুলো এখানে উড়ছে তুমি তা জানো না? যাও, এ ফল অপবিত্র হয়ে গেছে। এ আর কৃষ্ণযোগ্য নয়। ফেলে দাও এগুলো।

সেবক বুঝি তবু দ্বিধা করছিল, রাঘব নিজেই প্রাচীরের উপর দিয়ে ফলগুলি বাইরে ফেলে দিল।

রাঘবের সেবায় এমনি শুচিতার কঠোরতা।

যে ঋতুতে যে দ্রব্য উপাদেয়, সেই ঋতুতে সেই দ্রব্য সংগ্রহ করে বা রন্ধন করে কৃষ্ণকে নিবেদন করে রাঘব। শাক-ব্যঞ্জন, ফল-মূল তো বটেই, চিঁড়ে-মুড়ি, দই-দুধ, পিঠে-পায়েস সব কিছুই কৃষ্ণকে খাওয়ানো চাই। এমন কি আচার-কাসুন্দি পর্যন্ত। রাঘবের ঘরে যা-ই রান্না হয় অনুরাগের পবিত্রতায় তা সুস্বাদু হয়ে ওঠে। প্রভু বলেন, 'রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী।'

নীলাচল থেকে ভক্তবিদায়ের সময় প্রভু রাঘবের কৃষ্ণভক্তি ও সেবাবিধির কথা প্রত্যক্ষ ঘোষণা করলেন, তাকে দিলেন প্রেমালিঙ্গন।

বললেন, আমি তোমার ঘরে নিত্য আবির্ভাবে আহার করব।

তবু প্রতি বৎসর নীলাচলে যাওয়া চাই রাঘবের। আর যাবে সে ঝুলি সাজিয়ে। প্রভুর জন্যে বহুবিধ খাদ্যসামগ্রী, এমন কি গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে সেই ঝুলি সাজানো। সেই বিপুল দ্রব্যসম্ভার একজনের পক্ষে বহন করা অসাধ্য ছিল। নানাজনে নানা বোঝা বইত। অধ্যক্ষ হত মকরধ্বজ কর।

মকরধ্বজ রাঘবেরই প্রিয় শিষ্য। প্রভুই তাকে বলে দিয়েছিলেন রাঘবের

'পদদ্বন্দ্ব' সেবা করবে।

প্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দ গৌড়ে এলে সর্বাগ্রে গঙ্গাতীরে পানিহাটিতে রাঘবের বাড়িতে এসে উঠলেন।

নিত্যানন্দের সর্বদা বিহ্বল অবস্থা। শুধু হুঙ্কারে-গর্জনে হচ্ছে না, নিত্যানন্দ নৃত্যানন্দ হয়ে উঠলেন। পদভরে পৃথিবী টলমল করতে লাগল। নাচতে-নাচতে যার দিকে তাকান সেই প্রেমে ঢলে পড়ে, সেই ভক্তির সুবাসে বিভোর হয়ে যায়।

রাঘবের ঘরে খট্টার উপর উঠে বসলেন নিত্যানন্দ। বললেন, অভিষেক করো। ঘটে-ঘটে গঙ্গাজল আনা হল, নানা গন্ধে সুবাসিত করে নিত্যানন্দের মাথায় ঢালতে লাগল সকলে। চতুর্দিকে উঠল হরিধ্বনি। উঠল অভিষেক-মন্ত্র। নতুন বসন পরানো হল নিত্যানন্দকে, চন্দনে চর্চিত হল শ্রীঅঙ্গ। সতুলসী বনমালায় সজ্জিত হয়ে নিত্যানন্দ আবার উপবিষ্ট হলেন। তাঁর মাথায় ছাতা ধরল রাঘব।

নিত্যানন্দ বললেন, কদম্বের মালা গেঁথে আনো। কদম্ব আমার প্রিয় ফুল। কদম্বের বনেই আমার নিত্য বসতি।

রাঘব কুণ্ঠিত হয়ে বললে, এটা তো কদম্বের সময় নয়।

তোমার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখ কোথাও ফুটেছে কিনা কদম্ব।

অভিভূতের মত বাড়ির অঙ্গনে এসে দাঁড়াল রাঘব। এ কী অভাবনীয়, জাম্বীরের বৃক্ষে অসংখ্য কদম্ব ফুল ফুটে আছে। যেমন বর্ণ তেমনি গন্ধ। তেমনি শোভাবিস্তার।

রাঘব সেই কদম্বের মালা গাঁথল। ভুবনসুন্দর নিত্যানন্দের গলায় দুলিয়ে দিল।

কদম্ব-গন্ধ ছাপিয়ে এ আবার কিসের গন্ধ নাকে লাগছে!

মনে হচ্ছে এ দমনক ফুলের গন্ধ। ভক্তদল বলাবলি করতে লাগল।

ঠিকই বলেছ, এ দমনক ফুলের গন্ধ। বললেন নিত্যানন্দ, কিন্তু এ গন্ধ এল কোত্থেকে?

সত্যিই তো, কোত্থেকে এল? ভক্তেরা চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

তোমাদের কীর্তন শুনতে চৈতন্য গোসাঁই নীলাচল থেকে এখানে এসেছেন। নিত্যানন্দ আনন্দগদগদ হয়ে বললেন, তাঁর গলায় দমনক ফুলের মালা। তারই গন্ধ পাচ্ছ তোমরা। সুতরাং অন্য সব কাজ ফেলে কৃষ্ণগুণগান

করো। গৌরাঙ্গযশে সকলে পূর্ণ হয়ে ওঠো।

গৌরহরি নীলাচল থেকে গৌড়ে এসে নৌকাযোগে প্রথমেই পানিহাটিতে রাঘবের গৃহে এসে উপনীত হলেন।

বললেন, তুমি নিত্যানন্দকে সেবা কর, তোমার মত ভাগ্যবান কে। তোমাকে বলি এক গোপন কথা। নিত্যানন্দ ছাড়া আমার দ্বিতীয় কেউ নেই। যেই আমি সেই নিত্যানন্দ। 'আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে।'

নিত্যানন্দের আড্ডাও এই রাঘবের বাড়িতে।

নিত্যানন্দ দরজা খুলে না দিলে চৈতন্য-গৃহে পৌঁছনো যায় না। তাই রঘুনাথ চৈতন্যপ্রাপ্তির আশায় নিমাইকে আশ্রয় করল।

নিত্যানন্দের সম্পত্তি গৌরচরণ চুরি করে নিতে চায় বলে নিত্যানন্দ রঘুনাথকে দণ্ড দিলে। দণ্ড আর কিছু নয়, আমাদের সকলকে দই-চিঁড়ে খাওয়াও।

রাঘব এসে দেখল গঙ্গাতীরে অগণিত ভক্ত চিঁড়ে-দই খেতে বসেছে।

রাঘবকে দেখে নিত্যানন্দ বললেন, আমি গোপদের নিয়ে পুলিন-ভোজন করছি। তুমিও বসে খাও।

দিনশেষে রাঘবের নিমন্ত্রণে সবাই রাঘবের ঘরে এল। কীর্তন আরম্ভ হল। নিত্যানন্দ নাচতে লাগলেন। গৌরহরি চলে এলেন সেই নাচ দেখতে। কিন্তু নিত্যানন্দ ছাড়া গৌরহরিকে কে দেখে?

না, রাঘবও দেখল। যখন নিত্যানন্দ খেতে বসলেন তাঁর ডানপাশে আরেকখানা আসন পাতলেন। সে কী, ওখানে কে বসবে? রাঘব বিস্ময়বিহ্বল চোখে চেয়ে দেখল এ যে স্বয়ং গৌরহরি!

দু ভাইয়ের অবশিষ্ট-পাত্র রঘুনাথকে উপহার দিল রাঘব। বললে, তুমি চৈতন্য গোসাঁইয়ের প্রসাদ পেলে, তোমার সর্ববন্ধন খণ্ডন হল।

কোথায় চৈতন্য গোসাঁই! ব্যাকুল হল রঘুনাথ।

তিনি নীলাচলে। তিনি আবার ভক্তচিত্তে, ভক্তগৃহে। তিনি কখনো ব্যক্ত, কখনো গুপ্ত। তিনি যে স্বতন্ত্র ভগবান। কখনো মানুষের মত হাঁটেন, কখনো ভগবানের মত আবির্ভূত হন। তিনি সর্বব্যাপী, তাঁর ইচ্ছায় তাঁর গতি-স্থিতি। সংশয় করতে যেও না। সংশয়েই সর্বনাশ।

প্রভুর অন্ত্যলীলার শেষ দিকেও ঝালি বহন করে নীলাচলে গিয়েছে রাঘব। কিন্তু তারপর—তারপর তার আর দেখা মেলে না।

। ৬১ ।

রামদাস বিপ্র

দাক্ষিণাত্য পর্যটনের সময় দক্ষিণ-মথুরাতে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হল গৌরহরির। সে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে বসল।

কৃতমালায় স্নান সেরে প্রভু বিপ্রের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। মধ্যাহ্নকাল, তবু বিপ্রের ঘরে রান্নার কোনো আয়োজন নেই।

এ কেমনতরো নিমন্ত্রণ ?

প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, দুপুর হয়ে গেল, রান্না কোথায় ?

রামদাস বিপ্র বললে, আমি বনবাসে আছি। বনে পাকের সামগ্রী সম্প্রতি দুর্লভ। লক্ষ্মণ বন্য অন্ন শাক-ফল আনতে গেছে। সে ফিরে এলে সীতাদেবী রান্নার যোগাড় দেখবেন।

বিপ্রের উপাসনার ভাবটি বুঝে নিলেন প্রভু। বুঝে আনন্দে ভরে উঠলেন। এমন লীলাস্মরণের ভক্তও দেখা যায় সংসারে!

প্রায় তৃতীয় প্রহরে বিপ্রের আবেশ তিরোহিত হল। তখন অতিযত্নে ভিক্ষা দিল প্রভুকে। কিন্তু নিজে কিছুই খেল না, বিষণ্ণ মনে বসে রইল।

এ কী, তুমি খেলে না ? তোমার কী হয়েছে ?

আমার জীবনে প্রয়োজন নেই। বললে রামদাস, আমি দেহত্যাগ করব।

কেন, তোমার কিসের দুঃখ ?

রাক্ষস জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরানীকে ধরেছে। রামদাস কাঁদতে লাগল : এই দুঃখে দেহ জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, একে আর খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তুমি অমন চিন্তা মনেও স্থান দিও না। বললেন প্রভু, সীতা ঈশ্বরপ্রেয়সী, চিদানন্দ-মূর্তি। প্রাকৃত হাত তাঁকে ছুঁতে পারে না, দেখতে পারে না প্রাকৃত চোখ। রাবণের কী সাধ্য তাঁকে দেখে, তাঁকে ছোঁয়! রাবণকে কুটিরদ্বারে আসতে দেখেই মায়া-সীতাকে রেখে সীতা দেবী অন্তর্হিত হলেন। তুমি দুর্ভাবনা কোরো না, আমাকে বিশ্বাস করো। 'অপ্রাকৃতবস্তু নহে প্রাকৃতগোচর।'

প্রভুর বাক্যে রামদাসের বিশ্বাস হল। আহার গ্রহণ করল।

ঘুরতে ঘুরতে প্রভু রামেশ্বরে পৌঁছুলেন। রামেশ্বরে ব্রাহ্মণ-সভায়

কূর্মপুরাণ পাঠ হচ্ছে, শুনতে গেলেন। পতিব্রতা-উপাখ্যান পড়ছে। কী আশ্চর্য, তিনি যেমনটি বলেছিলেন রামদাসকে, তেমনি অবিকল পাঠ।

জগতের মাতা সীতা, শ্রীরাম-গৃহিণী পতিব্রতা-শিরোমণি, রাবণকে আসতে দেখেই অগ্নির শরণাপন্ন হলেন। অগ্নি তাঁকে পার্বতীর কাছে রেখে মায়া-সীতা দিয়ে রাবণকে বঞ্চনা করল। সেই মায়া-সীতাই হরণ করল রাবণ। রাবণবধ করে সীতাকে ঘরে এনে রাম যখন তাঁর অগ্নিপরীক্ষা করলেন, তখন অগ্নি সেই মায়া-সীতাকে গ্রাস করে সত্য-সীতাকে রাম-সকাশে এনে দিল।

গ্রন্থের যে পত্রে এ কাহিনী বিবৃত আছে তার প্রতিলিপি রেখে সে-মূল পত্র ছিঁড়ে নিলেন প্রভু। মূল পত্র নিজের চোখে না দেখলে কি রামদাস বিশ্বাস করবে?

দক্ষিণ-মথুরায় ফিরে এসে প্রভু রামদাসের গৃহে গিয়ে উঠলেন। দেখ দেখ কূর্মপুরাণ কী বলে। রামদাসকে দেখালেন সেই প্রাচীন পত্র।

আর সন্দেহ কী, দুঃখ কিসের! দশানন রাক্ষস সত্য-সীতাকে স্পর্শ করতে পারে নি, স্পর্শ করেছিল মায়া-সীতাকে। সত্য-সীতাকে অগ্নিদেব লুকিয়ে রেখেছিল।

প্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগল বিপ্র। বললে, তুমিই সাক্ষাৎ রঘুনন্দন রাম। সন্ন্যাসীর বেশে আমাকে দর্শন দিলে। তোমার কী করুণা! মহাদুঃখ থেকে আমাকে ত্রাণ করলে। পাছে তোমার মুখের কথায় আমার প্রতীতি না হয়, একেবারে প্রাচীন পুঁথির পত্র নিজের হাতে ছিঁড়ে নিয়ে এলে। প্রভু, সেদিন মনোদুঃখে তোমাকে ভালো করে খাওয়াতে পারিনি। আজ একবার পরিপূর্ণ করে ভিক্ষা গ্রহণ করো।

কূর্ম

গৌরহরি ক্রমে এসে পৌঁছুলেন কূর্মক্ষেত্রে, গঞ্জামে।

সেই গ্রামে কূর্ম নামে আছে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রভুকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করে আনল। নিজে প্রভুর পা ধুয়ে দিল, সেই জল খেল সবংশে। অনেক স্নেহে, অনেক প্রকার ভিক্ষা করাল, সবংশে খেল শেষান্ন। বললে, যে পাদপদ্ম ব্রহ্মা ধ্যান করছে, সেই পাদপদ্ম আমার ঘরে অবতীর্ণ। আমার আজ সৌভাগ্যের সীমা নেই, আমার সমস্ত জন্ম-জীবন কুল-ধন ধন্য হয়ে গেল প্রভু, তোমাকে আমি আর ছাড়ব না, বিষয়তরঙ্গের আঘাত আর সইতে পারছি না, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

এ সব কথা কখনো বলবে না। প্রভু তাকে আশ্বস্ত করলেন, ঘরে বসে নিরন্তর কৃষ্ণনাম নেবে, আর যাকেই দেখবে তাকে কৃষ্ণ-উপদেশ করবে। তোমাকে বিষয়তরঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না।

সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, বাসুদেব নামে ব্রাহ্মণ, রাত্রে শুনতে পেল, কূর্মবিপ্রের ঘরে প্রভু এসেছেন। প্রভাত হলেই তাড়াতাড়ি চলে এল কূর্মগৃহে।

প্রভু কোথায়? ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বাসুদেব।

এই খানিক আগেই চলে গেছেন।

চলে গেছেন! বাসুদেব মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

জীবনে তার একমাত্র সঙ্গী কুষ্ঠকীট। শরীরের ক্ষতস্থান থেকে যদি একটি কীট মাটিতে পড়ে যায়, বাসুদেব আবার তাকে সযত্নে তুলে ক্ষতস্থানে আশ্রয় দেয়। নিজের দেহের প্রতি তার বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ নেই, নিজের দেহ দিয়ে কীটের ভরণপোষণ করে। যে ঈশ্বরতন্ময়, সে দেহের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করে না।

মূর্ছা ভাঙবার পর বাসুদেব বিলাপ করতে লাগল।

হঠাৎ তার চোখের সামনে প্রভু এসে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ালেন না, তাকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। দিলেন তাকে জ্যোতির্ময় নিরাময় স্পর্শ।

মুহূর্তে অভিনব কাণ্ড ঘটে গেল। বাসুদেবের কুষ্ঠ অন্তর্হিত হল। তার সর্ব অঙ্গ নিরবদ্য হয়ে উঠল, ধরল সুবর্ণকান্তি।

এ শুধু তুমিই পারো। বললে বাসুদেব, এ জীবের পক্ষে অসম্ভব। তুমি ভগবান, জীবনিস্তার তোমার স্বভাব, তাই তোমার মধ্যে উত্তম-অধমের ভেদ নেই, উত্তম-অধম দুইই তোমার সমান প্রিয়। কিন্তু এ আরোগ্য আমার পক্ষে সর্বাংশে শুভ হল কি ?

কেন এ কথা বলছ ?

আমার এখন অহংকার না জন্মায় ! দ্রবচিত্তে বললে বাসুদেব, আগে আমি সকলের অস্পৃশ্য ছিলাম, আমার গায়ের গন্ধে কেউ আমার কাছে ঘেঁষত না, নিজেকে ভাবতে পারতাম দীনাতিদীন বলে। তুমি এখন আমার দেহকে নিষ্কলঙ্ক করলে, রূপে-লাবণ্যে গরীয়ান করলে, এখন আমার মধ্যে দেহাভিমান না এসে যায় ! অভিমানই তো ভজনের শত্রু।

প্রভু বললেন, তুমি সর্বদা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। কৃষ্ণধ্বনিতেই অভিমান জন্মাতে পারবে না। কৃষ্ণই তোমাকে আত্মসাৎ করে নেবেন।

প্রভু চললেন এগিয়ে। দুই বিপ্র গলাগলি করে কাঁদতে বসল।

প্রভুর নতুন নাম হল 'বাসুদেবামৃতপদ'। অর্থাৎ যাঁর পদ বাসুদেব সম্পর্কে অমৃততুল্য হয়েছে। কিংবা বলতে পারো 'বাসুদেবামৃতপ্রদ'। অর্থাৎ যিনি বাসুদেবকে রোগশান্তির অমৃত প্রদান করলেন।

। ৬৩ ।

রঘুপতি উপাধ্যায়

ত্রিহুতবাসী পণ্ডিত, পরমবৈষ্ণব।

বল্লভ ভট্টের গৃহে আহারান্তে প্রভু বিশ্রাম করছেন, রঘুপতি এসে প্রভুকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

কৃষ্ণে মতি স্থির থাক। প্রভু আশীর্বাদ করলেন। বললেন, কৃষ্ণকথা বলো।

কৃষ্ণভক্ত রঘুপতি আনন্দিত হল। নিজের লেখা কৃষ্ণলীলাশ্লোক পড়ে শোনাল প্রভুকে। ভবভীত মানুষ শ্রুতি স্মৃতি মহাভারত যাই ভজনা করুক আমি শুধু নন্দকে বন্দনা করি, যে নন্দের অলিন্দে পরব্রহ্ম খেলা করছেন।

প্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন। বললেন, আরো বলো।

রঘুপতি আবার শ্লোক পড়ল : কাকেই বা বলব, কেই বা বিশ্বাস করবে, যমুনাতটের নিকুঞ্জে পরব্রহ্ম অল্পবয়স্কা গোপবধূদের সঙ্গে খেলা করছেন।

প্রভু প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, উপাধ্যায়, তুমি কোন্ রূপকে শ্রেষ্ঠ মানো ?

কৃষ্ণের শ্যাম রূপকেই শ্রেষ্ঠ মানি। বললে উপাধ্যায়, 'শ্যামমেব পরং রূপং।'

কৃষ্ণের কোন্ বাসস্থানকে শ্রেষ্ঠ মানো ?

বৃন্দাবনকেই শ্রেষ্ঠ মানি। 'পুরী মধুপুরী বরা।'

বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর—কৃষ্ণের কোন্ বয়সকে শ্রেষ্ঠ মানো ?

কৈশোরকেই শ্রেষ্ঠ মানি। কৈশোরেই কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং।'

আর রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী ?

রসের শ্রেষ্ঠ মধুর। 'আদ্য এব পরো রসঃ।'

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥

প্রেমাবেশে প্রভু রঘুপতিকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, তুমি আজ আমাকে পরমতত্ত্ব শেখালে।

রঘুপতি ভাবল, এত প্রেম কি মানুষে সম্ভব ? স্থির করল, এই সন্ন্যাসীই স্বয়ং কৃষ্ণ। 'মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ করিল নির্ধার।'

॥ ৬৪ ॥

সনাতন গোস্বামী

কর্ণাটের রাজা সর্বজ্ঞ জগদগুরু। ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ। পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের দুই মহিষী, দুই পুত্র—রূপেশ্বর আর হরিহর। রূপেশ্বর শাস্ত্রে আর হরিহর শস্ত্রে পারদর্শী। অনিরুদ্ধের মৃত্যুর পর হরিহর বড় ভাই রূপেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করলে। রূপেশ্বর সস্ত্রীক পৌরস্ত্য দেশে পালিয়ে গেল। সেখানকার রাজা শিখরেশ্বরের সঙ্গে মিত্রতা করে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে লাগল।

রূপেশ্বরের ছেলে পদ্মনাভ। রূপে-গুণে ধনে-মানে শুধু নয়, বেদে-উপনিষদে কাব্যে-ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ। শিখরধাম ছেড়ে গঙ্গাতীরে, নবহট্টে বা নৈহাটিতে এসে বসতি করল। বিবাহ করল পণ্ডিত যদুজীবন তর্কপঞ্চাননের মেয়ে রমা দেবীকে। তাঁদের আঠারো কন্যা ও পাঁচ পুত্র। জগন্নাথ উপাস্য দেবতা, তাঁর নামেই পঞ্চ পুত্রের নামকরণ হল। পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি আর মুকুন্দ।

মুকুন্দের ছেলের নাম কুমারদেব। কুমারদেব পরম আচারনিষ্ঠ, অহিন্দুর স্পর্শ ঘটলে প্রায়শ্চিত্ত না করে জলবিন্দু গ্রহণ করে না। নৈহাটিতে ধর্মবিপ্লব হলে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে গিয়ে বাসা বাঁধল। বিয়ে করল মহানন্দার পূর্বকূলে মাধাইপুরের হরিনারায়ণ বিশারদের মেয়ে রেবতী দেবীকে। এঁদের অনেক পুত্রের মধ্যে তিনজন কীর্তিমান—সনাতন, রূপ আর অনুপম।

সনাতনের পিতৃদত্ত নাম অমর, রূপের সন্তোষ আর অনুপমের বল্লভ। অনুপমের পুত্রই শ্রীজীব।

কুমারদেবের পরকাল হলে তিন ভাই মাতুলালয়ে মানুষ হতে লাগল। বহু বিদ্যায় অলঙ্কৃত হয়ে উঠল। গৌড়ের রাজা হুশেন শার কানে উঠল এদের গুণগরিমার কথা। কোতোয়াল কেশব ছত্রীকে পাঠিয়ে দিল মাধাইপুরে, দু ভাইকে নিয়ে এস। এত যাদের বিদ্যা ও ভক্তির কথা শুনি তাদের একবার দেখি।

রাজার নিমন্ত্রণ, অগ্রাহ্য করা গেল না। দু ভাই পালকিতে করে রাজসকাশে চলে এল রামকেলিতে। রাজা দেখল রূপে গুণে বিদ্যার আরাধনায় দু ভাই-ই অত্যুজ্জ্বল। খুশি হয়ে দু ভাইকেই রাজকর্মে নিযুক্ত করতে চাইল। রাজাজ্ঞা না মানলে অসুবিধে হতে পারে ভেবে দু ভাই-ই রাজী হল। সনাতন হল প্রধান সচিব আর রূপ হল খাস মুন্সি। রাজ-পদবী যথাক্রমে সাকর মল্লিক আর দবির খাস।

রাজকার্যে অধিষ্ঠিত হয়েও শাস্ত্রচর্চা থেকে এদের বিরতি নেই। নবদ্বীপ থেকে তো বটেই সুদূর কর্ণাট থেকেও পণ্ডিতেরা আসে আলোচনা করতে। কিন্তু শুধু শাস্ত্রে, শুধু বিদ্যায় শান্তি পায় না দু ভাই। তারা যে লোকমুখে শুনেছে গৌরাঙ্গের কথা। তাঁকে দেখবার জন্যে, তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে যে মন-প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই রাজকার্য থেকে মুক্তি পাবে কী করে?

নীলাচলে প্রভুর কাছে দু ভাই চিঠি লিখে পাঠাল—আমাদের এ দুরবস্থার উপায় কী?

উত্তরে প্রভু দু ভাইকে আশ্বাস দিলেন। লিখলেন: পরপুরুষে আসক্তা রমণী যেমন গৃহকর্মে ব্যস্ত থেকেও সর্বদা অন্তরে তার কান্তকে স্মরণ করে নব-নব সঙ্গরস আস্বাদন করে তেমনি ভক্তজন বাইরে বিষয়ীর মত লোক-ব্যবহার করেও অনুক্ষণ তার ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গস্মৃতিতে সংলগ্ন থাকে।

অর্থাৎ রাজকর্ম যা করছ তা করো কিন্তু মনটিকে সর্বক্ষণ ভগবৎচরণে ফেলে রাখো।

প্রভু যখন রামকেলিতে এসে পৌঁছুলেন, লোকসংঘট্টে ভীষণ কোলাহল উঠল। হুসেন শার ভয় হল, দেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব দেখা দিল নাকি! কেশব ছত্রীকে পাঠাল খোঁজ নিতে। এত লোকজন কেন? কেন এত কোলাহল?

কেশব ছত্রী ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইল। বললে, এক ভিখিরি সন্ন্যাসী তীর্থপর্যটনে বেরিয়েছে। তাকে দেখতে দু-চারজন অলস কৌতুহলী একত্র হয়েছে মাত্র। তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তাকে হিংসা করারও মানে হয় না।

হুসেন শা তার দবির খাস ও সাকর মল্লিকের কাছে সন্ধান নিতে গেল।

তারা বললে, যিনি আপনাকে রাজ্য দিয়েছেন, যাঁর মঙ্গলেচ্ছায় আপনার সমস্ত কার্যসিদ্ধি হচ্ছে, আপনি সর্বত্র জয়ী হচ্ছেন, সেই ঈশ্বরই এই সন্ন্যাসী। আপনার সৌভাগ্যে আপনার রাজ্যে প্রকাশিত হয়েছেন।

সত্যি? নবাব বিস্ময়াবিষ্ট হল।

আমাদের জিজ্ঞেস করছেন কেন? নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করুন। আপনার যেমন অনুভব তেমনি প্রমাণ।

হুসেন শা ক্রুদ্ধ না হয়ে বিনত হল। বললে, কেন কে জানে আমার প্রাণও তাই বলছে। বলে চিন্তাকুল মনে অন্তঃপুরে চলে গেল।

নবাবের কী মতলব কে জানে! মৌখিক সৌজন্য দেখাচ্ছে, হয়তো অন্তরে ক্রুরতা। চলো দু ভাই গিয়ে সন্ন্যাসীকে সতর্ক করে আসি। দর্শন যেখানে সহজ সেখানে সুযোগ ছাড়ে কে?

সাকর মল্লিক আর দবির খাস পোশাক বদলাল। অর্ধরাতে দু ভাই চলল প্রভুদর্শনে।

দন্তে তৃণ ধরে গলবস্ত্র হয়ে দু ভাই প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়ল।

প্রভু মঙ্গলনেত্রে তাকালেন। বললেন, ওঠো, দৈন্য সংবরণ করো।

আমরা নীচ সঙ্গ, নীচ কাজ করছি। আমাদের মত পতিতাধম জগতে আর কেউ নেই। আমাদের দোষ মার্জনা করো এমন প্রার্থনা করতেও আমাদের লজ্জা হচ্ছে। কাতর কণ্ঠে বললে দু ভাই: জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার তো সহজ ছিল। তারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, থাকে নবদ্বীপে, তারা নীচের দাসত্ব করে নি। তাদের একমাত্র দোষ পাপাচার। শুধু তোমার নিন্দা করতে গিয়ে তোমার নাম করে তারা লাভবান হয়েছে। শুধু নামে কী, নামাভাসেও পাপ চলে যায়। কিন্তু আমরা? আমাদের সঙ্গম-সাহচর্য গো-ব্রাহ্মণদ্রোহীদের সঙ্গে। আমাদের কী উপায় হবে? তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। আমাদের উদ্ধার করে তুমি তোমার বল দেখাও। তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক করো।

প্রভু বললেন, তোমাদের দৈন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু তোমাদের ভয় কী? তোমরা রাজকার্যে লিপ্ত থেকেও মন সর্বদা ভগবানে ফেলে রেখেছ। ভগবানে নিরবচ্ছিন্ন নিবিষ্টতাই তোমাদের সংসারাসক্তি কাটিয়ে দেবে। আর কিছুর জন্যে নয়, তোমাদের দুজনকে দেখতেই আমি রামকেলিতে এসেছি। ভয় নেই, শিগগিরই তোমাদের সংসারবন্ধন ঘুচে যাবে। কৃষ্ণ কৃপা করবেন। আজ থেকে তোমাদের নাম হল সনাতন আর রূপ।

তবে আমাদের আর পায় কে! দু ভাই আশ্বস্ত হল।

প্রভু, আপনি এ অঞ্চলে বেশি দিন থাকবেন না। গৌরহরিকে লক্ষ্য করে সনাতন বললে, না। বিধর্মী রাজার কখন কী মতিগতি হয় কিছু ঠিক নেই। তাছাড়া তীর্থযাত্রায় এত লোক কি ভালো?

ঠিক বলেছে সনাতন। এত লোক সঙ্গে থাকলে তীর্থদর্শনে শান্তি হবে না, রসভঙ্গ হবে। কানাইর নাটশালা পর্যন্ত গিয়ে প্রভু ফিরে চললেন নীলাচলে।

দুই ভাই, সনাতন আর রূপ, বিষয়ত্যাগের উপায় ভাবতে বসল।

প্রথমেই কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যাতে নির্বিঘ্নে অচিরে চৈতন্য-চরণ পেতে পারে। মন্ত্রের সিদ্ধিলাভের জন্যে যে প্রাথমিক অনুষ্ঠান তাকে পুরশ্চরণ বলে। কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যেহেতু গৌরহরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

রূপ ছুটি নিয়ে পালাল। কিন্তু সনাতন কী করবে? সে অসুখের ছল করে বাড়িতে বসে রইল। সে প্রধান মন্ত্রী, সে জানে ছুটি চাইলে নবাব তার দরখাস্ত মঞ্জুর করবে না, বরং ক্রুদ্ধ হবে। সরাসরি কাজে ইস্তফা দিলে কারাদণ্ড সুনিশ্চয়। কিন্তু চাকরিই বা করে কী করে? বিষয়ব্যাপারে আর বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। তাই ভাবল অসুস্থ হয়ে সরে থাকাই উপায়।

কী এমন অসুখ, নবাব রাজবৈদ্যকে বললে যাও, দেখে এস। রাজবৈদ্য এসে বললে, অসুখ ভান মাত্র। সনাতন ভালো আছে, বাড়িতে বসে শাস্ত্রচর্চা করছে।

নবাব আচম্বিতে সনাতনের বাড়িতে এসে হাজির হল। নিজের চোখে দেখল সনাতন ভট্টাচার্যদের নিয়ে ভাগবত-বিচার করছে।

তার মানে? নবাব রুষ্ট হয়ে বললে, দিব্যি ভালো আছ অথচ রাজকাজ করছ না?

সনাতন শান্তস্বরে বললে, আমার আর কাজ-কর্মে রুচি নেই, আপনি অন্য লোক বহাল করুন।

সজ্ঞানে রাজকার্যে অবহেলা! নবাব আদেশ দিল, একে কারাগারে নিক্ষেপ করো।

কারাগারে বন্দী হল সনাতন।

কদিন পরেই উড়িষ্যার সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ বাধল। নবাব নিজে চলল সৈন্য নিয়ে। সনাতনকে বললে, তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

সনাতন বললে, মার্জনা করুন। আপনি যদি দেবস্থান কলুষিত করেন তা আমার সহ্য হবে না।

বটে? নবাব বললে, কারাগারে একে হাতকড়া পরিয়ে বেঁধে রাখো।

রূপ সনাতনকে চিঠি লিখে পাঠাল: আমি আর অনুপম বৃন্দাবনে যাচ্ছি প্রভুর চরণবন্দনা করতে। তুমি যেমন করে পারো চলে এস। রামকেলিতে মুদির কাছে দশ হাজার মুদ্রা রেখে এসেছি, তাই মুক্তিপণ দিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এস।

সনাতন কারারক্ষীকে চাটুবাক্যে তুষ্ট করতে চাইল। বললে, তুমি একজন জীবন্ত পীর, সিদ্ধ মহাপুরুষ। কেতাবে-কোরানে তোমার অগাধ জ্ঞান। এত বড় ভাগ্যবান কজন আছে?

রাজমন্ত্রী প্রশংসা করছে, প্রহরীর চিত্ত আলোড়িত হল।

যদি কারাগার থেকে কাতর কোনো বন্দীকে মুক্ত করে দাও তবে ভগবানও তোমাকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবেন।

বলুন কী করতে হবে?

মনে আছে, আগে আগে তোমার অনেক উপকার করেছি, তুমি এবার তার কিঞ্চিৎ শোধ দাও। আমাকে ছেড়ে দাও, খালাস দিয়ে দাও। শোনো, তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দেব—একসঙ্গে তোমার পুণ্য আর অর্থ দুই-ই লাভ হবে।

কিন্তু বাদশাকে বড় ভয়।

বাদশা যুদ্ধে গিয়েছে, কে জানে হয়তো আর ফিরবে না। আর যদি ফেরে, বলবে সাকর মল্লিক প্রাতঃকৃত্য করতে গঙ্গাতীরে গেল আর অতর্কিতে ঝাঁপ দিল নদীতে। অনেক খুঁজলাম, সন্ধান পেলাম না। হাতে বেড়ি ছিল, সাঁতার দিতে পারে নি, জলের অতলেই ডুবে মরেছে। আমি মরে গেছি ভেবে বাদশা আর তোমাকে শাস্তি দেবে না। শোনো, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি এ রাজ্য ছেড়ে দরবেশ হয়ে সোজা মক্কায় চলে যাব।

তাতেও প্রহরীর মন উঠল না।

বেশ, সাত হাজার দিচ্ছি। বললে সনাতন, বণিকের দোকানে টাকা গচ্ছিত আছে। তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। আগে টাকা গুনবে পরে আমাকে ছাড়বে।

রাশীভূত টাকা। প্রহরীর মন টলল।

সনাতনকে ছেড়ে দিল। হাতের বেড়ি কেটে দিল। রাতারাতি গঙ্গা পার হয়ে গেল সনাতন।

এ সংসারে চৈতন্যচরণই সত্য। সে চরণপ্রাপ্তির যা কিছু প্রতিকূল, যে কোনো উপায় হোক, ছলে বলে কৌশলে, তাকে অতিক্রম করাই মানুষের একমাত্র সত্যধর্ম।

সঙ্গে চাকর ঈশান, নিরিবিলি পথ নিল সনাতন। পাতড়া-পর্বতে এসে থামল। সেখানকার ভুঁইয়াকে বললে, আমাদের পার করে দিন।

গুনতে জানত ভুঁইয়া। গুনে দেখল এদের সঙ্গে আটটা মোহর আছে। খুশি মনে বললে, স্নান করে খাওয়া-দাওয়া করো, রাত্রে লোক দিয়ে পার করে দেব।

স্নানাহার সারল দুজনে। কিন্তু তাদের প্রতি এত যত্ন-আদর কেন, সনাতনের সন্দেহ হল। আমাকে তো ওর চেনবার কথা নয়, নিতান্ত

দরিদ্রবেশ পরে আছি, তবে কেন এত আপ্যায়ন? এ আবার কোনো বিপদের ছদ্মবেশ নয় তো?

ঈশানকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কাছে কি কোনো লোভনীয় জিনিস আছে?

ঈশান বললে, সাতটা মোহর আছে।

এই কাল-যম সঙ্গে এনেছ কেন? দাও আমাকে দাও।

সেই মোহর নিয়ে সনাতন ভুঁইয়ার কাছে গেল। বললে, এই সাতটা মোহর সঙ্গে ছিল, তাই আপনাকে সম্মানমূল্য দিচ্ছি। আমাদের পার করে দিন। আপনার পুণ্য হবে।

সাত নয়, আটটা মোহর আছে। ভুঁইয়া বললে, তা যাক গে। আজ রাত্রে তোমাদের খুন করে মোহর সংগ্রহ করব—এই রকম সংকল্প ছিল। তার দরকার হল না। তুমি নিজের থেকেই দান করতে এসেছ। আমাকে নরহত্যার পাপ থেকে বাঁচিয়ে দিলে। শোনো, এই মোহর আমি নেব না, পাপের চেয়ে পুণ্যেই আমার এখন লোভ হচ্ছে। আমি লোক দিচ্ছি, তোমাদের নির্বিঘ্নে পার করে দেবে।

মোহর কিছুতেই সনাতন ফিরিয়ে নেবে না। বললে, এ শত্রু সঙ্গে থাকলে দস্যুর হাতে আমি মারা যাব। এ মোহর আপনি গ্রহণ করে আমার প্রাণ রক্ষা করুন।

অগত্যা ভুঁইয়া নিল সেই সাত মোহর। সনাতনের জন্যে চারজন দেহরক্ষী নিযুক্ত হল। এরা বনপথে নিয়ে যাবে।

পর্বত পার হয়ে এসে সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞেস করলে, তোমার কাছে আর কিছু আছে?

ঈশান বললে, শেষ সম্বল আরেকটি মোহর আছে।

ওটি তুমি নাও। ওটি নিয়ে দেশে ফিরে যাও।

ঈশান কাঁদতে লাগল।

সজল চোখে সনাতন বললে, আমি কাঙাল হয়ে একা-একা যাব। আমি নিঃসঙ্গ, আমি অকিঞ্চন।

হাতে করঙ্গ, গায়ে ছিন্ন কাঁথা, নির্ভয়ে চলতে লাগল সনাতন। নির্ভয়, যেহেতু কৃষ্ণেই আমার আত্মসমর্পণ, কৃষ্ণকেই আমি রক্ষাকর্তারূপে বরণ করে নিয়েছি।

হাজিপুরে এসে পৌঁছুল সনাতন। সেখানে থাকে তার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত, বাদশা হুসেন শার ঘোড়া জোগানের কাজ করে। তার সঙ্গে দেখা হল। বললে, গৌরাঙ্গ পাবার আশায় কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু এ তোমার কী পোশাক! চলো আমার ঘরে, কদিন বিশ্রাম করো। দাড়িগোঁফ কামিয়ে মুখখানি ভদ্র করো। শ্রীকান্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

সনাতন বললে, আমি এখানে এক মুহূর্তও থাকব না, আমি কাশী যাব। দয়া করে আমাকে গঙ্গা পার করে দাও।

শ্রীকান্ত দেখল এ আরেক রকম সনাতন। বেশে-বাসে ভদ্রে-সভ্যে স্পৃহা নেই। ঈশ্বরভাবনাই তাঁর একমাত্র আচ্ছাদন। ঈশ্বরচিন্তনই তার একমাত্র আহার। ঈশ্বরনির্ভরই তার একমাত্র আনন্দ।

শ্রীকান্ত সনাতনকে গঙ্গা পার করিয়ে দিল। শীতত্রাণ ভোটকম্বল দিল একখানা।

হাঁটতে হাঁটতে সনাতন কাশী চলে এল। শুনল প্রভু এখানেই আছেন, উঠেছেন চন্দ্রশেখরের বাড়িতে।

সেই বাড়ির দরজায় এসে বসল সনাতন।

অন্তর্যামী প্রভু বললেন, দেখ তো একজন বৈষ্ণব দ্বারে এসে বসেছে। তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এস।

সনাতনের অঙ্গে কোনো বৈষ্ণববেশ বা চিহ্ন নেই, তাকে তাই চন্দ্রশেখর চিনতে পারল না। প্রভুকে বললে, দ্বারে কোনো বৈষ্ণব নেই, একজন দরবেশ বসে আছে।

তাকেই ডেকে আনো।

সনাতন অঙ্গনে এসে দাঁড়াতেই প্রভু দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন।

আমাকে ছুঁয়ো না। সনাতন কেঁদে উঠল : আমি পতিত, আমি অধম, আমি তোমার স্পর্শের অযোগ্য।

প্রভু বললেন, নিজে পবিত্র হবার জন্যে তোমাকে স্পর্শ করছি। ভক্তিবলে তুমি সমস্ত বিশ্ব পবিত্র করতে পারো। ভক্তি যার নেই, সে পরকে দূরের কথা, নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না। তাই তোমাকে দেখতে দাও, ছুঁতে দাও, গাইতে দাও তোমার গুণগান। ভক্তের দর্শনই চক্ষুর ফল, ভক্তগাত্র-

সঙ্গই দেহের ফল, ভক্তের গুণকীর্তনই জিহ্বার ফল। জগতে ভক্তই সুদুর্লভ। আর ভয় নেই, কৃষ্ণই তোমাকে উদ্ধার করলেন।

আমি কৃষ্ণ জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি। বললে সনাতন, তুমিই আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছ।

প্রভু চন্দ্রশেখরকে আদেশ দিলেন, ক্ষৌরকর্ম করিয়ে একে ভদ্র বানিয়ে দাও।

ভদ্র হয়ে সনাতন গঙ্গাস্নান করল। চন্দ্রশেখর নতুন বস্ত্র দিল। তা নিল না সনাতন। বললে, নতুনে আমার রুচি নেই, একখানা পরিহিত পুরোনো বস্ত্র দাও।

তাই দিল তপন মিশ্র। পুরোনো ধুতি ছিঁড়ে বহির্বাস ও ডোর কৌপীন করে পরল সনাতন।

তপন তার বাড়িতে সনাতনকে প্রভুর পাত্রশেষ নিবেদন করল।

মহারাষ্ট্রী বিপ্র বললে, আপনি যতদিন কাশীতে থাকবেন, আমার বাড়িতে প্রত্যহ ভিক্ষে করবেন।

সনাতন বললে, না, আমি মাধুকরী করব, এক ঘরে রোজ রোজ ভিক্ষে নেব না।

সনাতনের মুক্তবৈরাগ্য দেখে প্রভুর আনন্দ হল। কিন্তু তিনি বারে বারে সনাতনের কম্বলের দিকে তাকাচ্ছেন কেন? বোধ হয় তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। যে মাধুকরী করে খাবে তার গায়ে দামী কম্বল মানায় না।

গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে সনাতন, দেখল কে একখানা কাঁথা ধুয়ে শুকোতে দিয়েছে। তাকে বললে, ভাই, তুমি আমার কম্বলখানা নিয়ে তোমার ঐ ছেঁড়া কাঁথাখানা আমাকে দাও।

কাঁথার বদলে কম্বল! লোকটা তক্ষুনি রাজী হয়ে গেল।

কাঁথা গায়ে দিয়ে সনাতন প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল। প্রভু খুশি হয়ে বললেন, কৃষ্ণ তোমার বিষয়ভোগ খণ্ডে দিয়েছেন। সৎবৈদ্য রোগের অবশেষও রাখে না।

সনাতন শিক্ষার্থীর ভঙ্গিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। বললে, এতদিন গ্রাম্য ব্যবহারে বিষয়ব্যাপারে দিন কাটালাম, আমাকে যদি উদ্ধার করলেন, তবে এবার আমার কর্তব্য কী বলে দিন। আমার তিনটি প্রশ্ন—আমি কে, তাপত্রয় আমাকে কেন জীর্ণ করছে, আর কিসে আমার মঙ্গল?

এই তিন সনাতন প্রশ্নের উত্তর দিলেন গৌরহরি।

আমি কে, আমার স্বরূপ কী? জীবের স্বরূপ—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। এই নিত্যদাসত্ব ভুলে জীব যখন বহির্মুখ হয়, তখনই তাকে ত্রিতাপজ্বালা জীর্ণ করে। আর মঙ্গল সাধুর কৃপায়, শাস্ত্রের কৃপায়। যদি সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয় তা হলেই সে মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণভজনই সার কথা।

প্রশ্ন হল: কে কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ আমার একমাত্র প্রভু, একমাত্র ত্রাতা—একমাত্র প্রাপ্য। আর সেই প্রাপ্তির সাধনই ভক্তি। সাধনভক্তির ফলেই প্রেম, আর এই প্রেমেই কৃষ্ণ-মাধুর্যের আস্বাদন। সুতরাং প্রেমই মহা প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন।

কাশীতে গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে সনাতনকে দু'মাস ধরে উপদেশ করলেন প্রভু—কী করে কৃষ্ণপ্রেমধন পাওয়া যায়? বোঝালেন সম্বন্ধ, অভিধেয়, সাধন আর প্রয়োজন। সম্বন্ধ কৃষ্ণ, অভিধেয় ভক্তি, প্রয়োজন প্রেম, আর তা পাবার জন্যে যে উপায় তাই সাধন। সাধনবিধি পাঁচটি—সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস আর বিগ্রহসেবা।

পরীক্ষিৎ কৃষ্ণকে পেয়েছিল শ্রবণে, শুকদেব পেয়েছিল কীর্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পদসেবনে, পৃথু পূজনে, অক্রূর বন্দনে, হনুমান দাস্যে, অর্জুন সখ্যে আর বলি আত্মনিবেদনে।

বোঝালেন কৃষ্ণতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, বোঝালেন রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এক কৃষ্ণ থেকে অসংখ্য অবতারের উদ্ভব। গুনে শেষ করা যায় না। গাছের পল্লবিত শাখার মধ্য দিয়ে দেখা টুকরো টুকরো চাঁদের মত।

সনাতন জিজ্ঞেস করল, প্রভু এটা কলিযুগ। এই কলির অবতার কে? কী করে বুঝব?

প্রভু বললেন, শাস্ত্র বিচার করে বুঝতে হবে। যিনি অবতার তিনি তো আর নিজের অবতারত্ব ঘোষণা করবেন না, লক্ষণ দেখেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

যিনি স্বরূপে অবতীর্ণ আর প্রকটে কীর্তন-প্রবর্তক ও প্রেমদাতা তিনিই তো কলির অবতার। সনাতন আকুল কণ্ঠে বললে, বলুন ঠিক কিনা। নিশ্চয় করে বলুন।

প্রভু বললেন, চাতুরালি ছাড়ো। কৃষ্ণের কথা শোনো।

কৃষ্ণ চিরকিশোর। কৈশোরেই কৃষ্ণের নিয়তস্থিতি। তার ঐশ্বর্যের অমৃত-সিন্ধুর এক বিন্দুও মনোবাক্যের গোচর নয়। কৃষ্ণের সমান কেউ নেই, উচ্চতরও কেউ নেই। তার সমস্ত লীলার মধ্যে নরলীলাই সর্বোত্তম। নিজের রূপ দেখে নিজেই বিস্মিত। নিজেকে আস্বাদ করবার জন্যে নিজেই ইচ্ছুক-উৎসুক।

যারা পতিব্রতা-শিরোমণি, বৈকুণ্ঠের সেই সব লক্ষ্মীরাও কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট। আর কৃষ্ণ আকৃষ্ট গোপীদের কামগন্ধহীন নির্মল প্রেমে। সেই নির্মল প্রেমিকাদের সঙ্গেই কৃষ্ণের রাসক্রীড়া। সেই ক্রীড়ায় কন্দর্পের মনও মথিত। যে সকলের মোহ উৎপাদন করে সে এখানে মোহিত। তাই কৃষ্ণের এখানে মদনমোহন নাম। 'চড়ি গোপীমনোরথে, মন্মথের মন মথে, নাম ধরে মদনমোহন।'

মাধুর্যই ভগবত্তার শেষ কথা। সে কথাই প্রকাশিত হয়েছে ভাগবতে। তাই ভাগবত-শ্রবণই সর্বজীবের আশ্রয়। ভাগবতই জীবকে ভগবৎপরায়ণ হতে প্রবুদ্ধ করে।

সনাতন, তোমার প্রতি কৃষ্ণের অগাধ কৃপা। আমাকে যন্ত্র করে আমার চিত্তভ্রম জন্মিয়ে আমার মুখে তাঁর ঐশ্বর্য-মাধুরী তোমাকে শোনালেন। আমি তো পাগল, কী কথা বলতে কী কথা বলি তার ঠিক নেই। শুধু কৃষ্ণ-মাধুরীর স্রোতে ভেসে যাওয়াই আমার কাজ।

শোনো। ভক্তি অর্থ সেবা। এ সেবা নিজের সুখের জন্যে নয়, কৃষ্ণের সুখের জন্যে। একমাত্র কৃষ্ণ প্রীত হলেই বিশ্ব প্রীত।

শুধু একবার বলো, কৃষ্ণ, আমি তোমার হলাম। আমার দেহ মন প্রাণ সমস্ত তোমার হল। আমি তোমাতেই প্রসন্ন, আমি একমাত্র তোমারই। তুমি ছাড়া আমি বলে কিছু নেই, তা হলেই মায়া পলাতকা। যার মায়াতে অভিনিবেশ তারই ভয় আর যার ভয় তারই দুঃখ।

মহৎকৃপা হলেই ভগবৎকৃপা। সাধুর চরণধূলি না পাওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে মতি হয় না। 'লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।'

জানবে সদাচারই বিধি, অসদাচারই নিষেধ।

সাধনভক্তি দু'রকম। এক বৈধী, অন্য রাগানুগা। যার অনুরাগ নেই সে শাস্ত্রশাসনের ভয়ে কৃষ্ণভজনা করে, কৃষ্ণকে সুখী করবার জন্যে নয়। আর

যে অনুরাগে রঞ্জিত সে বিধিনিষেধের ধার ধারে না, সে প্রাণের থেকে ভজনা করে, তার প্রাণধন কৃষ্ণকে খুশি করতে।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণাই রাগ। এ কোনো শাস্ত্রযুক্তি মানে না, শুধু ভাবমাধুর্যেই লোভান্বিত। ভাবমাধুর্যে লোভ জন্মে বলে লোভধর্মেই শাস্ত্রযুক্তি উপেক্ষা করে। বাইরে শ্রবণ-কীর্তন করে, অন্তরে স্মরণ-সেবন করে। যার যেমন ইচ্ছা কৃষ্ণকে সেই ভাবে প্রিয়তম ভেবে অন্তর্মনা হয়ে নিরন্তর সেবা করো। যার খুশি দাস হও, সখা হও, প্রিয়া হও। এতেই প্রীতির উদয় হবে। প্রীতির অঙ্কুর অবস্থার নাম রতি। রতি গাঢ় বা পরিপক্ক হলেই প্রেম।

কোনো ভাগ্যে জীবের যদি শ্রদ্ধা জাগে, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস জাগে, তবে সে কী করে? সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গ থেকে শ্রবণ-কীর্তন বা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করে। এই সাধনভক্তিতেই সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হয়। ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা দূরে যায়। অনর্থ-নিবৃত্তি থেকে নিষ্ঠা আসে। নিষ্ঠা রুচি আনে। রুচি থেকে আসক্তি জাগে। আসক্তি থেকে প্রীত্যঙ্কুর। আর এই প্রীতি বা রতি ঘনীভূত হলেই প্রেম।

যে সাধনের মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর জেগেছে তার লক্ষণ কী?

ক্ষান্তি, ক্ষোভের কারণ থাকলেও ক্ষোভশূন্যতা। অব্যর্থকালত্ব, নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণভজন। একমুহূর্তেও বৃথা বা কৃষ্ণ ছাড়া না থাকা। বিরক্তি বা বিরাগ। মানশূন্যতা বা দৈন্যবোধ। আশাবন্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণ-কৃপা করবেন এই দৃঢ়বিশ্বাস। সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ কৃষ্ণকে দেখবার লালসা। নামগানে সদা রুচি। কৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি। আর তীর্থবাসে অনুরাগ।

সনাতন, বললেন গৌরহরি, তোমাকে চারটি কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি মথুরামণ্ডলে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো, বৃন্দাবনে প্রচার করো কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব আচার আর ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র। শুষ্কবৈরাগ্য ছেড়ে ধরতে বলো যুক্ত-বৈরাগ্য।

সনাতন বললে, এই অমৃতসমুদ্রের এক বিন্দুও ধারণ করি আমার এমন সাধ্য নেই। তবে তুমি যদি পঙ্গুকে নাচাতে চাও, আমার মাথায় তোমার চরণ রাখো।

প্রভু বললেন, তোমাকে যা শেখালাম, তোমাতে তা স্ফুরিত হোক। বলে সনাতনের মাথায় হাত রাখলেন।

পরে বৈষ্ণবস্মৃতি সংকলনের সূত্র ধরিয়ে দিলেন। বললেন, তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। জ্ঞান বুদ্ধি ভাব সমস্ত কৃষ্ণ তোমাকে জুগিয়ে

যাবেন। লিখতে আরম্ভ করলেই দেখবে কৃষ্ণ তোমার চিত্তে সমস্ত উজ্জ্বল করে তুলবেন। 'যবে তুমি লিখ কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ।'

এবার তবে বৃন্দাবন যাও। আমার আরেকটি অনুরোধ। বললেন গৌরহরি, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে, হাতে করঙ্গ, আমার কাঙাল ভক্তেরা বৃন্দাবন এলে তাদের প্রতিপালন কোরো।

ব্রজবনের বনে বনে মহাবিরক্ত সনাতন কৃষ্ণান্বেষণে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দিনের বেলায় এক-এক দিন এক-এক বৃক্ষতলে ও রাতে এক-এক রাত এক-এক কুঞ্জে বাস করতে লাগল। মথুরা-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করে তা দেখে মথুরাখণ্ডের লুপ্ত তীর্থের স্থান নির্দেশ করল।

কিন্তু প্রভু ছাড়া মন টেঁকে না। সনাতন পুরীর দিকে যাত্রা করল। গৌড়ের পথে গেল না, ঝারিখণ্ডের পথ নিলে। একেবারে একলা চলেছে সনাতন, একেবারে নিঃসহায়। অর্ধাশনে, অনশনে, চানা চিবিয়ে কখনো বা শুধু জল খেয়ে পথ ভাঙতে লাগল। ঝারিখণ্ডের জলের দোষে গায়ে চুলকুনি দেখা দিল। ভাবল, এ অশুচি শরীর নিয়ে কী করে প্রভুর মুখোমুখি হব? আমি কৃষ্ণভজনের অযোগ্য, তাই আমার দেহে এ কুৎসিত ব্যাধি উপস্থিত হয়েছে। মন্দিরে ঢোকবারও আমার অধিকার নেই। এ দেহ আর রাখব না, আত্মহত্যা করব। রথযাত্রার আর দেরি নেই, রথের দিনে প্রভুর সামনে প্রভুকে দেখতে দেখতে রথের চাকার নিচে দেহ ছাড়ব।

নীলাচলে হরিদাসের বাসায় এসে উঠল সনাতন।

মন্দিরে উপলভোগ দেখে প্রভু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সনাতন প্রণাম করতেই প্রভু তাকে আলিঙ্গন করতে বাহু বাড়ালেন।

সনাতন পিছু হটল। না, না, ছুঁয়ো না আমাকে, আমি হীন অস্পৃশ্য, আমার সারা গায়ে ব্যাধি—

প্রভু নিষেধ শুনলেন না। জোর করে সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। সনাতনের কণ্ডুক্লেদ তাঁর গায়ে লাগল। সনাতন অপরাধীর মত ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু প্রভুর মুখে বদান্য হাসি।

হরিদাসের ঘরেই থেকে গেল সনাতন। প্রভু বললেন, আর কথা কী। দু'জনে একসঙ্গে থাকো আর কৃষ্ণ-নাম-আস্বাদ-সমুদ্রে স্নান করো।

সনাতন মন্দিরে যায় না, মন্দিরের চক্র দেখে দূর থেকে প্রণাম করে। গোবিন্দই প্রসাদ নিয়ে আসে। হোক প্রণাম, হোক প্রসাদ, তবু দেহত্যাগের

সংকল্প ত্যাগ করে নি সনাতন। যে দেহ কণ্ডুতে কলুষিত সে দেহ রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেলেই সদ্গতি।

সহসা সেদিন প্রভু চলে এলেন হরিদাসের বাসায়। সনাতনকে বললেন, শোনো, দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ পাওয়া যায় ভজনে। দেহত্যাগেই যদি কৃষ্ণ পাওয়া যেত, তবে আর ভাবনা ছিল না, কোটি কোটি লোক এক মুহূর্তে আত্মহত্যা করত। কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি।

আশ্চর্য, অন্তর্যামী প্রভু মনের গূঢ় বাসনাটি পর্যন্ত জেনে ফেলেছেন!

তুমি নীচ জাতি কে বললে? শুধু যবনের সংস্রবে দীর্ঘকাল ছিলে বলে দৈন্যবশত নিজেকে নীচ বলছ, কিন্তু ভক্তের আবার জাতি কী। যে কৃষ্ণ ভজন করে সেই উচ্চ সেই বৃহৎ। ভক্তিতে সবাই সমজাতি। আর যদি সত্যি দৈন্য ধরো, অভিমান থেকে মুক্ত হও, দেখবে তোমার প্রতিই ভগবানের বেশি দয়া।

ভগবানের অশেষ দয়া কি সনাতনের চোখের সামনে প্রতিমূর্ত নয়?

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি, আর সেই নয় অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামকীর্তন। বললেন প্রভু, নিরপরাধে নাম নিলেই প্রেমধন মিলে যাবে।

তা হলে বোঝা যাচ্ছে সনাতনের দেহত্যাগ প্রভুর মনঃপূত নয়। সনাতন বললে, আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই। যৈছে নাচাও তৈছে নাচি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তোমার কী লাভ হবে?

যখন তুমি আমাতে আত্মসমর্পণ করেছ তখন তোমার দেহে আর তোমার স্বত্বস্বামিত্ব নেই। বললেন প্রভু, যা এখন পরের দ্রব্য তা তুমি নষ্ট করবে কোন্ অধিকারে? তোমার শরীরে আমার ভীষণ দরকার, অনেক প্রয়োজন সাধন করব একে দিয়ে।

প্রভু যমেশ্বরটোটায় আছেন, পুরীতে খবর পাঠালেন, সনাতন যেন মধ্যাহ্ন-ভিক্ষার সময় আসে।

সনাতন আছে হরিদাসের সঙ্গে, সিদ্ধবকুলের স্থানে। সিদ্ধবকুল থেকে যমেশ্বরে যাবার দুটো রাস্তা। একটা মন্দিরের সিংহদ্বার পেরিয়ে শহরের রাজপথ দিয়ে, অন্যটা সমুদ্রতীর ধরে। প্রথম পথটাই অপেক্ষাকৃত সহজ, অকষ্টসাধ্য। দ্বিতীয় পথটা নির্জন, বালুকাপূর্ণ, গাছগাছালি নেই, ছায়া নেই এক ফোঁটা। জ্যৈষ্ঠের বেলা, তবু দ্বিতীয় পথই নির্বাচন করল সনাতন।

তপ্ত বালিতে পা পুড়ে যাচ্ছে সনাতনের খেয়াল নেই। ফোস্কা পড়েছে

তো পড়ুক। প্রভু তাকে ডেকেছেন সেই আনন্দ-তন্ময়তায় তপ্ত বালিও তার কাছে সুখস্পর্শ।

ভিক্ষাশেষে প্রভু বিশ্রাম করছেন, সনাতন এসে পৌঁছুল। গোবিন্দ তার জন্যে ভিক্ষাবশেষ নিয়ে এল। প্রসাদ পেল সনাতন।

সনাতন, কোন্ পথে এলে? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।

সমুদ্রতীরের পথ দিয়ে এসেছি।

সে কি, সিংহদ্বারের পথ দিয়ে এলে না কেন? সিংহদ্বারের পথ ঠাণ্ডা, সমুদ্রতীরের পথ তপ্ত বালিতে দুঃসহ। তোমার পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে, তুমি হাঁটলে কী করে?

পায়ের ফোস্কা টের পাই নি। বললে সনাতন, সিংহদ্বারের পথে আমার যাবার অধিকার নেই। সে পথে জগন্নাথের সেবকেরা যাতায়াত করছে, যদি দৈবাৎ কারু সঙ্গে আমার গাত্রস্পর্শ হয়ে যায়, তাহলে আমার অপরাধের শেষ থাকবে না। আমার স্পর্শে দেবসেবার কাজ অপবিত্র হবে এ অসহ্য।

সনাতনের দৈন্য ও মর্যাদাবোধ দেখে প্রভু তুষ্ট হলেন। বললেন, তুমি অপবিত্র এ তোমাকে কে বলল? তুমি জগৎপাবন, তোমার স্পর্শে মুনি-ঋষিরা পবিত্র হয়। বলে সনাতনকে প্রভু আবার আলিঙ্গন করলেন। তার কণ্ডুরস প্রভুর গায়ে লাগল।

কত নিষেধ করছে তবু প্রভু শোনেন না। ক্ষোভে লজ্জায় মলিন হল সনাতন। জগদানন্দকে জানাল তার দুঃখের কথা, অপরাধের কথা। জগদানন্দ তাকে নীলাচল ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যাবার পরামর্শ দিল।

সে কথা শুনে প্রভু রুষ্ট হয়ে জগদানন্দকে তিরস্কার করলেন। কালকের ছাত্র জগা, তার কিনা এত অহংকার, তোমাকে উপদেশ করে! তুমি মাননীয় জন, তোমার মূল্য ও কী বুঝবে?

জগদানন্দের কী ভাগ্য! বললে সনাতন, তাকে আপনি আত্মীয়বোধে তিরস্কার করছেন। আর আমি আপনার অনাত্মীয়। তাই আমাকে আপনার গৌরবস্তুতি। আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে? আমি আপনার আত্মীয়তা পেলাম না।

তোমাকে যে আমি প্রশংসা করি, তা বহিরঙ্গ বুদ্ধিতে নয়, তোমাকে বাইরের লোক মনে করে নয়, তোমার এত গুণ, তোমাকে স্তুতি না করে থাকা যায় না। তোমার দেহ তোমার কাছে বীভৎস, আমার কাছে অমৃত-

তুল্য। তোমার দেহ, ভক্তের দেহ, অপ্রাকৃত, চিন্ময়, শুধু বুদ্ধিদোষে তুমি তা প্রাকৃত মনে করছ। শোনো, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধর্ম সমদর্শন। চন্দনে ও পঙ্কে আমার সমবুদ্ধি। তাই তোমাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। তোমাকে ত্যাগ করলে আমার নিজধর্ম সন্ন্যাসধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়।

হরিদাস বললে, প্রভু, এ তোমার পরিহাস। জ্ঞানযোগের কথা বাজে কথা। আমি আসল কথাটি জানি।

সে আবার কোন্ কথা ?

আসল কথা হচ্ছে, আমরা অধম, আমরা পতিত, আর তুমি দীনের প্রতি, পতিতের প্রতি স্বভাবদয়ালু। বললে হরিদাস, তুমি তোমার দীনদয়ালগুণে আমাদের অঙ্গীকার করে নিয়েছ। ঘৃণ্য জেনেও স্থান দিয়েছ পাদপদ্মে।

না, তা নয়। বললেন প্রভু, তোমাদের আমি লাল্য মনে করি আর নিজেকে মনে করি লালনকর্তা। মা যেমন সন্তানের ক্লেদ-মালিন্য ধুয়ে-মুছে দেন তেমনি ; মার মধ্যে কি ঘৃণা থাকে, না, দোষজ্ঞান থাকে ? মার মধ্যে যে ভাব তাকে তুমি শুদ্ধ দয়াও বলতে পারো না। মার মধ্যে শুধু স্নেহসুখ, শুধু প্রীতিময়ী পরিচর্যা। সনাতনের প্রতিও আমার সেই মাতৃস্নেহ। শিশু-সন্তানের গায়ে যদি কণ্ডুরস থাকে মা কি তাকে কোলে নেয় না, নাকি কোলে নিতে তার ঘৃণা হয় ? আমার তো মনে হয় ক্লিন্ন বলেই মার সন্তানকে কোলে নিতে বেশি আনন্দ।

পরে আবার বললেন, বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত নয়, চিদানন্দময়। দীক্ষাকালে যেই ভক্ত কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করল, অমনি সে কৃষ্ণের আত্মসম হয়ে উঠল। ভগবানে সমর্পিত ভক্তদেহ চিন্ময়ত্ব অর্জন করল। তাই সনাতন, তোমার দেহ নিত্যপবিত্র, তোমাকে আলিঙ্গন করে আমি নিত্যতৃপ্ত, নিত্যসুখী।

বলে প্রভু আরেকবার সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। আর তখুনি সকলে দেখল, সনাতনের শরীরে আর কণ্ডু নেই, সর্ব অঙ্গ মসৃণ সোনার মত ঝলমল করে উঠেছে।

এই তোমার ভঙ্গি! হরিদাস উল্লসিত হয়ে উঠল : ঝাড়িখণ্ডের জল খাইয়ে সনাতনের দেহে কণ্ডু করালে, তারপর তাকে পরীক্ষা করলে যন্ত্রণায় ভগবানে দোষ দেয় কিনা, কর্তব্যে বিমুখ হয় কিনা, পরে নিজেই আবার ব্যাধির নিরাকরণ করলে। তোমার এ লীলারহস্য কে দেখে কে বোঝে।

দোলযাত্রার পরে সনাতন বৃন্দাবন যাত্রা করল। লুপ্ততীর্থ প্রকট করবে,

বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করবে, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণপ্রচার করবে। প্রভু আবার মনে করিয়ে দিলেন।

প্রভু যে পথে গেছেন সেই পথ ধরল। বলভদ্র আচার্যের কাছ থেকে জেনে নিল কোন্ গ্রামে কোন্ নদীতে কোন্ পাহাড়ে প্রভুর কী কী লীলা হয়েছে। সেই সব দেখতে দেখতে সনাতন পৌঁছুল বৃন্দাবন।

তারপর জগদানন্দ যখন বৃন্দাবনে যায় তখন প্রভু তাকে বলে দিলেন, সনাতনকে বোলো, আমি শীগগির যাচ্ছি, আমার জন্যে যেন স্থান করে রাখে।

দ্বাদশাদিত্য টিলায় প্রভুর জন্যে এক মঠ সংস্কার করে রেখে তার সামনে এক ছাউনি করে তাতে সনাতন বাস করতে লাগল। কিন্তু প্রভু এলেন না।

জগদানন্দের নিমন্ত্রণে সনাতন একদিন মাথায় রক্তবস্ত্র বেঁধে হাজির হল। জগদানন্দ ভাবল এ বুঝি প্রভুরই দেওয়া, ভেবে প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে গেল। পরে প্রশ্ন করে জানল এ কোন এক মুকুন্দ সরস্বতী নামে সন্ন্যাসীর দেওয়া। শুনে জগদানন্দ খেপে গেল, রান্নার হাঁড়ি নিয়ে সনাতনকে তেড়ে গেল—প্রভুর প্রধান পার্ষদ হয়ে তোমার এমন আচরণ! সনাতন হেসে বললে, প্রভুতে তোমার যে নিষ্কপট প্রেম তা দেখবার জন্যেই আমার এই ছল। ভয় নেই, এ বস্ত্র আমি আর মাথায় রাখব না, কোনো প্রবাসীকে দিয়ে দেব।

তখন জগদানন্দ শান্ত হল।

বৃন্দাবনে সনাতনের কাছে এল জীবনঠাকুর। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, কাশীতে বিশ্বনাথের কাছে ধনের জন্যে প্রার্থনা করলে বিশ্বনাথ আদেশ করলেন, বৃন্দাবনে সনাতনের কাছে যাও, সেখানে তাঁর হাতে ধনের উপায় আছে। শুনে সনাতন বললে, আমার তো প্রভু ছাড়া কিছু নেই, কী দিয়ে আপনার সেবা করব? বিপ্র হতাশ হয়ে চলে যাচ্ছে, সনাতন হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে তাকে ডেকে উঠল, শুনুন, মনে পড়েছে, ঐখানে বালি খুঁড়ে দেখুন তো কী আছে, যা পান নিয়ে যান। আপনার দুঃখ দূর হবে।

আঙুল দিয়ে সনাতন যে জায়গা দেখাল তার বালি খুঁড়ে জীবন পেল এক আশ্চর্য নীলকান্তমণি। অভিভূতের মত বসে পড়ল। ভাবল কী সে বৈরাগ্য কী সে বিপুল ঐশ্বর্য যার জন্যে এই অমূল্য মণিকেও তুচ্ছ করা যায়!

জীবন সনাতনের চরণ আশ্রয় করে বললে, আমাকে দীক্ষামন্ত্র দিন।

সনাতন তাকে দীক্ষামন্ত্র দিল। বললে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শরণাগতের পালক, কোনো চিন্তা নেই।

এই সাধুকৃপাই স্পর্শমণি।

মহৎকৃপা বিনা কোনো কার্যে সিদ্ধি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

দৈন্যার্ণবে শ্রীচৈতন্য আমার মহাবৈদ্য। আমি ভক্তিহীন দীন দরিদ্র, আমি কোথায় যাব, আমার কে আছে? আমি শুধু দীনবন্ধু শ্রীচৈতন্যে শরণ নিলাম।

॥ ৬৫ ॥

লোকনাথ গোস্বামী

যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে আবির্ভাব। পিতা পদ্মনাভ, মাতা সীতাদেবী —বংশের উপাধি চক্রবর্তী। বয়সে মহাপ্রভুর চেয়ে দু বছরের বড়।

অদ্বৈত আচার্যের বিদ্যালয়ের নাম অদ্বৈতসভা। পিতার কাছে শাস্ত্র-ব্যাকরণ পড়ে লোকনাথ অদ্বৈতসভায় এল ভাগবত পড়তে। অদ্বৈত তাকে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে তাঁর সভায় ভর্তি করে নিলেন। সেখানে সে সতীর্থ পেল গঙ্গাধরকে। আর গৌরাঙ্গসুন্দরকে।

গৌরাঙ্গসঙ্গের গুণে লোকনাথের মধ্যে ভক্তিশাস্ত্র প্রস্ফুরিত হল।

শ্রীগৌরাঙ্গসঙ্গের গুণে অতি চমৎকার।
লোকনাথের হৈল ভাগবতে অধিকার॥

গৌরাঙ্গের প্রতি লোকনাথের অদ্ভুত প্রেম দেখে অদ্বৈত লোকনাথকে গৌরাঙ্গের হাতে সমর্পণ করে দিলেন।

তালখড়ি গ্রামের পার্শ্ববর্তী 'বারাঙ্গনা' নদীর ধার দিয়ে পূর্ববঙ্গে যাবার সময় গৌরহরি লোকনাথের খোঁজ করলেন। পদ্মনাভ হাতে চাঁদ পেয়ে গৌরাঙ্গকে ঘরে ডেকে নিল। দিন কয়েক সযত্নে অতিথিসংকার করল। তারপর লোকনাথকে গৌরাঙ্গের সঙ্গী করে দিল।

প্রভুর পূর্ববঙ্গবিজয়ের সহচর লোকনাথ। তারপর পর্যটন শেষে যখন

নবদ্বীপে ফিরলেন লোকনাথকে বললেন, ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো।

লোকনাথ ঘরে ফিরল বটে কিন্তু সব সময়ে উদাস ভাব, অনুরাগময়ী উৎকণ্ঠাদশা। ইতিমধ্যে পিতা-মাতার লোকান্তর হল। ঘরে আর মন টিকল না, নবদ্বীপে চলে এল লোকনাথ।

এসে বুঝল প্রভু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সন্ন্যাস নেবেন। প্রভুর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল লোকনাথ—তোমার চাঁচর চিকুরের কী হবে?

গৌরহরি বললেন, তুমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলে যাও। আমিও যাচ্ছি।

লোকনাথের দ্বিরুক্তি নেই, সে বৃন্দাবনে চলল। গদাধরের শিষ্য ভূগর্ভ গোস্বামী বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

দুই ভক্ত, লোকনাথ আর ভূগর্ভ, পদব্রজে শ্রীব্রজে উপনীত হল। এসে দেখল গৌরভক্তদের মধ্যে শুধু সুবুদ্ধি রায়ই বৃন্দাবনে প্রথম সমাগত। কিন্তু বৃন্দাবনে প্রভু আসছেন কই, তিনি কবে আসবেন? তাঁর সঙ্গে মিলবে বলেই তো তাদের বৃন্দাবনে আসা।

শুনল প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে চলে গিয়েছেন, সেখান থেকে গিয়েছেন দক্ষিণ-বিজয়ে। সাক্ষাৎদর্শনের আশায় লোকনাথ দক্ষিণে যাত্রা করল। দাক্ষিণাত্যে গিয়ে শুনল প্রভু নীলাচল হয়ে বৃন্দাবনের দিকে গিয়েছেন। লোকনাথ বৃন্দাবনে ফিরে গেল। ফিরে এসে শুনল প্রভু বৃন্দাবনবিজয় শেষ করে প্রয়াগে প্রয়াণ করেছেন।

লোকনাথ স্থির করল প্রয়াগে যাবে। সাক্ষাৎদর্শন ছাড়া এ বিরহযন্ত্রণা শান্ত হবে না।

রাত্রে প্রভুকে স্বপ্ন দেখল লোকনাথ। প্রভু বললেন, তুমি বৃন্দাবনেই থাকো, এখেনেই ভজন করো।

স্বপ্নাদেশকে সাক্ষাৎ-আদেশ বলে মানল লোকনাথ। বৃন্দাবন ছেড়ে এক পা-ও আর বাইরে গেল না। দুর্গম প্রদেশে শুধুই ঘুরে বেড়াতে লাগল—কোথায় কৃষ্ণ—গেল না তার বিরহের কাতরতা। এমন দুর্বার বৈরাগ্য কেউ আর কখনো দেখে নি, এমন নিষ্কিঞ্চনতা। আকৌমার ব্রহ্মচারী, ফলমূলের বেশি কিছু খায় না, থাকে বৃক্ষতলে। সুবুদ্ধি রায় আছে মথুরায়, কেশবদেবের মন্দিরের কাছে, আর লোকনাথ আছে ছত্রবনের কাছে উমরাও গ্রামের কিশোরীকুণ্ডের ধারে। প্রবল বর্ষাই হোক বা দুর্দান্ত শীতই হোক, বৃক্ষতল ছাড়া কোথাও আশ্রয়ভিক্ষা করে না, গায়ে জীর্ণ একখানি কাঁথা, জীর্ণতর

বহির্বাস। গ্রামবাসীরা ছোট একটি কুটির নির্মাণ করে দিতে চাইল, কিন্তু লোকনাথ রাজী হল না। আমি সর্বক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধান করছি, কুটিরে স্থায়ী হয়ে বসবাস করি এমন সাধ্য কী!

কিন্তু যদি একটি অন্তত বিগ্রহ পেতাম তার সেবা করে আমার কৃষ্ণ না পাওয়ার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ লাঘব হত। লোকনাথ উৎকণ্ঠিত হয়ে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন কে একজন নির্জনে তার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকনাথের হাতে একটি যুগল বিগ্রহ দিয়ে বললে, এই নাও, এই বিগ্রহের সেবা করো।

এ বিগ্রহের নাম কী?

রাধাবিনোদ। বলে সেই লোক অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এ বিগ্রহ কে দিয়ে গেল? কোথাকার বিগ্রহ? কোনখান থেকে নিয়ে এল একে!

তখন বিগ্রহই কথা কয়ে উঠল। বললে, আমি এই কিশোরীকুণ্ডেই বাস করি। তোমার উৎকণ্ঠা ও আকুলতা দেখে নিজেই নিজেকে প্রকট করেছি। আমাকে আবার কে আনবে? কেন, আমি নিজে তোমার কাছে চলে আসতে পারি না?

আনন্দে লোকনাথ কাঁদতে লাগল। ভাবল এ শুধু প্রভুর কৃপা।

কিন্তু তোমার কান্না দেখবার আমার সময় নেই। আমি ক্ষুধার্ত। বললে বিগ্রহ, আমাকে শীগগির কিছু খেতে দাও।

গাছতলায়ই রান্না করল লোকনাথ। খেতে দিল বিগ্রহকে। ভোগ-রাগের পর পুষ্পশয্যায় শুইয়ে দিল। বন্যপল্লবে বাতাস করল খানিকক্ষণ, পদসেবা করল। কিন্তু উত্থানের পর একে রাখি কোথায়?

বৃক্ষতলে বাস, বৃক্ষের কোটরে রাখল। কিন্তু যখন ভিক্ষায় বেরুব তখন একে কে দেখে? লোকনাথ একটি ঝোলা তৈরি করল, সেই ঝোলার মধ্যেই রাখল বিগ্রহকে। সেই ঝোলাই রাধাবিনোদের মন্দির। সেই ঝোলাই কণ্ঠমালার মত বুকে ঝুলিয়ে রাখল সর্বক্ষণ।

ক্রমে ক্রমে গোস্বামীরা আসতে লাগল বৃন্দাবনে। রূপ সনাতন গোপাল ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট। বৃন্দাবন কৃষ্ণখ্যাতিতে মুখর হয়ে উঠল।

এল নরোত্তম দত্ত। নরোত্তমই লোকনাথের একমাত্র শিষ্য।

বৃন্দাবন যাবার উদ্দেশে গৌরহরি যখন কানাইর নাটশালায় পৌঁছোন

তখন একদিন কীর্তনে নৃত্য করতে করতে আচম্বিতে 'নরোত্তম' নাম ধরে ডাকতে শুরু করেন। কে নরোত্তম? এখনো জন্মগ্রহণ করে নি, পরে করবে।

পদ্মাতীরে গড়েরহাটে নিত্যানন্দকে নিয়ে এলেন গৌরহরি। সেখান থেকে কুতুবপুরে। পদ্মায় স্নান করে তীরে কীর্তন আরম্ভ করলেন। পদ্মাবতীকে বললেন, আমি আর নিত্যানন্দ তোমাকে প্রেম দিয়ে যাচ্ছি, যত্ন করে এ প্রেম তুমি গোপন করে রাখো। নরোত্তমই এই প্রেমের পাত্র। সে এলে তাকে এই প্রেম দিও।

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলে, নরোত্তমকে চিনব কী করে?

যার স্পর্শে তুমি বেশি উচ্ছল হবে, বুঝবে সেই নরোত্তম। 'যাহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা। সেই নরোত্তম, প্রেম তাঁরে তুমি দিবা।'

কিশোরবয়স্ক নরোত্তম স্বপ্ন দেখল নিত্যানন্দ তাকে বলছেন, যাও, পদ্মাবতীর স্থানে তোমার জন্যে যে প্রেম গচ্ছিত আছে তাই নিয়ে এস।

প্রভাতে একাকী পদ্মাতীরে চলে এল নরোত্তম। স্নান করতে নদীতে নেমেছে, নদী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তখন গৌরাঙ্গের কথা মনে করে পদ্মাবতী নরোত্তমকে প্রেম দিলে। প্রেম পেয়ে নরোত্তমের গায়ের রঙ বদলে গেল, শ্যামবর্ণ গৌরবর্ণ হল। নরোত্তমের মনে হল এক গৌরবর্ণ শিশু তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। দিনে দিনে তার প্রেমব্যাধি বাড়তে লাগল, পরিশেষে একদিন গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করে চলে এল বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে এসে নরোত্তম লোকনাথের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হল। বললে, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন।

লোকনাথ প্রথমে রাজী হয় নি। কিন্তু শুধু সেবাভক্তির মূল্যে নরোত্তম গুরুকৃপা ক্রয় করে নিল।

রঘুনাথ দাসের মত নরোত্তমও ধনীর দুলাল। ইচ্ছে করলে সে তো অনায়াসে ভোগবিলাসে ডুবে থাকতে পারত। কিন্তু সমস্ত রাজৈশ্বর্য ঠেলে ফেলে দূর-দুর্গম বৃন্দাবনে সে কী কঠোর কৃচ্ছ্রে কালাতিপাত করছে। যদি গুরুকৃপার সৌভাগ্য তার অদৃষ্টে থাকে।

লোকনাথের দুয়ারেই নরোত্তম পড়ে থাকে। শিক্ষা নেয়, প্রসাদ নেয়, কিন্তু কিছুতেই দীক্ষামন্ত্র পায় না।

লোকনাথ দেখল প্রত্যূষে তারও শয্যাত্যাগ করবার আগে নরোত্তম

উঠেছে, উঠে লোকনাথের জন্যে শৌচ-মৃত্তিকা প্রস্তুত করছে। অন্ধকার তখনো ভালো করে কাটে নি, আরেকদিন লোকনাথ দেখল অনুদয়ে অঙ্গনে ঝাঁট দিচ্ছে নরোত্তম। লোকনাথের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল। বললে, তোমার হৃদয়ে জগৎগুরু প্রবেশ করেছেন, যে প্রেমের জন্যে মানুষ ভজনা করে সেই প্রেমে তুমি ভরপুর, তোমার কি আর গুরুর প্রয়োজন আছে ?

তবু নরোত্তমকে দীক্ষামন্ত্র দিল লোকনাথ। শিখিয়ে দিল যাবতীয় উপাসনা-রীতি। তারপর একদিন শ্রীবাসের হাতে সঁপে দিল গৌড়ে-উৎকলে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করবার জন্যে। নিজে আর বৃন্দাবন ছাড়ল না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বললে, তোমার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আমার বিষয়ে যেন কিছু লেখা না হয়।

নামাকাঙ্ক্ষাহীন লোকনাথ ভজন-আনন্দে শতাধিক বছর বেঁচে ছিল। ব্রজমণ্ডলের খদির বনে ভজন করতে করতে শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করল।

। ৬৬ ।

সুবুদ্ধি রায়

প্রকৃত নাম সুবুদ্ধি ভাদুড়ি, পিতা শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি।

সুবুদ্ধি এককালে গৌড়ের অধিকারী ছিল, তার অধীনে চাকরি করত হুসেন শা। হুসেন শাকে সুবুদ্ধি দীঘি খনন করবার ভার দিল। কাজে ছিদ্র পেয়ে হুসেন শাকে চাবুক মারল সুবুদ্ধি। পিঠের আঘাত এত গভীর হল যে ঘা শুকোলেও দাগ মিলিয়ে গেল না।

কালক্রমে হুসেন শা গৌড়ের নবাব হয়ে বসল। প্রথম-প্রথম সুবুদ্ধিকে সে অনেক সম্মান দেখাল, করল অনেক পরিতোষ। কিন্তু একদিন হুসেন শার স্ত্রী দেখতে পেল সেই খোলা পিঠের কালো দাগ। স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, এ দাগ কিসের ?

সুবুদ্ধি রায় একবার মেরেছিল। হুসেন শা আর ঢেকে রাখতে পারল না।

কী মেরেছিল ?

চাবুক।

সব শুনে স্ত্রী মরীয়া হয়ে উঠল : তুমিও সুবুদ্ধি রায়কে মারো।

প্রহার করব ?

না, বধ করবে। একেবারে মেরে ফেলবে।

হুসেন শা বললে, তা পারব না। সুবুদ্ধি রায় আমার পূর্ব মনিব, আমার পালনকর্তা, পিতৃতুল্য। তাকে প্রাণে মারা অধর্ম হবে।

তা হলে জাতে মারো।

জাতে মারলেও সে প্রাণে বাঁচবে না।

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই নিবৃত্ত হল না। স্বামীকে দিবারাত্রি উত্তেজিত, উত্যক্ত করতে লাগল।

সুবুদ্ধি রায়কে ডেকে এনে তার মুখে করোয়ার জল ঢেলে দিল হুসেন শা।

সুবুদ্ধি রায়ের জাত গেল। কাশীতে এসে পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইল। কেউ বললে তপ্ত ঘি খেয়ে প্রাণত্যাগ করাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। কেউ বললে, নিজের ইচ্ছায় তো আর জল খায় নি, ও অবস্থায় অতবড় শাস্তি অবিধেয়। কী করে, কোথায় যায়, সুবুদ্ধি অস্থিরচিত্তে দিন কাটাতে লাগল।

এমন সময় বৃন্দাবনের পথে কাশীতে মহাপ্রভু এলেন।

সুবুদ্ধি তাঁর কাছে গিয়ে সুবুদ্ধি চাইল।

প্রভু বললেন, নিরন্তর হরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। তুমি বৃন্দাবনে যাও। অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্তন করো। এক নামাভাসেই তোমার পাপদোষ যাবে আর নাম হতেই পাবে কৃষ্ণচরণ।

হরিনাম পরমপাবন। অশুচিকে শুচি করে, অতীর্থকে তীর্থ করে। হেলায়-অশ্রদ্ধায় এমন কি বাক্য-পূরণেও নমোচ্চারণ করলে ফল হয়।

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥

শুধু নামে নয়, নামাভাসেও হবে। রত্ন যেখানেই রাখো, সিন্দুকেই হোক বা ছাইয়ের গাদায়ই হোক, তার সমান মূল্য। পুরো নাম তো বটেই, নাম-বদ্ধ নামের অক্ষরগুলোও অপ্রাকৃত চিন্ময়। তাই নামের মত নামাভাসেও প্রচণ্ড শক্তি। শূকরের দাঁতে আহত হয়ে যবন 'হারাম' 'হারাম' বলে ডেকে

মুক্তি পেয়েছিল। বলছে শূকর, ডাকা হচ্ছে রামকে। একেই বলে নামাভাসে মুক্তি। নামাভাসেরই যদি এত শক্তি তাহলে স্পষ্ট নামোচ্চারণ যে প্রত্যক্ষ ফল দেবে তাতে আর কার সন্দেহ? নামের উচ্চারণ যদি অশুদ্ধ হয়, এমন কি অসম্পূর্ণও হয়, কিছু এসে যাবে না, ঐ ভ্রমে ও ন্যূনতায়ও নামপ্রভাব অম্লান থাকবে। সমস্ত প্রারব্ধ পাপের নাশও এই নামেই। আর নাম ও নামী অভিন্ন বলে নামীর যেমন মহিমা, নামেরও তেমনি।

সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করল। প্রয়াগ অযোধ্যা হয়ে পৌঁছুল নৈমিষারণ্যে। সেখান থেকে মথুরায়। মথুরায় এসে শুনল প্রভু ব্রজভূমি দর্শন করে ফিরে গিয়েছেন। আরেকবার দেখা হবে ভেবেছিল, হল না।

কী করে জীবিকানির্বাহ করবে সুবুদ্ধি? জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ এনে বাজারে বিক্রি করতে লাগল। কাঠ আনে কী করে? দড়ি দিয়ে বেঁধে, কাঁধে বয়ে। বেচে পায় কত? এক বোঝা মাত্র পাঁচ পয়সা, খদ্দের সদয় হলে, ছয়। তার থেকে এক পয়সা দিয়ে চানা-চাবানা কিনে নিজে খায় আর বাকি পয়সা বেনের দোকানে জমিয়ে রাখে। সে পয়সায় গরিব দুঃখী সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করে। আর যদি সে বাঙালি বৈষ্ণব হয় তাহলে তার জন্যে গায়ে মাখবার তেল কেনে, শুখা রুটির বদলে দুটি ভাতের যোগাড় দেখে। নিজের জন্যে কিন্তু শুকনো চানার বেশি নয়, না, কখনো নয়।

যে সুবুদ্ধি একদিন অধিকারী ছিল, কত তার দাসদাসী, কত তার ভোগের উপকরণ, সে আজ কিনা এক পয়সার চানা খেয়ে দিন কাটায়। প্রভুর কৃপায় সে বৈরাগ্য-ভূষণ হয়েছে। পরাপেক্ষা নেই, নিজেতেই নিজের নির্ভর, নেই বিন্দুমাত্র অপ্রসাদ। যেটুকু সঞ্চয় সেটুকুও নিজের ভোগের জন্যে নয়, কাঙাল বৈষ্ণবের সেবার জন্যে।

রূপ ও অনুপম মথুরায় এলে সুবুদ্ধি রায় দেখা করতে গেল। দুই ভাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল দ্বাদশবন। কিন্তু মাসখানেকের বেশি তারা থাকতে পারল না, সনাতন কাশীতে আছে খবর পেয়ে চলল কাশী। গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়ে প্রভু গিয়েছেন শুনে তারা সেই পথ ধরল। আর সনাতনের বৃন্দাবনযাত্রা সটান রাজপথ দিয়ে। তাই কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হল না। প্রয়াগে পৌঁছে রূপ ও অনুপম খবর পেল সনাতন মথুরায় গিয়েছে আর সনাতন মথুরায় পৌঁছে জানল যদিও রূপ-অনুপম মথুরায়ই ফিরেছিল, তারা এখন প্রয়াগে।

সনাতনকে পেয়ে সুবুদ্ধির আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু কঠোর তপস্বী মহাবিরক্ত সনাতনের দেহসুখে স্পৃহা নেই, তাই সুবুদ্ধির স্নেহ-ব্যবহার তার কাছে লোভনীয় নয়। সে তীব্র বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, কী হবে তার দেহস্বাচ্ছন্দ্যে?

বৃন্দাবনে পরে যে আনন্দনিকেতন গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তির প্রথম প্রস্তর সুবুদ্ধি রায়।

॥ ৬৭ ॥

রামনামী বিপ্র

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু সিদ্ধবটে এসেছেন। সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে দেখলেন রঘুনাথকে।

মুখে নিরন্তর রামনাম, এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়াল যুক্তকরে। কৃপা করে আমার ঘরে যদি ভিক্ষা পান—ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করল সবিনয়ে।

রামনাম ছাড়া অন্য কথা বলে না, ব্রাহ্মণে আকৃষ্ট হলেন প্রভু। তার ঘরে অতিথি হয়ে রাত কাটালেন।

পরদিন চললেন আরো দক্ষিণে। স্কন্দ-ক্ষেত্রে এসে স্কন্দ দর্শন করলেন। ত্রিমঠে এসে দেখলেন ত্রিবিক্রমকে।

ফিরে এলেন সিদ্ধবটে। সেই রামভক্তের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এ কী, ব্রাহ্মণ দেখি এখন নিরন্তর কৃষ্ণনাম বলছে!

এ তোমার কী রকম হল? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, আগে তুমি সর্বদা রামনাম করতে, এখন হঠাৎ কৃষ্ণনাম বলতে শুরু করেছ কেন?

ব্রাহ্মণ বললে, প্রভু, তোমার দর্শনপ্রভাবে আমার আজন্মের স্বভাব দূর হল। আমি বাল্যকাল থেকে রামনাম করছি, তোমাকে দেখে কেন কে জানে একবার কৃষ্ণনাম মনে এল। মনে আসতেই জিভে এল, আর বিনা চেষ্টায়ই বারে-বারে স্ফুরিত হতে লাগল। শাস্ত্রমতে রামও পরব্রহ্ম, কৃষ্ণও পরব্রহ্ম, কিন্তু শাস্ত্রই বলছে রামনামের চেয়ে কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য বেশি। তবু আমি যে রামনাম করতাম তার কারণ রাম আমার ইষ্টদেব, কিন্তু তোমাকে

দেখে যখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কৃষ্ণনাম মুখে এসে গেল, তখনই বুঝলাম সে নামের কী মহিমা।

প্রভু হাসতে লাগলেন।

তুমিই সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। সকলকে, এমন কি নিজেকে যিনি আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। যিনি জীব-হৃদয় কর্ষণ করে ভক্তির বীজ বোনেন তিনিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই নিত্য আনন্দের উৎস। কৃষ্ণই সুখস্বামী।

॥ ৬৮ ॥

প্রকাশানন্দ সরস্বতী

কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী। প্রভূত প্রতাপ ও প্রতিপত্তিশালী। কয়েক হাজার শিষ্যের গুরু।

বৃন্দাবনের পথে কাশীতে এসেছেন গৌরাঙ্গ। উঠেছেন তপন মিশ্রের বাড়িতে।

এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হল। প্রভুর রূপ আর প্রেম দেখে চমৎকার মানল।

সোজা চলে গেল প্রকাশানন্দের কাছে। তাঁকে এ খবর না দিলেই নয়।

প্রকাশানন্দ শিষ্যদের বেদান্ত পড়াচ্ছে, ব্রাহ্মণ এসে বললে, শুদ্ধকাঞ্চনবর্ণ এক সন্ন্যাসী দেখে এলাম। প্রকাণ্ড শরীর, আজানুলম্বিত বাহু, কমলনেত্র, সর্ব অঙ্গে ঈশ্বরের সৎলক্ষণ। নরদেহে নারায়ণ বলে মনে হয়। আর এমন অদ্ভুত, যে তাকে দেখে সেই কৃষ্ণ-কীর্তন শুরু করে।

প্রকাশানন্দ অবজ্ঞার হাসি হাসল।

ব্রাহ্মণ আরো বললে, মহাভাগবতের সমস্ত লক্ষণ তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট। তাঁর মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, দুই চোখে নিরন্তর অশ্রু। কখনো হাসেন, নৃত্য করেন, কখনো বা রোদন করেন আর্তস্বরে। আবার কখনো বা সিংহের মত হুঙ্কার করে ওঠেন। নাম শুনেছেন? নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শুনেছি। প্রকাশানন্দ উপহাস করে উঠল : গৌড়দেশে নতুন এক ভাবুক

সন্ন্যাসী উঠেছে। কিন্তু আসলে সে প্রতারক। চৈতন্য নাম ধরে দেশে-দেশে লোক নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। কেশব ভারতীর শিষ্য বলে শুনেছি। কিন্তু তার আসল বিদ্যা সম্মোহন-বিদ্যা, তারই প্রভাবে যে তাকে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, তাকে ঈশ্বর বলে বিবেচনা করে।

বলেন কী! অদ্বৈত বেদান্তে মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য পর্যন্ত বশীভূত হয়েছেন। মায়াবাদ ছেড়ে ভক্তিপথ ধরেছেন।

সার্বভৌম পাগল হয়েছে বলে তোমার চৈতন্য মহৎ হয় না। প্রকাশানন্দ শাসন করে উঠল: কাশীপুরে তার ভাবুকালি বিকোবে না। ঐ প্রতারকের কাছে যেও না, এখানে বসে বেদান্ত শোনো।

ব্রাহ্মণ সেখানে আর বসতে পারল না। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে উঠে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত প্রকাশানন্দ প্রভুকে উচ্ছৃঙ্খল বললে।

উচ্ছৃঙ্খল নিন্দার্থে স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু প্রশংসার্থে অ-পরতন্ত্র, স্বেচ্ছাধীন। ভগবানই তো স্বতন্ত্র, সর্বস্বাধীন। সেই অর্থে প্রভু উচ্ছৃঙ্খল নয় তো কী।

ব্রাহ্মণ প্রভুর কাছে গিয়ে প্রকাশানন্দের কথা বললে। বললে, আপনার নিন্দা করবার উদ্দেশে আপনার নাম বলতে গিয়ে 'চৈতন্য' বললে, কৃষ্ণচৈতন্য বললে না। তিন-তিনবার চৈতন্য উচ্চারণ করল কিন্তু একবারও কৃষ্ণনাম তার মুখে এল না। কিন্তু তোমাকে দেখামাত্র আমার মুখে কেবলই কৃষ্ণ-কৃষ্ণ আসছে। এর কারণ কী?

ও যে মায়াবাদী, কৃষ্ণে অপরাধী। বললেন প্রভু, ওর মুখে কৃষ্ণনাম আসবে না। ও কেবল ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য বলবে। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণনাম এক বস্তু। যার কৃষ্ণে অপরাধ তার জিহ্বায় নামস্ফুরণ হবে কী করে? নাম নামী আর বিগ্রহ তিনই এক, তিনই চিন্ময়। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা তা গ্রাহ্য নয়। তাই ব্রহ্মজ্ঞানীর লীলারসের আনন্দে অধিকার নেই। ব্রহ্মানন্দের চেয়ে কৃষ্ণলীলার আস্বাদনে আনন্দ বেশি। কিন্তু তোমায় বলি, লীলারসের শক্তি এত প্রবল যে ব্রহ্মজ্ঞানীকেও আকর্ষণ করে আত্মবশ করে তোলে।

বুঝেছি বহির্মুখ বলেই প্রকাশানন্দের মুখে কৃষ্ণনাম এল না।

আমি আর তবে কী করব! বললেন প্রভু, আমার ভাবুকালির গ্রাহক যখন এখানে নেই তখন এখানে আর বিকোব কী। ভারী বোঝা নিয়ে এসেছিলাম, সেই ভারী বোঝা বয়ে নিয়েই আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যদি অল্পস্বল্পও মূল্য পেতাম এখানেই বেচে যেতাম।

ব্রাহ্মণ শুধু ভাবছে কোনো উপায়ে যদি প্রভুকে একবার মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সামনে নিয়ে যেতে পারতাম! ভগবান কি কৃপা করে সেই সুযোগ এনে দেবেন না? যদি ওদের প্রভুসাক্ষাৎ না হয়, ওরা তবে চিরদিনই প্রভুর নিন্দে করে বেড়াবে। তা হলে আমার কাশীবাস তো অনন্ত যন্ত্রণা!

বৃন্দাবন থেকে প্রভু যখন কাশীতে ফিরলেন তখন চন্দ্রশেখর আর তপন তাঁকে ধরল: প্রভু, মায়াবাদীদের মুখে তোমার নিন্দা আর শুনতে পারি না। বলে, বেদান্ত পড়ে না, শুধু ভাবের বন্যায় ভাসে। সন্ন্যাসী কখনো নৃত্য-গীতে মত্ত হয় এমন কথা তো শুনিনি।

প্রভু হাসলেন। নিন্দা-অপবাদ গ্রাহ্য করলেন না। প্রতিবাদ নেই, মনক্ষোভ নেই। উদাসীন হয়ে বসে রইলেন।

কিন্তু ভক্তদুঃখের খণ্ডন করবেন তো? তাঁর নিন্দা শুনে ভক্তদের যে দুঃখ হচ্ছে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিকার কোথায়?

মহারাষ্ট্রী বিপ্র প্রভুর চরণে এসে নিবেদন করল: আপনার কাছে এক বস্তু ভিক্ষা করতে এসেছি।

কি?

আমি জানি আপনি সন্ন্যাসীসঙ্গ করেন না, তবু আমি প্রার্থনা করছি আমার বাড়িতে একবার চলুন।

তোমার বাড়িতে কী?

নিমন্ত্রণ। আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

প্রভু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে মায়াবাদীরাও আসবে বুঝি?

হ্যাঁ, তাদেরও নিমন্ত্রণ করেছি। ব্রাহ্মণ আকুলকণ্ঠে বললে, শুধু তোমার কৃপার উপর নির্ভর করে তাদের ডেকেছি। কৃপা করে তুমিও রাজী হও। একবার ওরা তোমাকে দেখুক। তোমার করুণার ওরাও অংশ নিক।

প্রভু রাজী হলেন। বললেন, চলো।

সকলে বুঝল সন্ন্যাসীদের কৃপা করবেন বলেই তাঁর এই ভঙ্গি।

নির্ধারিত দিনে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে উপস্থিত হলেন। দেখলেন সন্ন্যাসীরা আগে থেকেই সমবেত হয়েছে। প্রকাশানন্দকে মাঝে নিয়ে বসেছে গোল হয়ে। সবাই এক-একজন গর্বের পর্বত।

প্রভু দূর থেকে সন্ন্যাসীদের নমস্কার করলেন এবং পা ধুয়ে সেই পা-ধোবার জায়গাতেই বসে পড়লেন।

সন্ন্যাসীরা তাঁকে দেখেও দেখল না। অভ্যর্থনা করল না।

প্রভু ভাবলেন, একটু ঐশ্বর্য প্রকাশ করা যাক। নইলে ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না।

প্রভুর অঙ্গ তেজোময় হয়ে উঠল, আলো হয়ে গেল চারদিক।

সন্ন্যাসীরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দলপতি প্রকাশানন্দ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, শ্রীপাদ, আপনি ঐ অপবিত্র স্থানে, ঐ পা-ধোবার জায়গায় বসে আছেন কেন? আপনার কিসের দুঃখ?

প্রভু বললেন, আমি হীন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়েছি, আপনাদের সভায় বসতে আমার যোগ্যতা নেই।

প্রকাশানন্দ প্রভুর হাত ধরে সসম্মানে সভায় এনে বসাল। জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি কেশব ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য?

প্রভুকে দেখামাত্রই প্রকাশানন্দের মধ্যে কিছু ভাবান্তর ঘটল বোধ হয়। প্রকাশানন্দ বললে, শত হলেও তুমি সন্ন্যাসীই, আছও এই কাশীতে, তবে আমাদের সঙ্গ কর না কেন? আর সন্ন্যাসী হয়ে নাচ-গান করা কি শোভা পায়? সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে ধ্যান আর বেদান্তপাঠ, তা না করে ভাবুকের আচরণ করো কেন? তোমার ঐশ্বর্য দেখে মনে হয় তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, কিন্তু এই হীনাচার করার অর্থ কী?

প্রভু নম্রস্বরে বললেন, আমি মূর্খ, আমার গুরুদেব আমাকে শাসন করে বললেন, তোমার বেদান্তে অধিকার নেই, তুমি শুধু কৃষ্ণমন্ত্র জপ করো। এই কৃষ্ণমন্ত্রই সমস্ত বেদান্তের সার।

কৃষ্ণমন্ত্র?

হ্যাঁ, কৃষ্ণমন্ত্রেই সংসারমোচন, কৃষ্ণমন্ত্রেই কৃষ্ণচরণপ্রাপ্তি। কলিকালে এই কৃষ্ণনাম ছাড়া আর ধর্ম নেই। কৃষ্ণনামই সমস্ত মন্ত্রের সার। বলে গুরু আমাকে একটি শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই শ্লোকটি শুনবে?

কী শ্লোক?

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে অন্য গতি নেই, হরিনামই একমাত্র গতি। প্রভু বললেন গাঢ়-স্বরে, গুরুর আদেশে তাই অনুক্ষণ নাম নিচ্ছি। নাম নিতে নিতে অন্য বিষয়ে আমার ভ্রান্তি জন্মেছে। পাগলের মত হয়ে গিয়েছি। শুধু হাসি কাঁদি নাচি

গাই, আমার সমস্ত জ্ঞান কৃষ্ণনামে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবকে অবস্থার কথা বললে তিনি বললেন, না, তুমি পাগল হওনি, কৃষ্ণনামের ফল যে প্রেম তুমি সেই প্রেম লাভ করেছ। এই প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ। আমার উপদেশ সফল হয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়েছি। তুমি অমনি নাচো গাও, ভক্তসঙ্গে কীর্তন করো, উদ্ধার করো সকলকে। গুরুবাক্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই আমি অহর্নিশ কীর্তন করে বেড়াই। কৃষ্ণনামের আনন্দসিন্ধুর কাছে ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদতুল্য।

প্রভুর মধুর কথা শুনে সন্ন্যাসীদের মন ফিরে গেল। কিন্তু প্রকাশানন্দ টলল না। বললে, তোমার প্রেমলাভ হয়েছে সে তো ভালো কথা, কিন্তু বেদান্তকে বাদ দাও কেন? নিজে পড়ে কিছু না বোঝো তো আমাদের কাছে এসেও শুনতে পারো। বেদান্ত শুনতে দোষ কী!

প্রভু মৃদু হাসলেন, বললেন, যদি অপরাধ না নাও, তবে কিছু বলি সবিনয়ে।

বলো। সন্ন্যাসীরা আকুল হয়ে উঠল: তোমার কথা শুনে মন-প্রাণ স্নিগ্ধ হয়, তোমার মাধুরীতে নয়ন সন্তোষ মানে। তোমার কথা অসঙ্গত হবে না।

প্রভু বললেন, বেদান্তসূত্র তো ঈশ্বরেরই বাক্য। নারায়ণই তো বেদব্যাস-রূপে এ ব্যক্ত করেছেন। তাই এর পঠনে-শ্রবণে দোষ নেই। আর ঈশ্বরের বাক্যে কোনো ভ্রম-প্রমাদ নেই, নেই বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনা করবার ইচ্ছা। না বা করুণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। নেই সাদাকে হলদে দেখবার দোষদৃষ্টি। মুখ্য অর্থ করুন, বেদান্ত ঠিক আছে, গৌণার্থেই যত অসঙ্গতি।

কেন, ব্যাখ্যা করুন।

সেব্য-সেবকের ভাবই ভক্তিমার্গের মূল। জীব আর ব্রহ্মে যদি অভেদ হয় তবে কে সেবক কে সেব্য, ভক্তি আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না। শঙ্করাচার্য তো জীব আর ব্রহ্মের অভেদত্বই প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা হলে ভক্তি আর রইল কোথায়? তবে শঙ্করের দোষ নেই, তিনি ঈশ্বরের আদেশেই মুখ্য অর্থকে গৌণার্থ দিয়ে আচ্ছন্ন করেছেন।

ঈশ্বরের আদেশে?

ভগবান মহাদেবকে আদেশ করলেন, স্বকল্পিত আগমশাস্ত্র দিয়ে মানুষকে তুমি আমার থেকে বিমুখ করো। আমাকে গোপন করো। সবাই যদি ভগবৎ-উন্মুখ হয় সৃষ্টি লোপ পাবে। শঙ্কর নিজেই তো মহাদেব, তাই মায়াবাদ

রচনা করে ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব গোপন করলেন। নইলে ধরুন ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ কী ?

আপনিই বলুন।

ব্রহ্ম অর্থ যিনি নিজে বড় হন ও যিনি অন্যকেও বড় করেন। বললেন প্রভু, তাই তিনি সর্বশক্তিমান। শক্তি না থাকলে অন্যকে বড় করবেন কী করে ? সর্ববৃহত্তম যে তত্ত্ব তাই ব্রহ্ম। তাঁর অসীমত্ব সর্বদিকে—স্বরূপে, শক্তিতে, প্রকাশবৈচিত্র্যে। বৃহত্তমতাকে কী বলবেন ? নিশ্চয়ই এটা গুণ। তাহলে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ। সচ্চিদানন্দময়। এ হেন ব্রহ্মকে শঙ্কর নিরাকার বলেন কী করে ? ভগবান অর্থই বিগ্রহময় বস্তু। শুধু উপাসনার সুবিধের জন্যেই রূপকল্পনা করা হয় নি—ব্রহ্মই নিত্যরূপ, সত্যরূপ, আনন্দরূপ।

কিন্তু, তার্কিকেরা প্রশ্ন করল, শ্রুতি তো নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেছে, তা কি মিথ্যে ?

না, সাকার ব্রহ্ম যেমন সত্য, নিরাকার ব্রহ্মও তেমনি সত্য। শক্তির অল্পতম বিকাশেই সাকার, ন্যূনতম বিকাশেই নিরাকার।

তা হলে দাঁড়াল কী ?

দাঁড়াল, শঙ্করের গৌণার্থে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, শক্তিশূন্য। তাঁর ধাম নেই, লীলা নেই, পরিকর নেই, এক তিল ঐশ্বর্য নেই।

আর আপনার মতে ?

মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সাকার, সবিশেষ, স্বশক্তিমান। তাঁর ধাম আছে, লীলা আছে, পরিকর আছে। ঐশ্বর্যের আনন্ত্য আছে।

আর ?

আর শঙ্কর বলছেন, সাকার ভগবান প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার। তাঁর মতে ভগবান মায়িক উপাধিবিশিষ্ট। যিনি নিজে মায়াময় তিনি অন্যকে কী করে মায়ামুক্ত করবেন ? নিজে শৃঙ্খলিত হয়ে কি অন্যকে শৃঙ্খলমুক্ত করা যায় ? যে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার সে তো সৃষ্ট বস্তু আর সৃষ্ট বস্তুমাত্রই ধ্বংসশীল। তা হলে ঈশ্বরও অনিত্য হয়ে দাঁড়ান। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বিরোধী। কেননা শ্রুতি বলছে ঈশ্বর নিত্য, অনিত্যের মধ্যে নিত্য। নিত্যোনিত্যানাম। ভগবানের দেহকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলে মানা চরমতম বিষ্ণুনিন্দা।

কিন্তু জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কী বলবেন ?

ঈশ্বর যদি প্রজ্বলিত অগ্নি, জীব তার স্ফুলিঙ্গের কণা। বললেন প্রভু,

চৈতন্যে বা স্বরূপে দুই অভেদ, কিন্তু পরিমাণে ভিন্ন—ঈশ্বর বিভু-বস্তু, জীব অণু-বস্তু। বিভু অণু হতে পারে কিন্তু অণু বিভু হতে পারে না। দুই-ই চিদ্বস্তু বলে এরা আবার বিভুতে-অণুতে ভিন্ন। ভেদ আর অভেদ একসঙ্গে। তেমনি জীবে-ব্রহ্মেও অভেদ থেকেও ভেদ আছে। যদি ভেদের কথা ভুলে যাই, তাহলে জীবের মনে হবে শক্তি-সামর্থ্যে আমি ঈশ্বরেরই সমতুল। ঈশ্বর যা করতে পারেন আমিও তা করতে পারি। এই ভাব ঈশ্বরমহত্ত্বকে খর্ব করে। সিন্ধু কি বিন্দুরূপে পরিচিত হবার যোগ্য? সে পরিচয়ে সিন্ধুর গৌরবের হানি হয়। তাই জীব ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম হতে পারে না।

আর জগৎ? তার্কিকেরা প্রশ্ন করল।

শঙ্কর বলছেন, জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নয়। জগৎ ব্রহ্মে ভ্রমমাত্র যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এটা গৌণার্থ। কিন্তু মুখ্যার্থে, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি—জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ঘট যেমন মৃত্তিকার পরিণাম।

তার্কিকেরা বললে, পরিণামবাদ যদি স্বীকার করেন, তাহলে ব্রহ্মকে বিকার্য বা বিকারশীল বলে মানতে হয়। কিন্তু আসলে ব্রহ্ম অবিকৃত। সুতরাং এ জগৎ ব্রহ্মে ভ্রমমাত্র—যেমন শুক্তিতে রৌপ্যভ্রম, মরুভূমিতে মরীচিকাভ্রম। তার মানে ব্রহ্মকেই আমরা জগৎ বলে ভ্রম করছি। এই ভ্রমবাদই আমাদের বিবর্তবাদ।

তার অর্থ বিবর্তবাদে এ জগৎ মিথ্যা বাস্তবসত্তাহীন। বললেন প্রভু, কিন্তু ভেবে দেখুন, দেহে আত্মবুদ্ধির জন্যেই এই বিবর্ত। অনাত্মদেহে আত্মভ্রমই বিবর্ত। আসলে ভগবান স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পরিণত হয়েও আবার অবিকারী। কারু আদেশে-অনুরোধে বা কোনো কর্মবশে ঈশ্বরের কার্য নয়, তাঁর ইচ্ছাই জগৎরূপে পরিস্ফূর্ত, এবং জগৎ হয়েও তিনি যে তিনি সেই তিনিই থেকে যাচ্ছেন। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

তত্ত্বমসি সম্বন্ধে কী বলবেন?

প্রভু বললেন, শঙ্করের মতে তত্ত্বমসিই মহাবাক্য। তত্ত্বমসি তো বেদের এক পরিচ্ছেদে একটি বাক্যমাত্র, তা প্রণবের মত বিশ্বব্যাপী নয়। একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য।

প্রণব?

হ্যাঁ, প্রণবই ওঙ্কার আর ওঙ্কারই ব্রহ্ম। দৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কার, অদৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কার। ওঙ্কারই সর্বাশ্রয়, সর্বব্যাপক। বেদেরও উৎপত্তি এই প্রণব

থেকে। আর তারই একটি উক্তি তত্ত্বমসি। তত্ত্বমসির অর্থ তো তুমি ব্রহ্ম নও—অর্থ, তুমি ব্রহ্মের। দেহাত্মবিশিষ্ট জীব নিজেকেই ঈশ্বর মনে করে আর উপাসনা করতে চায় না—কিন্তু তুমি যদি ব্রহ্মের হও তবে উপাসনা তোমার অবশ্য কর্তব্য। সহজ অর্থ ছেড়ে গৌণার্থ ব্যাখ্যা করেই যত অনর্থের সূত্রপাত। প্রভু তাকালেন সকলের দিকে।

সন্ন্যাসীরা বিস্ময় মানল। বললে, তুমি যে গৌণার্থ খণ্ডন করলে তাতে প্রতিবাদ করবার কিছু নেই। শুধু সাম্প্রদায়িকতার খাতিরেই আমরা শঙ্করের ব্যাখ্যাকে মর্যাদা দিই।

কিন্তু প্রকাশানন্দ সহজে হটবার পাত্র নয়। তার মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিসম্মত। তার উপলব্ধির জন্যে একমাত্র জ্ঞানযোগই প্রশস্ত। প্রভু দেখালেন সবিশেষ ব্রহ্মবাদ ও ভগবানের উপাসনাও শ্রুতিস্মৃতিসম্মত। আর কলিকালে সংসারজয় সন্ন্যাসে নয়, একমাত্র হরিনামে, ভক্তিতে। 'কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি।'

এই বাঙালি ভাবুক সন্ন্যাসী বলে কী?

শুধু কথার কথা বলে না, প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে বলে। তাই এমন সাধ্য নেই কেউ অতিক্রম করে। ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু সন্দেহ নেই আর এই ব্রহ্মই ভগবান। বহুবিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ। সেই ঈশ্বরকেই বন্দনা করি যিনি কমলনয়ন মেঘশ্যামল পীতবসন বনমালী। ভক্তিই সেই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। সর্ববেদের অভিধেয়। আর ভক্তি থেকে প্রেম, প্রেম থেকেই সেবাবাসনা। আর উপাসনা ছাড়া সেবা হয় কী করে? উপাসনার মন্ত্র কী? হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলিকালে এ ছাড়া আর গতি নেই। নেই, নেই, কিছুতেই নেই। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' তাই কলিকালে নামই একমাত্র সাধন।

কী ভাবে নাম করবে? তৃণ হতে নীচ হয়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে, নিজে সম্মান কামনা না করে, অন্য সকলকে সম্মান দেখিয়ে।

আর বুঝি বক্তাকে ঠেকানো গেল না। প্রকাশানন্দ বিচলিত হল। বিনয় করে বললে, তুমি বেদময় মূর্তি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। আগে যে নিন্দা করেছি তার জন্যে ক্ষমা চাই।

তাহলে এবার কৃষ্ণধ্বনি তোলো।

সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল।

মহারাষ্ট্রী বিপ্রের ঘরে সন্ন্যাসীদের মধ্যে বসিয়ে প্রভুকে ভিক্ষা করাল প্রকাশানন্দ। সমস্ত কাশী প্রভুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। যেখানে যান সেখানেই দারুণ জনতা। বিশ্বনাথের মন্দিরেই হোক বা গঙ্গায়ই হোক, হরিধ্বনি করেন প্রভু আর জনতা প্রতিধ্বনি তোলে।

একদিন পঞ্চগঙ্গাতে স্নান করে প্রভু বিন্দুমাধব দর্শনে গেলেন। মাধবের সৌন্দর্য দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে অঙ্গনে নাচতে লাগলেন। চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ, তপন আর সনাতনও কীর্তনে যোগ দিল। চতুর্দিক হতে কত লোক যে ছুটে এল তার লেখাজোখা নেই।

প্রেমোন্মত্ত হয়ে প্রভু গান ধরলেন : হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

হরি হরি। স্বর্গ-মর্ত্য ভরে মঙ্গলধ্বনি উঠল। প্রতিধ্বনি হল হাজার লোকের কণ্ঠে।

প্রকাশানন্দের আশ্রম মন্দির থেকে বেশি দূরে নয়। সে-নামধ্বনি শুনে প্রকাশানন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল। শিষ্যদের বললে, চলো দেখে আসি।

আর বুঝি এ ভাবুকের ভাবকালি নয়, এ 'কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ।' এ বুঝি প্রাণ ধরে টান মারা। 'চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়।'

কিন্তু এ কী দেখছে! প্রভু নৃত্য করছেন! শুধু কীর্তন নয়, নর্তন। অনন্ত-সৌন্দর্যের নিকেতন দেহভঙ্গিতে কী অনির্বচনীয় মাধুরী!

প্রকাশানন্দ আত্মহারার মত বলে উঠল : হরি-হরি। তার শিষ্যেরাও গর্জন করে উঠল : হরি-হরি।

প্রকাশানন্দ শুধু ধ্বনিত হল না, তার সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিকভাব ফুটে উঠল। শুধু তাই নয়, সে কাঁদতে লাগল দীনহীনের মত।

কাশীবাসীদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। যে-সব ব্যবহারকে চিরকাল বিদ্রূপ করেছে, ধিক্কার দিয়ে বেড়িয়েছে, নিজেই কিনা সেসব আচরণ করছে প্রকাশ্যে। এত বড় পণ্ডিত, গর্বে যে পর্বতাকার, তার এ কী দৈন্যচাপল্য! কোথায় তার গাম্ভীর্য, কোথায় তার বিরক্তি! এ যে দেখছি সে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে!

সত্যিই বুঝি সে আজ প্রকাশানন্দ। শুষ্ক জ্ঞানের কঠিন আবরণ সরিয়ে সে আজ ভক্তিতে প্রকাশিত, আনন্দে প্রকাশিত। সে আজ সার্থকনামা।

লোকসংঘট্ট দেখে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ফিরে এল। সন্ন্যাসীদের দেখে ভাব সংবরণ করলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ রাধাভাব, তাঁর হৃদয়ের গোপননিধি—এ সকলের সামনে অনাবৃত করবার নয়।

প্রকাশানন্দকে প্রণাম করলেন প্রভু। প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণযুগল ধারণ করল।

প্রভু বললেন, আপনি জগদগুরু, পূজ্যশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মের সমান, মায়াতীত। আর আমি অজ্ঞ, হীন, মায়াবদ্ধ। আপনার শিষ্যের শিষ্য। আমি আপনার প্রণামের যোগ্য নই। আপনি শ্রেষ্ঠ হয়ে আমার মত হীনজনকে যদি প্রণাম করেন, তাহলে আমার সর্বনাশ হবে। আপনি ব্রহ্মতুল্য বলে সমস্ত কিছু ব্রহ্মময় দেখছেন, তাই বলে লোকশিক্ষার ছলেও সকলকে বন্দনা করা উচিত নয়।

তোমাকে আমি আগে আগে অনেক নিন্দা করেছি, বললে প্রকাশানন্দ, তার থেকে মুক্ত হবার জন্যেই আমি তোমার চরণস্পর্শ করলাম। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান। আর ভগবৎচরণস্পর্শেই সমস্ত অপরাধের নিস্তার।

প্রভু বললেন, আমি ক্ষুদ্র জীব। জীবকে বিষ্ণু মনে করলে অপরাধ হয়। ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্তা আর রুদ্র যে সংহারকর্তা তাদেরকেই নারায়ণের সমান বলে মনে করলে অপরাধ হয়, আর জীব তো সামান্য কথা।

তুমি যে সাক্ষাৎ ভগবান তাতে সন্দেহ নেই, বললে প্রকাশানন্দ, তবু যদি জীবশিক্ষার জন্যে নিজেকে কৃষ্ণদাস বা ভগবানের ভক্ত বলে মনে করো, তা হলেও তুমি আমাদের চেয়ে বড়, আমাদের পূজনীয়। তোমাকে নিন্দা করেছি, ভক্তনিন্দাতেও জীবের সর্বনাশ ঘটে। সুতরাং সে অপরাধ সে সর্বনাশ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যেও তোমার চরণস্পর্শের প্রয়োজন।

কী বলছে ভাগবত ?

যারা মহৎ তাদের অবমাননায় মানুষের আয়ু শ্রী যশ সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়।

তোমার চরণস্পর্শে আমার নিন্দাপরাধ খণ্ডন হয়েছে বলে চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হবে। বললে প্রকাশানন্দ, তাই তো তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছি।

মহৎ কৃপা ছাড়া জীবের সংসারনিবৃত্তি নেই। সজ্জনসঙ্গতিই ভবার্ণবতরণের তরণী।

প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর ভাগবত নিয়ে আরো আলোচনা হল। শ্রুতিবাক্য আর ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে ভাগবতের ঐক্য প্রমাণ করলেন প্রভু।

ভাগবত আর বেদান্ত দুইই ব্যাসের রচনা—ভাগবতই বেদান্তের ভাষ্য। ভাগবতই সর্ববেদান্তসার। প্রকাশানন্দের অন্তরে প্রভু ভক্তি জাগিয়ে দিলেন, জাগিয়ে দিলেন আনন্দ। প্রকাশিত আনন্দের প্রতিমূর্তি বলেই প্রকাশানন্দ।

প্রভু বললেন, ভাগবতের প্রতি শ্লোকেই ভক্তি ব্যাপ্ত হয়ে আছে—শুধু ভাগবতই বিচার করো, তা থেকেই বেদ-উপনিষদের সার রহস্য বুঝতে পারবে।

কাশীবাসী সন্ন্যাসীরা ভাগবতচর্চায় মন দিল। আরম্ভ করল নামকীর্তন। বারাণসী দ্বিতীয় নবদ্বীপ হয়ে গেল।

প্রভু পরিহাস করে বললেন, কাশীতে আমি ভাবকালি বেচতে এসেছিলাম, শুনেছিলাম গ্রাহক নেই, বস্তু বিকোবে না এখানে। কিন্তু তাই বলে কি মাল আবার দেশে ফেরত নিয়ে যাওয়া চলে? মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ আর তপন মিশ্রকে লক্ষ্য করলেন: তোমাদের দুঃখ হল যে-বোঝা নিয়ে ফিরে যাব, তাই তোমাদের ইচ্ছায় সব উজাড় করে বিনামূল্যে বিলিয়ে দিলাম।

॥ ৬৯ ॥

কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী

কাশীশ্বর ঈশ্বর পুরীর শিষ্য আর গোবিন্দ অনুচর। মথুরায় যখন দেহ রাখছেন তখন ঈশ্বর কাশীশ্বরকে বললেন, নীলাচলে যাও, সেখানে গিয়ে চৈতন্যের সেবা করো। আর গোবিন্দকে বললেন, তুমি যাও, তুমি চৈতন্যের অঙ্গসেবক হও।

দাক্ষিণাত্য হতে ফিরেছেন প্রভু, গোবিন্দ প্রণাম করে সামনে দাঁড়াল।

আমি গোবিন্দ, ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য। তিরোধানকালে বলে দিলেন, নীলাচলে গিয়ে চৈতন্যের অঙ্গসেবা করো। তাই এসেছি। তাঁর আর এক সেবক কাশীশ্বর, তাকেও আপনার সেবায় নিযুক্ত করেছেন। সে পথে তীর্থ করছে। সেও শিগগির এসে পড়বে।

প্রভু বললেন, আমার প্রতি পুরীশ্বরের কী কৃপা, কী স্নেহ। তাঁর নিজের ভৃত্যকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু গোবিন্দ তো শূদ্র। সার্বভৌম কাছে ছিল, আপত্তি করল। শূদ্রের সেবা পুরীগোসাঁই অঙ্গীকৃত করলেন কী করে?

প্রভু বললেন, ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুল মানে না। বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ ভোজন করলেন। কৃষ্ণে শুধু ভক্তির অপেক্ষা। কিন্তু আমি ভাবছি, গোবিন্দ আমার গুরুর সেবক, মান্যপাত্র, তাকে দিয়ে অঙ্গসেবা করানো কি সঙ্গত হবে?

তখন সার্বভৌমই বললে, কিন্তু গুরুর আদেশ যে লঙ্ঘন করবার নয়।

ঠিক বলেছ। গোবিন্দকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। দিলেন তাকে অঙ্গসেবার অধিকার।

যথাদিনে কাশীশ্বর এসে পৌঁছুল। বিশালকায় বলবান পুরুষ।

গোবিন্দ তো প্রভুর গা-হাত-পা টিপবে, আহারের ব্যবস্থা করবে, যে যা দেবে তার ভার নেবে। কেউ দেখা করতে এলে তারও দেখাশোনা করবে। প্রভুর কিসে আরাম হবে এই দেখতে হবে সর্বক্ষণ। কিন্তু কাশীশ্বর করবে কী? প্রভু যখন জগন্নাথদর্শনে যাবেন তখন সে ভিড় সরিয়ে প্রভুর জন্যে পথ করে দেবে। তার দেহে সামর্থ্য আছে, দরকার হলে ঠেলাঠেলিতেও সে পেছপা হবে না।

তাই দিনের পর দিন করতে লাগল কাশীশ্বর। মনুষ্যগহনে প্রভুর যাত্রার পথ করে দেবার কাজ। এই, সরে যাও, পথ দাও, ছুঁয়ো না, গায়ে পোড়ো না, কথা শুনবে না তো ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেব।

কাশীশ্বরের আর কী কাজ?

ভক্তদের সঙ্গে প্রভু যখন ভোজনে বসেন তখন কাশীশ্বর পরিবেশন করে।

কাশীশ্বর প্রভুরই পরিবারের একজন হয়ে গেল।

প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কোড়ি চারি পণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন॥

প্রভু বললেন, হরিদাস্ ঠাকুরের কৃপাতেই আমি নামের মহিমা শিখেছি। আর কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছি গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গ করে।

গৌড়ীয় ভক্তদের নাম করলেন প্রভু। তার মধ্যে কাশীশ্বর একজন।

নবদ্বীপে নিমাইয়ের বাল্যলীলার সঙ্গী কাশীশ্বর। শ্রীবাসের কীর্তন আসরে, গঙ্গায় জলক্রীড়ায়, শ্রীধরের বাড়িতে, প্রভুর প্রকাশকালে সে উপস্থিত। তারপর গৌরহরি নীলাচলে চলে গেলে সেও চলে গেল বৃন্দাবনে। ঈশ্বর

পুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তারই সেবায় আত্মনিয়োগ করল তারপরে গুরুর আদেশে নীলাচলে এসে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ।

বৃন্দাবনে রূপগোস্বামী গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করল। প্রভুর কাছে সে সংবাদ পৌঁছুলে প্রভু কাশীশ্বরকে বৃন্দাবনে যেতে বললেন। প্রভুকে ছেড়ে যেতে কাশীশ্বরের মর্মান্তিক দুঃখ হল। প্রভু তাকে তাঁর 'নিজস্বরূপ বিগ্রহ' বলে একটি বিগ্রহ দিলেন আর বললেন, একে গৌরগোবিন্দ আখ্যা দিয়ে নিত্যসেবা কোরো।

কাশীশ্বর বৃন্দাবনকে আর প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। বললে, প্রভু, যেখানেই আমাকে রাখো, ভাবতে দিও তোমার চরণেই আমি আছি।

ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গে যুক্ত হল।

॥ ৭০ ॥

কাশী মিশ্র

উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ, রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু। তাই সহজেই অনুমেয় কত বড় মাননীয় ব্যক্তি।

শুধু রাজার রাজা নয়, জগন্নাথের সেবার অধ্যক্ষ। রাজা যখন শ্রীক্ষেত্রে থাকেন, প্রত্যহ গুরুর পা টিপে দেন ও জগন্নাথসেবার কী রকম ভিয়েন হল তাই শোনান।

এ হেন কাশী মিশ্র অবাক্যব্যয়ে প্রভুর চরণে শরণ নিল।

প্রভুর থাকবার জন্যে একটি নির্জন ঘর দরকার, সার্বভৌমের ইঙ্গিতে কাশী মিশ্র তার নিজের বাড়িতে স্থান করে দিল।

আমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে, আমার বাড়িতে প্রভু থাকবেন। শুধু গৃহ নয়, দেহ-মন-আত্মা সর্বস্ব কাশী মিশ্র প্রভুকে নিবেদন করে দিল।

প্রভু তাকে তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন। সত্যি কাশী মিশ্রের মত ভাগ্যবান আর কে আছে। তারপর তাকে আলিঙ্গন করে আত্মসাৎ করে নিলেন।

পরমানন্দ পুরী এসেছে—থাকবে কোথায়? প্রভু কাশী মিশ্রের বাড়িতেই

একটি নিভৃত ঘর ঠিক করে দিলেন। তারপর গৌড় থেকে হরিদাস ঠাকুর যখন এল তখন তার থাকবার জন্যে কাশী মিশ্রের আরেকটি কুটির চাইতে গেলেন প্রভু। কাশী মিশ্র বললে, আমার যা কিছু আছে সমস্ত তোমার। তুমি চাইবে কেন ? যা তোমার ইচ্ছে তুমি নিয়ে নেবে, দ্বিধা করবে না।

রথযাত্রার কদিন আগে প্রভু কাশী মিশ্রকে ডাকলেন। বললেন, গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনে অনুমতি চাই।

পড়িছা পাত্র আর সার্বভৌমকেও খবর দেওয়া হল। পড়িছা বললে, রাজার আদেশে তোমার সমস্ত ইচ্ছাই আমাদের কর্তব্য বলে ধার্য হয়েছে। সুতরাং মন্দির মার্জনা করতে চাও, যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু যাই বলো, মন্দির সাফ করবার কাজে তোমাকে মানায় না।

প্রভু নীরবে একটু হাসলেন।

বুঝেছি এ তোমার এক লীলা। শুধু তুমি নও, তোমার ভক্তেরাও এ প্রক্ষালনে অংশ নেবে। বেশ, তবে আদেশ করো, একশো ঘট আর একশো ঝাঁটা নিয়ে আসি।

মার্জন-লীলা শেষ হবার পর সরোবরে জলক্রীড়া হল। তারপর পাঁচশো ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হল। রামানন্দের ভাই বাণীনাথ প্রসাদ নিয়ে এল আর পরিবেশনের তদারক করল কাশী মিশ্র।

এক দিকে রাজা, আরেক দিকে প্রভু। দুদিকে সমান দায়িত্ব পালন করছে কাশী মিশ্র। দেহে কত শক্তি ও মনে কত আগ্রহ থাকলে এ সম্ভব তা কে বলবে। দক্ষতা ও চারুতাই যে কর্মোদযাপনের প্রাণ তা কাশী মিশ্রের চেয়ে বেশি আর কে জানে।

রথের উৎসবের সময় সাত সম্প্রদায় কীর্তন করছে—চার দল রথের সামনে দু' দল রথের দু-পাশে আর একদল রথের পিছনে। রাজা প্রতাপরুদ্র দেখতে পেল প্রভু সাত দলেই উপস্থিত আছেন, সাত দলেই বিলাস করছেন। অথচ প্রত্যেক দল ভাবছে, প্রভু শুধু আমারই গোষ্ঠীভুক্ত।

রাজা কাশী মিশ্রকে এ অপূর্ব দর্শনের কথা বললে।

কাশী মিশ্র বললে, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। তোমাকে সাক্ষাৎদর্শন না দিলেও দেখাচ্ছেন এই লীলা-বিলাস। তাঁর কৃপা বিস্ময়কর।

কাশী মিশ্র যে প্রভুর চতুর্ভুজ মূর্তি দেখল সেও তো প্রভুর অহেতুক করুণা।

তারপর জন্মাষ্টমীতে কাশী মিশ্র গোপবেশ পরল। সে একা নয়, পরল প্রতাপরুদ্র, তুলসী পড়িছা আর সার্বভৌম। স্বয়ং প্রভু এদের সঙ্গে নৃত্য করলেন। দুধ, দই আর হলুদ-জলে সকলের অঙ্গ ভিজে গেল।

রামানন্দের ভাই গোপীনাথ রাজার প্রাপ্য ধন দিচ্ছে না, তাই তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। আরেক ভাই বাণীনাথকেও বেঁধে নিয়েছে। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্যে প্রভুর কাছে অনুরোধ এল। প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, রাজাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবে, তারপর বিচারে দণ্ড হলে আমার কাছে নালিশ জানাবে! এ সব বিষয়-বার্তা আমি শুনতে পারব না, আমি শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে আলালনাথে চলে যাব।

তখন তাঁকে নিরস্ত করবার জন্যে কাশী মিশ্র মিনতি করতে বসল। তুমি ভুল বুঝছ কেন? গোপীনাথ তোমার কাছে বিষয়-আকাজ্ক্ষা করে না, সে তোমার অনন্যশরণ ভক্ত বলে তার সেবকেরা তার দুঃখের কথা তোমাকে জানিয়েছে। যে তোমাকে তোমার জন্যেই ভজনা করে সে তার দুঃখের দিনে তোমাকে জানাবে না তো কাকে জানাবে? ভয় নেই, তোমাকে কেউ বিষয়ের কথা বলবে না, তুমি এখানেই থাকো।

কাশী মিশ্র তখন রাজাকে গিয়ে ধরল। রাজা গোপীনাথের ঋণ মকুব করে দিল।

প্রভু আবার বিরক্ত হলেন। কাশী মিশ্রকে ডেকে বললেন, এ তুমি কী করলে? রাজার থেকে আমাকে তুমি দান নেওয়ালে?

কাশী মিশ্র আবার প্রভুকে বোঝাতে বসল। রাজা বলে দিয়েছে আপনি যেন মনে না করেন যে, আপনার দিকে তাকিয়ে রাজা তার দাবি ছেড়ে দিয়েছে। ভবানন্দের ছেলেরা তার প্রিয়পাত্র বলেই এই অনুগ্রহ।

ভবানন্দের ছেলেরা এসে প্রভুর পায়ে পড়ল। চরণস্মরণের ফল কী, পেয়ে গেল হাতে-হাতে।

প্রভু ভক্ত-বাৎসল্য প্রকট করলেন। থেকে গেলেন নীলাচলে।

যার যা ন্যায্য প্রাপ্য তাকে তা দেবে, সঙ্গত উপায়ে যা লাভ থাকে তা ধর্মকর্মে ব্যয় করবে, কদাচ অসদ্ব্যয় করবে না।

কাশী মিশ্র দুকূল বজায় রাখল। এক কূল রাজানুগত্য, আরেক কূল ঈশ্বরভক্তি। আর বুঝল কাকে বলে শুদ্ধভক্ত। 'সেই শুদ্ধ ভক্ত—তোমা ভজে তোমা লাগি। আপনার সুখদুঃখে হয় ভোগভোগী।'

প্রভুর তিরোভাবের সময় কাশী মিশ্র বর্তমান ছিল। শ্রীনিবাস যখন নীলাচলে এল তখন আর তাকে দেখা যায়নি।

॥ ৭১ ॥

রূপ গোস্বামী

রামকেলিতে প্রভুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই সনাতনের সঙ্গে-সঙ্গে রূপও আরেক রকম হয়ে গিয়েছে।

চাকরিতে আর স্পৃহা নেই। চাকরির ফলে বিস্তর পয়সা হয়েছে। বিষয়ত্যাগ না করলে মনে-প্রাণে ভজন করা অসম্ভব। কিন্তু এই বিষয় নবাব বাজেয়াপ্ত করুক এও অসহ্য।

সনাতনের সঙ্গে-সঙ্গে রূপও কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যাতে অচিরে চৈতন্যচরণ পেতে পারে।

নবাবের কাছে ছুটি চেয়ে ছুটি পেল রূপ। নৌকোতে ভরে অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে নিজের গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলার মাড়গ্রামে, এসে পৌঁছুল। এত ধন নিয়ে সে কী করে, কাকে দেয়? অর্ধেক দিয়ে দিল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সেবায়, বাকি অর্ধেকের অর্ধেক দিল আত্মীয়-কুটুম্বকে, আর অবশিষ্ট বিশ্বাসী এক ব্রাহ্মণের কাছে গচ্ছিত রাখল যদি রাজদণ্ডে জরিমানা দিতে হয়। সনাতনের জন্যে গৌড়ে এক মুদির দোকানে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছে।

নীলাচলে রূপ লোক পাঠাল প্রভু কখন বৃন্দাবন রওনা হন আমাকে খবর দেবে। আমি অপেক্ষা করছি।

রূপ সনাতনকে চিঠি লিখে পাঠাল: আমি আর অনুপম বৃন্দাবনে যাচ্ছি প্রভুর চরণবন্দন করতে। তুমি যেমন করে পারো চলে এস। মুদির কাছে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছি, তাই মুক্তিপণ দিয়ে বেরিয়ে এস কারাগার থেকে।

প্রয়াগে এসে শুনল প্রভু এখানে আছেন। শুনে আনন্দের তরঙ্গে ভাসতে লাগল। আর শুনল প্রভু চলেছেন বিন্দুমাধবদর্শনে। দু ভাই রূপ আর অনুপম চলল এগিয়ে। দেখল পথে লক্ষ লোকের জনতা। কেউ নাচছে,

গাইছে, কেউ-কেউ বা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে পথে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ভিড় থেকে দু ভাই সরে দাঁড়াল। তারা বুঝি পতিত, তারা বুঝি কলুষিত।

দক্ষিণ ভারতের এক বিপ্র প্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিল। সেইখানে রূপ আর অনুপম হাজির হল। দশনে দুই গুচ্ছ তৃণ ধরে দুজনে প্রভুর উদ্দেশে দূর থেকেই পড়ল দণ্ডবৎ হয়ে।

প্রভু প্রসন্নমুখে বললেন, ওঠো, এস আমার কাছে। কৃষ্ণের করুণা অপরিসীম। তোমাদের বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও আমার অপ্রিয় যদি সে ভক্তিহীন হয়, আর চণ্ডালও আমার প্রিয় যদি সে আমাতে ভক্তিমান থাকে। সুতরাং সে ভক্ত চণ্ডালকেই সৎপাত্র মনে করে দান করবে, তার বস্তুই গ্রহণ করবে, তাকে পূজা করবে আমার মত। বলে প্রভু দু ভাইকে আলিঙ্গন করলেন, চরণ রাখলেন মাথার উপরে। তোমরাও যে ভক্তিধনে ধনী, আমার হৃদয়গ্রাহ্য।

দু ভাই প্রভুকে স্তুতি করল। কৃষ্ণপ্রেমদাতা মহাবদান্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধারী গৌরতনু কৃষ্ণকে প্রণাম করি।

প্রভু বললেন, সনাতনের কথা বলো।

সে তো রাজগৃহে বন্দী হয়ে আছে। বললে রূপ, তুমি যদি উদ্ধার করো তবেই তার মুক্তি সম্ভব। নচেৎ নয়।

প্রভু বললেন, ভয় নেই, শিগগিরই সনাতন মুক্ত হবে। মিলন হবে আমার সঙ্গে।

দাক্ষিণাত্যে বিপ্রের গৃহেই দু ভাই স্থান পেল। তাদেরকে প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র এনে দিল বলভদ্র।

ত্রিবেণীসঙ্গমের কাছেই প্রভুর থাকবার জায়গা ঠিক হল। দু ভাই রূপ আর অনুপম কাছেই বাসা নিল। বিপরীত তীরের আড়েল গ্রাম থেকে দেখা করতে এল বল্লভ ভট্ট। যার এত ভাবভক্তির কথা শুনি তাকে দেখে আসি স্বচক্ষে।

দেখতে এসেই চক্ষুস্থির। কে এ সানন্দসুন্দর লাবণ্যপ্রদীপ। তখুনি দণ্ডবৎ করল বল্লভ। প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। শুরু হল কৃষ্ণকথা, আর কৃষ্ণকথা শুরু হলে সাধ্য কী প্রেম সংবরণ করো।

প্রভুকে বল্লভ নিমন্ত্রণ করল নিজগৃহে।

এই দুই ভাইকে দেখুন। রূপ আর অনুপম। অনুপমেরও আরেক নাম বল্লভ।

বল্লভ এগিয়ে এল, দু ভাই দূরে পালাল। বললে, আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদের ছুঁয়ো না।

সে কী কথা। বল্লভ তাকাল প্রভুর দিকে।

পণ্ডিতাভিমানী বল্লভের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করবার জন্যে প্রভু বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে, তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক কুলীন, তুমি এদের ছুঁয়ো না, এরা হীন জাতি।

হীন জাতি! বিস্ময় মানল বল্লভ: কিন্তু এদের মুখে যে কৃষ্ণনাম নর্তন করছে। এরা অধম নয়, এরা সর্বোত্তম।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। বললেন প্রভু, যার ভক্তি নেই তার জপতপ শাস্ত্রজ্ঞান মৃতদেহের অলঙ্কারের মতই অসার। নীচকুলে জন্মেও যে ভক্ত, তার ভক্তির দীপ্তাগ্নি সমস্ত কল্মষ দগ্ধ করে দিয়েছে। সে পণ্ডিতদেরও মাননীয়।

নির্জনতার আশায় প্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে এলেন। রূপকে নিলেন সঙ্গে, শিক্ষা দিতে বসলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমস্ত ভাগবত-সিদ্ধান্ত। রামানন্দের সঙ্গে বসে যত মীমাংসা করেছিলেন—সমস্ত। পরে বললেন, এবার বৃন্দাবনে যাও।

শোনো তবে ভক্তিরসের লক্ষণ।

ভক্তিরসসিন্ধু পারাপারশূন্য, গম্ভীর। তোমার আস্বাদের জন্যে শুধু এক-বিন্দু উপহার দিচ্ছি। কেশাগ্রের শত ভাগকে বহু শত বার বিভাগ করলে যে বস্তু হয়, জীব সেই সূক্ষ্মতম বস্তু, সংখ্যায় অন্তহীন। স্বীয় কর্মফলে চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করছে। সে ঈশ্বরের শাসনাধীন। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। জীবের মধ্যে আবার দুরকম ভেদ—স্থাবর আর জঙ্গম। যারা অচল, যেমন বৃক্ষ, তারা স্থাবর জীব আর যারা সচল তারাই জঙ্গম জীব। জঙ্গমে আবার তিন রকম ভেদ—জলচর, স্থলচর, তির্যক। মানুষ স্থলচরের মধ্যে। সমগ্র জীবমণ্ডলের তুলনায় অত্যল্প। আবার মানুষের মধ্যেও কত কম লোক বেদনিষ্ঠ। যারা বেদনিষ্ঠ অর্থাৎ যারা বেদ মানে, তাদের মধ্যে অর্ধেক শুধু মুখে মানে, প্রাণে মানে না, অর্থাৎ বেদনির্দিষ্ট কর্ম করে না, বরং বেদনিষিদ্ধ পাপ কর্ম করে। যারা বেদবিহিত কর্ম করে তাদের মধ্যে

জ্ঞানীই বা কজন? কোটি কর্মনিষ্ঠের চেয়ে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী জীব-ব্রহ্মের অভেদ মানলেও ভক্তিহীন থাকতে পারে না। জ্ঞানীও ভক্তির জোরেই ব্রহ্মের সাজুয্য চায়।

কোটি-কোটি জ্ঞানীর মধ্যে যদি একজন মাত্র মুক্ত হয়! আর কোটি মুক্তমধ্যে যদি একজন মাত্র কৃষ্ণভক্ত হয়! তা হলেই দেখ কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা কত সামান্য। 'দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।'

কৃষ্ণভক্ত কী রকম?

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, তার নিজসুখের বাসনা নেই। তাই সে শান্ত, অচঞ্চল। যারা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী তারা অশান্ত। ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃপায় বা কৃষ্ণকৃপায় ভজনাকাঙ্ক্ষা পেয়ে যায়। শুধু মহৎকৃপাই কৃষ্ণভক্তির উৎস।

মহৎকৃপা ছাড়া কিছু হবার নয়।

মহৎ-কৃপা বিনা কোন ধর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

আর এই মহৎ-কৃপা দুই রূপে অভিব্যক্ত হয়—হয় গুরুরূপে নয় অন্তর্যামি-রূপে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

অন্তর্যামী বা চৈত্ত্যগুরুর ইঙ্গিত জীব সহজে বুঝতে পারে না, তাই কৃষ্ণ সাধারণত মহান্ত বা গুরুরূপে জীবকে কৃপা করে।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

ভাগ্যবান হব কিসে? সাধুসঙ্গে। সাধুসঙ্গ করে মহৎকৃপা আকর্ষণ করব। আর সেই মহৎকৃপার ফলে কৃষ্ণভক্তি জাগবে। যদি সেই ভজন-প্রবৃত্তি জাগে, তবে তা ভাগ্য ছাড়া আর কী।

তারপর সেই বীজে জলসেচন করো। শ্রবণকীর্তনই সেই জলসেচন। জলে লতার বৃদ্ধি। শ্রবণকীর্তনেই ভজনেচ্ছা বলবতী। বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে লতা। জলসেচন বাড়তে বাড়তে লতা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে—বৃক্ষকে আশ্রয় করে লতা ক্রমশই বিস্তারিত হতে থাকে, পুষ্পিত ও ফলান্বিত হয়। কী ফল ধরে? আর কী! প্রেমফল।

দেখো যেন বৈষ্ণবাপরাধ করে বোসো না। বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অনাদর করা, ক্রোধ করা, বৈষ্ণবদর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করা—এই সব বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ যেন মত্ত হাতি, অনায়াসেই ভক্তিলতার মূলোচ্ছেদ করে দিতে পারে। সুতরাং সাবধানতার বেড়া দাও। যাতে মূল না ছেঁড়ে, পাতা না শুকোয়। নিরন্তর জলসেকে লতাকে সজীব রাখো।

আরো দেখো—লতার অঙ্গ থেকে উপশাখা না ওঠে। উপশাখা কী? ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা উপশাখা। নিষিদ্ধাচার, প্রাণিহিংসা, লাভপ্রতিষ্ঠা, কুতর্ক-কুটিলতা উপশাখা। উপশাখা জন্মালে লতার পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্য কামনাই দুর্বাসনা। আর দুর্বাসনাই দুঃসঙ্গ।

যদি দেখ উপশাখা জন্মাচ্ছে, সূচনাতেই তা ছিন্ন করবে। বাড়তে দেবে মূলশাখাকে। যত জলসেক সব এই মূলশাখায়।

তারপরেই কালক্রমে লতায় ফল ধরবে, ফল পাকবে। সেই তো প্রেমফল। পরমফল।

'প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।' সেই ফলই পঞ্চম পুরুষার্থ। তার কাছে আর চার পুরুষার্থ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তৃণতুল্য।

যে একবার কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ পেয়েছে তার কাছে অষ্টসিদ্ধি বা সমাধি দূরের কথা, ব্রহ্মানন্দও স্পৃহনীয় নয়।

যে শুদ্ধ ভক্ত, তার কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বাঞ্ছা নেই, অন্য পূজা নেই। তার সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। চোখে বিগ্রহদর্শন, কানে নামগুণশ্রবণ, নাকে প্রসাদী তুলসী ও ফুলের ঘ্রাণগ্রহণ, জিভে নামকীর্তন, ত্বকে গন্ধমাল্যের স্পর্শানুভব, হাতে মন্দিরমার্জন, পায়ে তীর্থভ্রমণ, মনে লীলাস্মরণ, বুদ্ধিতে কৃষ্ণসংকল্পগ্রহণ, অহংকারে কৃষ্ণদাসত্বের অভিমান-পোষণ আর চিত্তে কৃষ্ণানুসন্ধান। যেহেতু কৃষ্ণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁর সেবা করবে। কৃষ্ণানুকূল্যে ইন্দ্রিয়ের যে সেবা তাই ভক্তি। স্বসুখবাসনাহীনা কৃষ্ণসুখসাধিনী সেবা। অবিচ্ছিন্না, অনিমিত্তা, অব্যবহিতা।

ব্রজগোপীরাই মধুর রসের মুখ্য ভক্ত। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখলেও তাদের প্রীতি সংকুচিত হয় না। কৃষ্ণ পরিহাস করলে রুক্মিণীর ভয় হয়, কৃষ্ণ বুঝি তাকে ত্যাগ করবে। ব্রজগোপীদের সেই ভয় নেই। কৃষ্ণের মুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখেও যশোদা সংকুচিত হল না, আপন গর্ভের পুত্র মনে করেই বুকে

চেপে ধরল, সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানকে আড়াল করল তার বাৎসল্য। কৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য জেনেও শ্রীদামের সখ্যভাব সংকুচিত হয়নি। অনায়াসে কৃষ্ণকে কাঁধে করেছে, কখনো বা নিজেই চড়েছে কৃষ্ণের কাঁধে। বনপথে চলতে চলতে শ্রান্ত রাধিকা কৃষ্ণকে বললে, আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমাকে বহন করে নিয়ে চলো। কৃষ্ণ বললে, বেশ, আমার কাঁধে ওঠো। রাসলীলায় কৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য দেখেছে রাধা, তবু তার মধুরারতি সংকুচিত হয়নি। কে বলে কৃষ্ণ ঈশ্বর, রাধার কাছে সে তার প্রাণবল্লভ ছাড়া কিছু নয়।

ঈশ্বরে নিষ্ঠাবুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয়সংযমের নাম দম, দুঃখসহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা, আর জিহ্বোপস্থের জয়ই ধৃতি। শান্ত রসের কাজ কী ? 'কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ।' শান্ত অকুতোভয়, স্বর্গ-অপবর্গ আর নরক সমান দেখে। কিন্তু তার কৃষ্ণে মমত্ববোধ নেই। তার শুধু কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান। দাস্যে সম্ভ্রম-গৌরব। অধিকন্তু সেবা। সখ্যে দাস্যের চেয়ে মমতা বেশি। পরস্পরে অপার্থক্য। সখ্য বিশ্রম্ভপ্রধান। বাৎসল্যে সখ্যের অসংকোচ সেবা তো আছেই, আছে আবার মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন। মধুরে এ সমস্ত তো আছেই, শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসংকোচ, বাৎসল্যের মমতা— সর্বোপরি আছে কান্তভাবে অঙ্গদানসেবা। মধুরেই সর্বভাবের সমাহার।

এই মত মধুরে সর্বভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥

শিক্ষাদানের পর প্রভু বললেন, আমি এবার কাশী যাব।

রূপ আর অনুপম সঙ্গী হতে চাইল। প্রভু বললেন, বলেছি তোমরা বৃন্দাবনে যাবে। সেখানে কিছুদিন কৃষ্ণভজন করো। পরে নীলাচলে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলবে।

রূপকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু। অন্তরে শক্তিসঞ্চার করে দিলেন।

প্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবনেই গেল রূপ। তার কৃষ্ণলীলা নাটক লেখবার অভিলাষ হল। গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণ ও নান্দীশ্লোক লিখে ফেলল। কিন্তু প্রভু যদি নীলাচলে গিয়ে থাকেন, আমিও তবে সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিই। অনুপম বললে, আমিও যাব। দুই ভাই প্রয়াগ হয়ে কাশী হয়ে পৌঁছল গৌড়ে। গৌড় থেকেই যাত্রা করব নীলাচল।

গৌড়ে এসে অনুপম অসুস্থ হয়ে পড়ল। রূপ অনেক পরিচর্যা করল কিন্তু অনুপম তারকব্রহ্ম নাম করতে করতে গঙ্গাপ্রাপ্ত হল।

রূপের তাই দেরি হয়ে গেল। গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গ নিতে পারল না। সে একা একা চলল।

পথে যেতে যেতে সে তার নাটকের কথা ভেবেছে, কখনো বা খসড়া করেছে। নাটকের কথাই তো কৃষ্ণের কথা। আর কৃষ্ণ এখন কোথায় সশরীরে ?

নীলাচলে।

পথে সত্যভামাপুরে এক রাত্রি বিশ্রাম করল রূপ। রাত্রে স্বপ্ন দেখল এক দিব্যরূপা নারী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানল সে দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের মহিষী সত্যভামা। সত্যভামা আদেশ করল, আমার নাটক আলাদা করে লেখ, ব্রজলীলা আর দ্বারকালীলা একসঙ্গে মিশিয়ে দিও না।

এই নির্দেশের তাৎপর্য বুঝতে পারল রূপ। যেন মাধুর্য আর ঐশ্বর্যকে একত্র না করি।

ভাবতে ভাবতে রূপ হরিদাসের বাসায় এসে উঠল। আগে ভক্তকে স্বীকার করি, পরে ভগবানকে স্বীকার করব। ভাগবতেও আগে ভক্তের কথা, পরে ভগবানের।

প্রত্যহই প্রভু এসে হরিদাস ও রূপের সঙ্গে মিলিত হন, ইষ্টগোষ্ঠী করেন, অর্থাৎ করেন কৃষ্ণালোচনা। মন্দির থেকে যে প্রসাদ পান তাই বণ্টন করে দেন।

একদিন ভক্তসমাবেশে প্রভু রূপকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, কৃষ্ণকে ব্রজের থেকে বার কোরো না। ব্রজ ছেড়ে কৃষ্ণ কোথাও কখনো যায়নি।

এর তাৎপর্য কী ?

তাৎপর্য প্রকট লীলায় কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যান কিন্তু অপ্রকট লীলায় বৃন্দাবনেই বন্দী থাকেন। অর্থাৎ যে ঘটনার উপলক্ষে কৃষ্ণকে ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হচ্ছে সে সব ঘটনা তোমার নাটকে বর্ণনা কোরো না। শুধু ব্রজলীলাতেই আবদ্ধ রেখো। তোমার নাটক ব্রজলীলায় শুরু, ব্রজলীলায় শেষ। তাতে মথুরা-দ্বারকার কীর্তি-কাহিনী যেন না থাকে। তোমার নাটকে শুধু বৃন্দাবনই নন্দিত হোক।

রূপ বিস্ময় মানল। সত্যভামা বলে গেল, আমার পুরলীলার নাটক আলাদা লেখ, এখন রাধাবিভাবিতচিত্ত প্রভু বলছেন, ব্রজলীলার নাটক যেন পৃথক হয়। দুই ধামের দুই কৃষ্ণপ্রেয়সী ভিন্নভাবে একই আদেশ করলেন।

তাই হবে। দুই ভাগে ভাঙব নাটককে। নান্দী-প্রস্তাবনাও আলাদা হবে। বৃন্দাবন নিয়ে লিখব 'বিদগ্ধ মাধব' আর দ্বারকা-মথুরা নিয়ে লিখব 'ললিত মাধব'।

কিন্তু রথাগ্রে নৃত্যের সঙ্গে-সঙ্গে প্রভু এ কোন্ শ্লোক আবৃত্তি করছেন? 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ—' যে আমার কৌমারহরণ করেছিল সেই আমার মনোনীত বর। সেই চৈত্ররাত্রি মধুযামিনী উপস্থিত। সেই মালতী উন্মীলিত। সুরভিপ্রৌঢ় সেই কদম্ববনবায়ু। আমিও সেই নায়িকা সমুৎসুকা। তবুও আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে রেবাতটের বেতসীতরুতলের জন্যে উৎকণ্ঠিত।

প্রভু কেন এই শ্লোক এত আদরের সঙ্গে পড়েছেন মর্মজ্ঞ রূপ সহজেই বুঝতে পারল। সে একটি সমার্থবহ শ্লোক রচনা করল, তারপর সেটি তালপত্রে লিখে কুটিরের চালায় গুঁজে রেখে সমুদ্রস্নান করতে গেল।

কুটিরে প্রভু হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। চালের মধ্যে গোঁজা তাল-পাতায় নজর পড়তেই সেটি টেনে আনলেন। দেখলেন তাতে একটি শ্লোক লেখা। আহা, কী মধুর সে শ্লোক! প্রভুর যে গোপনভাব শুধু স্বরূপ-দামোদর জানে তা রূপ টের পেল কী করে?

স্নানান্তে রূপ এসে প্রণত হতেই প্রভু তাকে এক চড় মারলেন। ক্রোধের চড় নয়, স্নেহের চড়। বললেন, তুমি আমার অন্তরের গোপন কথা কী করে জানলে? তোমাকে কে বলল? কে বোঝাল?

স্বরূপকে পড়তে দিলেন।

প্রিয়ঃ সোঽহং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ—হে সহচরি, আমার সেই দয়িত কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছেন, আমিও সেই রাধা, আমাদের এই মিলনও সুখদায়ক, তবুও আমার চিত্ত চঞ্চল কৃষ্ণের মুরলীধ্বনিতে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দীপুলিনের কাননের জন্যে উৎকণ্ঠিত।

প্রভু রূপকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। কী করে জানতে পারলে আমার নিগূঢ় তত্ত্ব?

শুধু তোমার কৃপাশক্তিতে। বললে স্বরূপ, তোমার কৃপা ছাড়া তোমার মনের ভাব বোঝে কার সাধ্য? শ্লোক উচ্চারিত হোক, বাচ্যার্থ প্রাঞ্জল হোক, নিহিত সত্যকে বুঝতে হলে তোমার কৃপা দরকার।

আরেক দিন নাটক লিখছে রূপ। প্রভু পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন,

কী লিখছ ? বলেই এক পত্র ধরে টান মারলেন।

কী সুন্দর হস্তাক্ষর। যেন মুক্তোর সার। প্রভু অক্ষরের স্তুতি করলেন। যেমন লিপি তেমনি রচনা!

কী অপূর্ব শ্লোক! 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে—'

'কৃ' আর 'ষ্ণ' এই দুটি অক্ষর কী অমৃতে তৈরি বলতে পারো কেউ? এই দুটি শব্দ যদি একত্র হয়ে নাচতে আরম্ভ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত-শত জিহ্বায় এই নাচের আসর বসুক, যদি এক কানে তা প্রবেশ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত-শত কানে তা বিস্তৃত হোক, আর যদি একবার তা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের শত-শত ঘরে খিল পড়ে যাক।

তার মানে এক মুখে কত বলব, অসংখ্য মুখ অসংখ্য জিহ্বা পাবার আকাঙ্ক্ষা হয়। দুই কানে নামসুধা কতটুকু পান করব, ধ্বনির অমৃত ধরবার জন্যে অসংখ্য কান দাও। ইন্দ্রিয়সমূহ যতই প্রবল হোক, নামের সামনে তাদের অস্তিত্ব নেই, তারা তখন মন্ত্রশান্ত, বিলয়তন্ময়। নদীতে বান এলে যেমন খাল-বিল জলা-নালা জলে একাকার হয়ে যায় তেমনি নাম-সমুদ্র উথলে উঠলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ডুব মেরে তলিয়ে যায় অতলে। এমন কৃষ্ণনাম কোন্ মধুতে প্রস্তুত?

হরিদাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, শাস্ত্রে আর সাধুমুখে কৃষ্ণনামের অনেক মহিমা শুনেছি কিন্তু এমনটি কখনো শুনিনি। যেমন নাম তেমনি তার ব্যাখ্যা। মধুরে-মধুরে কোলাকুলি।

রামানন্দ আর সার্বভৌমের কাছে প্রভু রূপের গুণবর্ণন করলেন। তোমরাও বিচার করো রূপ কেমন লিখেছে। ভাবে ছন্দে রসে কাব্যে কেমন উতরেছে তার রচনা।

ঈশ্বরের বোধ করি এই রকমই রীতি। ভক্তের কোনো ত্রুটিই গায়ে মাখেন না। নেন না কোনো অপরাধ। অল্প সেবাকেই বহু বলে মানেন। ভক্তের কাছে হারেন। ভক্তের হাতে দান করে দেন নিজেকে।

রূপ তার নাটক শোনাতে বসল। প্রথমে বিদগ্ধ-মাধব, পরে ললিত-মাধব।

রামানন্দ বললে, তবে এবার নান্দী শ্লোক পড়ো।

রূপ পড়তে লাগল: হরিলীলাকথা তোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত ভোগবাসনা হরণ করুক। কী রকম সে কথা? যেন চিনিপাতা দই।

তাতে ব্রজসুন্দরীদের প্রণয়-কর্পূর মেশানো। তাতেই সুগন্ধি করা। এমন যে সুধা যা চন্দ্রসুধার মাধুর্যগর্বকে ম্লান করেছে। সে স্নিগ্ধ ও সুস্বাদু পানীয় সংসারপথশ্রান্ত সন্তপ্ত প্রাণীদের তৃষ্ণা দূর করে। দুর্বিষয়ের তৃষ্ণা।

রামানন্দ বললে, এবার ইষ্টদেবের বর্ণন করো।

প্রভু সামনে বসে, কী করে পড়ে? রূপ কুণ্ঠিত হয়ে রইল।

সে কি, সংকোচ কিসের? প্রভু আশ্বাস দিলেন: গ্রন্থের ফল সমস্ত বৈষ্ণবসমাজকে শোনাও।

রূপ পড়ল: পুরটসুন্দরদ্যুতি শচীনন্দন হরি সকলের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হোন। যিনি উন্নত-উজ্জ্বল রসাশ্রিতা ভক্তিশ্রী করুণা করে বিতরণ করতে অবতীর্ণ হয়েছেন—যে শ্রী বহুদিন ধরে সংসারে অনুপস্থিত।

সকলে বলে উঠল: এই শ্লোক শুনে কৃতার্থ হলাম। রূপ, তুমি এই শ্লোক শুনিয়ে সকলকে কৃতার্থ করলে।

তারপর শ্রোতাদের প্রশংসা করে লেখক তার দৈন্য জানাচ্ছে।

মনে হয় আমার মত অভাজনেরও কিছু পুণ্যফল ছিল। হে বুধমণ্ডলী, আমি ক্ষুদ্র হলেও আমার কথা তুচ্ছ হবে না। কেননা সেকথা হরিগুণময়ী কথা, হরির গুণবর্ণনায় পরিপূর্ণ। সে কথাই সিদ্ধার্থবিধাত্রী। আমি লঘু হতে পারি কিন্তু আমার বিষয় লঘু নয়। আমি হীন হতে পারি কিন্তু আমার বিষয় গুণগরীয়ান।

তারপর রূপ প্রেমোৎপত্তির কারণ কী কী বর্ণনা করলে। কাকে বলে পূর্বরাগ, কাকে বলে চেষ্টা। কী বা কামলেখন?

রাধার হৃদয়বেদনা দুঃসাধ্য। এর চিকিৎসা শুধু চিকিৎসকের নিন্দা। এই ব্যাধিই পূর্বরাগ। শরীরচাঞ্চল্যই চেষ্টা। প্রেমপত্রই কামলেখন।

কৃষ্ণের কাছে পত্র পাঠাল রাধা: তুমি চিত্রপটরূপ ধারণ করে আমার মন্দিরে বাস করছ। তোমাকে দেখলেই আমার চিত্তবিকার ঘটে, ভয়ে আমি পালিয়ে যাই, কিন্তু কোথায় যাব, যেখানে যাই সেখানেই তোমার ছবি দেখি। সর্বত্রই তুমি এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াও। সর্বত্রই তোমার স্ফূর্তি, তোমার উদ্দীপন।

রাধিকার দুঃখে বিশাখা কাঁদছে। তুমি কেন কাঁদছ? রাধিকা বিশাখাকে বলছে: কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ তাতে তোমার কী অপরাধ? আমিই মরব। আমার মৃতদেহকে তমালের ডালে এমনি করে বেঁধে দিও

যেন আমি তাকে ভুজবল্লরী দিয়ে আলিঙ্গন করে আছি। আমার এই মিলনেচ্ছাকে বৃন্দাবনে অবিনশ্বর করে রেখো।

রামানন্দ বললে, এবার তবে প্রেমের স্বভাব কী বলো।

প্রেমের যে পরিমাণে সুখ সেই পরিমাণে দুঃখ। বিষ আর অমৃত একসঙ্গে।

এই প্রেমের আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

কৃষ্ণের উৎসঙ্গ-সুখের আশায় গুরুলজ্জা শিথিল করে দিলাম, রাধিকা সখীদের কাছে বিলাপ করছে, তোমরা প্রাণের চেয়েও সুহৃত্তম, তোমাদেরই বা কত ক্লেশ দিলাম, সাধ্বীসেবিত মহান পাতিব্রত্য-ধর্মেরও সম্মান রাখলাম না, তবুও কৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করল। রাধিকা বলছে, তারপরেও পাপীয়সী আমি বেঁচে আছি। আমার ধৈর্যকে ধিক।

ললিতা বলছে, অন্তরক্লেশে কলঙ্কিত হয়ে যমপুরীতে চললাম, আর উনি এখনো প্রবঞ্চকের হাসি হাসছেন! হে মেধাবিনী রাধিকে, এই একটা গভীর-কপট আভীর-পল্লীর ধূর্তের সঙ্গে তোমার কী করে প্রেম হল?

দেবী পৌর্ণমাসী কৃষ্ণকে বললে, কৃষ্ণ, তুমি সমুদ্র আর রাধিকা বাহিনী, নদী। সে ধর্মসেতু ভেঙে দিয়ে এসেছে। বেদধর্ম, লোকধর্ম, আর্যপথ স্বজন-ভবন সব সে বিসর্জন দিয়েছে। শুধু তোমাতে মিলিত হবার জন্যে। ছেড়েছে ধব-তরু বা পতিচ্ছায়ার সান্নিধ্য, লঙ্ঘন করেছে সমস্ত গুরুপর্বত। আর তুমি কিনা কপট বাকচাতুরীতে তার প্রতি বিমুখতা দেখাচ্ছ!

সকলে একবাক্যে বলে উঠল : চমৎকার।

রামানন্দ প্রশ্ন করল : বৃন্দাবনের কেমন বর্ণনা করলে? মুরলীধ্বনির? আর কৃষ্ণ-রাধিকাকেই বা কী রকম চিত্রিত করলে?

কৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলছে, মধুমঙ্গল, দেখ আম্র-মুকুল থেকে মকরন্দ ক্ষরিত হচ্ছে। তার সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর এসে বন্দীকৃত হচ্ছে, চন্দনগিরির মন্দানিলে আন্দোলিত বৃন্দাবন, আমার অতুল আনন্দের আস্পদ। আমার ইন্দ্রিয়ের আনন্দবর্ধন। ভ্রমরীর গান কানের তৃপ্তি, শিশির-বায়ুর স্পর্শ ত্বকের, লতানৃত্য চোখের, মল্লিকাগন্ধ নাকের আর দাড়িম্ব রসনার।

মুরলীকে সম্বোধন করে রাধিকা বলছে, হে মুরলি, তুমি তো জাতিতে সরল, জড়-বংশে জন্ম বলে তোমার তো কুটিলতা থাকার কথা নয়, আছও পুরুষোত্তমের হাতে, তবে কার কাছে গোপাঙ্গনাদের বিমোহনের বিষমদীক্ষা নিলে, কোন্ গুরুর কাছে?

হে সখি মুরলি, তুমি ছিদ্রজালে পূর্ণ, তুমি লঘু, অতি কঠিন। নীরসা গ্রন্থিলা, তবু কোন্ পুণ্যের ফলে কৃষ্ণকরের আলিঙ্গন ও কৃষ্ণাধরের চুম্বন পাচ্ছ? আমার কি সেই পুণ্য হয় না?

হায় কৃষ্ণের বাঁশি। এই বাঁশির ধ্বনিতে মেঘের গতি স্তম্ভিত হয়, তুম্বুরু ঋষি যিনি স্বরনাদ-বিশারদ, গায়কশ্রেষ্ঠ, তিনিও বিস্ময়ে চমকে ওঠেন। যারা ব্রহ্মাসক্ত, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, সেইসব সনক-সনন্দনের ধ্যান ভেঙে যায়, স্বয়ং ব্রহ্মা তার সৃষ্টি-কার্য ভোলে, গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি বলিও চঞ্চল হয় আর অনন্তদেব যিনি পৃথিবীকে মাথায় ধরে আছেন, পারেন না নির্বিচল থাকতে। সে-ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করে চলে যায় ঊর্ধ্বলোকে, লোক-লোকান্তরে।

দেখ কৃষ্ণকে দেখ। তার নয়নচ্ছটায় পুণ্ডরীকের প্রভা তিরস্কৃত, তার পীতাম্বরে নবকুঙ্কুমের শোভা পরাভূত, তার আরণ্য অলঙ্কারে মণিরত্নের আভরণ বিড়ম্বিত। সেই উজ্জ্বলাঙ্গ হরিকে দেখ, তার কান্তি হরিমণিমনোহর। বামজঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ চরণটি ন্যস্ত হয়ে দেহের তিনস্থান কিঞ্চিৎ বাঁকা করে রাখা, স্কন্ধ বক্রভাবে স্তম্ভিত, নেত্রপ্রান্ত বক্রভাবে সঞ্চারিত, সংকুচিত অধরে লোলাঙ্গুলিসঙ্গত বাঁশি, নীলকমলের উপর ভ্রমরের মত নয়রেন উপরে যার ভ্রূ নৃত্য করছে সেই পরমানন্দ পুরুষকে অঙ্গীকার করো।

আর রাধিকা?

যার নয়নশোভায় নবকুবলয় পরাজিত, যার মুখোল্লাসে ফুল্ল কমলবন উল্লঙ্ঘিত, যার আঙ্গিকরুচিতে স্বর্ণকান্তি লাঞ্ছিত, রাধার সেই অনির্বচনীয় বিচিত্ররূপ ঝলমল করছে।

মধুমঙ্গলকে কৃষ্ণ বলছে, চন্দ্র দিবাভাগে বিরূপ হয়ে যায়, শতপত্র-পদ্ম শর্বরীমুখে সন্ধ্যাকালেই ম্লান হয়, আমার প্রেয়সীর প্রিয়োজ্জ্বল মুখের সঙ্গে কার তুলনা করব? আনন্দরসতরঙ্গে কপোল যার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, যার কন্দর্পধনু ভ্রূলতা, নৃত্যচঞ্চল ঘনসন্নিবিষ্ট পক্ষ্মযুক্ত যার চক্ষু, তারই কটাক্ষ আমাকে নিরন্তর দংশন করছে।

রামানন্দ বললে, তোমার কবিত্ব অমৃতনির্ঝর। এবার তবে দ্বিতীয়

নাটক ললিতমাধবের কথা বলো।

তুমি সূর্য আর আমি খদ্যোত। বললে রূপ, তোমার কাছে কিছু ব্যাখ্যা-বর্ণনা করা আমার ধৃষ্টতামাত্র।

না, না, পড়ো নান্দীশ্লোক।

রূপ পড়ল: চকোর চন্দ্রের সুধাপান করে বলে চন্দ্রোদয়ে তার অসীম আনন্দ। তেমনি কৃষ্ণের দর্শনে কৃষ্ণের লীলাকথাশ্রবণে সুহৃদ ও ভক্তদের আনন্দ। তাই কৃষ্ণের যশঃশশী অখিলসুহৃৎ-চকোরানন্দা।

তারপর দ্বিতীয় নান্দী বলো যাতে ইষ্টদেবের বন্দনা।

রূপ আবার সঙ্কুচিত হল। তবু পড়ল থেমে থেমে: যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হয়ে স্বীয় প্রেমসুধা অকাতরে বিতরণ করছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি অজ্ঞান-তিমির নাশ করেছেন, যিনি বশীকৃতজগন্মনা, জগজ্জনের মন যাঁর বশীভূত, সেই শচীসুতশশী দিকে-দিকে আনন্দ ঢালুন।

অন্তরে উল্লসিত হলেও বাইরে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করলেন প্রভু: কৃষ্ণরসকাব্যসুধাসিন্ধুর মধ্যে আমার মিথ্যাস্তুতির ক্ষারবিন্দু মিশিয়েছ কেন? তাতে অমৃতের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেল।

রামানন্দ বললে, অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশল। তাতে আনন্দচমৎকারিতা আরো বেড়ে গেল।

তোমার এতে উল্লাস হচ্ছে? শুনতে লজ্জা করে, লোকে উপহাস করবে।

কী বলো, এ শুনে লোকের আনন্দ বাড়বে। বললে রামানন্দ, অভীষ্ট-দেবের স্মৃতি চিরজাগরূক থাকবে। তাকাল রূপের দিকে: ললিতমাধবের কী বিষয়বস্তু?

কৃষ্ণ কিরাতরাজ কংসকে নিধন করবে ও রাধাকে বিবাহ করবে। বললে রূপ, সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পূর্তির জন্য রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের প্রয়োজন।

আরো শ্লোক শোনাও।

রজ আর তম দুইই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটায় বৃন্দাবনে। রজ মানে গো-ধূলি, আর তম মানে সন্ধ্যার অন্ধকার। সাধারণত রজ আর তমগুণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু বৃন্দাবনে বিপরীত। এখানে রজ আর তমই কৃষ্ণমিলনের সহায়ক। তাই ব্রজাঙ্গনার ভজনকৌশল বেদেরও অপ্রকট।

হে সহচরি, যে নবজলধরকান্তি, মদমত্ত মাতঙ্গের মত যার বিলাস, সেই নির্ভীক নিরাতঙ্ক যুবক কে? কোথা থেকে এসেছে ব্রজমণ্ডলে? হায়, তার কটাক্ষদস্যু আমার চিত্তধনাগার থেকে ধৈর্যধন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে।

আর কৃষ্ণ বলছে রাধিকার উদ্দেশে . যে আমার চিত্তকরীন্দ্রের বিহার-মন্দাকিনী, যে আমার নয়নচকোরের শারদীয় চন্দ্রপ্রভা, যে আমার হৃদয়াকাশের চারুতারাবলী, বহুকালব্যাপী উৎকণ্ঠার ফলে তাকে আমি পেয়েছি।

রামানন্দ সহস্রমুখে রূপের কবিত্বের প্রশংসা করতে লাগল। সেই কবির কাব্যরচনার প্রয়োজন কী যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে আনন্দে না তাকে অভিভূত করে? সেই ধনুর্ধারীর বাণনিক্ষেপেই বা কী প্রয়োজন যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে তার মূর্ছা না ঘটায়?

প্রভুকে উদ্দেশ করে বললে, তোমার শক্তিতেই এই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

প্রয়াগে এর সঙ্গে দেখা। এর বড় ভাই সনাতন। প্রভু রামানন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, তারও বিষয়ত্যাগ তোমার মতই। এ দু ভাইকে আমি বৃন্দাবনে পাঠালাম, ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন করবার জন্যে শক্তি-সঞ্চার করে দিলাম। দেখ গ্রন্থ কেমন মধুর, প্রসন্ন ও সালঙ্কার হয়েছে। কবিত্ব থাকলেই তো রসপ্রচার হবে।

সব তোমার ইচ্ছায়। বললে রামানন্দ, তুমি ইচ্ছে করলে কাঠের পুতুল নাচাতে পারো। গোদাবরীতীরে আমার মুখে যেসব রসতত্ত্ব বলালে সব আবার এই রূপের লেখায় স্থাপিত হয়েছে। ভক্তের প্রতি কৃপায় ব্রজরস প্রচার করতে চাও, যাকে দিয়ে তুমি করাবে সেই করবে, সমস্ত জগৎ তোমার বশংবদ।

রূপকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। আর রূপকে দিয়ে সকল ভক্তের চরণ-বন্দনা করালেন। সকলে চলে গেলে হরিদাস একান্তে এসে আলিঙ্গন করল রূপকে। বললে, তোমার কী ভাগ্য, কে বলবে তোমার রচনার কী মহিমা!

আমি কিছুই জানি না। প্রভু যেমন বলিয়েছেন তেমনি বলেছি।

প্রভুর ভক্ত গোসাঁয়েরা চার মাস থেকে গৌড়ে ফিরল। রূপ থেকে গেল নীলাচলে। দোলযাত্রার পরে প্রভু রূপকে বৃন্দাবনে যেতে বললেন। বললেন,

বৃন্দাবনে গিয়ে শাস্ত্রদৃষ্টে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করো, কৃষ্ণসেবা রসভক্তি প্রচার করো।

রূপ প্রভুকে প্রণাম করে বৃন্দাবনে যাবার উদ্দেশে গৌড় থেকে চলে গেল বৃন্দাবন।

প্রভুর নির্দেশিত কাজে আত্মনিয়োগ করলে।

রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবনে এল। তাকে প্রভু স্বরূপের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। স্বরূপের অন্তর্ধান হতে রঘুনাথের অসহ্য হল। ঠিক করল বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ-সনাতনের চরণবন্দন করে গোবর্ধন হতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করবে।

রূপ-সনাতন তাকে তৃতীয় ভাইয়ের মত করে কাছে-কাছে রাখল, তার আর মরা হল না। রূপের ললিতমাধব নাটক পড়ে রঘুনাথ আত্মহারা হয়ে গেল। গ্রন্থকে বুকে ধরে অহোরাত্র কাঁদতে লাগল। পাণ্ডুলিপির সংশোধন দরকার, রূপ চাইলেও রঘুনাথ গ্রন্থ ছাড়ল না। তখন রূপ নতুন গ্রন্থ 'দানকেলিকৌমুদী' লিখলে। লিখে তা রঘুনাথকে দিয়ে ললিতমাধব ফেরত নিল।

শ্রীজীব গোস্বামী অনুপমের ছেলে, রূপের ভাইপো, প্রাণপ্রতিম। শুধু তাই নয় রূপের মন্ত্রশিষ্য।

একদিন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বৃন্দাবনে এসে হাজির। রূপকে লক্ষ্য করে বললে, তোমার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে এসেছি। বিচারে নির্ণীত হবে কে জয়ী, কে পরাজিত।

রূপ তার সঙ্গে বিতণ্ডা করতে চাইল না। বিনাযুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে তাকে জয়পত্র লিখে দিল।

দিগ্বিজয়ীর জয়োল্লাসে বৃন্দাবন মুখরিত হয়ে উঠল।

যমুনা থেকে স্নান করে ফিরছিল জীব গোস্বামী। কী ব্যাপার, এত হৈ-চৈ কেন?

শাস্ত্রবিচারে রূপ গোস্বামীকে পরাজিত করেছি।

বিশ্বাস করি না।

তুমি কে হে যে বিশ্বাস করো না?

আমি তাঁর নগণ্য শিষ্যমাত্র। বিশ্বাস করি না পাণ্ডিত্যে কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে পারে।

কিন্তু এই দেখ জয়পত্র। রূপ গোস্বামী নিজের হাতে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন।

জয়পত্র দেখে বেদনায় জীবের হৃদয় বিদীর্ণ হল। সে বলে উঠল: না, বিশ্বাস করি না। আমাকে পরাস্ত করুন তো দেখি।

দিগ্বিজয়ী তখনই শাস্ত্রযুদ্ধে উদ্যত হল।

কিন্তু যে প্রশ্ন করে জীব তারই যথোচিত উত্তর দেয়। যথার্থ তো বটেই, গৌরবগুণান্বিত। আবার প্রশ্ন আবার উত্তর। পর্যাপ্ত, পরিমিত, সমীচীন। জীবের যেমন বিদ্যা তেমনি ধী তেমনি ধারণা।

দিগ্বিজয়ীর আর প্রশ্ন নেই। সে নিরুত্তর।

তার হাত থেকে জয়পত্র কেড়ে নিল জীব। যাও বিদ্যার আর জাঁক করতে হবে না।

রূপ একথা জানতে পেরে জীবকে ডেকে পাঠাল।

একখানা জয়পত্র পেয়ে পণ্ডিতের কত আনন্দ হয়েছিল, তুমি তাকে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলে কেন? রূপ জীবকে তিরস্কার করল: তোমার কেন এই অভিমান, এই অসহিষ্ণুতা?

শুধু তিরস্কার নয়, রূপ তাকে বিতাড়িত করল। তুমি বেরিয়ে যাও আমার সমুখ থেকে, আমি আর তোমার মুখ দেখব না।

সেই আদেশ শিরোধার্য করে জীব বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অনশনে দেহ ক্ষয় করে দেবে এই তার সংকল্প হল।

সনাতনের কাছে খবর পৌঁছুল। সে এসে মিলন ঘটাল।

বলো রূপ-সনাতনের কেমন বৈরাগ্য?

তারা অনিকেত, গৃহহীন। তাদের করতলভিক্ষা তরুতলবাস। যে গাছের নিচে থাকে সে গাছও নির্দিষ্ট নয়। আজ যে গাছের নিচে শোকে কাল আর সেখানে নয়, কাল অন্য গাছের নিচে। যে যা দেবে তাই নেবে, স্থূলভিক্ষার জন্যে চেষ্টা করে না। তরকারি ছাড়া শুকনো রুটি বা ছোলাতেই তাদের তৃপ্তি। করঙ্গ আর কাঁথাই তাদের সম্বল। তাদের একমাত্র উল্লাস কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম। দিবারাত্রির মধ্যে চারদণ্ড মোটে শয়ন করে, কিন্তু যেদিন নামসংকীর্তনে প্রেমোন্মত্ত হয় সেদিন ঐটুকু সময়ও ঘুমোয় না। সর্বক্ষণই তাদের কৃষ্ণভজন।

সনাতনের অপ্রকটের সাতাশ দিন পরে বৃন্দাবনে রাধাদামোদরের মন্দিরে রূপ অপ্রকট হল।

নরোত্তম বলছে :

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবন-জীবন॥
তুয়া অদর্শন-সহি গরলে জারল দেহী
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

॥ ৭২ ॥

কমলাকান্ত বিশ্বাস

অদ্বৈত আচার্যের কিঙ্কর। এর উপরেই অদ্বৈতের সংসার-তদারকের ভার। জমাখরচও সেই রাখে, সেই দেখাশোনা করে।

অদ্বৈতের সঙ্গে সেও নীলাচলে গিয়েছে। হিসেব খতিয়ে দেখল অদ্বৈতের ঋণ হয়েছে। তখন, অদ্বৈতকে না জানিয়েই, সে রাজা প্রতাপরুদ্রকে চিঠি লিখল।

লিখল : অদ্বৈত আচার্য ঈশ্বরতত্ত্ব। তবু দৈবাৎ তার কিছু ঋণ হয়েছে। যদি তিনশো টাকা দেন, ঋণ শোধ হয়।

দৈবাৎ সে চিঠি রাজার হাতে না পড়ে প্রভুর হাতে পড়ল।

চিঠি পড়ে প্রভু দুঃখিত হলেন। অদ্বৈতকে ঈশ্বর বলা হয়েছে এটা কিছু দোষের নয়, কিন্তু ঈশ্বর দরিদ্র, ঈশ্বর ঋণী, এসব বলে কী করে? এসব বলে যে ঈশ্বরকে খর্ব করা হয়েছে। ভগবান শেষকালে রাজার কাছে গিয়ে টাকা চাইবেন?

প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন। গোবিন্দকে বললেন, আজ থেকে কমলাকান্তকে আমার এখানে আসতে দেবে না।

কমলাকান্তের দ্বারমানা হয়ে গেল।

কমলাকান্ত কাঁদতে বসল কিন্তু অদ্বৈত মহা-আনন্দিত। বললেন,

কমলাকান্ত, তোমার পরমভাগ্য প্রভু তোমাকে দণ্ড দিয়েছেন।

ভাগ্য? কমলাকান্ত চোখের জল মুছতে চাইল।

নিশ্চয়ই ভাগ্য। প্রভু তোমাকে স্নেহ করেছেন। যাকে প্রভু স্নেহ করেন তাকেই করুণা করে দণ্ড দেন।

কমলাকান্তকে আশ্বাস দিয়ে আচার্য নিজে প্রভুর কাছে গেল। বললে, প্রভু, তোমার লীলা বোঝা ভার। তুমি যে-কৃপা আমাকেও করলে না তাই তুমি আমার কিঙ্করকে করলে! আমি কী অপরাধ করেছি যে, তোমার দণ্ড-প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হলাম?

প্রভু হাসতে লাগলেন। গোবিন্দকে বললেন, কমলাকান্তকে ডাকো।

বা, তাকে আবার দর্শনও দেবে? অদ্বৈত আবার অনুযোগ করল: দু ভাবে আমাকে তুমি বিড়ম্বিত করবে? দণ্ডের বেলায়ও কিঙ্কর, দর্শনের বেলায়ও সে?

প্রভু বুঝলেন অদ্বৈতের মর্মকথা। এ তো সত্যিকার অভিযোগ নয়, এ প্রণয়কোপ।

কমলাকান্ত প্রভুর সামনে দাঁড়াল নতশিরে।

প্রভু বললেন, যাতে আচার্যের লজ্জাধর্মের হানি হয় এমন কাজ কখনো কোরো না। রাজধন কখনো যাচ্ঞা করে নেবে না। বিষয়ীর অন্ন খেলে মন দুষ্ট হয়, দুষ্ট মনে কৃষ্ণের স্মরণ হয় না। আর যদি কৃষ্ণস্মরণই না হয় তাহলে জীবনে আর ফল কী? যাও, আর কখনো এমন কাজ কোরো না।

কমলাকান্ত দণ্ডমুক্ত হয়ে গেল।

। ৭৩ ।

গোবিন্দ ঘোষ

কাটোয়ার অনতিদূরে অজয়ের পারে কুলাই গ্রামে গোবিন্দ ঘোষের আবির্ভাব। গোবিন্দও তার আর দুই ভাই বাসুদেব আর মাধবের মত গৌরাঙ্গের পদকর্তা। সুকণ্ঠ গায়ক। নীলাচলে রথযাত্রায় প্রভুর নৃত্যে তিনজনই কীর্তন করেছে।

দলবল নিয়ে প্রভু চলেছেন গৌড়ে, রামকেলির অভিমুখে। যত এগোচ্ছেন জনতা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে। যেন বিস্ফারিণী নদী বেগে-বলে বাড়তে বাড়তে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

এত বড় দলের খাওয়া জোটাবে কে?

আর কে! ভগবান জোটাবেন। যে গ্রামে যখন মধ্যাহ্ন পড়বে সেই গ্রামের লোকেরাই ভগবৎপ্রেরিত হবে। নিয়ে আসবে খাদ্যভার।

সেদিন ভিক্ষান্তে হঠাৎ মুখশুদ্ধির জন্যে হাত বাড়ালেন প্রভু।

গোবিন্দ ঘোষ কাছে ছিল, ছুটল গ্রামের দিকে। কোত্থেকে একটা হরীতকী যোগাড় করে আনল। তার থেকে এক খণ্ড দিল প্রভুকে।

পরদিন দল অগ্রদ্বীপে এসে পৌঁচেছে। ভিক্ষান্তে প্রভু আবার মুখশুদ্ধির জন্যে গোবিন্দের দিকে হাত বাড়ালেন।

গোবিন্দ তখুনি দ্বিতীয় খণ্ড হরীতকী দিল।

প্রভু বিস্ময় মানলেন। কাল যোগাড় করতে কত দেরি করেছিলে আর আজ চাওয়া মাত্রই পেয়ে গেলাম?

কাল যে হরীতকীটি পেয়েছিলাম তার থেকে কিছুটা আপনাকে দিয়ে বাকিটা রেখে দিয়েছিলাম। সরলমুখে বললে গোবিন্দ, সেই বাকিটার থেকেই দিলাম আজ।

তুমি তা হলে সঞ্চয় করেছিলে? প্রভু গম্ভীর হলেন।

গোবিন্দের মুখ শুকিয়ে গেল।

তোমার সঞ্চয়ের স্পৃহা যায়নি এখনো। ঈশ্বরে আসেনি তোমার সমগ্র নির্ভর। সুতরাং, প্রভু কঠিন হলেন, আমার সঙ্গ ছাড়ো। তোমার পথ ত্যাগের নয়, সঞ্চয়ের, সংসারের। গোবিন্দ, তুমি গৃহস্থ হও।

গোবিন্দ কাঁদতে লাগল। কিন্তু প্রভু তাকে সঙ্গে নিলেন না। রেখে গেলেন অগ্রদ্বীপে। প্রভু বললেন, তুমি কেঁদো না, তোমাকে দিয়ে অসাধ্যসাধন করাব। দেখাব ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা।

গঙ্গায় নেমে নাম করছে, কী একটা কালো মতন জিনিস ভাসতে ভাসতে এসে গোবিন্দের গায়ে ঠেকল। শ্মশানের পোড়া কাঠ বোধ হয়। স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে ফের নামধ্যানে তন্ময় হল গোবিন্দ।

তার হৃদয়ে গৌরহরি উদয় হলেন। বললেন, ওটা পোড়া কাঠ নয়। ওটাকে ধরো, ওটাকে ঘরে নিয়ে যাও।

ধরে ঘরে নিয়ে গেল গোবিন্দ। দেখল, সত্যিই তো, কাঠ নয়, কালো একখানি পাথর।

সদলে এলেন একদিন প্রভু। জিজ্ঞেস করলেন, কি, পেয়েছ যা পাঠিয়েছিলাম?

পেয়েছি।

ঐ পাথর দিয়ে বিগ্রহ স্থাপন করব।

ভাস্কর এল। নির্মিত হল শ্রীমূর্তি। গোবিন্দের কুটিরে প্রভু নিজহাতে তাকে স্থাপন করলেন। নাম দিলেন গোপীনাথ। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ।

গোবিন্দ, তুমি সংসারে থাকো আর গোপীনাথের সেবা করো। চলে গেলেন প্রভু।

গোবিন্দ বিয়ে করল। একটি ছেলে রেখে স্ত্রী মারা গেল। একা গোপীনাথের সেবা করছিল, এবার আবার শিশুর সেবার ভার পড়ল। দুজনকে সমানে সেবা করতে অসুবিধে হতে লাগল। কখনো গোপীনাথকে দুঃখ দিয়ে ছেলের সেবা করে, কখনো ছেলেকে দুঃখ দিয়ে গোপীনাথের সেবা করে। কে গোপীনাথ কে ছেলে বুঝে উঠতে পারে না।

পাঁচ বছরের হয়েছে, ছেলেটি মারা গেল।

শোকে পাগল হয়ে গেল গোবিন্দ। দিবানিশি ঠাকুরের সেবা করি, তার এই প্রতিফল! এ জীবন রাখব না। বিগ্রহের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে রইল। ঠাকুরের সেবা নেই, স্নানাহার নেই, কিছু নেই। থাক উপোস করে। দেখি কে ওকে খেতে দেয়!

গোবিন্দ, বাবা, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা জল দেবে না? বিগ্রহ কথা কয়ে উঠল।

অনড় হয়ে পড়ে রইল গোবিন্দ।

তোমার কি দয়ামায়া নেই? বললে আবার গোপীনাথ, একটা নিরীহ ছেলেকে তুমি না খাইয়ে রাখবে?

ছেলে? আমার ছেলে কোথায়? উঠে বসল গোবিন্দ।

দৈবে একটা ছেলে মরে গেলে আরেকটা ছেলেকে নিজের হাতে মেরে ফেলতে হয়?

তুমি আমার ছেলে? তুমি আমার ছেলে হয়ে আমাকে পুত্রশোক দিলে? বুক খালি করে নিয়ে গেলে ছিনিয়ে?

শোনো, তোমাকে একটা গোপনীয় কথা বলি। বললে গোপীনাথ, যে বাপের দুই ছেলে সেখানে আমি থাকতে পারি না পুত্র হয়ে। এক ছেলে ছিলাম, বেশ ছিলাম। তোমার যখন আরেক ছেলে হল, ভাবলাম ছেড়ে চলে যাই—

না, না, যেও না তুমি—

আমি যদি যেতাম তবে তুমি তোমার দুই ছেলেই হারাতে। আমাকেও পেতে না, আর তোমার ছেলেও মারা যেত। এখন সে ছেলে গেছে আমি আছি—তার মানে তোমার সে-ছেলেও আছে। বললে গোপীনাথ।

সে আছে? সে থাকলে আমার কত কাজ করত। তুমি করবে? গোবিন্দ আর্তনাদ করে উঠল।

বলো কী কাজ?

তুমি আমার শ্রাদ্ধ করবে?

যখন বলছ নিশ্চয়ই করব। তুমি আমার বাবা, তোমার আদেশ আমি অমান্য করব না। গোপীনাথ আশ্বাস দিল।

গোবিন্দ দেহত্যাগ করলে বিগ্রহের পদ্মচক্ষু দিয়ে বিন্দু-বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগল। পিতার মৃত্যুতে ছেলে শোকার্ত হবে না? ছেলে কি পাষাণ?

নতুন সেবায়েতকে স্বপ্ন দেখাল গোপীনাথ।

গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা। আমি এক মাস অশৌচ পালন করব আর হবিষ্যান্ন খাব। আমাকে স্নান করিয়ে কাচা পরিয়ে দাও। আমি আমার পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, আমি তার শ্রাদ্ধ করব, পিণ্ড দেব নিজের হাতে। সব বন্দোবস্ত করো।

স্বপ্ন-কথা সকলকে বললে সেবায়েত।

গোবিন্দের শ্রাদ্ধবাসরে সে কী ভিড়! গোপীনাথকে কাচা পরিয়ে আনা হল সভায়। আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল চারদিকে। নিজ হাতে গোপীনাথ গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ড দিল।

একেই বলে ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরকাষ্ঠা দেখানো।

নিজের ছেলে বেঁচে থাকলে সে আর ক-বছর শ্রাদ্ধ করত? গোপীনাথের মতন যে ছেলে সে আবহমানকাল রাখতে পারে প্রতিশ্রুতি।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে আসছে।

॥ ৭৪ ॥

কালিদাস

গৌড়ভক্তদের সঙ্গে কালিদাসও এসেছে নীলাচলে।

কে কালিদাস ?

রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতি-খুড়ো—বয়োবৃদ্ধ—সরল, উদার, মহা-ভাগবত। কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছু বলে না। কাউকে যদি ডাকতে হয়, হরেকৃষ্ণ বলে শব্দ করে, কাকে ডাকছে সম্বোধিত লোক বুঝতে পারে চকিতে! কী চাই, কী করতে হবে তাও ঐ হরেকৃষ্ণ শব্দ থেকেই বোঝা যায়। তার সমস্ত ব্যবহারের কৃষ্ণনামই একমাত্র সংকেত।

এমন কি যখন পাশা-খেলায় দান ফেলে তখনো কালিদাস বলে ওঠে, হরেকৃষ্ণ।

আর কী করে ?

ছোট-বড় বিচার না করে পরিচিত সকল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে। এই তার আবাল্য সাধন।

কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সে বৈষ্ণববাড়িতে যায়, গিয়ে বলে, উচ্ছিষ্ট করে দিন, আমি তাই খাব তৃপ্তি করে। যদি কেউ উচ্ছিষ্ট না দেয়, কালিদাস লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে কোথায় এ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়। তারপর সেই আবর্জনা থেকে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে এনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে খায়।

ঝড়ুঠাকুর বৈষ্ণব, কিন্তু জাতিতে ভুঁইমালি। তার বাড়িতে কতকগুলো আম নিয়ে একদিন হাজির হল কালিদাস। ঝড়ুঠাকুর ও তার স্ত্রীকে আম দিয়ে প্রণাম করল। কতক্ষণ বলল কৃষ্ণকথা।

ঝড়ুঠাকুর বললে, আমি নীচ জাতি আর তুমি সৎকুলোদ্ভব অতিথি—বলো কী দিয়ে তোমার সেবা করব ? আদেশ করো কোনো ব্রাহ্মণের ঘরে তোমার আহারের ব্যবস্থা করি। তুমি যদি প্রসাদ না পাও, অভুক্ত চলে যাও, তাহলে আমি বাঁচব না।

কালিদাস বললে, ঠাকুর, আমি পতিত, আমি পামর, তোমাকে দর্শন করে পবিত্র হতে এসেছি। তোমার কাছে আমার শুধু এক প্রার্থনা, তোমার পদরজ দাও, আমার মাথায় তোমার শ্রীচরণ রাখো।

ঝড়ুঠাকুর অস্থির হয়ে উঠল। বললে, ছি-ছি, ও কী কথা, ওকথা বলতে

নেই। আমি নীচ জাতি আর তুমি সুসজ্জন, তুমি অমন অসঙ্গত প্রার্থনা করো না।

কিন্তু শাস্ত্রে কী বলেছে? শ্লোক আবৃত্তি করে শোনাল কালিদাস: চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও যদি ভক্তিশূন্য হয় সে আমার প্রিয় নয় আর চণ্ডালও যদি আমাতে ভক্তিমান হয় সে আমার প্রিয় হয়। সুতরাং ভক্ত চণ্ডালকেই সৎপাত্র জ্ঞান করে দান করবে আর তার কাছ থেকেই প্রতিগ্রহ করবে। সে যে আমারই মত পূজ্য। আবার শোনো। কৃষ্ণচরণে ভক্তি নেই এমন দ্বাদশ-গুণযুক্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে কৃষ্ণচরণে মন বাক্য চেষ্টা অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করেছেন এমন চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি। কেননা সেই চণ্ডাল নিজের কুলকে পবিত্র করতে পারেন কিন্তু সেই বহুগর্বিত ভূরিমান ব্রাহ্মণ তা পারে না।

ঝড়ুঠাকুর বললে, হ্যাঁ, শাস্ত্রে তা বলেছে বটে কিন্তু আমার সেই ভক্তি কই? আমি শুধু হেয়কুলেই জন্মেছি, কৃষ্ণভক্তির কানাকড়িও আমাতে নেই।

কালিদাস আর কী করে, ফিরে চলল। ঝড়ুঠাকুর কয়েক পা এগিয়ে দিল কালিদাসকে।

ঝড়ুঠাকুর চলে গেলে ফিরে দাঁড়াল কালিদাস। দেখল পথের ধুলোয় ঝড়ুঠাকুরের পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে। সেই ধুলো তুলে নিয়ে মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে।

তারপর ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

ঝড়ুঠাকুর ঘরে ফিরে এসে সেই আম মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রকে নিবেদন করল। তারপর স্বামী স্ত্রীতে আম খেয়ে আঁঠি আর খোসা ফেলে দিল আঁস্তাকুড়ে। কালিদাস তা দেখল, পরে চুপিচুপি সেখান থেকে চোষা আঁঠি কুড়িয়ে নিয়ে চুষতে লাগল। আস্বাদনে প্রেমোল্লাস হল।

প্রভু জগন্নাথদর্শনে মন্দিরে যান, জলকরঙ্গ নিয়ে সঙ্গে যায় গোবিন্দ। সিংহদ্বারের উত্তরে বাইশ সিঁড়ির কপাটের আড়ালে একটা গর্ত আছে, সেখানে প্রভু প্রত্যহ পা ধোনন। পা ধুয়ে পরে সিঁড়ি ভেঙে যান ঈশ্বরদর্শনে। গোবিন্দকে বলে দিয়েছেন, দেখো, আমার পাদোদক যেন কেউ না নেয়।

মন্দিরে যাবার আগে প্রভু সেদিন পা ধুচ্ছেন, কালিদাস হাত পেতে এসে দাঁড়াল। একে একে তিন অঞ্জলি জল নিয়ে সে পান করল। তারপর প্রভু তাকে বারণ করলেন, বললেন, আর নয়, তোমার বাসনা এতেই পূর্ণ হয়েছে।

প্রভু জানেন কালিদাসের বৈষ্ণবশ্রদ্ধা, তাই যে প্রসাদ অন্যের পক্ষে দুর্লভ

তাই পাইয়ে দিলেন তাকে। বুঝিয়ে দিলেন শুধু বৈষ্ণবনিষ্ঠায়ই ভগবানের মহৎ কৃপা লাভ করা যায়।

দর্শনান্তে প্রভু ঘরে এসে আহার করছেন, দেখলেন বহির্দ্বারে কালিদাস প্রত্যাশা করে বসে আছে। প্রভু গোবিন্দকে ইঙ্গিত করলেন, গোবিন্দ কালিদাসকে প্রভুর ভুক্তাবশেষ খেতে দিল।

যে ঘৃণা-লজ্জা ছেড়ে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খেতে পারে সেই চূড়ান্ত কৃপার অধিকারী হয়। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম মহাপ্রসাদ আর ভক্ত-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের নাম মহা-মহা-মহাপ্রসাদ।

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পাদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল॥

এই তিনের সেবা থেকেই কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস। ভক্তপদধূলিতে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত শুধু যাগযজ্ঞ তপস্যা বা বেদপাঠ দ্বারা ভগবৎতত্ত্বের জ্ঞানোদয় হয় না। সাধুদের চরণধূলির মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় ভগবানের পদস্পর্শ।

কালিদাসই তার সাক্ষী।

॥ ৭৫ ॥

ভাগবত আচার্য

আসল নাম রঘুনাথ, উপাধি ভাগবতাচার্য। উপাধি প্রভুর দেওয়া।

গৌড়ে এসে আবার নীলাচলে ফিরে যাচ্ছেন প্রভু, পথে বরাহনগরে এক মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণের ঘরে এসে উঠলেন। সে ব্রাহ্মণ রঘুনাথ। তার একমাত্র গুণ—সে ভাগবত-পাঠে সুশিক্ষিত।

প্রভুকে পদার্পণ করতে দেখেই রঘুনাথ ভাগবত-পাঠ করতে শুরু করল।

সম্বর্ধনার সব চেয়ে বড় আয়োজন—ভাগবত-পাঠ।

প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। নৃত্যের সঙ্গে কখনো-কখনো হুঙ্কার-গর্জন। কখনো বা আকুল অশ্রুধারা। বাহ্যস্মৃতি হারিয়ে রাত্রির তিন প্রহর পর্যন্ত চলল এই নৃত্যাবেশ। পরিশেষে একটু সুস্থির হলে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, কারু মুখে এমন ভাগবত পড়া শুনিনি। আজ

থেকে তোমার নাম হল ভাগবতাচার্য। ভাগবত পড়া ছাড়া আর তোমার কোনো কাজ নেই।

শুধু গ্রন্থপাঠেই কৃষ্ণপ্রেম।

ভাগবতাচার্য গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীপাট বরাহনগরে।

॥ ৭৬ ॥

রঘুনাথদাস গোস্বামী

হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস দুই ভাই সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার—কায়স্থ সমাজের শিরোমণি। হিরণ্যদাস নিঃসন্তান। গোবর্ধনদাসের ছেলেই রঘুনাথ।

হরিদাস ঠাকুর বেনাপোল ছেড়ে চলে এসেছে চাঁদপুর। উঠেছে বলরাম আচার্যের বাড়িতে। চাঁদপুর সপ্তগ্রামের কাছেই আর বলরাম হিরণ্য-গোবর্ধনের পুরোহিত।

রঘুনাথ তখন বালক। পাঠশালায় পড়ে আর মাঝে মাঝে, ফাঁক পেলেই হরিদাস ঠাকুরকে দেখতে যায়। কাছে বসে তার কথা শোনে।

কে জানে কেন রঘুনাথের উপর হরিদাসের মন পড়ে। এই কৃপাই বুঝি শেষ পর্যন্ত তাকে চৈতন্যচরণ পাইয়ে দিল।

লক্ষপতির বংশধর, বিষয়ে বাল্যকাল হতেই উদাস রঘুনাথ। বাপ-জেঠা চিন্তিত, ছেলেটা এমন ছন্নমতি কেন? সবাই বললে, বিয়ে দিয়ে দাও। বিয়ে হলেই বিষয়ে আকৃষ্ট হবে।

অপ্সরার মত সুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে রঘুনাথের বিয়ে হল। কিন্তু বিয়ের পরেও তার ঔদাস্য ঘুচল না। মন বসল না বিষয়ে।

কানে এল গৌরহরি সন্ন্যাসী হয়ে শান্তিপুরে এসেছেন।

রঘুনাথ পাগলের মত হয়ে উঠল। চলল শান্তিপুর। সেও প্রভুর মত সন্ন্যাসী হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

প্রভুর কাছে অভিলাষ ব্যক্ত করল রঘুনাথ।

প্রভু তাকে নিবৃত্ত করলেন। বললেন, ঘরে বসেই ভগবদভজন করো।

ঘরে বসেই ভগবদভজন করে রঘুনাথ, কিন্তু মন সর্বক্ষণ নীলাচলে। কবে কত দিনে আবার দেখবে প্রভুকে। পাবে তাঁর চরণের প্রসাদ।

বারে-বারেই সে পালায়, প্রতিবারই ধরা পড়ে। প্রভু তাকে কেন টানছেন না? কেন ধরা পড়িয়ে দিচ্ছেন?

বংশের একমাত্র সন্তান, তার বাবা-জেঠা কিছুতেই আর শাসন শিথিল করতে প্রস্তুত নয়। ধনজন-স্ত্রী কিছুই তাকে বৈরাগ্য থেকে বিরত করতে পারল না। আবার সে বেড়ি কাটল। আবার সে ধরা পড়ল। এবার তাকে ঘরে বন্দী করা হল, খাড়া করা হল দিনরাতের পাহারা। পাঁচজন পাইক, চারজন ভৃত্য আর দুজন ব্রাহ্মণ।

এগারো জন তাকে ঘিরে রইল। না, কিছুতেই যেতে পাবে না নীলাচলে।

প্রভু রামকেলির পথে আবার শান্তিপুরে এসেছেন। রঘুনাথ বাবা-জেঠার পায়ে পড়ে মিনতি করল: অনুমতি করুন প্রভুর চরণ একবার দেখে আসি। নইলে এ দেহে জীবন আর থাকবে বলে ভাবতে পারছি না।

অনুমতি পেল রঘুনাথ। সঙ্গে অনেক লোক গেল যাতে পালাতে না পারে। গেল অনেক দ্রব্যসম্ভার, পূজার উপকরণ।

সাতদিন প্রভুর সঙ্গে-সঙ্গে থাকল। অহোরাত্র মনের মধ্যে শুধু এই জল্পনা কেমন করে রক্ষীদের পাহারা এড়িয়ে পালাব নীলাচল?

সর্বজ্ঞ প্রভু তার মনের কথা বুঝে আশ্বাসের সুরে বললেন, তোমার সংসারবিরক্তি দেখে আমি আনন্দিত। কিন্তু আমি বলছি লোক-দেখানো মর্কট-বৈরাগ্য না দেখিয়ে তুমি অনাসক্ত হয়ে যথাযোগ্য বিষয়ভোগ করো। যা লোকব্যবহার বাইরে তাই করে যাও, শুধু অন্তরে কৃষ্ণনিষ্ঠা করো। লোককে বুঝতে দিও না তোমার মনপ্রাণ কৃষ্ণে সংযুক্ত হয়ে আছে। সময় হলে আমিই তোমাকে ডেকে নেব।

নেবেন? রঘুনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আমি যখন উত্তর-পশ্চিমের তীর্থদর্শন সাঙ্গ করে ফের নীলাচলে ফিরব তখন তুমি চলে এস আমার কাছে। যথাকালে কৃষ্ণই তোমাকে ছলের উপায় করে দেবেন।

সে কবে?

অস্থির হয়ো না। ধৈর্য ধরো। সহসা কেউ ভবসিন্ধু পার হতে পারে না। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে হয়। মুগ্ধ না হয়ে বিষয়ভোগ করাও কঠিন।

রঘুনাথ শান্ত হল। ঘরে ফিরে গেল। যথাযোগ্য কাজকর্মে মন দিল। তার পরিবর্তন দেখে তার বাপ-মা খুশি হল। আবরণ কিছুটা তাই শিথিল হল। যে ছেলে শান্ত, কর্তব্যরত, তার আর প্রহরীর দরকার কী।

ধনী হলেই তার শত্রু থাকবে। মুলুক থেকে হিরণ্য-গোবর্ধনের থোক আদায় বিশ লাখ—নবাবের ঘরে বারো লাখ রাজস্ব দিয়ে নীট আট লাখ তারা ঘরে তোলে। এই ঐশ্বর্যে এক মুসলমান চৌধুরীর চোখ টাটাল। তারও চেয়ে বেশি, হিংসায় জলতে-পুড়তে লাগল। নবাবের সেরেস্তায় গিয়ে নালিশ জানাল। কোনো খবর রাখেন ? আমি তদন্ত করে দেখেছি মুলুকের আদায় এখন বিশ লাখেরও অনেক বেশি। কিন্তু রাজস্ব সেই বারো লাখই আছে। আদায় যদি বেড়ে যায় তা হলে রাজার প্রাপ্যও কি বাড়বে না ?

ঠিক বলেছ। তলব করো হিরণ্য-গোবর্ধনকে। নবাব ফরমান দিল।

রাজাকে কম দিয়ে নিজেরা বেশি খাচ্ছ এ কেমনতরো কথা ? চোখ আগুন করল নবাব : রাজস্ব দ্বিগুণ করতে হবে।

এ জুলুম, এ জবরদস্তি। হিরণ্য-গোবর্ধন মানল না ফরমান।

কুমিরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করা অসম্ভব।

হিরণ্য-গোবর্ধনের জমিদারি নবাব বাজেয়াপ্ত করল আর দু-ভাইকে ধরে নিয়ে এসে জেলে পোরবার হুকুম দিল।

নবাবের সৈন্য এসে বাড়ি ঘিরল। কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে পেল না। দু-ভাই আঁচ পেয়ে আগেই সরে পড়েছে।

তবে ছেলেটাকে ধরো।

হিরণ্য-গোবর্ধনকে না পেয়ে নবাবের সৈন্য রঘুনাথকে বেঁধে নিয়ে চলল।

বল তোর বাপ-জেঠা কোথায় ? উজির হুমকে উঠল।

তার আমি কী জানি। নির্ভীক রঘুনাথ দাঁড়াল মুখোমুখি।

কোথায় গেলে তাদের ঠিকানা পাওয়া যাবে ?

আমি কী করে বলব ?

তর্জনে-গর্জনে হবে না, উজির উৎপীড়নের ভয় দেখাল। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চরণে আশ্রয় নিয়েছে তার আবার ভয় কী।

না, শুধু কথায় কাজ হবে না, সরাসরি প্রহার দরকার। প্রহারই বশীকরণের একমাত্র ওষুধ। মার খেলেই ছেলেটা অন্ধিসন্ধি সব বলে দেবে।

কিন্তু ছেলেটার মুখে কী যেন মাখানো আছে, মারতে হাত ওঠে না।

কেন কে জানে মনের মধ্যে কে ডাক দেয়, মারলে ভালো হবে না পরিণাম।

আর ছেলেটার কী মিষ্টি কথা! কী বিনয়নম্রতা! কণ্ঠস্বরেই মনের কাঠিন্য নরম হয়ে আসে!

কেন অপ্রতুল হচ্ছেন? ব্যাপার তো অতি সামান্য—এ তো নির্বিবাদেই মীমাংসা করে নেওয়া চলে। অধিপতিকে রঘুনাথ বললে মধুস্বরে, আমার বাপ-জেঠা তো আপনারই ভায়ের মত। ভায়ে-ভায়ে সব জায়গায়ই ঝগড়া হয়, আবার সহজেই মিটমাট হয়ে যায়। আমি যেমন আমার বাবার ছেলে তেমনি আবার আপনারও ছেলে। আমার বাবা যদি আমার আবদার রাখেন, আপনিও বা রাখবেন না কেন?

অধিপতির মন আর্দ্র হল। ছেড়ে দিল রঘুনাথকে।

বাবা-জেঠাকে নবাবের দরবারে নিয়ে এল রঘুনাথ। কিছু রাজস্ব বেশি নাও আর জমিদারি ফেরত দাও।

মীমাংসা এত সহজ ছিল তা কে জানত। হিরণ্য-গোবর্ধন আবার তাদের পুরোনো স্বত্বে অধিষ্ঠিত হল।

কিন্তু এ কী উৎপাত!

রঘুনাথের প্রতি বাড়ির সকলের স্নেহমমতা প্রবলতর হয়ে উঠল। সন্দেহ কী, রঘুনাথের জন্যেই নবাবের রোষ নিবারিত হয়েছে, ফিরে এসেছে তালুক-মুলুক।

সংসারের সোনার শিকল রঘুনাথের সারা গায়ে কাঁটা হয়ে উঠল।

একদিন রাতে, চুপিচুপি পালাল ঘর ছেড়ে।

গোবর্ধন আবার তাকে ধরে আনল।

ছেলে আমার পাগল হয়ে গিয়েছে, মা আকুল হয়ে বললে, ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখো।

বিষণ্ণ মুখে গোবর্ধন বললে, দড়ির সাধ্য কী ওকে বাঁধে। অপ্সরার মত স্ত্রী, ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্যও ওকে বশ করতে পারল না। আর সত্য কথা বলতে কী, জন্মদাতা পিতাও পুত্রের প্রারব্ধ খণ্ডাতে অসমর্থ। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ওর যদি সংসারে বৈরাগ্য এসে থাকে, সে ফল কেউ হরণ করতে পারবে না।

তাই বলে যে পাগল তাকে তুমি বেঁধে রাখবে না? মা কেঁদে পড়ল।

গোবর্ধন বললে, যে চৈতন্যচন্দ্রের জন্যে পাগল তাকে বাঁধবার দড়ি নেই।

রঘুনাথের ভাবনা ধরল—বারে-বারে পালাই, বারে-বারেই ধরা পড়ি কেন? তবে কি নিজের চেষ্টায় চৈতন্যচন্দ্রের কাছে পৌঁছুতে পারব না? তবে কি নিত্যানন্দের কৃপা দরকার? সংসারসমুদ্র পার করে চৈতন্যবন্দরে পৌঁছে দেবার ভেলাই কি নিত্যানন্দ?

সন্দেহ নেই, নিতাইই চৈতন্যহেতু। নিতাইই চৈতন্যসেতু।

রঘুনাথ বুঝল নিতাই দরজা খুলে না দিলে চৈতন্যমন্দিরে ঢোকা যাবে না। তাই সে চলল নিতাই-সাক্ষাতে।

বাবার কাছে যাবার অনুমতি চাইল। নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে আছেন, সেখানে নিত্য-উৎসব চলেছে, আমি যাই দেখে আসি।

ফিরে আসবে তো? জিজ্ঞেস করল গোবর্ধন।

আসব।

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে উচ্চভূমিতে জ্যোতির্ময় দেহে নিত্যানন্দ ভক্ত-পরিবৃত হয়ে বসে আছে, রঘুনাথ এসে দণ্ডবৎ করল।

নিতাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, চোর! এতদিন পর ধরা দিলে?

চোর?

চোর নয়তো কী। নিতাইয়ের সম্পত্তি গৌরচরণ যে নিতে চায় লুকিয়ে, যার সম্পত্তি তাকে না জানিয়ে, সে একশোবার চোর। চুরির যে চেষ্টা করে সেও চোর। কিন্তু চোর হয়েও, যাই বলো, সে প্রিয়, সে সুজন, সে মনোচোর।

নিতাই নিজেই রঘুনাথের মাথা কাছে টেনে নিজের পায়ের উপর রাখল। বললে, যখন ধরতে পেরেছি তখন তোমাকে দণ্ড দেব।

দণ্ড মাথা পেতে নেবার জন্যে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল রঘুনাথ।

আমাদের সকলকে দই-চিঁড়া খাওয়াও।

এই দণ্ড!

মহানন্দে বাড়িতে খবর পাঠাল রঘুনাথ। প্রচুর অর্থ, দ্রব্যসম্ভার ও লোকজন আনাল। দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দিল পানিহাটিতে মহোৎসবের মেলা বসবে, যে যা পারো চিঁড়ে দই কলা চিনি ক্ষীর সন্দেশ নিয়ে এস, সব রঘুনাথ উচিত দামে কিনে নেবে। আর যেখানে যত ভক্ত আছে সকলের নিমন্ত্রণ। যে আসবে সেই পরিপূর্ণ প্রসাদ পাবে। সর্বত্র অঢেল, ধনে জনে

কুণ্ঠা নেই কোথাও। শুধু চলে এস। উপস্থিত হও। রঙ্গ দেখে যাও।

পার্ষদেরা অনেকে এসেছে। রামদাস, সুন্দরানন্দ, গঙ্গাধর, মুরারি, কমলাকর। আর এই যে সদাশিব কবিরাজ। পুরন্দর পণ্ডিত, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাসও এসেছে। সবাই নাম-প্রেম-প্রচার-লীলার সঙ্গী। আর এসেছে গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস, মহেশ, উদ্ধারণ দত্ত। আরো কত শত, কে গোনে, কে হিসেব করে!

রাঘবের বাড়িতেই নিতাইয়ের আড্ডা। রাঘবকে দেখে নিতাই বললে, আমি গোপদের নিয়ে পুলিনভোজন করছি। তুমিও বসে যাও।

এ বুঝি নিতাইয়ের বলরামের ভাব। সেই যে রাখাল-সখাদের নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম যমুনাপুলিনে ভোজন করেছিল এ বুঝি সেই স্মৃতি। তাই যদি, তবে কৃষ্ণ কোথায়?

নিতাই মহাপ্রভুর ধ্যান করল আর মহাপ্রভু অমনি আবির্ভূত হলেন।

নিতাই মহাপ্রভুকে নিয়ে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু সবাই নিতাইকেই দেখছে, মহাপ্রভুকে দেখছে না। আর প্রত্যেকের মালসা থেকে এক এক গ্রাস চিঁড়ে নিয়ে তাঁরা যে পরস্পরকে খাইয়ে দিচ্ছেন তাই বা কে দেখে!

নিজের পাশে আসন পাতল নিতাই। সে আসনে নিমাই বসল। দু ভাই পাশাপাশি বসে চিঁড়ে খেতে লাগল।

এমন কে ভাগ্যবান আছে যে এ দৃশ্য দেখে।

হরি-হরি ধ্বনি তোলো। আদেশ করল নিত্যানন্দ।

সন্দেহ কী, রঘুনাথের প্রতি এ নিতাইয়ের কৃপা। শুধু তার সামগ্রীই অঙ্গীকার করল না, মহাপ্রভুকে উৎসবে টেনে নিয়ে এল। তার অর্থই রঘুনাথকে নিতাই চৈতন্যচরণ দান করলে।

রঘুনাথ কোথায়? সে বসেনি। নিতাই-ই তাকে বসতে দেয়নি। নিতাই যে তাকে গৌরহরির ভুক্তাবশেষ প্রসাদ খাওয়াবে।

রঘুনাথ জানল এ বুঝি নিত্যানন্দের প্রসাদ! নিত্যানন্দের প্রসাদই তো গৌরহরির করুণার আস্বাদ দিয়ে ভরা।

রাঘবমন্দিরেও নিতাইয়ের পাশে বসে গৌরহরি ভোজন করলেন। দু ভাইয়ের অবশিষ্টপাত্র রঘুনাথকে উপহার দিল রাঘব। বললে, তুমি চৈতন্যগোসাঁইয়ের প্রসাদ পেলে, তোমার সর্ববন্ধন ছিন্ন হল।

কোথায় চৈতন্যগোসাঁই ? ব্যাকুল হল রঘুনাথ।

তিনি নীলাচলে। তিনি আবার ভক্তচিত্তে, ভক্তগৃহে। তিনি কখনো ব্যক্ত, কখনো গুপ্ত। কখনো মানুষের মত হাঁটেন, কখনো ভগবানের মত আবির্ভূত হন। তিনি সর্বব্যাপী। তাঁর ইচ্ছায় তাঁর গতি-স্থিতি। সংশয় করতে যেও না। সংশয়েই সর্বনাশ।

না, সংশয় করি না। রঘুনাথ এবার নিতাইয়ের পা আঁকড়ে ধরল : কিন্তু তিনি না আসুন, আমি তাঁর কাছে যাই কী করে ? চাঁদ যদি নিজে থেকে নেমে না আসে বামন তাকে ধরে কী করে ? যতবার ঘর ছেড়ে পালাতে যাই, ধরা পড়ি, মা-বাবা কঠোরতর শাসনে বেঁধে রাখেন। আমি আর কিছু চাই না, শুধু চৈতন্য চাই, বন্ধনহীনতার চৈতন্য। তোমার কৃপা ছাড়া চৈতন্য অলভ্য, তুমি আমাকে কৃপা করো। জানো আমি অযোগ্য, কিন্তু অযোগ্য-অকৃতীরই তো কৃপালাভে অগ্রগণ্য অধিকার।

নিত্যানন্দ ভক্তবৈষ্ণবদের বললে, তোমরা সব দেখ। রঘুনাথের ইন্দ্রসুখের মত বিষয়সুখ, কিন্তু চৈতন্যকৃপায় এতে তার রুচি নেই। যে একবার কৃষ্ণপাদপদ্মের গন্ধ পায় সে ব্রহ্মলোকের সুখও অগ্রাহ্য করে।

তাকাল রঘুনাথের দিকে। সস্নেহে বললে, তোমার পুলিনভবনে চৈতন্য এসেছিলেন, খেয়ে গেলেন দই-চিঁড়া। রাত্রে নাচ দেখতে এসে রাধারাণীর রান্না খেয়ে গেলেন। তুমি দুবার তাঁর প্রসাদ পেলে। এ সব কেন ? তোমাকে উদ্ধার করতেই এই আয়োজন। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাও। গৌরাঙ্গ তোমাকে ঠিক তাঁর অন্তরঙ্গ ভৃত্য করে নেবেন।

তবে আর কথা কী। নিত্যানন্দের সেবার জন্যে ভাণ্ডারীর হাতে রঘুনাথ কিছু অর্থ আর সোনা দিল গোপনে। বললে, এখন নয়, প্রভু যখন নিজের ঘরে ফিরে যাবেন তখন বলবে। আর শুধু প্রভুকে নয়, প্রভুর ভৃত্য ও আশ্রিত সকলকেই আমি সেবা-প্রণাম জানাতে চাই।

রাঘব প্রকাণ্ড ফর্দ তৈরি করল। যাকে যা বলল তাই রঘুনাথ দিল নির্বিচারে।

আর এই সামান্য আপনার জন্যে। রঘুনাথ রাঘবকেও সোনা আর টাকা দিল। সকলের আশীর্বাদ মাথায় করে বাড়ি ফিরল।

বাবার কাছে দেওয়া কথা রাখল। এখন দেখি নিত্যানন্দ কেমন তাঁর কথা রাখেন। কেমন গৌরহরি তাকে টেনে নেন অন্তরঙ্গ করে।

রঘুনাথ আর অন্দরমহলে যায় না, বাইরে দুর্গামণ্ডপে পড়ে থাকে। সেইখানেই প্রহরীরা পাহারা দেয়। আর রঘুনাথ একান্তে ভাবে কবে আসবে সেই সুবর্ণসুযোগ।

গৌড়ের ভক্তেরা নীলাচলে চলেছে, তাদের সঙ্গ ধরা কত সহজ হত। কিন্তু সেই পথ সকলের জানা, প্রহরীরা ঠিক ধরে আনত তাকে। এমন সুযোগ কি আসে না যখন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অজানা পথ ধরে চলে যাওয়া যায়?

চারদণ্ড রাত্রি বাকি আছে, একদিন মণ্ডপে যদুনন্দন আচার্য এসে হাজির। যদুনন্দন রঘুনাথদের কুল-পুরোহিত, দীক্ষাগুরু অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য।

রঘুনাথের ঘুম ভেঙে গেল। যদুনাথকে দণ্ডবৎ করে দাঁড়াল নীরবে।

আমার যে পূজুরী ছিল সে আর পূজো করতে আসছে না। বললে রঘুনন্দন, তুমি যদি তাকে বলে-কয়ে পাঠিয়ে দিতে পারো তবে ভালো হয়। সে ছাড়া আর ব্রাহ্মণ নেই।

রঘুনাথ প্রহরীদের দিকে তাকাল। তারা সুখনিদ্রায় অচেতন।

রঘুনাথ বললে, বেশ তো, আমাকে আপনি আদেশ করুন, আমি যাই।

যদুনাথ ভাবলে, প্রহরী ছাড়া একাকী যাবারই অনুমতি চাইছে রঘুনাথ। বললে, যাও।

রঘুনাথ গুরু-আজ্ঞা পেয়েছে, নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ল। প্রহরীরাও জেগে উঠে শুনল সব, ভাবল পূজুরীকে নিয়ে ফিরে আসবে রঘুনাথ। যদুনাথ বা প্রহরী, কেউ কল্পনাও করতে পারল না এই ছলনার সুযোগ নিয়ে রঘুনাথ নীলাচলে পালাবে।

ছলে বলে কৌশলে যে করে হোক, পৌঁছুনো নিয়ে কথা। সন্দেহ কী, স্বয়ং কৃষ্ণই এই ছলনা রচনা করে পাঠিয়েছেন।

পথ ছেড়ে উপপথ ধরল রঘুনাথ। গ্রাম ছেড়ে বনজঙ্গল। পথ যাই হোক, গন্তব্য চৈতন্যচরণ। গোপন পথ হলেও, পাছে প্রহরীরা ধরে ফেলে তাই ছুটে চলেছে। তর সয় না, ছুটেছে উর্ধ্বশ্বাসে।

রঘুনাথ পালিয়েছে, রঘুনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না—এদিকে রব উঠেছে বাড়িতে। খবর পেয়ে যদুনন্দন তো হতবাক। গোবর্ধন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই নীলাচলের পথে গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গে ভিড়েছে। শিবানন্দকে পত্র দিয়ে লোক পাঠাল গোবর্ধন। দয়া করো, আমার ছেলেকে

ফেরত পাঠিয়ে দাও।

ওদিকে পনেরো ক্রোশ হেঁটে সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালার বাথানে এসে পৌঁচেছে রঘুনাথ।

চোখমুখ শুকনো, সারাদিন কিছু খাওনি মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করল গোয়ালা, দুধ খাবে?

ধনীর দুলাল রঘুনাথ হাসল।

গোয়ালা দুধ এনে দিল। তাই খেয়ে সারারাত বাথানে পড়ে রইল রঘুনাথ।

ভোরে উঠে, এতক্ষণ পূব দিকে যাচ্ছিল, রঘুনাথ দক্ষিণ দিকে চলল।

শিবানন্দের কাছে পত্র পৌঁছুল। কোথায় রঘুনাথ? কই আমাদের সঙ্গে আসে নি তো। কাকে ফেরাব?

গোবর্ধনের লোকই দিশপাশ না পেয়ে ফিরে চলল।

আর ওদিকে রঘুনাথ সমানে হাঁটছে, হেঁটে চলেছে। কখনো চর্বণ, কখনো রন্ধন, কখনো দুগ্ধপান, কখনো বা নিরম্বু উপবাস। জীবনের অহোরাত্রের ক্ষুধা—একমাত্র চৈতন্যচরণ। সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে কবে?

বারো দিন পরে—বারো দিনের মধ্যে তিন দিন মাত্র ভোজন করেছে—রঘুনাথ পুরুষোত্তমে পৌঁছুল।

এই যে রঘুনাথ এসেছে। রঘুনাথ নিজেই ঘোষণা করল।

এসেছ? এস। প্রভু উঠে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, কৃষ্ণকৃপা সব চেয়ে বলিষ্ঠ। তোমাকে তা বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

রঘুনাথ বললে, আমি কৃষ্ণ জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি। তোমার কৃপাই আমাকে নিয়ে এল এখানে।

এর বাপ আর জেঠা বিষয়বিষকেই সুখসেব্য বলে মনে করে। সকলকে লক্ষ্য করে বললেন প্রভু, এদের অনেক দানধ্যান কিন্তু এদের কৃষ্ণকামনা নেই, নেই বা অনন্যা কৃষ্ণভক্তি। বিষয়ের এমনি স্বভাব, মানুষকে অন্ধ করে রাখে। এমন কর্ম করায়, যাতে ভববন্ধন আরো দৃঢ় হয়। তোমাকে সেই বিষয় থেকে কৃষ্ণ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু দেখেছ, ছেলেটার শরীর কী রকম কৃশ হয়ে গিয়েছে, মুখখানি ম্লান! স্বরূপ, তুমি এর ভার নাও, একে তুমি তোমার ছাত্র-ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করো। আজ থেকে এর নাম হল 'স্বরূপের রঘুনাথ'। বলে রঘুনাথের হাত ধরে স্বরূপের হাতে তুলে দিলেন।

স্বরূপ বললে, তাই হবে।

প্রভু তারপর গোবিন্দকে বললেন, কতদিন উপবাসে থেকেছে, তুমি ভালো করে খাইয়ে এর তৃপ্তিবিধান করো। রঘুনাথকে লক্ষ্য করলেন: তুমি যাও, সমুদ্রস্নান সেরে জগন্নাথ দর্শন করে এস।

পাঁচ দিন গোবিন্দের তত্ত্বাবধানে রইল রঘুনাথ। প্রভুর অবশেষ-পাত্র খেল পেট ভরে। ভাবল, এও তো সেই বাড়ির মত আদর-যত্নেই আছি, দিব্যি মুখের কাছে অনায়াসে খাবার এসে জুটছে। তবে তো সেই আত্ম-সুখস্পৃহাতেই আবদ্ধ রইলাম। না, ফিরিয়ে দিল গোবিন্দকে, বললে, ভিক্ষে করে খাব।

ভিক্ষার্থী হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ। যদি কিছু জোটে, খাব, না জোটে তো থাকব উপোস করে। আর সর্বক্ষণ নামকীর্তন করব।

গোবিন্দ প্রভুকে গিয়ে বললে, রঘুনাথ আর খাচ্ছে না, আমার থেকে। সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছে।

এই তো নিষ্কিঞ্চন বৈরাগীর লক্ষণ। প্রভু আনন্দিত হয়ে বললেন, খুব ভালো করছে।

যে বৈরাগী সে অবিচ্ছেদে নামকীর্তন করবে। আহারের জন্যে উদ্বিগ্ন হবে না, সঞ্চয়-সংস্থান কিছু করবে না। ভিক্ষে করে যেটুকু পায় তা দিয়েই দেহরক্ষা করবে—দেহরক্ষা না হলে ভজনকীর্তন হবে কিসে? ভিক্ষান্নই অহঙ্কারমুক্ত, ভিক্ষান্নেই কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদগন্ধ।

একদিন স্বরূপকে ধরল রঘুনাথ।

বলুন আমার কী কর্তব্য? প্রভু আমাকে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন—তাঁর উদ্দেশ্য কী?

প্রভুকে বিশেষ সম্ভ্রম করে, তাই সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়। স্বরূপকে দিয়ে বলে পাঠাল। স্বরূপ জিজ্ঞেস করলে, রঘুনাথ জানতে চেয়েছে কী তার করণীয়।

রঘুনাথকে ডেকে পাঠালেন প্রভু। বললেন, স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করে দিয়েছি, ওর কাছ থেকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখে নাও। ও যত জানে আমার তত জানা নেই। তবু আমার বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তোমাকে বলি, কখনো গ্রাম্যবার্তা শুনবে না, কখনো বলবেও না। ভালো

খাবার-পরবার লোভ করবে না। অমানীমানদ হয়ে সর্বদা কৃষ্ণনাম নেবে আর মানসব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করবে। আমি সংক্ষেপে বললাম, বিশদ-বিশেষ জেনে নেবে স্বরূপের থেকে।

গৌড়ভক্তেরা এসে পড়েছে, পূর্ববৎ শুরু হল আনন্দলীলা।

শিবানন্দ রঘুনাথকে বললে, তোমার বাবা তোমার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিল, আমরা তাদের ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, রঘুনাথ আমাদের সঙ্গে আসে নি। কোথায় আছে কী করে বলব। কী করে জানব তুমি আগেই এখানে এসে হাজির হয়েছ।

উৎসবান্তে, চার মাস পরে, গৌড়ভক্তেরা গৌড়ে ফিরে এল। তাদের কাছে যদি কোনো খবর পাওয়া যায় সেই আশায় শিবানন্দের কাছে লোক পাঠাল গোবর্ধন।

গোবর্ধনের ছেলে রঘুনাথকে কি নীলাচলে দেখলেন ?

দেখলাম বইকি। প্রভু তাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

সে কি বাড়ি ফিরবে ?

মনে হয় না। বললে শিবানন্দ, তাকে বৈরাগ্য আচ্ছন্ন করেছে। তার ভক্ষ্যে-পরিধানে দৃষ্টি নেই। দশ দণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলির পর সে সিংহদ্বারে এসে দাঁড়ায়, যদি কেউ ভিক্ষে দেয় তো খায়, নয় তো খায় না, উপোস করে থাকে।

চোখে জল, গোবর্ধন শুনল সব বিবরণ। বেঁচে আছে এতে তার আনন্দ, কিন্তু আর যে ফিরবে না এটাই দুর্বিষহ যন্ত্রণা।

ছেলের পরিচর্যার জন্যে চাকর আর টাকা পাঠাতে মনস্থ করল গোবর্ধন। শিবানন্দ বললে, এখন কোথায় যাবে, কার কাছে পৌছুবে ঠিক নেই। এখন থাক, পরের বছর আমি যখন আবার যাব তখন সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

তাই ভালো। পরের বছর গৌড়ভক্তেরা যখন যাচ্ছে তখন শিবানন্দের সঙ্গে গোবর্ধন লোক আর টাকা পাঠিয়ে দিল। দুই চাকর, এক ব্রাহ্মণ আর চারশো টাকা।

যথারীতি সকলে পৌছুল নীলাচল। রঘুনাথের সাক্ষাৎ পেল। এই নাও, এই সব আরাম-সম্ভার তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রঘুনাথ সমস্ত অগ্রাহ্য করে দিল।

ব্রাহ্মণ আর ভৃত্য দেশে ফিরল না, নীলাচলেই অপেক্ষা করতে লাগল।

রঘুনাথ ভাবল, তবে এক কাজ করি। বাবার দেওয়া টাকা থেকে প্রভুকে মাসে দু দিন মহাপ্রসাদ খাওয়াই।

গৌরহরি নিমন্ত্রণ নিতে রাজী হলেন। মাসে দু দিন।

দু দিনের মহাপ্রসাদ কিনতে আট পণ মাত্র কড়ি লাগে। ঠিক সেই আট পণ কড়িই রঘুনাথ বাবার ভৃত্যদের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। কদাচ এক কড়ি বেশি নয়। অর্থাৎ এক কপর্দকও নিজের জন্যে নয়। যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকু, তাও প্রভুর জন্যে। তাও এক মাসে আট গণ্ডা।

টানা দু বছর এভাবে প্রভুর সেবা করল রঘুনাথ।

তারপর হঠাৎ একদিন নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিল।

কী ব্যাপার? স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু, রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করল কেন?

স্বরূপ বললে, রঘুনাথের মনে একটি বিচার উপস্থিত হয়েছে, তাই বন্ধ করেছে নিমন্ত্রণ।

কী বিচার?

বিষয়ীর দ্রব্য দিয়ে প্রভুর সেবা করছি এতে প্রভুর মন নিশ্চয়ই প্রসন্ন নয়। এতে আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর তো কোনোই ফল দেখছি না। রঘুনাথ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে মহাপ্রসাদ দিচ্ছে—শুধু এই অহঙ্কার দিয়ে কী হবে? আমার প্রার্থনা না মানলে আমি দুঃখ পাব তারই জন্যে প্রভু নিমন্ত্রণ নিতে রাজী হয়েছিলেন—কিন্তু এতে তাঁরও প্রসন্নতা নেই আর আমার মনও মালিন্যময়।

প্রভু হাসলেন। বললেন, বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়। আমি যে এতদিন রঘুনাথের নিমন্ত্রণ নিয়েছি তার কারণ ওকে দুঃখ দিতে চাইনি। ও যে নিজের থেকে বুঝেছে, নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে, এই আমার আনন্দ।

রঘুনাথ তারপর সিংহদ্বারও ছেড়ে দিল, ছত্রে গিয়ে ভিক্ষে করতে লাগল।

হ্যাঁ হে, রঘুনাথ নাকি ভিক্ষের জন্যে সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন স্বরূপকে।

কে দেবে কে না দেবে এই আশা-নিরাশায় চিত্ত চঞ্চল হয়ে থাকে বলে দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছে।

ঠিক করেছে। প্রভু সমর্থন করলেন: সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। ছত্রে যথালাভ উদরভরণ অনেক ভালো। সেখানে আর মনে-মনে আশায়-নিরাশায় আন্দোলিত হওয়া নেই। তফাত মনে-মুখে

কৃষ্ণনাম করতে পারবে। স্বরূপ, এই শিলা আর মালা নিয়ে যাও, রঘুনাথকে দিও।

শঙ্করারণ্য সরস্বতী গোবর্ধনের শিলা আর গুঞ্জমালা নিয়ে এসেছিল বৃন্দাবন থেকে। প্রভুকে উপহার দিয়েছিল। লীলাস্মরণের সময় ঐ মালা প্রভু গলায় পরতেন আর ঐ শিলা কখনো মাথায় ধরতেন, কখনো বুকে, কখনো তার ঘ্রাণ নিতেন আর কখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চোখের জলে তাকে স্নান করিয়ে দিতেন। এ তো সামান্য শিলা নয়, এ আমার কৃষ্ণকলেবর। তিন বছর এই শিলা-মালা ধারণ করেছেন, আজ তা রঘুনাথকে দিয়ে দিলেন।

বললেন, রঘুনাথ, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ, এর তুমি সাত্ত্বিক পূজো করো। এক পাত্র জল নাও, আর নাও আটটি তুলসীমঞ্জরী, তাই দিয়ে তুমি শুদ্ধভাবে, শ্রদ্ধায়, নিবেদন করো শিলাকে, তুমি অচিরেই কৃষ্ণপ্রেমধন পেয়ে যাবে।

স্বরূপই সব যোগাড় করে দিল। শিলার বসবার জন্যে একখানি পিঁড়ি, আচ্ছাদনের আধ হাত বস্ত্র আর জলের জন্যে একটি কুঁজো।

প্রাণ-মন ঢেলে পূজো করতে লাগল রঘুনাথ। এ আর কেউ নয়, প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্ধন-শিলা। যতই প্রভুর এই করুণার কথা ভাবে ততই রঘুনাথ প্রেমাশ্রুতে ভেসে যায়। এই জল-তুলসীর পূজায় যত সুখ তত সুখ তো সাড়ম্বর ষোড়শোপচার পূজায় নেই। আর এ শিলা কোথায়, স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন এসে দাঁড়িয়েছেন।

স্বরূপ বললে, আট কড়ির খাজা সন্দেশ নিবেদন করো শিলাকে। যদি শ্রদ্ধা করে দাও, সেই খাজা সন্দেশই অমৃতের সমান হয়ে উঠবে।

স্বরূপের আদেশে গোবিন্দই নিয়ে আসছে সেই খাজা সন্দেশ। ধনীর দুলাল রঘুনাথ সর্বস্বত্যাগের পরমদৈন্যে সেই খাজা সন্দেশ দিয়েই বিগ্রহের ভোগ দিচ্ছে।

আর শুধু কৃষ্ণ কোথায়? সঙ্গে যে রাধাঠাকুরাণী।

শিলা দিয়ে প্রভু আমাকে গিরিগোবর্ধনের চরণে সমর্পণ করলেন আর গুঞ্জমালা দিয়ে রাধিকার চরণে।

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ হল। প্রভুই তো আমার যুগলকিশোর।

কী কঠিন নিয়মে বন্দী রঘুনাথ! কোথাও এতটুক সময়ভঙ্গ নেই, নেই ছন্দচ্যুতি। 'রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।' পাষাণের রেখা যেমন

নিশ্চল তেমনি রঘুনাথের নিয়মনিষ্ঠাও অভঙ্গ। দিন-রাত্রির আটপ্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই সে ভজন করে, আহার ও ঘুমের জন্যে বরাদ্দ মোটে চার দণ্ড। কোনো কোনো দিন ভজন-আবেশে সে এত তন্ময় হয়ে যায়, আহার-নিদ্রার অবকাশই থাকে না।

জিহ্বাকে কোনোদিন রসস্পর্শ দিল না, ছেঁড়া-কানি ছাড়া কিছু ঠেকাল না গায়ে। আর আহার শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। ভালো না-খাওয়া আর ভালো না-পরার আদেশ রাখল প্রাণপণে। আর সর্বক্ষণই নিজেকে নির্বেদ-বচন শোনাচ্ছে। হায়, আমি দারুণ হতভাগ্য, আমি নিজের স্বরূপ ভুলে দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করছি। এখনো আমি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছি, এখনো আমার অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন। ঘুরে ফিরে আমার এখনো এই আত্মসেবা!

রঘুনাথ ছত্রে গিয়ে মেগে খাওয়াও ছেড়ে দিল। এতেও পরাপেক্ষা আছে। কতক্ষণে ছত্রের মালিক বা মালিকের কর্মচারী ভিক্ষান্ন নিয়ে আসে তারই জন্যে থাকতে হয় উৎকণ্ঠিত হয়ে। সুতরাং এই চাঞ্চল্যভোগও বিসর্জন দাও।

রঘুনাথ ফেলে-দেওয়া বাসি পচা প্রসাদান্ন খেতে লাগল কুড়িয়ে।

আনন্দবাজারে প্রসাদান্ন সমস্তই রোজ বিক্রি হয় না। বাসি অন্নও থেকে যায় কিছু-কিছু। দু-তিন দিনের বাসি হয়ে গেলে সে অন্ন আর কেউ কেনে না। তখন সে পচা দুর্গন্ধ অন্ন গরুর সামনে ফেলে দেয়। অনেক সময় অন্নের এমন দুরবস্থা, গরুও তা মুখে তোলে না। সেই গলিত প্রসাদান্নই রঘুনাথ মাটি থেকে ঘরে তুলে নিয়ে আসে, জল দিয়ে ধুয়ে গলিতাংশ বাদ দিয়ে শক্ত শক্ত ভাত কটি নুন দিয়ে মেখে খায়।

প্রসাদ কি কখনো পচে, না দুর্গন্ধ হয়? প্রসাদ তো চিদ্‌বস্তু, সে বাসিও হয় না, বিকৃতও হয় না। সে চিরন্তন অমৃতস্বরূপ হয়ে থাকে। আগুন কি কখনো ঠাণ্ডা হয়? তুষার কি কখনে উষ্ণ হয়? তেমনি প্রসাদও তার ধর্ম ছাড়ে না, সে চিরকাল অবিকৃত থাকে। প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিবিচারেই প্রসাদকে বাসি দেখায়, গলিত দেখায়। প্রাকৃত চক্ষুতে চিন্ময় ভগবদ্‌-বিগ্রহকেও যেমন দেখায় সামান্য প্রতিমা। চিন্ময় বৃন্দাবনকে সামান্য তীর্থ। তাই প্রাকৃতজনের কাছে যাই হোক, রঘুনাথের কাছে এ প্রসাদ বাসিও নয়, বিকৃতও নয়—অপূর্ব সাত্ত্বিক সম্পদ।

একদিন স্বরূপ দেখতে পেল রঘুনাথের প্রসাদ খাওয়া।

আমাকে কিছু দাও। স্বরূপ হাত বাড়াল। খেয়ে বললে, তুমি রোজ-রোজ এই অমৃত খাও, আমাদের দাও না কেন? এ তোমার কেমন স্বভাব?

গোবিন্দের কাছ থেকে প্রভুও জানতে পেলেন।

সে কী? নিজেই চলে এলেন রঘুনাথের কাছে।

নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছ, আমাকে ভাগ দিচ্ছ না কেন? বলেই ত্বরিতে এক গ্রাস মুখে পুরলেন।

আরো এক গ্রাস নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, স্বরূপ বাধা দিল। বললে, না, এ তোমার যোগ্য নয়।

প্রভু বললেন, কী যে বলো তার অর্থ নেই। যত প্রসাদ খেয়েছি এমন সুস্বাদু প্রসাদ আর কখনো খাইনি।

রঘুনাথের বৈরাগ্যে প্রভুর অশেষ সন্তোষ।

আমি কুজন, পতিত ও ঘৃণিত, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু গ্রন্থে বলছে রঘুনাথ, তবু আমাকে যিনি ভোগসুখের দাবানল থেকে কৃপা করে উদ্ধার করলেন, নিজের বুকের গুঞ্জাহার আর গোবর্ধন-শিলা উপহার দিলেন, সঁপে দিলেন স্বরূপ গোস্বামীর হাতে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে আনন্দময় হয়ে বিরাজ করুন।

রঘুনাথ আর কী করে? রাত্রিকালে সকলের আগোচরে প্রভুর পদসেবা করে, লীলাবেশে প্রভু যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন তখন করে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ। ষোল বছর সমানে সে এই অন্তরঙ্গ সেবা করে এসেছে। চৈতন্যচন্দ্র অস্তমিত হলে স্বরূপও কিছুদিনের মধ্যে নিত্যলীলায় প্রবেশ করল। স্বরূপের অন্তর্ধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে চলে এল, ঠিক করল রূপ আর সনাতনকে দর্শন করে গোবর্ধন পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

রূপ-সনাতনের সঙ্গে দেখা হতেই তারা তাকে আটকে রাখল, মরতে দিল না। বললে, তার চেয়ে আমাদের কাছে প্রভুর লীলাবিহার বর্ণনা করো। এত দিন তাঁর সঙ্গ করলে, শোনাও তাঁর সে সব চিত্তচমৎকার কাহিনী।

তাই ভালো। তাই বলি।

অন্ন-জল ত্যাগ করল রঘুনাথ, ত্যাগ করল অন্যকথন। আর গ্রাম্যবার্তা নয়, শুধু গৌরবার্তা। দধিমন্থনের পর নবনীতবিহীন তিন ছটাক মাত্র মাঠাই তার সারাদিনের আহার। প্রত্যহ নাম করে এক লক্ষ, দণ্ডবৎ এক হাজার। আর বৈষ্ণবদের উদ্দেশে দুই সহস্র প্রণাম। আর রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের

মানসসেবা। আট প্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই ভজন আর চারদণ্ড মাত্র নিদ্রা—তাও সব দিন নয়। যেদিন লীলাবেশে মত্ত থাকে সেদিন তার ঘুমই ঘুম যায়।

বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে রঘুনাথের সঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কৃষ্ণদাসের রঘুনাথই 'সারগুরু'। জীব গোস্বামীরও আরাধ্য রঘুনাথ।

তারপর শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্যামানন্দ যখন বৃন্দাবনে তখন তাদেরও অনুগ্রহ করল রঘুনাথ। তখন রঘুনাথের শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে, তবু তার একবিন্দু নিষ্ঠাভঙ্গ নেই। 'যদ্যপিহ শুষ্কদেহ বাতাসে হেলয়। তথাপি নির্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয়॥' রামচন্দ্র কবিরাজও বৃন্দাবনে এসে রঘুনাথের প্রসাদ পেল। জাহ্নবী দেবী যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে এলেন তখন রঘুনাথ এত বৃদ্ধ যে তাকে আর চেনা যাচ্ছে না। বীরচন্দ্র প্রভু এসে আর তাকে দেখতে পেল না।

॥ ৭৭ ॥

কমলাকর পিপলাই

কমলাকর ধনী জমিদারের ছেলে, জন্ম সুন্দরবনের কাছে খালিজুলি গ্রামে। জাতিতে ব্রাহ্মণ। বাল্যকাল থেকেই বীতরাগ।

গৌরাঙ্গের অনুগত। প্রায়ই নবদ্বীপে যায় কীর্তন শুনতে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সকলেই কাঁদে, কমলাকরের চোখে জল নেই।

কমলাকরের মনে ধিক্কার জাগে। কীর্তনের চেয়ে ক্রন্দন শ্রেষ্ঠ। না কাঁদলে হৃৎকমল বিকশিত হবে কী করে? হৃৎকমল বিকশিত না হলে সেখানে রাধাকৃষ্ণ এসে দাঁড়াবেন কেন?

চোখের জলেই তো চোখের দোষ কাটবে। চোখ অদোষদর্শী হলেই তো সর্বভূতে কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হবে।

সেদিনও কীর্তনকালে কমলাকরের চোখে জল এল না। শত চেষ্টায়ও না। খেপে গেল কমলাকর। কোত্থেকে কতকগুলো পিপুলের গুঁড়ো এনে দু চোখে ঘষতে লাগল।

আর যায় কোথা! দুচোখে অবিশ্রাম জল ঝরতে লাগল।

প্রভু খুশি হলেন। পিপুল দিয়ে অশ্রু বার করেছে বলে নাম রাখলেন পিপলাই। কমলাকর পিপলাই।

আর প্রভুর দৃষ্টি যখন পড়েছে তখন কমলাকরের ভাবভক্তি তো নিরর্গল হবেই।

প্রভুর আরেক প্রিয়পাত্র ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী। নিষ্কিঞ্চন, গ্রন্থিহীন। অনেক তীর্থ ঘুরে নীলাচলে গিয়েছে, জগন্নাথ তাকে আদেশ করলেন, তুমি মাহেশ যাও, সেখানে আমি বলরাম ও সুভদ্রার সঙ্গে বিরাজ করব।

ধ্রুবানন্দ মাহেশে ছুটে এল। মাহেশে এসে আবার আদেশ পেল, গঙ্গাতীরে আমরা আছি, আমাদের নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করো।

গঙ্গাতীরে তিন বিগ্রহ প্রকট হল। ধ্রুবানন্দ মন্দির তৈরি করে তিন বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করল।

তারপর ধ্রুবানন্দ বৃদ্ধ হলে ভাবনা হল আমার অবর্তমানে কে জগন্নাথের সেবা করবে?

তোমার ভাবনা করতে হবে না। স্বপ্নে আবার জগন্নাথ আদেশ করলেন, খালিজুলির কমলাকর পিপলাইকে খবর দাও, সে এসে আমাদের সেবা করবে।

খবর পৌঁছুল কমলাকরের কাছে। কোনো জিজ্ঞাসা নেই, কাউকে কিছু না বলে, কারু সঙ্গে পরামর্শে না বসেই কমলাকর গৃহত্যাগ করল। স্ত্রী পর্যন্ত জানল না।

জগন্নাথ তাঁর সেবায় আমাকে ডেকেছেন—আমি পরমনির্বাচিত—এর বাইরে আর প্রশ্ন কী! কমলাকর সোজা মাহেশে এসে উপনীত হল।

কী হবে ধনে-জনে বৈভবভোগে যদি না জগন্নাথসেবায় তা উৎসর্গ করি? যিনি দিয়েছেন তাঁকেই আবার সব ফিরিয়ে দেব, সঙ্গে আরো একটু উদ্বৃত্ত দিয়ে দেব—সে হচ্ছে আমার অনুরাগ, আমার চোখের জল।

কমলাকরকে পেয়ে ধ্রুবানন্দ উদ্বেল হয়ে উঠল।

কিন্তু এ কী, কমলাকরের ছোট ভাই নিধিপতিও যে এসে উপস্থিত। তুমি কেন? তুমি কী চাও?

আমি দাদাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। কত দিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোনো খবর নেই কোনোখানে। শেষে ঘুরতে ঘুরতে মাহেশে এসে ধরতে পেলাম।

তবে আর কথা কী, বেঁধে টেনে নিয়ে যাও।

নিধিপতি অনেক সাধ্য-সাধনা করল, কমলাকর এক তিল নড়ল না। মাহেশ ছেড়ে, মাহেশের জগন্নাথ ছেড়ে আমি যাব না সংসারে।

তবে সংসারই এখানে চলে আসুক।

খালিজুলির সমস্ত সংসারকেই মাহেশে স্থানান্তরিত করা হল। ধ্রুবানন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজল।

কমলাকরের মেয়ে রাধারাণী আর নিধিপতির মেয়ে রমা। খড়দহের কামদেব পণ্ডিত রাধাকে আর যোগেশ্বর পণ্ডিত রমাকে বিয়ে করে। এদেরই অনুরোধে কমলাকর নিত্যানন্দকে নিয়ে আসে খড়দহে।

কামদেবের প্রপৌত্র চাঁদ শর্মা যশোরে রাজা প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী ছিল। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে নিয়ে গেলে চাঁদ রাজার রাধাকান্ত বিগ্রহ খড়দহে নিয়ে এসে স্থাপন করল।

এদিকে মাহেশে কমলাকরের বংশধর রাজীবলোচনের সময় অর্থাভাবে জগন্নাথসেবার অসুবিধে ঘটে। জগন্নাথই জানেন কী করবেন, খাবেন না উপবাসে থাকবেন।

মুর্শিদাবাদের নবাব নদীবক্ষে বিপদে পড়ল। স্বয়ং জগন্নাথ তাকে রক্ষা করলেন, আশ্রয় দিলেন মন্দিরে। জগন্নাথের সেবার জন্যে নবাব এক হাজার বিঘেরও বেশি জমি দান করল। আর কোথাও ক্লেশকৃচ্ছ্র থাকল না।

দ্বাদশ গোপালের একজন, কমলাকর একাত্তর বছর প্রকট থেকে বৃন্দাবনে লীলাসংবরণ করল।

॥ ৭৮ ॥

অভিরাম (রামদাস)

দ্বাদশ গোপালের আরেকজন অভিরাম বা রামদাস। খানাকুল কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। বিবাহিত, স্ত্রীর নাম মালিনী।

সর্বদা সখ্যপ্রেমের আবেশে উন্মত্ত, অভিরাম গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলায় যোগ দিয়েছে। সেই সব চেয়ে বেশি ভাবগ্রস্ত, ঈশ্বরকথা ছাড়া তার আরু

কোনো বাক্য নেই। একবার তো এমন কৃষ্ণাবেশ হল তিন মাসেও তা গেল না।

প্রভু নীলাচল থেকে নিত্যানন্দকে গৌড় পাঠিয়ে দিলেন সংসারে থেকে নাম-প্রচারের জন্যে। সঙ্গে যে কজন সহচর ঠিক করে দিলেন তাদের মধ্যে একজন অভিরাম।

পথিমধ্যে রামদাসের মধ্যে গোপাল-ভাব প্রকাশ পেল। তিন প্রহর ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাহ্যজ্ঞান নেই, সে কী অপূর্ব প্রেমাবেশ! 'মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া। আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া।'

নিত্যানন্দের নৃত্য-কীর্তনের প্রধান সঙ্গী, স্থানে-স্থানে ঘুরে বেড়ায় অভিরাম। পানিহাটিতে রঘুনাথ যখন দধি-চিঁড়ার উৎসব করল সেখানে অভিরামও নিমন্ত্রিত।

তেজস্বী, প্রকাণ্ড শক্তির অধিকারী অভিরাম। একদিন নিত্যানন্দের সঙ্গে নাচছে, প্রেমাবেশে অভিরাম বলে উঠল : আমার বাঁশি কই?

এখানে বাঁশি পাব কোথায়? ঐ দেখ এক খণ্ড কাঠ পড়ে আছে।

কাঠ তো নয়, প্রকাণ্ড গুঁড়ি একটা। এত ভারী যে তুলতে বত্রিশজন লোক লাগে। সেই বত্রিশজনের বহনযোগ্য কাষ্ঠখণ্ডকে অনায়াসে তুলে নিল অভিরাম। শুধু তাই নয়, দুই হাতে তাকে মুখের বাঁশির মত করে ধরল।

অভিরামের একটা চাবুক আছে। তার নাম জয়মঙ্গল—সকলমঙ্গলসিদ্ধি চাবুক। এই চাবুক দিয়ে অভিরাম যাকেই স্পর্শ করে তারই মধ্যে ভক্তি-শক্তি উথলে ওঠে।

শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাবার আগে এল খানাকুল কৃষ্ণনগরে, অভিরামের আশীর্বাদ নিতে।

আপনার চাবুক দিয়ে আমাকে আঘাত করুন।

অভিরাম হাসল। সহ্য করতে পারবে তো?

শ্রীনিবাসের অঙ্গে তিন-তিনবার চাবুক মারল অভিরাম। আবারও মারতে যাচ্ছে বুঝি, মালিনী ছুটে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরল। বললে, ঠাকুর, স্থির হও। শ্রীনিবাস বালক, ওকে আরো বিহ্বল করে কাজ নেই।

হ্যাঁ, এতেই হবে। এতেই শ্রীনিবাস বৈরাগ্য-প্রেমিক হয়ে উঠতে পারবে।

শ্রীনিবাস আছে অভিরামের ঘরে, গোপীনাথের পদচ্ছায়ে। অভিরামের বাড়ির পূর্বদিকে রামকুণ্ড নামে পুকুর, সেই পুকুর খুঁড়েই পাওয়া গেছে

বিগ্রহ। সে বিগ্রহের সামনে নামকীর্তনে কী সীমাহীন আনন্দ।

অভিরাম খবর দিল পাশেই কোন ধনীর বাড়িতে বিবাহোৎসব হচ্ছে—তুমি সেইখানে গিয়ে আহার করো ও দক্ষিণা নাও। সেই দক্ষিণাতেই তোমার বেশ কিছুদিন চলে যাবে।

শ্রীনিবাস রাজী হল না।

কেন, রাজী হচ্ছ না কেন?

দরকার নেই। আমার কাছে এখনো পাঁচ গণ্ডা কড়ি আছে।

অভিরাম অবাক মানল। ঐ স্বল্প সম্বলে এত তেজ!

গোপনে সংবাদ নিল অভিরাম। শুনল শ্রীনিবাস ষোল কড়ার তণ্ডুল, এক কড়ার খোলা, দুই কড়ার কাঠ আর বাকি কড়ার লবণ কিনে দারুকেশ্বর নদীর পারে ভোগ চড়িয়েছে।

দুজন বৈষ্ণবকে সেখানে পাঠিয়ে দিল অভিরাম। বললে, সেখানে গিয়ে শ্রীনিবাসের অতিথি হও।

অতিথি দেখে কোথায় কুণ্ঠিত হবে, শ্রীনিবাস উল্লসিত হল। সে অন্ন দিয়েই মহাপ্রসাদ বানিয়ে অতিথিদের খাওয়াল, নিজেও প্রসাদ পেল। কোথাও অল্প নেই, অভাব নেই, সর্বত্র পর্যাপ্ত, সর্বত্র প্রচুর।

অভিরাম শুধু প্রেমদ্রব নয়, প্রতাপ-প্রচণ্ড। তার প্রণামের তেজ বিষ্ণুবিগ্রহ ছাড়া অন্য কোনো বিগ্রহ সহ্য করতে পারে না। প্রণাম করলে অন্য বিগ্রহ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগরে। শ্রীপাটে এসে অভিরাম বসল এক বকুল-গাছের নিচে। সেখানেই 'সিদ্ধ বকুল কুঞ্জ'।

॥ ৭৯ ॥

রামচন্দ্র খান

বেনাপোল অঞ্চলের জমিদার, বৈষ্ণবদ্বেষী।

হরিদাসকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে নিযুক্ত করল লক্ষহীরাকে। রাত্রিকালে হরিদাসের কুটিরে যাও, তার চরিত্রে দোষ-সৃষ্টি করো।

লক্ষহীরাই লক্ষচ্যুত হল। দ্বারে বসে রইল নিস্তব্ধ প্রতীক্ষায়।

আমার নামসংখ্যা এখনো পূর্ণ হয় নি। বললে হরিদাস, তুমি বসে বসে আমার নামকীর্তন শোনো। সংখ্যাপূর্ণ হলেই তোমার যা মনোগত অভিলাষ তা পূর্ণ করব।

রাত্রি শেষ হয়ে গেল তবু হরিদাসের নামকীর্তন শেষ হল না। লক্ষহীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

এমনি পর-পর তিন রাত।

নাম শুনে শুনে লক্ষহীরা মধুমতী হয়ে গেল। সেও রসনায় নামক্ষরণ করতে লাগল।

লক্ষহীরা লক্ষেশ্বরী হয়ে গেল। যে দিনে এক লক্ষ নাম করে সেই লক্ষেশ্বর।

লক্ষহীরার পরিবর্তন হলেও রামচন্দ্র খানের পরিবর্তন হল না।

নিত্যানন্দ নীলাচল থেকে গৌড়ে ফিরছে, সশিষ্য রামচন্দ্রের ঘরে এসে উপস্থিত হল।

বললে, আমাদের থাকবার জায়গা করে দাও।

রামচন্দ্র তার ভৃত্যকে বললে, বলে দাও গোয়াল-ঘরে থাকবে।

ভৃত্য পর্যন্ত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

রামচন্দ্র গর্জন করে উঠল: ওসব বৈষ্ণব সাঙ্গোপাঙ্গদের গোয়াল-ঘরই উপযুক্ত স্থান।

নিত্যানন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। শিষ্যেরাও তাকে অনুগমন করল। এই অসম্মান অসহনীয়।

সত্যি এই ঘর আমাদের যোগ্য নয়। বললে নিত্যানন্দ, এখানে একদিন ম্লেচ্ছ এসে গোবধ করবে।

বৈষ্ণবদল চলে গেলে রামচন্দ্র ভৃত্যদের আদেশ করল, যেখানে ওরা বসেছিল সেখানকার মাটি চেঁছে ফেল। তারপর সমস্ত উঠোন—মন্দিরপ্রাঙ্গণ—গোবরজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করো।

তাই হল। রামচন্দ্র স্বস্তিতে ঘুমুতে গেল।

কিন্তু কতক্ষণের ঘুম!

রাজকর বাকি পড়েছে সেই অপরাধে রাজার ম্লেচ্ছ উজির রামচন্দ্রের ঘরে এসে হানা দিল। টাকা বার করো শিগগির। যতক্ষণ তা না করছ, আমি

আর আমার অনুচরেরা বসছি তোমার দুর্গামণ্ডপে। আমাদের খাওয়ার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমরা নিজেরাই রেঁধে নিতে পারব।

দুর্গামণ্ডপেই তারা অবধ্যবধ করে রান্না করে খেল।

দাবির টাকা রামচন্দ্র বার করতে পারল না।

আর কথা নেই। সস্ত্রীক রামচন্দ্রকে বেঁধে ফেলল উজির। তারপর তার গৃহ ও গ্রাম লুট করে সর্বস্বান্ত করল।

রামচন্দ্র বুঝল, হাড়ে-হাড়ে মর্মে-মর্মে বুঝল, মহতের কাছে অপরাধের এই বিষময় ফল।

॥ ৬০ ॥

গোপাল ভট্ট গোস্বামী

শ্রীরঙ্গমের বেঙ্কট ভট্টের ছেলে গোপাল ভট্ট।

প্রভু যখন বেঙ্কটের ঘরে এসেছেন, বেঙ্কট তাঁর পাদোদক খেল। এগারো বছরের ছেলে গোপালও খেল, খেয়েই প্রেমাপ্লুত হল। 'বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে।'

চাতুর্মাস্য করবার জন্যে বেঙ্কটের ঘরে থেকে গেলেন গৌরহরি। বেঙ্কট গোপালকে গৌরাঙ্গসেবায় সমর্পণ করে দিল। গোপালের প্রতি পুত্র-বুদ্ধি করল না, স্থির করল গোপাল গৌরধন।

বেঙ্কটের ছোট দু' ভাই প্রবোধানন্দ আর ত্রিমল্ল। প্রবোধানন্দ পরম পণ্ডিত, তার উপাধি সরস্বতী। গোপাল পিতৃব্য প্রবোধানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করে। অল্পকালের মধ্যেই সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ হয়ে ওঠে।

শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করে যাবার সময় বেঙ্কটকে প্রভু বললেন, তোমার এই বৈষ্ণবপুত্র গোপাল চার মাস আমাকে অশেষ-বিশেষে সেবা করেছে, তার প্রতি আমার কৃপাদৃষ্টি আছে। তুমি একে সুপণ্ডিত করে তোলো। কদাচ এর বিবাহ দিও না।

প্রবোধানন্দকে বললেন, তুমি গোপালকে যথাসময়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিও।

প্রভু চলে গেলে আমরা কী নিয়ে থাকব? বেঙ্কটেরা তিন ভাই কাঁদতে বসল। কার সঙ্গে কাবেরীতে স্নান করব? কে বা পরমাত্মীয়ের মত পরিহাস করবে? কে বা কীর্তন করবে রঙ্গনাথের মন্দিরে? আর কার দর্শনে আসবে বিপুল জনস্রোত? সুলভে ভক্তিফল কুড়িয়ে নেবে? আর আমাদের এ ভবনমন্দির শূন্য হয়ে যাবে তা সইব কী করে?

প্রভু তিন ভাইকে আলিঙ্গন দিয়ে শান্ত করলেন।

কিন্তু গোপাল নিরস্ত হবার ছেলে নয়। সে প্রভুর পায়ে-পায়ে চলতে লাগল। আমি তোমার সঙ্গী হব। যেখানে যাও সেখানে যাব।

প্রভু বললেন, তুমি গৃহে থাকো, যতদিন তোমার মা-বাবা বেঁচে আছেন তাঁদের সেবা করো। পরে আমি তোমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাব।

তারপর যথাকালে মা-বাবার লোকান্তরের পর গোপাল বৃন্দাবনে উপস্থিত হল। মিলল রূপ-সনাতনের সঙ্গে।

বহুদিন ব্রজের কোনো সংবাদ পাচ্ছি না, তাই না? গদাধরকে জিজ্ঞেস করলেন গৌরহরি। মন তাই উচাটন।

সেই দিনই বৃন্দাবন থেকে রূপ-সনাতনের চিঠি এসে পৌঁছুল—গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে এসে পৌঁচেছে।

প্রভু আনন্দিত হলেন। প্রত্যুত্তরে লোক-মারফৎ লিখন পাঠালেন বৃন্দাবনে। প্রিয় রূপ-সনাতন, গোপাল তোমাদের কাছে গিয়েছে জেনে সুখী হলাম। ওকে আপন ভাইয়ের মত দেখবে। আর মাঝে মাঝে মঙ্গলসংবাদ পাঠাবে। এই সঙ্গে গোপালের জন্যে ডোর-কৌপীন-বহির্বাস ও আসন পাঠালাম।

বৃন্দাবনে উৎসব লেগে গেল। গোপাল ডোর-কৌপীন-বহির্বাস পরল বটে কিন্তু প্রভুর আসনে বসতে দ্বিধা করতে লাগল। আসন তো বস্ত্রের তৈরি নয়, কালো রঙের কাঠের পিঁড়ি। হয়তো ভাবল এ আসনে বসবার তার কিসের অধিকার! কিন্তু রূপ-সনাতন তাকে বোঝাল, প্রভু যখন তাকেই এ আসন পাঠিয়েছেন তখন তাকে তা স্বীকার করতেই হবে।

গোপালের মন-প্রাণ সনাতনের প্রেমে পরিপ্লুত, তার সমস্ত চেষ্টা রূপের সখ্যে প্ররোচিত, তাই আর তার দ্বিধা থাকল না। সে আসনে বসল।

একটি শালগ্রাম-শিলার সেবা-পূজা করে গোপাল। আর সেই শালগ্রাম-শিলা থেকেই রাধারমণ বিগ্রহ প্রকট হল।

শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের জন্যে গোপাল পথে বেরিয়ে হরিদ্বারের কাছে দেববন্দ্য নামে এক গ্রামে এসে পৌঁচেছে। শুরু হয়েছে প্রচণ্ড বৃষ্টি। এক ব্রাহ্মণ তার ভক্তিপ্রদীপ্ত রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করে আনল। শুধু রূপে নয়, গুণেও আকৃষ্ট হল। বললে, আমার ভাবী প্রথম পুত্রসন্তান আপনাকে সমর্পণ করে দেব।

ফেরবার সময় গণ্ডকী নদী থেকে বারোটি শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করল গোপাল। একদিন বৃন্দাবনে যমুনাস্নান করে ভজনকুটিরে ফিরেছে, দেখল দ্বারপ্রান্তে একটি বালক বসে আছে।

কে রে তুই?

আমি গোপীনাথ।

কার ছেলে?

দেববন্দ্য গ্রামে যে ব্রাহ্মণের ঘরে আতিথ্য নিয়েছিলে তার। বাবা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে আসতে লাগল ভক্তেরা। কেউ কেউ বস্ত্র আর অলঙ্কার দিল।

এসব বসনভূষণ শালগ্রাম শিলা কি করে পরিধান করবে কাতর অন্তরে সারারাত চিন্তা করতে লাগল গোপাল। এই আবরণে-আভরণে শিলার কোন্ প্রয়োজন সাধন হবে?

রাত্রি প্রভাত হলে গোপাল দেখল দ্বাদশ শালগ্রামের মধ্যে একটি শালগ্রাম বিগ্রহরূপে প্রকটিত হয়েছে। দ্বিভুজ মুরলীধর ত্রিভঙ্গবঙ্কিম ব্রজকিশোর।

গোপাল আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। ছুটে গেল রূপ-সনাতনে কাছে। তারা বললে, এ আর বিচিত্র কী। ভক্তের ইচ্ছে হয়েছে ভগবানকে সাজাবে, তাই সে বাসনা পূর্ণ করবার জন্যে ভগবান বিগ্রহায়িত হয়েছেন।

বৈশাখী পূর্ণিমায় বিগ্রহের অভিষেক হল। নাম হল রাধারমণ।

এর আবার অন্যরকম বিবরণ আছে।

বল্লভ ভট্ট নীলাচলে প্রভুর কাছে শুনেছিল গোপাল ভট্টের কথা। বৃন্দাবনে তখন বনই বেশি, বল্লভ এখানে-ওখানে গোপালকে খুঁজতে লাগল। যমুনা-তীরে এসে দেখা পেল। দেখল দিব্যকান্তিময় মনোহর মূর্তি, সর্বাঙ্গে ভক্তি দ্যুতিমতী হয়ে আছে। প্রণাম করে দাঁড়াতেই বল্লভের হৃদয়ে আনন্দ উত্তাল হয়ে উঠল। ভাবল কী ধন দিয়ে ভট্টপাদের অভ্যর্থনা করি? গলায় ঝোলানো

বটুয়ার মধ্যে একটি অপূর্বসুন্দর শালগ্রাম মূর্তি আছে, সেই প্রাণধনকেই এর হাতে সমর্পণ করি।

আমার এই প্রাণধনকে আপনি নিন।

গোপাল সেই শিলামূর্তিকে মাথায় ও হৃদয়ে ধারণ করল। কেউ কেউ বলে এই শালগ্রাম থেকেই রাধারমণ বিগ্রহ প্রকট হয়েছে। তাই এর আরেক নাম 'বটুয়ার ঠাকুর'।

হে ভাণ্ডীরবনাধিপতি, শিখিপুচ্ছভূষণ, চন্দনচর্চিতাঙ্গ, বৃন্দাবনেন্দ্র, হে বরণীয়তম, বিকশিত নীলপদ্মের মত শ্যামল, কালিন্দীবান্ধব, নন্দনন্দন পরানন্দ, কমলেক্ষণ, হে গোবিন্দ, কমনীয়দেহ মুকুন্দ, দীন আমাকে আনন্দ দান কর। মাং দীনমানন্দয়।

এই তো গোপাল ভট্ট বিরচিত নামকীর্তনের শ্লোক। বিপ্রলম্ভভাবে বিভোর হয়ে নির্জনে বসে রাধারমণে নেত্র-মন বিলিয়ে দিয়ে শুধু এই পদটি কীর্তন করে গোপাল। যে শোনে সেই ভাবাবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

শ্রীগোপাল ভট্ট বসি আছয়ে নির্জনে।
সমর্পিয়া নেত্র-মন শ্রীরাধারমণে॥
ক্ষণে নিজকৃত পদ্য পঢ়য়ে সুস্বরে।
শুনিতে সে নামাবলী কেবা ধৈর্য ধরে॥

সনাতন গোপালকে বললে, বৈষ্ণব-আচার ও ক্রিয়া-মুদ্রা-নিয়মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করো। তোমার পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগাও।

গোপাল 'হরিভক্তি বিলাস' রচনা করল। সমস্ত পুরাণ-বাক্য উদ্ধার করল, ভগবান, ভক্তি আর ভক্তযোগ্য সদাচারের কোনো কথাই বাকি রাখল না।

শুধু যে বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থই সংকলন করল তা নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের একটি কড়চা বা কারিকা-গ্রন্থও রচনা করল গোপাল। রূপ-সনাতনের মুখে চৈতন্যমুখনিঃসৃত যে সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনেছিল, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার, তারই উপর প্রতিষ্ঠিত এই কারিকা। সেই থেকেই জীব গোস্বামী তার ষটসন্দর্ভ বা শ্রীভাগবতসন্দর্ভ রচনা করল।

শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষা নিল। তাকে আচার্য উপাধিতে ভূষিত করল গোপাল। আচার্য শ্রীনিবাস চৈতন্যধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গৌড়দেশে উপস্থিত হল। প্রচারের জন্যে সঙ্গে নিয়ে এল অনেক ভক্তিগ্রন্থ। তার মধ্যে একখানা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে গোপাল ভট্ট প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ নেই কেন ?

বৃন্দাবনে সমস্ত পূজ্যজনের আদেশ নিয়েই কৃষ্ণদাস গ্রন্থ লিখতে বসল। গোপাল ভট্ট অনুমতি দেবার সময় বলে দিল, তোমার গ্রন্থে আমার কথা কিছু লিখতে পারবে না।

কৃষ্ণদাস তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করল না। শুধু তার নামমাত্র উল্লেখ করল, অন্য কোনো প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না।

নামলেশের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষায়ও গোপাল কলুষিত নয়।

কৃষ্ণদাস স্তবপঞ্চকে গোপাল ভট্টের মহিমা বর্ণনা করল।

নিরন্তর হরিভক্তিকথনে যার শক্তি, যার সর্বদাই সৎ-অনুভব, নশ্বর বিষয়ে যে বিরক্ত, মহাপ্রভুর আগমনে যার পাট বিখ্যাত, সে আমার হৃদয়ে সতত স্ফুরিত হোক।

গোপাল ভট্টের আরেক শিষ্য সেই দেববন্দ্য গ্রামের ব্রাহ্মণ-পুত্র গোপীনাথ। সেই গোপীনাথকে রাধারমণ-সেবার ভারার্পণ করে শ্রাবণী শুক্লা-পঞ্চমীতে গোপাল ভট্ট অপ্রকট হল।

। ৮১ ।

পুরন্দর পণ্ডিত

বাৎসল্য-ভাবের ভাবুক, নিবাস খড়দহে।

প্রথমবার গৌড়ভক্তেরা যে নীলাচলে গিয়েছিল সে-দলে ছিল পুরন্দর। প্রভুকে দেখল স্বচক্ষে।

নিত্যানন্দ যখন সকলকে নিয়ে গৌড়ে ফিরছে, সে-দলেও পুরন্দর। পথিমধ্যে সকলকে প্রেমভাবিত করল নিতাই। রামদাসে গোপাল প্রকাশিত হল। গদাধরে রাধিকার ভাব। রঘুনাথ-বৈদ্য রেবতী হয়ে গেল। কৃষ্ণদাস আর পরমেশ্বর দাস গোপাল ভাবে হৈ-হৈ করতে লাগল।

আমি অঙ্গদ—বলে পুরন্দর গাছে চড়ে বসল। গাছের থেকে পড়ল আবার লাফ দিয়ে।

বাংলাদেশে ফেরবার কয়েক মাস পরে খড়দহে এল নিত্যানন্দ। পুরন্দর

পণ্ডিতের দেবালয়ে নৃত্য-কীর্তন করল। সেখানেও পুরন্দরের অঙ্গদ-ভাব। গাছে উঠে পুরন্দর গর্জন করতে লাগল।

পুরন্দর পণ্ডিতের পরম-উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ॥

প্রভু যখন পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ঘরে এলেন, খবর পেয়ে ছুটে এল পুরন্দর। প্রভুকে দেখে প্রেমাবেশে কাঁদতে বসল।

গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রকাশ করল পুরন্দর।

॥ ৮২ ॥

পুরন্দর আচার্য

এই পুরন্দরের বিশেষত্ব এই প্রভু একে পিতা বলে ডাকেন।

কুমারহট্টে শ্রীবাসমন্দিরে গিয়েছেন প্রভু, খবর পেয়ে পুরন্দর আচার্য ছুটে এল। প্রভু তাকে পিতৃসম্বোধন করে মহাপ্রেমে তাকে কোলে নিয়ে বসলেন।

প্রভুর কোলে বসে কাঁদতে কত সুখ। সেই সুখে কাঁদতে বসল পুরন্দর।

॥ ৮৩ ॥

রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী

তপন মিশ্রের পুত্র এই রঘুনাথ।

পূর্ববঙ্গে দেখা হলে প্রভু তপনকে বলেছিলেন, তুমি কাশীধামে গিয়ে বাস করো। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।

সপরিবারে কাশীতে চলে এল তপন। দু বছর পরে রঘুনাথ আবির্ভূত হল।

নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাচ্ছেন প্রভু, ঝাড়খণ্ডের পথে, কাশীতে এসে পৌঁছুলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে মধ্যাহ্নস্নান করছেন, তপনের সঙ্গে দেখা

হল। প্রথম যখন দেখা হয়েছিল তখন তো প্রভু গৃহস্থ, আজ এ যে দিব্য সন্ন্যাসী! প্রভুর পায়ে পড়ে উল্লসিতহৃদয় তপন কাঁদতে লাগল। প্রভু তাকে বুকে তুলে নিলেন, নিয়ে গেলেন বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধবের মন্দিরে।

পরে তপন তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে এল। সবংশে তাঁর পাদোদক খেল। তাঁর শেষান্নও খেল সবংশে। ভিক্ষা-অন্তে প্রভু শয়ন করলে কিশোর রঘুনাথ তাঁর পা টিপতে বসল।

এমনি দশ দিন প্রভু থাকলেন কাশীতে। অবস্থান চন্দ্রশেখর বৈদ্যের আবাসে কিন্তু ভিক্ষাগ্রহণ তপনের আলয়ে। আর সেখানে এলেই রঘুনাথের সেবা। প্রভুর প্রসাদগ্রহণ, পাত্রমার্জন আর পাদসম্বাহন। যতক্ষণ প্রভু চক্ষুর অগোচরে ততক্ষণ মানসপূজা।

বৃন্দাবন থেকে ফেরবার পথে প্রভু আবার দু মাস অপেক্ষা করলেন কাশীতে। আবার সে দুই মাস রঘুনাথ প্রভুর সেবা করল। সেই বাসনমাজা আর পা-টেপা। কতদিনে প্রভুর সর্বক্ষণের সেবক হব।

প্রভু যখন নীলাচলে যাচ্ছেন তপন আর রঘুনাথ দুজনেই বললে, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।

প্রভু তাদের নিবৃত্ত করলেন। বললেন, আমি একা-একা ফিরব। যদি কেউ যেতে চাও, পরে এস, এখন নয়।

ক্রমে-ক্রমে রঘুনাথ বড় হল ও একদিন সমস্ত কাজকর্ম ফেলে নীলাচল যাত্রা করল। প্রভুর ভোগের জন্যে নানা উপকরণ দিয়ে ঝালি সাজিয়ে নিল। সেবক তা মাথায় করে নিয়ে চলল।

পথে রামদাস বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা। রামদাস সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্য-প্রকাশ নামে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক। শুধু তাই নয়, সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী। সব চেয়ে বড় কথা—বৈষ্ণব, রামচন্দ্রের উপাসক, অষ্টপ্রহর রামনাম জপ করে। সে কিনা রঘুনাথকে দেখে আকৃষ্ট হল। বললে, তোমার ঐ ঝালি তোমার ভৃত্য বহন করবে না, আমি বহন করব। বলে ভৃত্যের মাথার ঝালি নিজের মাথায় তুলে নিল।

রঘুনাথ সঙ্কুচিত হল। বললে, সে কি, তুমি পণ্ডিত, মহাভাগবত, তুমি সামান্য ভারবাহীর মত কেন এ বোঝা মাথায় নেবে? এ তোমাকে মানায় না। তুমি ঝালি ছেড়ে দাও।

না, আমি শুনব না, আমাকে তোমার কিঞ্চিৎ সেবা করতে দাও।

রামদাস ঝালি ছাড়ল না।

তোমার সঙ্গ পেয়েছি এই তো আমার যথেষ্ট ভাগ্য। বললে রঘুনাথ, একসঙ্গে সদালোচনা করে পথ হাঁটব এই তো পরম সুখ। ঝালি বইবার দরকার কী।

রাজপুরুষ রামদাস তবু নিরস্ত হল না। বললে, তুমি কুণ্ঠিত হয়ো না। তোমার সেবাতেই আমার হৃদয়ে উল্লাস হচ্ছে। তুমি আমার মাথার দিকে তাকিয়ো না, পথের দিকে তাকাও।

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।

নীলাচলে পৌঁছে রঘুনাথ প্রভুর চরণে দণ্ডপ্রণাম করল।

রঘুনাথ? কত আগে দেখেছেন, প্রভু এক পলকে চিনতে পারলেন। বললেন, ভালোই হল তুমি এসেছ। কমললোচন জগন্নাথকে দর্শন করে এস, আমার এখানেই প্রসাদ পাবে।

গোবিন্দকে দিয়ে আলাদা বাসা পাইয়ে দিলেন। মিলিয়ে দিলেন প্রভুকে। ভক্তদের সঙ্গে। সুনিপুণ রান্না করতে পারে রঘুনাথ, প্রায়ই খাওয়াতে লাগল প্রভুকে। তার রান্না অমৃতময়, রঘুনাথ জানে সে অমৃতময়তা শুধু প্রভু খাবেন বলে।

কিন্তু রামদাসের প্রতি প্রভু বদান্য নন কেন?

যেহেতু রামদাস ভক্তিকামী নয়, সে মুক্তিকামী। তাছাড়া তার মনে বিদ্যাবত্তার অহঙ্কার। সর্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভুর আর জানতে বাকি নেই।

কী আর করবে রামদাস? সে গোপীনাথ পট্টনায়কের ছেলেদের কাব্য-প্রকাশ পড়াতে লাগল।

নীলাচলে আটমাস থাকল রঘুনাথ। বিদায় দেবার সময় প্রভু বললেন, শোনো, বিয়ে কোরো না। বৃদ্ধ মা-বাপের সেবা করো। কোনো বৈষ্ণবের কাছে ভাগবতের পাঠ নিয়ো। আর—আর একবার নীলাচলে এস।

নিজের কণ্ঠমালা প্রভু রঘুনাথকে পরিয়ে দিলেন। প্রেমগদগদনেত্রে কাঁদতে লাগল রঘুনাথ।

পিতা-মাতার সেবাই মহৎ আদর্শ। রাম, কৃষ্ণ, আর গৌরাঙ্গ সবাই এই পথের পথিক।

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥

ভক্ত পিতা-মাতার সেবা করলে ভগবান সেই পিতৃ-মাতৃ-ভক্তের প্রতি আপনিই কৃপা করেন।

বিট্‌ঠলনাথের কাহিনী মনে করো।

পুণ্ডলীক ভক্ত সন্তান, শুধু বাপ-মায়ের সেবাই তার একমাত্র জীবিকা। তার একনিষ্ঠতায় স্বয়ং নারায়ণ মুগ্ধ। ইচ্ছে হল একবার দেখে আসি ভক্তকে।

ভীমা নদীর তীরে পাণ্ডুরপুর গ্রাম, সেইখানে পুণ্ডলীকের বাড়ি। দ্বারকা থেকে বেরিয়ে নারায়ণ পুণ্ডলীকের গৃহদ্বারে এসে পৌঁছুলেন। পুণ্ডলীককে ডেকে বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

পুণ্ডলীক বললে, আমার সময় নেই, আমি এখন পিতা-মাতার সেবায় ব্যস্ত।

শোনো, আমি দ্বারকাধীশ ; দ্বারকা থেকে এসেছি। বললেন আগন্তুক। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

দ্বারকা থেকেই আস বা গোলোক থেকেই আস, আমার দাঁড়াবার সময় নেই। যদি আলাপ করতে চাও তো অপেক্ষা করতে হবে।

তাই করব। কিন্তু কতক্ষণ ?

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমি আমার বাবা-মার সেবা করি। তাঁদের খাওয়াবার পর তাঁদের যখন বিশ্রাম করতে পাঠাই তখনই আমার কিঞ্চিৎ অবসর মেলে।

বেশ, আমি ততক্ষণই অপেক্ষা করব। কিন্তু আমি বসব কোথায় ?

বসবে কোথায় ? পুণ্ডলীক দুখানি ইঁট সংগ্রহ করে আনল। বললে, এর উপরে বোসো। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—আমি যাই।

গৃহ-অভ্যন্তরে চলে গেল পুণ্ডলীক। বাবা-মাকে নাইয়ে-খাইয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়ে ছুটি পেল। ছুটি পেয়ে বললে, দ্বারকাধীশ এসেছেন, আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন বাইরে।

বাবা-মা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। কী বলছিস তুই ? দ্বারকাধীশ এসেছেন ?

হ্যাঁ, তাই তো বললে, বললে, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

কোথায় তিনি ? বাবা-মা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

দরজার গোড়ায় দুখানি ইঁট পেতে বসতে দিয়ে এসেছি। সেইখানেই বসে আছেন হয়তো।

এতক্ষণ বলিসনি কেন ?

কখন বলব ? সেই সকালবেলা এসেছে। আমি তো সারাক্ষণই তোমাদের সেবায় ব্যস্ত। কখন বা তোমাদের বলি, তার সঙ্গে বা আলাপ করি।

চল চল দেখি গে। আছেন না চলে গেছেন ?

পুণ্ডলীক ও তার বাবা-মা ব্যাকুল হয়ে বাইরে ছুটে এল। এসে দেখল দুখানি ইঁটের উপর চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন।

এদিকে দ্বারকায় সোরগোল পড়ে গিয়েছে মন্দিরে বিগ্রহ নেই। পুণ্ডলীকের বাড়িতে লীলা সাঙ্গ করে নারায়ণ যখন দ্বারকায় ফিরে গেলেন তখন মন্দিরের দরজা খুলে পূজুরী দেখল বিগ্রহ বিরাজিত।

আর পাণ্ডুরপুরের লোকেরা দেখল সেই দুখানি ইঁটের উপর নারায়ণের পদাঙ্ক মুদ্রিত হয়ে আছে।

ওদেশের ভাষায় ইঁটকে বিট বলে। বিটকে স্থল করে দাঁড়িয়েছিলেন বলে ঠাকুরের নাম হল বিটঠল-দেব। আবার কেউ কেউ বলেন, ইঁটের উপর বৈঠতে বা বসতে বলেছিল বলে বিটঠল-ঠাকুর।

সেই বিটঠল-ঠাকুরকে স্বচক্ষে দেখে গেছেন মহাপ্রভু।

তাৎপর্য কী ? যে সন্তান একনিষ্ঠ হয়ে বাবা-মার সেবা করে সে কৃষ্ণলাভ করে। আর তার গুণে তার বাপ-মাও কৃষ্ণের দর্শন পায়।

গৃহে চার বছর থাকল রঘুনাথ। অনন্য নিষ্ঠায় পিতা-মাতার সেবা করল। বৈষ্ণব পণ্ডিতের কাছে পড়ল ভাগবত। তারপর পিতা-মাতার দেহান্ত হলে উদাসীন হয়ে নীলাচলে ফিরে এল।

এবারও প্রভুর সঙ্গে আট মাস কাটল। ভক্তসঙ্গ করে আর দুই ব্রহ্ম, দারুব্রহ্ম ও জঙ্গম ব্রহ্ম, নিত্য দর্শন করে। কিন্তু প্রভু একদিন অন্যরকম বিধান করলেন। বললেন, যাও, রূপ-সনাতনের সঙ্গ করো। ভাগবত পড়ো, অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম নাও। বলে আলিঙ্গন করলেন। মহোৎসবে জগন্নাথের প্রসাদী চোদ্দ হাত লম্বা যে তুলসীর মালা পেয়েছিলেন আর যে পানের খিলি, তাই রঘুনাথকে উপহার দিলেন। সেই উপহারের স্পর্শে রঘুনাথের মধ্যে শক্তিসঞ্চার হল। ইষ্ট-ভক্তিতে রঘুনাথ নিবিষ্ট হয়ে রইল।

চলে এল বৃন্দাবন। রূপ-সনাতনকে আশ্রয় করল। পড়তে লাগল ভাগবত। আর 'ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় মন'—অষ্ট সাত্ত্বিকের উদয় হয়। এমন পিককণ্ঠ কেউ শোনে নি আগে। এক-একটি শ্লোক বিভিন্ন

রাগরাগিণীতে কীর্তন করে। আর যখন কৃষ্ণের সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের শ্লোক আসে তখন আত্মহারা হয়ে পড়ে। কী যে দেখছে কী যে বলছে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। বোঝাবার দরকারই বা কী। গোবিন্দচরণে আত্মসমর্পণই একমাত্র বস্তু। গোবিন্দচরণই তার একমাত্র প্রাণধন, একমাত্র প্রাণারাম।

রঘুনাথের অনুরোধে এক ধনী শিষ্য গোবিন্দের মন্দির করে দিল, সাজিয়ে দিল বিচিত্র অলঙ্কারে, মকরে, কুণ্ডলে, বংশীতে। রঘুনাথ গ্রাম্যবার্তা বা বৈষয়িক কথা মুখেও আনে না, কানেও নেয় না—কৃষ্ণকথাপূজাতেই দিনমান কাটিয়ে দেয়। সকলেই কৃষ্ণভজন করছে এই বিশ্বাসে কোনো বৈষ্ণব-নিন্দাও তার কানে আসে না। প্রভুর দেওয়া তুলসীর মালাটি কণ্ঠে ধরে থাকে।

ভাগবতেই রঘুনাথের অসামান্য অধিকার। যেমন মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর তেমনি উচ্চারণের নির্মলতা। তেমনি আবার সঙ্গীতকৌশল। মহাপ্রভুর মতে বেদান্ত-দর্শনের প্রাঞ্জল ভাষ্যই ভাগবত—রঘুনাথের ব্যাখ্যায়ও সেই মতেরই অনুসরণ।

নিজে কোনো গ্রন্থ লেখে নি রঘুনাথ। তার একমাত্র কৃত্য কৃষ্ণভজন আর ভাগবতপাঠ। যখন অপ্রকট হবার সময় হল প্রভুর দেওয়া প্রসাদমালা গলায় পরে নিল রঘুনাথ।

॥ ৮৪ ॥

ভূগর্ভ গোস্বামী

ভূগর্ভ গোস্বামী গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্য। সন্ন্যাস নেবার আগে প্রভু যখন লোকনাথ চক্রবর্তীকে বৃন্দাবনে পাঠাতে চান, তখন ভূগর্ভ বললে, আমিও যাব।

প্রভু অনুমতি দিলেন। বললেন, তোমরা দুজনেই যাও। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টা করো। দুই বন্ধু বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হল।

'তনু মন এক ইথে কিছু ভিন্ন নয়।
পরম অদ্ভুত এই দোঁহার প্রণয়॥'

বৃন্দাবনের প্রথমাগতদের মধ্যে অগ্রগণ্য ভূগর্ভ আর লোকনাথ। দুজনেই আজন্ম ব্রহ্মচারী, মহাবিবিক্ত, লোকবিরল বৃন্দাবনের বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে

লাগল। কোথায় কী তীর্থ আছে তার সন্ধানের সূত্র খোঁজা আর ভজন-আনন্দে কাটানো এই তাদের ব্রত। ব্রজধামের পুনরাবিষ্কারের প্রথম সূত্রধর এই দুই বন্ধু, অভিন্নাত্মা, সকল সমাজের মাননীয় ও বন্দনীয়। যে এসেছে সেই এই দুই নিত্যপরিকরের কাছে প্রণত হয়েছে।

ভূগর্ভ রূপগোস্বামীর সঙ্গী, জীব গোস্বামীর প্রণম্য। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ ও পরে রামচন্দ্র কবিরাজ সবাই বৃন্দাবনে ভূগর্ভের অভিনন্দন পেয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত লেখবার অনুমতি চাইতে গেলে ভূগর্ভ বললে, লেখ, কিন্তু আমার নামের যেন উল্লেখ না থাকে।

লোকনাথ বললে, আমিও যেন বাদ পড়ি।

ছয় গোস্বামী—রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, গোপাল ভট্ট আর রঘুনাথ দাস। নরোত্তম আরো তিনজনের নাম যুক্ত করল—স্বরূপ, ভূগর্ভ আর লোকনাথ।

স্বরূপ, সনাতন, রূপ রঘুনাথ, ভট্টযুগ
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইহা সবার পাদপদ্ম না সেবিলু তিল অর্ধ
আর কিসে পূরিবেক সাধ॥

॥ ৮৫ ॥

গোবিন্দ (দ্বারপাল)

নীলাচলে কে এক আগন্তুক প্রভুর সামনে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করতেই প্রভু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি?

আমার নাম গোবিন্দ। আমি ঈশ্বর পুরীর সেবক ছিলাম। তিরোধানের সময় ঈশ্বর পুরী বলে দিলেন, নীলাচলে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করো। তাই এসেছি।

আমার প্রতি পুরীশ্বরের কী কৃপা, কী স্নেহ! বললেন প্রভু, নিজের ভৃত্যকে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু সার্বভৌমের দিকে তাকালেন: গুরুর সেবক মান্য পাত্র, তাকে দিয়ে অঙ্গ সেবা করানো কি সঙ্গত হবে?

সার্বভৌম বললে, কিন্তু গুরুবাক্য লঙ্ঘন করবে কী করে?

তাও তো ঠিক। তাই গোবিন্দকে স্বীকার করলেন প্রভু। আলিঙ্গন করলেন।

গোবিন্দ শূদ্র। তা হোক। ঈশ্বরপুরীকে সেবা করার ফলে তার চিত্তে শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। তার চিত্তে এখন প্রীতি-ভক্তির লাবণ্য, কে আর তার জাতি-কুলের বিচার করে? দাসীপুত্র বিদুরের ঘরে ভোজন করেন নি শ্রীকৃষ্ণ? শুধু ভক্তি খোঁজ করো। কৃষ্ণে শুধু ভক্তির অপেক্ষা।

ঈশ্বরকৃপা পরম স্বতন্ত্রা। তা কিছুরই ধার ধারে না, না কুল-মান না ধন-সম্পদ, না বা বিদ্যাবুদ্ধি। তা বেদধর্ম লোকধর্ম দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত নয়। তা স্নেহলেশ খুঁজে বেড়ায়। যেখানে প্রীতি-স্পর্শ সেখানেই কৃপা মুক্তস্রোত।

বিদুরকে দেখ। বিদুর দাসীপুত্র, তার উপরে দরিদ্র। কিন্তু কৃষ্ণে প্রীতিমান। তাই দ্বারকার অধিপতি হয়েও কৃষ্ণ এলেন তার কুটিরে, খেলেন তার খুদকণা। সে তৃপ্তি কি দুর্যোধনের রাজভোগে সম্ভব?

গোবিন্দ পেল শ্রীঅঙ্গ সেবার অধিকার। প্রভুর দুই ভৃত্য ছিল—রামাই আর নন্দাই—তারা গোবিন্দের অধীন হল। প্রভুর সমস্ত কার্যের নির্বাহ-ভার গোবিন্দের হাতে, গোবিন্দই সর্বেসর্বা। এমন কি, যারা প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাদেরও তদারকি গোবিন্দের উপর। প্রভুর কিসে আরাম হবে—এই একমাত্র গোবিন্দের বিচার, গোবিন্দের সমাধান।

রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর উঠে প্রতাপরুদ্র যখন কীর্তনের শোভাযাত্রা দেখছে, দেখল দুটি লোক এক অমিততেজ মহান্তকে মালা পরাচ্ছে।

এরা কারা? জিজ্ঞেস করল রাজা।

এদের একজন স্বরূপ-দামোদর, আরেকজন গোবিন্দ। আগের জন প্রভুর দ্বিতীয়কলেবর, পরের জন প্রভুর অঙ্গসেবক। প্রভুর পক্ষ থেকে এরা মালা দিচ্ছে।

কাকে দিচ্ছে?

সর্বশিরোধার্য অদ্বৈত আচার্যকে।

হরিদাস দূরে সরে থাকলেও প্রভু তাকে আশ্বাস দিলেন, তোমার জন্যে আসবে প্রসাদান্ন।

সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দই গিয়ে দিয়ে আসে হরিদাসকে।

প্রভু যখন জগন্নাথদর্শনে যান, ভিড় সরিয়ে আগে-আগে যায় কাশীশ্বর,

পিছনে জলকরঙ্গ নিয়ে গোবিন্দ। ভিড় প্রবল হলে দুজনে হাতাহাতি দাঁড়িয়ে প্রভুর জন্যে আবরণ তৈরি করে। যেন কেউ তাঁকে ছুঁতে না পায়। কিন্তু প্রতাপরুদ্র যখন ছুঁল তখন সাময়িক শৈথিল্যে গোবিন্দ বুঝি অন্যমনস্ক ছিল।

শুধু হরিদাসকে নয়, রূপ-সনাতনকেও প্রসাদান্ন দিয়ে আসে গোবিন্দ।

কোনো ভক্ত দূর দেশ থেকে এলে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও গোবিন্দই করবে, জগন্নাথ দর্শন করাতেও সেই যাবে। দীনহীন কাঙাল এলে তাদের প্রত্যাশাও গোবিন্দই মেটাবে। রাঘবের ঝালি এসে পৌঁছুলে বস্তুসম্ভার সেই গুছিয়ে রাখবে আর প্রভু যেমনি বলবেন তেমনি বিতরণ করে দেবে। চন্দনাদি তেল আর তুলীগণ্ডু জগদানন্দ গোবিন্দের কাছেই রেখেছিল। গোবিন্দ একাধারে ভৃত্য, ভাণ্ডারী, দ্বারপাল।

যখন কারো দ্বার-মানা হয়, গোবিন্দই আদেশ জারি করে। কমলাকান্তের উপর বিরক্ত হয়ে প্রভু যখন তাকে আসতে বারণ করতে চাইলেন গোবিন্দকে বললেন সজাগ থাকতে। ছোট হরিদাসেরও প্রবেশাধিকার বন্ধ করবার ভার গোবিন্দের উপর পড়ল।

এ নিয়ে যখন নানা অনুরোধ আসতে লাগল প্রভুর কাছে আর প্রভু যখন কিছুতেই হরিদাস-বর্জন থেকে বিরত হবেন না তখন তিনি নীলাচল ছেড়ে দিয়ে আলালনাথে চলে যেতে চাইলেন। বললেন, আমি সেখানে একা-একা থাকবো।

গোবিন্দ সেই একাকীত্বেরও অংশ। আর সকলকে পরিত্যাগ করা গেলেও গোবিন্দকে নয়। গোবিন্দ যে তাঁর ছায়া। তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

রামচন্দ্র পুরীর রূঢ় আচরণে প্রভু যখন অর্ধ-ভোজন করে তার অভিযোগ খণ্ডন করলেন, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে গোবিন্দও অর্ধাশনে দিনাতিপাত করতে লাগল।

গোবিন্দকে প্রভু সাবধান করে দিলেন—দেখো আমার পাদোদক যেন কেউ না খায়।

তবু কালিদাসকে গোবিন্দ ঠেকাতে পারল না। জগন্নাথমন্দিরের উত্তরে বাইশ সিঁড়ির নিচে প্রভু পা ধুচ্ছেন কালিদাস হাত পেতে তিন অঞ্জলি জল গ্রহণ করে খেয়ে নিল। কালিসাসের বৈষ্ণবশ্রদ্ধার কাছে গোবিন্দের শাসন পরাস্ত দেখে প্রভু রুষ্ট হলেন না, আহারান্তে গোবিন্দকে বললেন, আমার ভুক্তাবশেষ কালিদাসকে দিয়ে এস।

গোবিন্দের সেবার অদ্ভুত মহিমা। মধ্যাহ্ন-আহারের পর প্রভু গম্ভীরায় শোন, গোবিন্দ তাঁর পা টেপে। প্রভু ঘুমিয়ে পড়লে গোবিন্দ উঠে গিয়ে আহার করে। আহার সেরে আবার দ্বারপ্রান্তে বসে, প্রভু জেগে উঠে আবার কী আদেশ করেন।

বেড়াকীর্তনের দিন প্রভু এক নতুন ভঙ্গি করলেন। প্রভাত থেকে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নৃত্যকীর্তন করেছেন, ভিক্ষান্তে শুয়েছেন—আজই তাঁর অঙ্গসেবার বেশি দরকার। কিন্তু গোবিন্দ দেখল গম্ভীরার দ্বার জুড়ে শুয়ে আছেন প্রভু। দ্বারজোড়া হয়ে থাকলে গোবিন্দ ঢোকে কী করে ?

এক পাশ হও, আমি ভিতরে যাই। গোবিন্দ মিনতি করল।

আমার নড়বার শক্তি নেই। প্রভু বললেন স্থির থেকে।

তোমার গা-হাত-পা টিপব যে।

তার আমি কী জানি !

গোবিন্দ তখন তার বহির্বাস প্রভুর গায়ের উপর বিছিয়ে দিল, যেন তার পায়ের ধুলো না প্রভুর গায়ে পড়ে। তারপর প্রভুকে ডিঙিয়ে সে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে প্রভুর পিঠ ও কটি টিপে দিতে লাগল। মধুর মর্দনে প্রভুর শ্রান্তি দূর হল, নিদ্রাকর্ষণ হল।

দণ্ড দুই পরে জেগে উঠে প্রভু দেখলেন গোবিন্দ তখনো বসে আছে। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এখনো বসে আছ কী ! খেতে যাও নি ?

কী করে যাই ? গোবিন্দ বললে কাতর মুখে, দরজায় শুয়ে আছ, পথ কই ?

ভিতরে এসেছিলে কী করে ? সেইভাবেই যেতে পারতে না ?

যাব তো নিজের খাওয়ার জন্যে। গোবিন্দ আত্মধিক্কারের সুরে বললে মনে মনে, তোমার সেবার জন্যে শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘন করেছি—অপরাধ করেছি। শাস্তি যদি কিছু থাকে হাসিমুখে সহ্য করব। কিন্তু নিজের উদরপূর্তির জন্যে অপরাধ করব এ আমার ভাবনার অতীত।

গোবিন্দ বাইরে স্তব্ধ হয়ে রইল। ভগবৎসেবী ভক্তের মনের কথা প্রভু নিশ্চয়ই বুঝবেন।

একদিন প্রভুর কাছে গিয়ে দুঃখ জানাল গোবিন্দ। ভক্তদের দেওয়া খাবার রাশীকৃত হয়ে উঠছে। খাচ্ছ না অথচ খাদ্য সঞ্চিত হয়ে আছে একথা গোপন করে রেখে আমার অপরাধের বোঝা আর কত ভারী করব ?

তোমার আবার অপরাধ কী। প্রভু হাসলেন: তুমি তো আদিবশ্য, অনাদিকাল থেকে আমার বশীভূত। নিয়ে এস কে কী খাবার দিয়ে গেছে। নাম ধরে ধরে নিবেদন করো।

একে একে সকলের দেওয়া খাবার প্রভুর সামনে জড়ো করতে লাগল গোবিন্দ। বাসি বিস্বাদ মানলেন না, শতজনের ভক্ষ্য প্রভু এক দণ্ডে খেয়ে ফেললেন। জড়বস্তুই পচে, চিন্ময়বস্তু পচে না। মহাপ্রভুর প্রসাদ চিন্ময়বস্তু।

হরিদাসকে রোজ মহাপ্রসাদ পৌঁছিয়ে দেয় গোবিন্দ। একদিন গিয়ে দেখে হরিদাস শুয়ে শুয়ে নাম করছে। গোবিন্দ বললে, ওঠো, প্রসাদ এনেছি।

হরিদাস বললে, আজ আমি উপবাস করব।

সে কি? কেন?

আজ আমার সংখ্যাপূরণ হয়নি। সংখ্যাপূরণ না হলে কী করে ভোজন করি? হরিদাস অস্থির হয়ে উঠল: এদিকে মহাপ্রসাদকেও বা কী করে ফিরিয়ে দিই? মহাপ্রসাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে হরিদাস তার কণিকামাত্র গ্রহণ করল।

এইভাবে নিজের ভজননিষ্ঠা আর মহাপ্রসাদ দুয়েরই মান রাখল হরিদাস।

প্রভু একদিন যমেশ্বরটোটা যাচ্ছেন, দূর হতে গীত-গোবিন্দের গান শুনতে পেলেন। গুর্জরীরাগে মধুর কণ্ঠে এ কে গায়? গায়ক পুরুষ না স্ত্রী কিছু অনুসন্ধান করবারও অবকাশ মিলল না, বাহ্যস্মৃতি হারিয়ে সিজের কাঁটার উপর দিয়ে ছুটলেন প্রভু। কাঁটার ঘায়ে অঙ্গ রুধিরাক্ত হল, তবু প্রভুর খেয়াল নেই। যে কৃষ্ণের গান করে সে না জানি আমার কত বড় বন্ধু। কত বড় আত্মীয়।

গোবিন্দ প্রভুকে ধরে ফেলল। বললে, প্রভু এ স্ত্রীলোকের গান। কোনো এক দেবদাসী গাইছে।

দেবদাসী! প্রভু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রূঢ় আঘাতে তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল।

গোবিন্দ, তুমি আমাকে আজ প্রাণে বাঁচালে। স্ত্রীলোকের স্পর্শ হলে আমি আর বাঁচতাম না।

আমি বাঁচাবার কে? তোমাকে জগন্নাথ বাঁচিয়েছেন। বললে গোবিন্দ।

শোনো, সব সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। বললেন, আমাকে বিপথে যেতে দেবে না।

আজ কেন কে জানে মন্দিরে প্রচণ্ড ভিড়।

প্রভু যথারীতি গরুড়স্তম্ভের পিছে এসে দাঁড়ালেন। এখানেই দাঁড়িয়েই তিনি বরাবর জগন্নাথ দর্শন করেন। আজ সামনে-পিছে আশে-পাশে দারুণ ঠেলাঠেলি। একটি ওড়িয়া স্ত্রীলোক কিছুতেই ভিড় সরিয়ে দেখতে পাচ্ছে না জগন্নাথকে। ব্যাকুল হয়ে এদিক-ওদিক উঁকি মারছে, কিন্তু চারদিকে মানুষের প্রাচীর। একটু উঁচু হয়ে না দাঁড়ালে তার চোখ জগন্নাথের নাগাল পাচ্ছে না। অনন্যোপায় রমণী ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় ধ্যাননিশ্চল প্রভুর কাঁধে ভর রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

প্রভুর বাহ্যচেতনা নেই তাঁর কাঁধে এ কী গুরুভার!

গোবিন্দের নজর পড়ল। সে তখুনি সেই রমণীকে নেমে দাঁড়াতে বললে।

প্রভু বললেন, না, ওকে নিষেধ কোরো না। ও যত খুশি দেখুক জগন্নাথকে। ওর তনু মন প্রাণ জগন্নাথে আবিষ্ট। এত আবিষ্ট যে কারো কাঁধে পা দিয়েছে তারও খেয়াল নেই।

রমণী তক্ষুনি নেমে পড়ল। প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করল।

আহা, ওর কী আর্তি, কী আনন্দময়তা। আমার যদি অমন থাকত। ও মহাভাগ্যবতী, ওকে প্রণাম করো। ওর প্রসাদে আমাদের যদি এমনি আর্তি জন্মায়, যদি এমন তন্ময়তার অধিকারী হই।

একদিন প্রভু সমুদ্রস্নানে যাচ্ছেন, চটক পর্বত তাঁর চোখে পড়ল। চটককে গোবর্ধন বলে ভাবলেন। অমনি প্রেমাবেশে চললেন চটকের দিকে।

গোবিন্দ পিছু নিল। কিন্তু সাধ্য কী প্রভুকে ধরে।

চিৎকার করে উঠল, ছুটলও সঙ্গে সঙ্গে। খোঁড়া ভগবান আচার্যও ছুটল।

কতদূর যেতেই প্রভুর স্তম্ভ-ভাব উদয় হল, শরীরে জাড্য দেখা দিল। দেখা দিল স্বরভঙ্গ। দুই চোখে নেমে এল গঙ্গা-যমুনা। গাত্রবর্ণ শঙ্খের মত সাদা হয়ে গেল। কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ। কম্পের ফলে মাটিতে পড়ে গেলেন। গোবিন্দ জল ছিটিয়ে চাইল সুস্থ করতে।

হরিবোল বলে প্রভু আচম্বিতে উঠে বসলেন। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। যা এতক্ষণ দেখছিলেন তা যেন আর পাচ্ছেন না দেখতে।

গোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে কে নিয়ে এল? গোবিন্দের দিকে তাকালেন প্রভু : অনর্থক দুঃখ দেবার জন্যে আমাকে কেন সুস্থ করলে?

যখন স্বপ্নে বা দৈবাৎ আমি কৃষ্ণকে দেখি, বললেন প্রভু, আমার দুই শত্রু এসে উপস্থিত হয়। এক শত্রু আনন্দ, আরেক শত্রু মদন। হায়, প্রেমানন্দও আমার শত্রু। প্রেমানন্দে যে সেবানন্দে বাধা পড়ে। তার পর মিলনের লালসায় চিত্তে মত্ততা জাগে। দুয়ে মিলে আমার অভিনিবেশ হরণ করে নেয়। নয়ন ভরে আর দেখা হয় না।

রাত্রিদিন প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে অবস্থান করছেন আর সর্বক্ষণ তাঁর পার্শ্বে গোবিন্দ জেগে রয়েছে। তার সাধনা অতন্দ্র সাধনা। তার ভাগ্যই তার ভাগ্যের তুলনা।

প্রভুর অন্তর্ধানের পর গোবিন্দের কাজ ফুরিয়ে গেল। চৈতন্যহীন নীলাচলে আর থাকতে পারল না, বৃন্দাবনে চলে গেল।

ভক্তের যে দুঃখ তাও ভগবৎপ্রেমেরই সম্বর্ধক। ভগবানের দেওয়া দুঃখ ভক্তের পক্ষে আনন্দের সমতুল। ভক্তের আর্তি ভগবৎপ্রীতি-ব্যাকুলতা ছাড়া কিছু নয়। এই প্রীতির আস্বাদনেই ভক্তের সর্ব-দুঃখের বিস্মরণ।

না জানি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিয়া দুখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥

শুধু নামই নিত্যানন্দে অবস্থিত করতে পারে। নামই অখিলরসময়। তার শুধু একমাত্র পথ। সে পথ ভক্তির, প্রপত্তির, শরণাগতির। দুঃখ-সুখের পথ নয়। শুদ্ধা রতির, চিৎ-রতির পথ।

গোবিন্দ নাম করতে বসল।

॥ ৮৬ ॥

জীব গোস্বামী

রূপ-সনাতনের ছোট ভাই বল্লভ, মহাপ্রভু যার নাম রেখেছেন অনুপম, তার পুত্র জীব গোস্বামী।

অনুপম শিশুকাল থেকেই রঘুনাথের উপাসনা করে। নিরবধি রামায়ণ শোনে আর রামনাম জপ করে। রামেই তার প্রাণের উপশম।

সনাতন বললে, আমি আর রূপ যেমন কৃষ্ণভজন করি, আমার ইচ্ছে তুমিও তেমনি করো। কৃষ্ণনামে প্রচুর প্রেম, প্রচুর বিলাস। তুমি আমাদের থেকে কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে?

অনুপম বললে, তোমরা আদেশ করলেই করি।

হ্যাঁ, তিনভাই একসঙ্গে কৃষ্ণকথায় মত্ত হয়ে থাকব সে বড় আনন্দের হবে।

তোমাদের আদেশ আমি কী করে লঙ্ঘন করব? তবে আমাকে দীক্ষামন্ত্র দাও, আমি কৃষ্ণভজনই করব।

মুখে বলল বটে কিন্তু হৃদয়ে সমর্থনের সুর বাজল না। চোখের ঘুম উড়ে গেল, সারারাত কাঁদল অনুপম। কী করে আমার রঘুনাথকে ছেড়ে থাকব?

ভোর হলে সনাতনের পায়ে এসে পড়ল অনুপম। বললে, রঘুনাথের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি, তা আর ফিরিয়ে নিতে পারছি না। তোমাদের আদেশ ফিরিয়ে নাও, বরং আশীর্বাদ করো জন্মে-জন্মে রঘুনাথের পায়েই যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে।

তার প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে সনাতন আদেশ ফিরিয়ে নিল। বললে, তোমার দৃঢ় ভক্তিকে সাধুবাদ দিই।

সেই নৈষ্ঠিক রাম-উপাসকের পুত্রই জীব গোস্বামী।

প্রভু যখন বৃন্দাবন যাবার পথে রামকেলিতে আসেন ও রূপ-সনাতনকে কৃপা করেন, তখন অনুপম ও তার ছেলে জীব উপস্থিত ছিল। জীব তখন পাঁচ বছরের বালক, সঙ্গোপনে দেখে নিল প্রভুকে।

বাল্যকাল থেকেই জীবের কৃষ্ণ-ভক্তি, অন্যান্য বালকের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম খেলা। অল্প বয়স থেকেই তার বিদ্যার্জনে রুচি, আর ভাগবত সর্ববিদ্যার সার বলে ভাগবতই তার প্রাণতুল্য। 'অল্প বয়সে অতি গম্ভীর অন্তর। শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রাণের সোসর॥'

একদিন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সকলে এসে দেখল জীব ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। কেঁদে আকুল হচ্ছে। এই অল্প বয়সেই এত বৈরাগ্য কেন? তবে কি এও গৃহত্যাগ করে চলে যাবে? বাপ মারা গিয়েছে, জেঠারা বৃন্দাবনে, জীবের পরিণাম কী? এও দেখি কৃষ্ণ বলতে তন্ময়।

তারপর জীব একরাত্রে কৃষ্ণ-বলরামকে স্বপ্ন দেখল। কৃষ্ণ-বলরাম গৌর-নিতাইয়ে রূপান্তরিত হল। গৌর-নিতাই জীবের মাথায় পা রাখলেন। গৌর বললেন, তোমাকে নিত্যানন্দের পায়ে সমর্পণ করে দিলাম।

চন্দ্রদ্বীপেই কিছুদূর অধ্যয়ন করেছে জীব, এবার চলল নবদ্বীপ। চলল ফতেয়াবাদ হয়ে। নবদ্বীপই বিদ্যার তীর্থ। সেখানেই সর্বতত্ত্বের সন্ধান মিলবে।

এ কে এল নবদ্বীপে! গায়ের রঙ কনক চাঁপার মত, মনোহর দেহ, দীর্ঘ নেত্র—দেখ দেখ এ কোন্ রাজার কুমার চলেছে পায়ে হেঁটে। কণ্ঠে তুলসী মালা, গলায় শুভ্র যজ্ঞসূত্র। কে জানে সন্ন্যাস না নিয়ে বসে!

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দ গৌরানন্দে রয়েছেন, হঠাৎ বলে বসলেন, মনে হচ্ছে জীব আসবে। তার জন্যেই আমার এখানে আসা।

বলতে না বলতেই খবর এল দ্বারপ্রান্তে কে এসে দাঁড়িয়েছে!

আর কে। জীব এসেছে। ডাকো ডাকো, ভিতরে নিয়ে এস।

নিত্যানন্দের পায়ে লুটিয়ে পড়ল জীব।

বাৎসল্যে বিহ্বল হয়ে নিত্যানন্দ জীবের মাথায় পা রাখল। মাটি থেকে তুলে নিল বুকের উপর। বললে, তোমার জন্যে আমি খড়দহ থেকে নবদ্বীপে এসেছি। তুমি এখানে থেকো না, তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও।

বৃন্দাবন?

হ্যাঁ, গৌরহরি তোমাদের বংশকে বৃন্দাবন দান করেছেন, তোমারও স্থান সেইখানে।

তবে আর কথা কী! জীব বৃন্দাবনে চলল।

পথে কাশীতে থামল। মধুসূদন সরস্বতীর কাছে বেদান্ত পড়তে বসল। মধুসূদন একদিকে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, অন্যদিকে দাসীভাবভাবিত রসিক ভক্ত। নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন মধুসূদন: অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে অধিরূঢ় হলেও কোন এক গোপীবধূবল্লভ শঠের দ্বারা বলপূর্বক দাসীকৃত হয়েছি।

মায়াবাদী হয়েও শেষ পর্যন্ত বলছেন, কৃষ্ণের চেয়ে অধিকতর কোনো তত্ত্ব নেই। 'কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।'

জীবকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করল মধুসূদন কাব্য ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ ন্যায় বেদান্ত সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে দিল। এবার বৃন্দাবনে গিয়ে বোসো।

বৃন্দাবনে গিয়ে জীব রূপের চরণাশ্রয় করল। রূপের শুধু মন্ত্রশিষ্য নয়, অনুগামী ভৃত্যমাত্র নয়, সমস্ত বিদ্যাসম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠল।

রূপ কর্তৃক জীব-বর্জনের কাহিনীটি 'ভক্তিরত্নাকরে' অন্যরকম।

রূপ নির্জনে বসে গ্রন্থ রচনা করছে, যমুনায় স্নান করতে যাবার পথে বল্লভ ভট্ট নামে এক পণ্ডিত এসে উপস্থিত হল। জিজ্ঞেস করল, কী লিখছেন ?

রূপ বললে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি পড়ে শোনাও তো। রূপ পড়ে শোনাল।

পণ্ডিত বললে, আমার মনে হয় একটু সংশোধন করে দিলে ভালো হয়।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কৃতার্থের মত বললে রূপ, একদিন আপনার অবসরমত এসে সংশোধন করে দিয়ে যাবেন।

যমুনাস্নানে চলে গেল পণ্ডিত।

রূপের পাশে চুপ করে বসে ছিল জীব, জল আনবার ছল করে সে উঠে গেল। পণ্ডিতের পিছু নিল। খানিক দূর গিয়ে তার কাছাকাছি হয়ে জিজ্ঞেস করলে, মঙ্গলাচরণের কোন্ অংশে আপনার সংশয় হচ্ছে ?

জীবকে চেনে না পণ্ডিত। কিন্তু তার প্রশ্নের মধ্যে এমন বিনয়মাধুর্য যে পণ্ডিত উত্তর না দিয়ে পারল না। প্রকাশ করে দেখাল কোথায় ও কেন তার সন্দেহ।

জীব বিচারে প্রবৃত্ত হল, এক বিচার থেকে আরেক বিচারে। পণ্ডিত কিছুতেই তাকে খণ্ডন করতে পারল না। দেখল শাস্ত্রজ্ঞানে জীব কত গভীর, তর্কের ভূমিতে কী ঋজু ও দৃঢ়। স্নানশেষে তাই বলতে গেল রূপকে। জিজ্ঞেস করলে, যে যুবকটি তোমার এখানে বসেছিল সে কে ?

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার শিষ্য। নাম জীব। এই কিছুদিন হল দেশ থেকে এসেছে।

পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে জীবের প্রশংসা করলে। তার বিচার-বিতর্ক কী রকম সতেজ-সহজ তাও প্রকাশ করলে।

বহুমানে পণ্ডিতকে বিদায় দিল রূপ।

জীব ফিরে এলে রূপ বললে, পণ্ডিত কৃপা করে আমার রচনা সংশোধন করে দিতে চেয়েছিল, তুমি তাতে বাদ সাধলে কেন?

জীব নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

তোমার খুব অহংকার হয়েছে, তাই না? পণ্ডিতের বিদ্যা তুমি সহ্য করতে পারলে না! যাও, তুমি ফের পূর্বদেশে চলে যাও। মনস্থির হলে বৃন্দাবনে এস।

অপ্রতিবাদে, কোনো কথা না বলে, জীব পূর্বমুখে চলতে লাগল। এক নগণ্য গ্রামে গিয়ে মাটিতে পড়ে রইল। পড়ে রইল অখণ্ড উপবাসে।

গ্রামবাসীরা পাতার কুটির নির্মাণ করে দিল। যোগাতে লাগল ফলমূল।

কেউ কেউ সনাতনকে গিয়ে খবর দিল। এক অল্পবয়সী তপস্বী আমাদের গ্রামে এক পাতার কুটিরে পড়ে রয়েছে। ওকে বাঁচাবার উপায় করুন।

সনাতন রূপের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তোমার গ্রন্থের কত দূর?

গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে।

সংশোধনের দরকার নেই?

জীব এখানে নেই, কে সংশোধন করবে?

তখন সনাতন জীবের দুর্দশার কথা বললে। বললে, তুমি ক্ষমা করলে ওকে ডেকে আনি। তোমার কাজে লাগাই।

রূপ তক্ষুনি ক্ষমা করল। নিজেই গিয়ে সাদরে ডেকে আনল জীবকে। সস্নেহ শুশ্রূষায় সুস্থ করে তুলল।

সনাতনও তার 'বৈষ্ণব তোষণী' গ্রন্থ জীবকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিল। জীবের বিদ্যাবল সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

জীব ক্রমে ক্রমে পঁচিশখানি গ্রন্থ লিখল। অন্যতম গ্রন্থ ষটসন্দর্ভ।

মঙ্গলাচরণে বলা হল: যাঁরা সপরিকর ভগবানের তত্ত্ব জানাবার জন্যে আমাকে এই পুস্তিকা লিখতে প্রবৃত্ত করাচ্ছেন সেই মথুরামণ্ডলবাসী শ্রীল রূপ-সনাতনের জয় হোক।

তত্ত্বটি কী? তত্ত্বটি এই যে যিনি কৃষ্ণ তিনিই গৌর। যাঁর অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ ও বাইরে গৌরবর্ণ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ হয়েও গৌররূপ

অঙ্গীকার করেছেন, যিনি স্বীয় অঙ্গ-উপাঙ্গাদির বৈভব দেখিয়েছেন, আমরা হরিনাম সংকীর্তন দ্বারা সেই কৃষ্ণচৈতন্যের শরণাগত হচ্ছি।

মহাপ্রভুর মুখে কাশীতে সনাতন যা শুনেছিল, আর প্রয়োগে যা শুনেছিল রূপ, সেই সব সিদ্ধান্ত আর বিচার নিয়ে গোপলভট্ট গোস্বামী লিখেছিল একটি কারিকা। সেই কারিকাই জীবের গ্রন্থের আকর।

ষটসন্দর্ভের একটি অংশ ভক্তিসন্দর্ভ। বলা হয়েছে, ভক্তিসন্দর্ভ অধ্যয়ন না করে ভাগবতধর্মে প্রবেশাধিকার হয় না। ভবব্যাধির চিকিৎসাপ্রণালীই এই সন্দর্ভে বর্ণিত হয়েছে। ভগবৎ-বৈমুখ্য থেকেই ক্লেশের সৃষ্টি। ভগবৎ-সান্মুখ্যেই ক্লেশের নিরসন। নিত্যানন্দলাভের একমাত্র পথই ভক্তি।

তারপর প্রীতিসন্দর্ভে জীব লিখছেন: ভাবময়ী ভক্তির বিস্তারকল্পে এই প্রপঞ্চে যে অবতারী অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি দুর্জন পর্যন্ত সকলের শরণ্য, সেই চৈতন্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন।

তারপর শেষ অংশ ক্রমসন্দর্ভে লিখছেন জীব: নামই চিন্তামণিস্বরূপ। নামই কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ। নামী থেকে নাম অভেদ বলে নাম পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যাঁর অঙ্গকান্তি কনকসদৃশ, যাঁর অবয়ব সর্বশুভলক্ষণযুক্ত ও চন্দনচর্চিত, যিনি সন্ন্যাসলীলা প্রকট করে শান্ত, সমতাযুক্ত ও শান্তিনিষ্ঠা-পরায়ণরূপে সহস্রনামোক্ত কৃষ্ণ-চৈতন্য নামে বিখ্যাত, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাকে সমস্ত অপরাধ থেকে পরিত্রাণ করে নিজপ্রেমের কিয়দংশ দান করে আমাকে পোষণ করুন।

জীবের আরেক গ্রন্থ হরিনামামৃত ব্যাকরণ।

গয়া থেকে ফিরে মহাপ্রভু তাঁর পড়ুয়াদের বললেন, কৃষ্ণই সর্বশব্দশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য। সাহিত্যে-ব্যাকরণে যা কিছু দেখছ, সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সমস্ত হরিনাম। সেই প্রেরণায় এই গ্রন্থ।

মঙ্গলাচরণে জীব লিখছেন: কৃষ্ণের উপাসনার জন্য ভক্তেরা যেমন মালিকা বিস্তার করে, আমিও তেমনি হরিনামাবল্লী সূত্রসাহায্যে গ্রন্থন করতে অভিলাষী হয়েছি। এই নামাবলী কৃষ্ণসঙ্গের আনন্দ বিলোবে। আর সব ব্যাকরণ তর্কযোগ্য, অনর্থক শব্দশাসনে পীড়িত ও দুর্বোধ্য বলে আমি এই সহজ হরিনামের ব্যাকরণ লিখেছি। যাঁরা শব্দজটিল ব্যাকরণের মরুভূমিতে জল খুঁজে-খুঁজে শ্রান্ত হচ্ছেন তাঁরা এই হরিনাম-ব্যাকরণের সুধা পান করুন এবং সে সুধায় শত-শতবার স্নান করুন। সংকেতে পরিহাসে পাদ-পূরণে,

ছলনায়-অবহেলায় নাম করলেও পাপ পরাভূত হয়।

মাধবমহোৎসব-গ্রন্থে লিখছেন জীব : যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ, শচীগর্ভসিন্ধুতে যাঁর আবির্ভাব ও যিনি শব্দভক্তিরসামৃতের সমুদ্রস্বরূপ, সেই গৌরকান্তি গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে স্বীয় দীপ্তি বিস্তৃত করুন।

জীবের তিন প্রধান শিষ্য—শ্রীনিবাস, আচার্য নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আর শ্যামানন্দ। এরা তিনজনই জীবের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করল ও তারই আদেশে সমস্ত গোস্বামী-গ্রন্থ গৌড়ে-উৎকলে এনে পঠন-পাঠনের প্রচলন করল।

শ্রীনিবাস চাকুন্দী গ্রামের গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের ছেলে। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় গঙ্গাধর উপস্থিত ছিল। সন্ন্যাস নামের শেষে চৈতন্যশব্দ শুনে সে দারুণ বিচলিত হয়, চৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে উন্মত্ত হয়ে যায়। তাতে তার নাম হয় চৈতন্যদাস। প্রকৃতিস্থ হবার পর তার পুত্রকামনা জাগে, মহাপ্রভুকে স্বপ্নে জগন্নাথের সঙ্গে অভিন্ন দেখে নীলাচলে চলে যায়। প্রভু তাকে গৌড়ে ফিরে যেতে বলেন। বলেন, তার কামনা সিদ্ধ হবে—পুত্র হলে তার নাম রাখা হবে শ্রীনিবাস। সেই শ্রীনিবাসকে জীব বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ থেকে আচার্য উপাধিতে ভূষিত করে।

নরোত্তমকেও জীবই ঠাকুর মহাশয় উপাধি দেয়। এই সেই ক্ষণজন্মা, যার নাম ধরে প্রভু আচম্বিতে ডেকে উঠেছিলেন ও যাকে পদ্মাবতী প্রেম দিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আর নরোত্তম, 'শ্রীজীবের যেন দুই বাহু দুইজন।' তারা গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের যোগ্য অধিকারী বলে নির্বাচিত করল জীব।

শ্যামানন্দ বললে, আমিও যাব।

পূর্বনাম দুঃখী কৃষ্ণদাস, দণ্ডেশ্বর গ্রামের বাসিন্দে। জীবই তার নাম রেখেছে শ্যামানন্দ। বৃন্দাবনে রাসমণ্ডল পরিষ্কার করতে করতে রাধারাণীর চরণ-নূপুর কুড়িয়ে পায়, সেই নূপুর ললাটে ঠেকাতেই নূপুরাকৃতি তিলক হয়ে ওঠে।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্যামানন্দ—তিনজনে অবিচ্ছিন্ন প্রীতি। যেন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মিলে-মিশে ত্রিবেণী হয়েছে। লোকেরা বলছে, শ্রীনিবাস হচ্ছে শ্রীচৈতন্য, নরোত্তম হচ্ছে নিত্যানন্দ, আর অদ্বৈত শ্যামানন্দ। ঐ তিনের অপ্রকটে এ তিন আবির্ভূত হয়েছে। মহাজনপদ বলছে :

নিত্যানন্দ ছিল যেই নরোত্তম হৈলা সেই
শ্রীচৈতন্য হইলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যারে কয় শ্যামানন্দ তেঁহো হয়
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ ॥
সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব।
সর্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব ॥

শ্যামানন্দকেও তাই দলে ঢুকিয়ে দিল জীব। শ্রীনিবাসের উপর নরোত্তমের ভার দিল, নরোত্তমের উপর শ্যামানন্দের ভার। সমস্ত ভক্তি-গ্রন্থের বোঝারি হল তিনজন। গরুর গাড়িতে গ্রন্থ-সম্পুট নিয়ে তারা গৌড়ের অভিমুখে যাত্রা করল।

রূপ যে রাধাদামোদর প্রকটিত করেছিল তারই সেবায় নিত্য স্থিত, জীব প্রায় পঁচাশি বছর বেঁচে ছিল। পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তার তিরোভাব তিথি।

কেউ-কেউ উমার সঙ্গে মহেশ্বরের, কেউ কেউ বা লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণের ভজনা করে। তারা তাই করুক। কিন্তু আমরা রাধাদামোদরকেই ভজনা করছি। বৃন্দাবনবাসী জীব নামক কোনো এক ব্যক্তির রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকাই দীপ্তিলাভ করুক।

॥ ৮৭ ॥

উদ্ধারণ দত্ত

ত্রিবেণীর অদূরে সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিককুলে উদ্ধারণের আবির্ভাব। পিতা শ্রীকর দত্ত, মাতা ভদ্রাবতী।

বাসুদেব ঘোষের কড়চা বলছে, উদ্ধারণের পূর্বনাম ছিল দিবাকর। নিত্যানন্দই দিবাকরের নাম রাখেন উদ্ধারণ। দিবাকরের থেকে সমস্ত বণিককুলের উদ্ধার হল বলেই তার ঐ নাম।

প্রভু হাসি হাসি কহে বণিককুমার,
বণিককুল তোমা হৈতে হৈল উদ্ধার ॥
দিবাকর করি নাম না পুছিবে কেহ।
আজি হৈতে মোর দত্ত নাম তুমি লহ ॥

বণিককুল উদ্ধার করিলি বটে সে কারণ।
আজি হৈতে তোর নাম রহুঁ উদ্ধারণ॥

শ্রীকর দত্ত সে যুগের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী, গৌড়ের নবাব পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নিত। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী উদ্ধারণ। তারপর কাটোয়ার ছ মাইল উত্তরে নৈহাটি বা নবহট্ট গ্রামের নৈ-রাজার দেওয়ান। নৈহাটির কাছে যে পল্লীতে উদ্ধারণ থাকে তারও নাম দাঁড়াল উদ্ধারণপুর।

এই উদ্ধারণপুরে একবার এসেছিলেন মহাপ্রভু। একটা নিমগাছের নিচে বসেছিলেন। সেই গোড়া-বাঁধানো নিমগাছ এখনো বর্তমান। সেই আগমন-স্মৃতি উপলক্ষ্যে প্রতি বছর মকরসংক্রান্তিতে এখানে মেলা বসে।

উদ্ধারণ বিপুল অর্থ সৎকাজে, দেবদ্বিজ-বৈষ্ণবসেবায় ব্যয় করে, ব্যয় করতে ভালোবাসে। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা—এই তার জীবনের ব্রত। তাছাড়া নিয়মিত ভাগবত পড়ে, শ্রীবিগ্রহের সেবা করে স্বহস্তে।

হলধর সেন উদ্ধারণের অধীনে কাজ করে। সেও সুবর্ণবণিক, তারই বংশ-প্রদীপ গৌরী সেন। সেই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।' উদ্ধারণের জমিদারী থেকেই হলধরের বিত্তবিস্তার। লোকে হলধরকে বলে হলধর কুবের। হলধরের বোন সুপ্রসন্নাকে বিয়ে করল উদ্ধারণ। সুপ্রসন্না বেশি দিন বাঁচেনি। একমাত্র পুত্র শ্রীনিবাসকে রেখে অকালে দেহত্যাগ করল।

বিপত্নীক উদ্ধারণ, শ্রীনিবাসকে নিয়ে সংসারে আছে বটে কিন্তু মন রেখেছে ঈশ্বরে। অনন্ত ঐশ্বর্য, কিন্তু একবিন্দু মাৎসর্য নেই। পরম ভাগবত, সংসারে থেকেও মায়া-মোহের অতীত। গভীর পাঁকের মধ্যে থেকেও পাঁকাল মাছের গায়ে যেমন পাঁক লাগে না তেমনি সংসারে বাস করেও উদ্ধারণ মুক্তপুরুষ, সংসারপঙ্কের ছিটেফোঁটাও তার গায়ে লাগে নি।

মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রেমবিতরণে বেরিয়েছে। প্রথমে পানিহাটি পরে খড়দহ। খড়দহ থেকে সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামে কারু বাড়িতে অতিথি হবার আগে নিত্যানন্দ সর্বগণ নিয়ে ত্রিবেণীতে স্নান করে নিল।

এরা কারা? এদের মধ্যে কে ঐ দলপতি, ঐ লাবণ্যমনোহর? মুখে হরি বলে গর্জন করছে আর সঙ্গের লোকেরা ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠছে—এ প্রেমের বন্যাকে আমরাও রোধ করতে পারছি না কেন?

স্নান করে এক পাকুড়গাছের নিচে বসল নিত্যানন্দ। অপেক্ষা করতে লাগল।

কে যাবে তাকে সম্ভাষণ করতে ?

আর কে ! উদ্ধারণ মানে দিবাকর দত্ত গিয়ে হাজির। একেবারে গলবস্ত্র হয়ে নিত্যানন্দের চরণে পড়ে দৈন্যদ্রব হয়ে কাঁদতে লাগল।

নিত্যানন্দ, যার মত দয়াল দাতা আর নেই, দিবাকরের মাথায় দুই হাত রেখে প্রগাঢ় আশীর্বাদ করল। বললে, 'ওঠো, কেঁদো না, আজ থেকে তুমি আমার কিঙ্কর হলে।'

এর চেয়ে বড় পদ কী হতে পারে ? বললে দিবাকর, তিন দিন উপবাসের পর আজ আমার পারণ, আপনার দেখা পেয়েছি, আপনাকে আমি ভোগ দেব, আপনি তা প্রসাদ করে দেবেন।

চলো তোমার মন্দিরে চলো। নিত্যানন্দ বৃক্ষতল হতে উঠে দাঁড়াল।

ভক্তের গৃহ মন্দির ছাড়া আর কী। ভক্তশ্রেষ্ঠ দিবাকরের গৃহ তো সুবর্ণ-মন্দির।

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তাঁহা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥

পরমানন্দে দিবাকরের ঘরে ভিক্ষা নিল নিত্যানন্দ। তারপর মাঘ মাসের সেই সপ্তমী তিথিতে দিবাকরকে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিল। বললে, আজ থেকে তোমার নাম উদ্ধারণ। তোমার থেকেই সমগ্র বণিককুল পবিত্র হয়ে গেল।

যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥

উদ্ধারণ কায়মনোবাক্যে অকৈতবে নিত্যানন্দের সেবা করতে লাগল।

নিত্যানন্দ বললে, আমার এখানে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, শুধু তোমাকে তোমার কুলকে উদ্ধার করবার জন্যেই আসা।

বণিক তারিতে নিত্যানন্দের অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেম-ভক্তি-অধিকার ॥
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনি নিতাইচাঁদ কীর্তনে বিহরে ॥

সে যেমন নবদ্বীপে লীলা হয়েছিল তেমনি শুরু হল সপ্তগ্রামে। সেদিন নবদ্বীপে—

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥

যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥

আর আজ সপ্তগ্রামে উদ্ধারণের গলা ধরে কাঁদছে নিতাই, আর—

গোরা গোরা বলি মুহু ছোড়য়ে হুঙ্কার।
শুনি সপ্তগ্রামের লোক হৈল চমৎকার॥
প্রভু কহে গতি নাই মোর গোরা বিনে।
হরি হরি বলে ভাই মোরে লও কিনে॥

সমস্ত বণিকসমাজ কৃষ্ণভক্ত হয়ে গেল। 'সপ্তগ্রাম হৈল যেন নববৃন্দাবন।' বণিক-সভার কৃষ্ণভজন দেখে সকলে অভিভূত। এত ভক্তি ছিল কোথায়? আর কে না জানে ভক্তির জাতি নেই, চণ্ডালও যদি হরিভক্ত হয় তবে সে ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণ যদি ভক্তিহীন হয় তবে সে অধমাধম।

এক ব্রাহ্মণ এসেছে উদ্ধারণের বাড়িতে, নিত্যানন্দের সঙ্গে তর্ক করতে—ভক্তি শ্রেষ্ঠ না জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তর্ক করে শেষ মীমাংসায় পৌছুতে বেলা অনেক বেড়ে গেল, নিত্যানন্দ ইঙ্গিত করে উদ্ধারণকে বললে, ব্রাহ্মণ যেন অভুক্ত ফিরে না যায়।

ব্রাহ্মণ সরস্বতীর জলে স্নান করতে গেল। ত্রিবেণীর এক বেণী সরস্বতী। আর দুই ধারা গঙ্গা আর যমুনা।

উদ্ধারণ নিত্যানন্দকে জিজ্ঞেস করলে, আজ কী রাঁধব? ব্রাহ্মণকেই বা কী খেতে দেব?

নিত্যানন্দ বললে, আজ চালে-ডালে খিচুড়ি রান্না করো।

তাই রান্না হল। রান্নার পর অঙ্গনে আসন ও পাতা সাজানো হল। নিত্যানন্দ ভক্তদের নিয়ে বসল পঙ্‌ক্তি-ভোজনে। স্নানান্তে ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়িয়েছে, নিত্যানন্দ তাকে বসতে আহ্বান করল।

রান্না করেছে কে?

উদ্ধারণ।

ক্রোধে রক্তচোখ করল ব্রাহ্মণ। বললে, বেনের রান্না কী করে খাব?

বানিয়ার পাচিত অন্ন কেমতে খাইব।
ছিয়ে ছিয়ে এমতে কি জাতি খণ্ডাইব॥

নিত্যানন্দ বললে, সন্ন্যাসীর বা ভক্তের কখনো অন্নদোষ হয় না। উদ্ধারণ গোবিন্দের প্রসাদ পাক করেছে। এতে তার কোনো অপরাধ

হয় নি। আর প্রসাদ খেতে কার অরুচি হবে ?

গুণকর্মে হৈলা ইঁহ জাতির উৎপত্তি।
লিখাজোখা ভাগবতে ভগবানের উক্তি॥
পরম ভক্ত বেনে এই উচ্চ-জাতি পাই।
তার গৃহে তার অন্ন মুই কিন্তু খাই॥

ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দের পাশে বসল আসনে। কিন্তু এ কী, উদ্ধারণ শুধু রান্নাই করে নি, উদ্ধারণ আবার পরিবেশন করছে। ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্ত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—নিত্যানন্দের কোনো যুক্তি কোনো সান্ত্বনাই কাজে লাগল না। স্বরে অবজ্ঞা মিশিয়ে উদ্ধারণকে লক্ষ্য করে বললে, তোমার এত অহঙ্কার ? তোমার আবার পরিবেশনের স্পর্ধা ! কে তোমার অন্ন স্পর্শ করে ?

নিত্যানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে উদ্ধারণকে বললে, তোমার হাঁড়ির ঐ কাঠের হাতাটা আমাকে দাও।

উদ্ধারণ সেই রান্নার কাঠিটা নিত্যানন্দের হাতে দিল।

নিত্যানন্দ সেই কাঠিটা অঙ্গনে পুঁতল আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিরাট একটা মাধবী তরুতে পরিণত হল। 'মুহূর্তের মধ্যে হল বৃক্ষের উন্নতি। পুষ্পিত হইল মধু, পিয়ে অলি ততি।' যেন আতপ নিবারণের জন্যে বহুবিতত শাখায় একটি আতপত্র তৈরি হল। দেখ উদ্ধারণের ভক্তির শক্তি, তার স্পর্শের পবিত্রতা !

ব্রাহ্মণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল। পরে আচ্ছন্ন ভাব কেটে যেতেই সে গাছের কাছে মাথা নত করল। উঠোনের মাটি মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে। উদ্ধারণকে বললে, উদ্ধারণ, অন্ন দাও, শুধু উদরের ক্ষুধা নয়, জীবনের ক্ষুধা মেটাই।

সেই লতামণ্ডপ এখনো শীতল ছায়া দিয়ে ত্রিতাপজর্জর জীবনের ব্যথাহরণ করছে।

এই অলৌকিক বিকাশের কতদিন পরে এই মাধবী-মণ্ডপে গৌরাঙ্গসুন্দর আবির্ভূত হন। উদ্ধারণকে বলেন, প্রাণ-উদ্ধারণ ! তুমি নিতাইচাঁদের কৃপায় শান্তি লাভ করেছ। যারা এই লতামণ্ডপে আশ্রয় নেবে তারাও নিতাইচাঁদের কৃপা পাবে।

উদ্ধারণের গৃহসংলগ্ন দেবালয়ের উত্তরে একটি পুকুর আছে। একদিন সে-

পুকুরে স্নানের সময় নিত্যানন্দ ব্রজরাখালভাবে উদ্ধারণের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে লাগল। ক্রীড়ার মধ্যে নিত্যানন্দের পা থেকে নূপুর খসে জলে তলিয়ে গেল।

উদ্ধারণ, আমার নূপুর উদ্ধার করে দাও। নিত্যানন্দ বলে উঠল।

উদ্ধারণ রাজী হল না। বললে, আপনার শ্রীচরণের সম্বন্ধ যাতে আছে সেই জিনিস যদি কেউ অনায়াসে পেয়ে যায় তা কিসে প্রাণ থাকতে প্রত্যর্পণ করতে চাইবে? আপনার পায়ের নূপুর আমার এই পুকুরের মধ্যে পড়ে থাক। আমার পুকুর পরম পবিত্র তীর্থে পরিণত হোক।

সেই থেকে সে পুকুরের নাম হল নূপুর-পুকুর—বা, নূপুর-কুণ্ড।

একদিন এক শাঁখারি সপ্তগ্রামের পথ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে—শাঁখা কিনবে গো, হঠাৎ একটি বালিকা এসে বললে, আমি কিনব। ভালো দেখে এক-জোড়া শাঁখা আমাকে পরিয়ে দাও।

শাঁখারি বালিকার সুন্দর দুটি মণিবন্ধে সুন্দর দুটি শাঁখা পরিয়ে দিল। দিয়ে দাম চাইল।

বালিকা বললে, আমার বাবা উদ্ধারণ দত্তের কাছে গিয়ে দাম চাও, তিনি দিয়ে দেবেন।

কত দাম তিনি তা বিশ্বাস করবেন কী করে?

বলবে, পূর্বঘরের পশ্চিমের কুলুঙ্গিতে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আছে, তাই তোমার মেয়ে দাম বলে দিতে চেয়েছে। আর বাবা যদি নেহাতই দাম না দেন তুমি এখানে ফিরে এস, যেমন করে পারি আমি তোমার দাম দিয়ে দেব। ইতিমধ্যে আমি নদীতে স্নান করে নিই।

শাঁখারি উদ্ধারণ দত্তের বাড়ি গিয়ে উদ্ধারণকে সব বলে শাঁখার দাম চাইল।

উদ্ধারণ বললে, আমার মেয়ে নেই।

মেয়ে নেই এমন কথা মুখেও আনবেন না। অমন সুন্দর সরল মেয়ে কি কখনো মিছে বলতে পারে? শাঁখারি বললে অনুনয় করে, তার উপর রাগ করবেন না, শাঁখা পরে তার হাত দুখানি কেমন সুন্দর হয়েছে যখন দেখবেন, রাগ থাকবে না। দিন, দামটা দিয়ে দিন।

কত দাম?

পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা। আপনার মেয়েই দাম ঠিক করে দিল। বলে দিল

আপনার পূর্বঘরের পশ্চিম কুলুঙ্গিতে মুদ্রা ক'টি আছে। তাই আমার প্রাপ্য।

ব্যস্ত হয়ে উদ্ধারণ দেখতে গেল—আশ্চর্য, নির্দিষ্ট কুলুঙ্গিতে পাঁচটি সোনার মুদ্রা !

কই আমার মেয়ে কই ? আমার মেয়েকে দেখাও।

শাঁখারি উদ্ধারণকে সরস্বতী নদীর ঘাটে নিয়ে এল। কিন্তু কই সে-মেয়ে কই ? কোথায় সে স্নান করতে নেমেছে ?

মা, মা-গো, তুই কোথায় ? দেখা দিয়ে আমার মান রাখ। নইলে যে আমি প্রবঞ্চক হয়ে থাকব। তোকে যে আমি শাঁখা পরিয়েছি এ কী করে দত্তঠাকুর বিশ্বাস করবেন ? শাঁখারি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

তখন সরস্বতীর জলের উপর দুখানি নিটোল হাত উঠে এল। দুই হাতে দুগাছা শাঁখা শোভা পাচ্ছে।

শাঁখারি আর উদ্ধারণ দুজনেই কাঁদতে লাগল। উদ্ধারণ বললে, শাঁখারি, তুমি ভাগ্যবান। তোমার ভক্তির শক্তিতে আমার এই দর্শন হল। বলেছে, আমার মেয়ে, আমার মা, ত্রিলোক-জননী—আর আমার কী চাই। এই নাও স্বর্ণমুদ্রা।

শাঁখারি নিল না। বললে, মণি ফেলে এই কাচের টুকরো নিয়ে আমি কী করব ? তখন আমি কেন মাকে চিনতে পারলাম না ? আমি ভাগ্যবান, না, আমি হতভাগ্য ?

সপ্তগ্রামে কিছুদিন বাস করবার পর নিত্যানন্দের 'গৃহী উদ্ধারিতে হৈল গৃহী হতে সাধ।' নিত্যানন্দের ভক্ত কমলাকান্তের মুখে এ কথা শুনে উদ্ধারণ লোকজন লাগিয়ে কন্যা খুঁজতে লাগল। 'রূপে গুণে লক্ষ্মী কন্যা আছে কোন্ ঘরে।'

খবর পাওয়া গেল অম্বিকা-কালনায় সূর্যদাস পণ্ডিতের ঘরে দুটি কন্যা আছে—বসুধা ও জাহ্নবা। সূর্যদাস তাদের দুজনকেই নিত্যানন্দের হাতে সম্প্রদান করুক।

নিত্যানন্দ গৌরহরিকে স্মরণ করল। 'অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা। মোর নেত্রে পট দিয়া লুকায়ে রহিলা।' এখন আবার বেশ-ভূষায় সজ্জিত করে বিষয়ী করছ, বলছ সংসার করতে। আমি কখন যে কী হই কিছু বুঝতে পারি না। শুধু তোমার আজ্ঞা শিরে বহন করে চলি।

সূর্যদাসের ঘরের দরজায় নিত্যানন্দ দাঁড়িয়ে রইল, উদ্ধারণ ঢুকল

অন্তঃপুরে। সূর্যদাসকে বললে, তোমার কন্যার জন্যে বর এনেছি।

কে সে?

উত্তম ব্রাহ্মণ। সর্বশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ-গরিষ্ঠ। রাঢ়চূড়ামণি। প্রেমানন্দে বাস, নাম নিত্যানন্দ। উদ্ধারণ বরের পরিচয় দিল।

সূর্যদাস উৎসাহিত হল না। অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুক লোককে কী করে মেয়ে দিই? আত্মীয়কুটুম্বেরাও প্রত্যাখ্যান করল।

কদিন পরে নিত্যানন্দ আর উদ্ধারণ গঙ্গাতীরে বসে কৃষ্ণকথা বলছে, দেখল শোকাকুল সূর্যদাস ও তার লোকেরা মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে চলেছে। খবর নিয়ে জানল এ বসুধার মৃতদেহ।

নিত্যানন্দ বললে, একে আমি বাঁচাতে পারি, যদি—

আপনি যা চাইবেন তাই দেব। বললে সূর্যদাস।

যদি তাকে আমার হাতে সমর্পণ করেন।

তাই করব।

মৃত-সঞ্জীবন হরিনাম শুনে বসুধা বেঁচে উঠল। মহাসমারোহে নিত্যানন্দ তাকে বিবাহ করলে। শুধু তাকে নয়, জাহ্নবাকেও। 'যৌতুক ছলে জাহ্নবারে আত্মসাৎ কৈলা।'

বিবাহমহোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার উদ্ধারণ বহন করল।

তারপর নিত্যানন্দ যখন সপ্তগ্রাম অন্ধকার করে চলে যাবার উদ্যোগ করল, তখন উদ্ধারণ কাঁদতে বসল।

উদ্ধারণ, কেন কাঁদছ? তুমি তো জান আমি শ্রীচৈতন্যের কিঙ্কর। তাঁর আজ্ঞায় তাঁর কাজ আমাকে সমাপন করতে হবে। আমি এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকি কি করে? দেশে দেশে ঘুরে যে আমাকে নাম প্রচার করতে হবে। যত দূরেই যাই না কেন, আমার প্রাণ তোমার কাছে বাঁধা থাকবে।

আটচল্লিশ বছর বয়সে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর পুত্র শ্রীনিবাসের উপর বিষয়-কর্মের ভার দিয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করল। ছ'বছর নীলাচলে কাটিয়ে ছ' বছর বৃন্দাবনে সাধন করল। তারপর ষাট বছর বয়সে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে নশ্বর দেহ ঈশ্বরে বিসর্জন দিল।

বৃন্দাবনের বংশীবটের কাছে তার সমাধি। সপ্তগ্রামের পাটবাড়িতে ও উদ্ধারণপুর গ্রামেও তার সমাধি-মন্দির আছে।

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর দ্বাদশ গোপালের একজন। শ্রীপাট সপ্তগ্রাম। ষড়ভুজ

মহাপ্রভুই প্রধান বিগ্রহ। ত্রেতায় রামের দু'হাত, দ্বাপরে কৃষ্ণের দু'হাত আর কলিতে গৌরাঙ্গের দু'হাত—এই মোট ছ'হাত। নিত্যানন্দ আর গৌরাঙ্গের যুগল-বিগ্রহও শ্রীপাটে অধিষ্ঠিত।

তারপর মাধবীমণ্ডপ। নূপুর-পুকুর।

॥ ৮৮ ॥

মহেশ পণ্ডিত

দ্বাদশ গোপালের একজন।

জন্মস্থান ও পূর্ববাস শ্রীহট্ট! পিতা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভাগ্যবতী।

কমলাক্ষের দুই ছেলে, বড় জগদীশ, ছোট মহেশ। নবদ্বীপে এদের বাড়ি। জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির কাছে। বলা যায় ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। জগদীশের স্ত্রী দুখিনীর সঙ্গে শচীদেবীর নিবিড় হৃদ্যতা।

গৌরাঙ্গের নৃত্য-কীর্তনে মহেশও একজন সঙ্গী। যেমন নবদ্বীপে তেমনি নীলাচলে। সে ঢাক বাজিয়ে নৃত্য করে।

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে—প্রেমে মাতোয়াল॥

ব্রজের উদার গোয়াল—সে কে, তার নাম কী? তার নাম মহাবাহু। মহেশ পণ্ডিত ব্রজলীলায় মহাবাহু সখা।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে যাবে, রাষ্ট্র হল নবদ্বীপে। জগদীশ পাগলের মত হয়ে গেল। ছুটল নীলাচলে। বলে গেল, নীলাচল থেকে জগন্নাথবিগ্রহ নিয়ে আসি, তা হলে নিমাই আর ওমুখো হবে না, নেবে না সন্ন্যাস।

নীলাচলের 'বৈকুণ্ঠ' থেকে শ্রীবিগ্রহ নিয়ে এল জগদীশ। কিন্তু গৌরাঙ্গ নিবৃত্ত হবার নয়। তখন জগদীশ সে-বিগ্রহ নবদ্বীপের কাছে যশড়া গ্রামে স্থাপিত করল।

সন্ন্যাসের পর গৌরহরি যশড়ায় জগদীশের বাড়িতে এলেন। সঙ্গে

নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ মহেশকে দীক্ষা দিয়ে নিজের পার্ষদ করে নিল।

খড়দহে নিত্যানন্দের শ্রীপাট স্থাপনের পর মহেশ যশড়ার কাছে মসিপুরে শ্রীপাট স্থাপন করে। মসিপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হলে শ্রীপাট সরডাঙায় স্থানান্তরিত হয়। সরডাঙাকেও গঙ্গা গ্রাস করে। তখন শ্রীপাট চাকদহের এক মাইল দক্ষিণে পালপাড়ায় চলে আসে। বিগ্রহ গোপীনাথ, নিতাইগৌর আর মদনমোহন।

জগদীশের শ্রীপাট যশড়ায়, চাকদহের এক মাইল পশ্চিমে। বিগ্রহ জগন্নাথ, রাধাকৃষ্ণ ও গৌরনিতাই।

॥ ৮৯ ॥

ধনঞ্জয় পণ্ডিত

দ্বাদশ গোপালের আরেকজন। ব্রজলীলায় সখা বসুদাম।

আবির্ভাব চট্টগ্রাম জেলার জাড়গ্রামে। পিতা শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী দেবী।

শ্রীপতি বিরাট ধনী, পুত্রও বিলাস-লালিত। শ্রীপতি বরবর্ণিনী সুন্দরীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। ধনীপুত্র ধনঞ্জয় সংসারের আমোদে-প্রমোদে মেতে উঠল।

কিন্তু কিছুকাল পরেই বৈরাগ্যের ডাক শুনল ধনঞ্জয়। সংসার মনে হল শৃঙ্খল। ব্যসন-বাসনা মনে হল আবর্জনা।

তীর্থে যাচ্ছি, বলে একদিন গৃহত্যাগ করল।

সোজা চলে এল নবদ্বীপ। মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করল। মিশে গেল ভক্তদলে। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে রইল।

তারপর চলে গেল বর্ধমান জেলার শীতলগ্রামে, সেখান থেকে মেমারি স্টেশনের কাছে সাঁচড়া-পাঁচড়ায়। জনে-জনে হরিনাম মহামন্ত্র বিতরণ করতে লাগল।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে বীরভূম জেলার বোলপুর স্টেশনের চার-পাঁচ ক্রোশ পুবে শীতলগ্রামে এসে উপস্থিত হয়। শীতলগ্রামে গৌরহরির

সেবা প্রকাশ করে।

তার লীলাবসানও এই শীতলগ্রামে।

শ্রীপাট শীতলগ্রাম। বিগ্রহ গোপীনাথ, দামোদর আর নিতাইগৌর।

॥ ৯০ ॥

সুন্দরানন্দ

দ্বাদশ গোপালের আরো একজন। ব্রজলীলায় সুদাম সখা।

যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে আবির্ভাব। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বা গোষ্ঠলীলার একজন সহচর।

মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ যখন নীলাচল থেকে গৌড়ে যাত্রা করে তখন তার সহচরদের মধ্যে একজন এই সুন্দরানন্দ। প্রেমে আনন্দসুন্দর।

'নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান।' নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ প্রিয় ভৃত্য, নিত্যানন্দের সঙ্গে তার ব্রজের ভাবে হাস্যপরিহাস।

সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম ॥

নিত্যানন্দের লীলাকালে সুন্দরানন্দ একবার জাম্বীর বৃক্ষ হতে কদম্ব ফুল চয়ন করে দুই কানে কুণ্ডল করে পরেছিল। প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় গঙ্গাগর্ভ থেকে কুমীর ধরে এনেছিল। বনের বাঘ ধরে এনে কানে হরিনাম দিয়ে আবার পাঠিয়ে দিয়েছিল স্ববাসে।

চিরকুমার। চিরমুক্ত।

নিত্যানন্দের বিবাহে আনন্দময় বরযাত্রী।

শ্রীপাট মহেশপুর, মাজদিয়া স্টেশনের চোদ্দ মাইল পূর্বে। বিগ্রহ দারুময় রাধাবল্লভ।

বংশীবদন

নবদ্বীপের দক্ষিণে কুলিয়াপাহাড়পুরে আবির্ভাব। পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়, মাতা সুনীলা দেবী।

যখন পাঁচ বছর বয়স, বংশীবদনকে নিমাই গৃহে নিয়ে গিয়ে লালন-পালন করে, বিষ্ণুপ্রিয়াও তার প্রতি মাতৃস্নেহে আকৃষ্ট হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করার পর বংশীবদনই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দেখাশোনার ভার নেয়। সংসারের অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থার কর্তৃত্বও বংশীবদনের হাতে।

মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর বংশীবদনের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। যে নিমগাছের নিচে নিমাইয়ের জন্ম, বংশীর প্রতি মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ হল সেই গাছের কাঠ থেকে বিগ্রহ নির্মাণ করো। বংশী সেই নিমগাছের কাঠ থেকে গৌরাঙ্গমূর্তি প্রকাশিত করল। পদ্মাসনে নিজের নাম লিখে নিল। বসল নিত্যসেবায়।

কিন্তু বিগ্রহ চলে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার পিত্রালয়ে। বংশী তখন চলে গেল বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে বলদেব তাকে আদেশ করল, ফিরে যাও, ফিরে গিয়ে আমার সেবা প্রকাশ করো।

বংশী দেশে ফিরে এল। বন কেটে বাঘনাপাড়া শ্রীপাট পত্তন করল। বলরামের বিগ্রহ স্থাপন করল। সঙ্গে গোপাল গোপেশ্বর রাধিকা আর রেবতী। এই গোপাল জগন্নাথ মিশ্রের কুলদেবতা। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এ বিগ্রহ বংশীকে দান করেছিলেন।

বলরামের স্বপ্নাদেশে বংশী চন্দ্রশেখর পণ্ডিতের মেয়ে পার্বতীকে বিয়ে করল। সেই বিয়ের দুই ছেলে—নিত্যানন্দদাস আর চৈতন্যদাস। চৈতন্য-দাসের দুই ছেলে শ্রীরামচন্দ্র আর শচীনন্দন। এই রামচন্দ্র বা রামাইকে জাহ্নবা দত্তক নেন।

বংশীবদন একজন পদকর্তা। বাংলা ও ব্রজবুলি দুই ভাষাতেই পদ-রচনায় সিদ্ধহস্ত।

পরমেশ্বরদাস

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ব্রজের অর্জুন-সখা।

আবির্ভাব কেতুগ্রাম বা কাউগ্রামে। নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব নিয়ে চলে আসে খড়দহে।

কানাইর নাটশালা থেকে প্রত্যাবর্তন করে মহাপ্রভু পানিহাটিতে রাঘব-পণ্ডিতের ঘরে পৌঁছুলে পরমেশ্বর দর্শন করতে যায়। পানিহাটিতে রঘুনাথ দাসের দই-চিঁড়ের মহোৎসবেও সে উপস্থিত।

নীলাচলযাত্রায় নিত্যানন্দের সঙ্গী। নিত্যানন্দ যখন ফিরে এল গৌড়ে তখনো পরমেশ্বরদাস তার সহচর।

শুধু তাই নয়, পরমেশ্বরদাস জাহ্নবা দেবীরও সেবক, রক্ষক, অভিভাবক। জাহ্নবা দেবীর সমস্ত যাত্রাপর্বে সেই প্রধান সহায়, প্রাচীন পরিচালক। তা হোক খেতুরি, হোক বৃন্দাবন। পরমেশ্বরদাস ছাড়া কে জাহ্নবাকে গোস্বামীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে?

জাহ্নবা রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ করিয়েছে। পাঠাবে বৃন্দাবনে। কে নিয়ে যাবে? আর কে! পরমেশ্বরদাস।

কী করে নিয়ে যাবে? নৌকোয়।

কণ্টকনগর থেকে নৌকো নিয়ে সোজা চলে গেল বৃন্দাবন। সেইখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে ফিরে এলে আবার তার উপর জাহ্নবার আদেশ হল, তড়াআটপুর গ্রামে রাধাগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করো।

পরমেশ্বরদাস তড়াআটপুর গ্রামের বাসিন্দা হল। স্থাপন করল শ্রীপাট। জাহ্নবা নিজে গিয়ে প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন করলে।

গলায় গুঞ্জামালা, পরমেশ্বরদাস নামপ্রেম-প্রচার-লীলায় নিত্যানন্দের সহচর। অলৌকিক শক্তি ধরে। বন্য জন্তুকেও হরিনামে বশীভূত করে।

তড়াআটপুর হুগলি জেলার হাওড়া-আমতা রেলের আটপুর স্টেশনের সন্নিকট। অধুনা বিগ্রহের নাম শ্যামসুন্দর।

। ৯৩ ।

মীনকেতন রামদাস

নিত্যানন্দের শিষ্য ও শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

সর্বদাই ব্রজরাখালের ভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকে। হাতে ব্রজরাখালের মতই বাঁশি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৃহে অহোরাত্র কৃষ্ণ-কীর্তন হচ্ছে। সে-আসরে মীনকেতনও আমন্ত্রিত। আসরে উপস্থিত হলে সমবেত বৈষ্ণবেরা তাকে সংবর্ধনা করল, করল চরণবন্দনা। ভাবুক-ভক্ত রামদাসের প্রেমাবেশ হল। অশ্রু পুলক জাড্য কম্প—সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ দেখা দিল।

কারো উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারো বংশী মারে, কাহারে চাপড়ে ॥

আর মাঝে মাঝে 'নিত্যানন্দ' বলে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। যে দেখে যে শোনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়।

শুধু একজন তার সংবর্ধনায় এগিয়ে আসেনি। সে গুণার্ণব মিশ্র।

কেন আসেনি? মীনকেতনের গুরু নিত্যানন্দের প্রতি অবজ্ঞায় নয় তো?

না। গুণার্ণব শ্রীমন্দিরে বিগ্রহসেবায় ব্যস্ত ছিল। তাই অঙ্গনে নেমে এসে মীনকেতনকে সম্ভাষণ করতে পারেনি।

কৃষ্ণসেবায় তৎপর ব্রাহ্মণের প্রতি মীনকেতন রুষ্ট হতে পারল না। বরং উলটে সে-ই গুণার্ণবকে সংবর্ধনা করলে।

এই তো দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ।
বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদগমন ॥

কিন্তু ঝগড়া বাধল কৃষ্ণদাস কবিরাজের এক ভাইয়ের সঙ্গে। সে-ভাই মহাপ্রভুকেই স্বয়ং-ভগবান বলে মানে, নিত্যানন্দের প্রতি তার বিশেষ আস্থা নেই।

কী, কী বললে? শুধু ক্ষুব্ধ নয়, ক্রুদ্ধ হল মীনকেতন।

কৃষ্ণদাসের ভাই বুঝি কিছু বাদ-প্রতিবাদ করতে চাইল। মীনকেতন বৃথা বাক্যব্যয় না করে তার বাঁশি ভেঙে দিয়ে চলে গেল।

জলের জীব-জন্তুকে উদ্ধার করেছে মীনকেতন, কৃষ্ণদাসের বিমুখ ভাইকেও ত্রাণ করল। নিত্যানন্দ না হলে যে বাঁশি বাজে না।

জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে মীনকেতন গেল খেতুরিতে, যোগ দিল সেই প্রেম-

উৎসবে! সে উৎসবে সংকীর্তনরঙ্গে মহাপ্রভু ক্ষণকালের জন্যে সকলের নয়নগোচর হয়েছিলেন। জাহ্নবা দত্তক পুত্র রামাইকে নিয়ে চলে গেল বৃন্দাবন, মীনকেতন ফিরে এল খড়দহে।

কিন্তু, না, কদিন পরে মীনকেতনের ডাক এল। সেও চলল বৃন্দাবন। জাহ্নবা তাকে গোপীনাথের দুটি বিগ্রহ দিল—একটি কানাই ও আরেকটি বলাই। এদের নিয়ে দেশে ফিরে যাও।

বাঘনাপাড়ায় বিরাট উৎসব করে এ দুটি বিগ্রহ অভিরাম ঠাকুরকে দিয়ে দিল মীনকেতন।

॥ ১৪ ॥

হরিদাস পণ্ডিত

বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর গোবিন্দ-বিগ্রহের প্রথম সেবক কাশীশ্বর গোসাঁই। নীলাচল থেকে মহাপ্রভুই পাঠিয়েছিলেন কাশীশ্বরকে।

পরবর্তী সেবক হরিদাস পণ্ডিত। সেও মহাপ্রভুরই নির্বাচিত।

গোবিন্দদেবের অনেক সেবক। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে 'সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।'

যারাই গোবিন্দের সেবক তারাই গোবিন্দের 'অধিকারী'।

অনন্ত আচার্যও ছিলেন একজন গোবিন্দাধিকারী। অনন্ত গদাধরের শিষ্য। আর এই অনন্তের শিষ্য হরিদাস।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে যাবার পথে ছত্রভোগে পৌঁছুবার আগে আটিসারায় এক অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভু ভিক্ষে করেছিলেন।

সর্বগণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীর ভিক্ষাধর্ম করাইলা শিক্ষা॥
সর্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥

অনেকে বলেন এই অনন্ত পণ্ডিতই অনন্ত আচার্য।

হরিদাস সুশীল, সহিষ্ণু, বদান্য, গম্ভীর, মধুরভাষী। তার শুধু দুই কাজ— গোবিন্দসেবা ও চৈতন্যগুণকীর্তনসেবন।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর শেষলীলার বর্ণনা নেই বলে হরিদাস সর্বপ্রথম কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অনুরোধ করলেন, তুমি যেন বঞ্চিত কোরো না।

॥ ৯৫ ॥

সীতাদেবী

অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী। পিতার নাম নৃসিংহ ভাদুড়ী। নৃসিংহের দুই কন্যা— সীতা আর শ্রী। দুই বোনকেই বিয়ে করল অদ্বৈত।

শান্তিপুরে বাড়ি, অদ্বৈত টোল খুলল নবদ্বীপে। নিমাইয়ের জন্মকালে সীতাদেবী নবদ্বীপেই ছিল। সূতিকা-গৃহে গেল শিশুর মুখ দেখতে। ধানদূর্বা কুঙ্কুমচন্দন—নানা মঙ্গলদ্রব্যে পাত্র ভরে নিল। নিল নানা উপহারের দ্রব্য।

কী কী উপহার?

সোনা-বাঁধানো বকুল-বীজের মালা, রজতমুদ্রার পাঁয়জোর, রুপোর বাঁকমল, সোনার অঙ্গদ-কঙ্কণ, সোনায় মোড়া বাঘনখ, পট্টসূত্রের ঘুনসি। মুখে-দেখানি মোহরও নিল সঙ্গে। শচীমাতার জন্যেও চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ি নিল। আর নিল স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা, বহু ধন।

শিশুর দিব্যমূর্তি দেখে সীতাদেবীর হৃদয় বাৎসল্যে দ্রবীভূত হল। ধান্-দূর্বা তার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করল: তোমরা দুই ভাই চিরজীবী হও।

'নিমাই' নামও সীতাদেবীই রাখল। 'ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই।' যাতে যমের মুখে তেতো লাগে, যাতে অপদেবতার না দৃষ্টি পড়ে।

স্নানের দিনে সীতাদেবী এসে আবার বস্ত্র দিল, শুধু প্রসূতি ও নবজাত শিশুকে নয়, জগন্নাথ মিশ্র ও বিশ্বরূপকেও। মিশ্র আর শচীদেবীও বস্ত্রাদি দিয়ে সীতাদেবীকে সম্মানিত করল।

সেই আশীর্বাদের সূত্রে নিমাই সীতাদেবীকে মা বলে। আর এই কারণে সীতাদেবী জগন্মাতা বলে আখ্যাতা।

নিমাইকে কত যে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছে সীতামাতা, কত পরিচর্যা করেছে। একদিন নিমাইয়ের জন্যে দুধ জ্বাল দিয়ে রেখেছে বড় ছেলে অচ্যুতানন্দ তাই খেয়ে ফেলল। সীতমাতা ক্ষুধার্ত পুত্রকে ক্ষমা করল না। পিঠে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসল: আমার নিমাইয়ের দুধ তুই খেয়ে ফেললি?

সেই চড়ের দাগ যে নিমাইয়ের পিঠে গিয়ে ফুটবে সীতাদেবী তা ভাবতে পারে নি।

আরেকদিন সীতাদেবী নিমাইয়ের জন্যে কলা রেখেছে, দ্বিতীয় ছেলে কৃষ্ণদাস তা খেয়ে ফেলল। সীতাদেবী এবার ছেলেকে মারল না, শুধু তিরস্কার করল।

নিমাই উদ্গারে কলার গন্ধ পেল। সে কী, আমি কলা খেলাম কখন?

মাঝে মাঝে সীতাদেবীকে যেতে হত শান্তিপুর। নিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে এল তখন গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের ভাই রামাইকে বললে, শান্তিপুর যাও, পূজার সজ্জা নিয়ে অদ্বৈতকে সস্ত্রীক আসতে বলো।

সীতাদেবীও স্বামীর সঙ্গে এল নবদ্বীপ। নন্দন আচার্যের ঘরে লুকিয়ে রইল অদ্বৈত। রাষ্ট্র করে দিল তারা কেউ আসেনি। কিন্তু নিমাইয়ের কাছে এ ছলনা টিকল না। যাও, নন্দন আচার্যের বাড়ি থেকে তাকে ডেকে নিয়ে এস। বলো গে সে ধরা পড়ে গেছে।

কোথায় আর ধরা পড়ল? তার তো প্রহার খাওয়া এখনো বাকি।

অদ্বৈত মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, সেই সম্পর্কে অদ্বৈতকে মান্য করে গৌরাঙ্গ। অদ্বৈত ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবেন, কোথায় তার সঙ্গে প্রভু দাসোচিত ব্যবহার করবেন, তা নয়, মর্যাদাসূচক ব্যবহার করছেন। এ অসহ্য, তাঁর কাছ থেকে অবজ্ঞা নিতে হবে, নিতে হবে অসম্মান। কিন্তু কী করে, কোন্ পথে?

পথ প্রস্তুত করলেন। ভাবলেন ওঁর ভক্তিধর্মকে হেয় করি, ভক্তির উপরে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা দিই। তাহলেই প্রভু শাসনে উদ্যত হবেন, আমি তাঁর হাতের মার খেয়ে ধন্য হব।

শিষ্যদের কাছে অদ্বৈত যোগবাশিষ্ঠ পড়াতে বসলেন। বললেন, ভক্তি গৌণ, জ্ঞানই মুখ্য। ভক্তির চেয়ে জ্ঞান গরীয়ান।

আরো ব্যাখ্যা করলেন : ভক্তি দর্পণ, জ্ঞান চক্ষু। চক্ষুহীনের দর্পণ দিয়ে কী হবে ? মূল্য কার বেশি ? দর্পণের না চোখের ?

কথা প্রভুর কানে গিয়ে পৌঁছুল। তিনি নিদারুণ ক্রুদ্ধ হলেন। নিত্যানন্দকে নিয়ে সটান চলে এলেন শান্তিপুর। একেবারে অদ্বৈতের ঘরে।

প্রভুকে আসতে দেখে অদ্বৈত উৎসাহিত হলেন। ঘরের পিঁড়ায় বসে পড়াচ্ছিলেন, দেখেও দেখলেন না।

কে বড় ? ভক্তি না জ্ঞান ? হুঙ্কার ছাড়লেন প্রভু।

অদ্বৈত ভাবলেন, এই সুযোগ, প্রভুকে আরো ক্ষিপ্ত করি। বললে, ও আবার একটা প্রশ্ন নাকি ? জ্ঞান সর্বকালের শ্রেষ্ঠ। যার জ্ঞান নেই তার ভক্তিতে কাজ কী ?

কী বললি ? ক্রোধে দিশাহারা হয়ে প্রভু অদ্বৈতকে পিঁড়া থেকে টেনে এনে উঠোনে ফেললেন। তারপর তাকে দুহাতে কিল মারতে শুরু করলেন। বললেন, ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শুয়েছিলাম, তুই আমার ঘুম ভাঙালি। বললি, আমাকে নিয়ে গিয়ে মর্তে ভক্তির প্রকাশ ঘটাবি। এখন কিনা তুই ভক্তিকে লুকিয়ে রেখে জ্ঞানকে বড় করছিস ? বলছেন আর মারছেন প্রভু।

তখন সীতাদেবী উঠোনে ছুটে এল। কাতরস্বরে অনুনয় করে প্রভুকে নিবৃত্ত করতে চাইল। রাখো রাখো বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আর মেরো না। ওর ব্যাখ্যাকে গ্রাহ্য কোরো না, ওকে ছেড়ে দাও। মারের চোটে কিছু একটা হলে তোমাকেই বিপদে পড়তে হবে ।

পতিব্রতার কাকুতি প্রভু কানে তুললেন না। বললেন, তুই জানিস না আমি কে ? আমি সে-ই যে কংসকে মেরেছিল, রাবণকে মেরেছিল, হিরণ্যকশিপুকে মেরেছিল—

মাটি থেকে উঠে পড়ে হাতে তালি দিয়ে নাচতে লাগলেন অদ্বৈত। সীতামাতাও যোগ দিলেন সে আনন্দে।

সমস্ত ব্যাপার মিটে গেল । অদ্বৈত প্রভুর চরণে মাথা রাখল। শান্তি দিয়েছ, এবার পদছায়া দাও। প্রভু অদ্বৈতকে কোলে নিলেন।

গৌরগতপ্রাণা সীতাদেবী আনন্দাশ্রু ঢালতে লাগল। নিজের হাতে নানা অন্নব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়াল প্রভুকে, তাঁর সহচরকে।

নীলাচলে গিয়েও অপত্যস্নেহে প্রভুকে কাছে বসিয়ে খাইয়ে এসেছেন সীতামাতা।

তারপর যখন শুনলেন প্রভু তিরোহিত হয়েছেন সীতামাতা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রভুর গৃহভৃত্য ঈশান এসে কেঁদে পড়ল, শচীমাতাও নেই, বিষ্ণুপ্রিয়াও নেই, আমি কোথায় যাই? সীতামাতা তখনো বেঁচে। ঈশানকে আশ্রয় দিলেন, জলবহনের কাজে নিযুক্ত করলেন। জলবহনের দরুন মাথায় ঘা হয়ে গেলে সীতামাতা তাকে প্রভূত সেবা করে সুস্থ করে তুললেন।

নিত্যানন্দ অপ্রকট হলেন। অদ্বৈতপ্রভুও চলে গেলেন। তখনো সীতাদেবী বেঁচে।

॥ ১৬ ॥

মালিনী

শ্রীবাসের স্ত্রী। নিত্যানন্দ তাকে মা বলে ডাকে।

নিত্যানন্দ আছেও এই শ্রীবাসের ঘরে, অহর্নিশ বাল্যভাবে। মালিনীর কোলে শুয়ে ঘুমোয়। মালিনীর শুষ্ক স্তনে মুখ দিয়ে দুধ আনে। মালিনী কাছে বসে না খাওয়ালে তার খাওয়া হয় না। 'আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।'

নিমাই বলে দিয়েছে, শ্রীবাসের ঘরে কোনো চাঞ্চল্য করবে না।

নিত্যানন্দ বলেছে, আমি কি পাগল?

কিন্তু ভাবেভোলা নিত্যানন্দ মাঝে মাঝে শাসন-বন্ধনের বাইরে চলে যায়। একদিন তো পরিধানের বস্ত্র মাথায় বেঁধে দিগম্বর হয়ে আঙিনায় লাফাতে লাগল। শ্রীবাস হরিদাস হাসতে লাগল বটে কিন্তু নিমাই প্রশ্রয় দিতে পারল না। বললে, থামো। গৃহস্থের বাড়িতে এসব কাণ্ড অবিধেয়।

চৈতন্যবচন নিত্যানন্দের কাছে অঙ্কুশ-সমান। নিত্যানন্দ সংযত হল। নিমাই কাপড় পরিয়ে দিল স্বহস্তে।

মাগো, ভাত দাও। আমি স্নান করে আসি।

কিন্তু গঙ্গায় নেমে আর উঠতে চায় না নিতাই। ওরে রান্না জুড়িয়ে গেল, কতক্ষণ আর জলে থাকবি?

নিত্যানন্দ গ্রাহ্য করে না।

তখন আবার নিমাইয়ের ডাক পড়ে। নিমাই পারে এসে দাঁড়াতেই নিতাই উঠে আসে জল থেকে।

একদিন নিত্যানন্দ দেখল, মালিনী কাঁদছে।

কী হয়েছে, কাঁদছ কেন?

শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র কাক চুরি করে নিয়েছে। মালিনী বললে অধোমুখে।

তার জন্যে কান্না কেন? দাঁড়াও, আমি বলছি কাককে। শিশুর সারল্যে নিতাই আকাশের দিকে তাকাল।

কত কাক উড়ছে, যেটা বাটি নিয়েছে তাকে তুমি চিনবে কী করে?

ঠিক চিনব। তুমি কেঁদো না। শিশুর মতই বিশ্বাস নিতাইয়ের। উঠোনে কতগুলি কাক বসেছে, তাদের লক্ষ্য করে বললে, কে বাটি নিয়েছিস, শিগগির ফিরিয়ে দে।

কাকগুলো উড়ে পালাল।

শিগগির বাটি এনে দে। নিত্যানন্দ আবার হাঁক দিল।

কতক্ষণ পরে একটা কাক উড়ে এল উঠোনে, তার ঠোঁটে সেই ঘৃতপাত্র। যেখান থেকে নিয়েছিল ঠিক সেইখানে রেখে গেল।

মালিনী বিস্ময়ে হতবাক।

সে যুক্তকরে নিতাইয়ের স্তব করতে লাগল।

স্তব শুনে নিমাই বাল্যভাব ধরল। বললে, আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও।

মালিনীর হৃদয়ে বাৎসল্য উথলে উঠল। তার স্তন হতে দুগ্ধ ক্ষরণ হতে লাগল। খাওয়াল নিত্যানন্দকে।

শ্রীবাসের ঘরে প্রভুর ঐশ্বর্যপ্রকাশের দিনে ভুরিভোজনের যোগাড় একা মালিনীকেই করতে হয়েছিল, তারপর আবার নীলাচলে গিয়ে মালিনী প্রভুকে তার প্রিয় ব্যঞ্জন রান্না করে খাইয়েছে, বাৎসল্যভাবে সেবা করেছে।

॥ ৯৭

দুঃখী

শ্রীবাসের ঘরে দাসীবৃত্তি করে। নাম দুঃখী।

শ্রীবাসগৃহে প্রভুর অভিষেক উৎসব হচ্ছে—শ্রীবাসেরা চার ভাই, মালিনী ও তার জায়েরা সবাই মেতেছে উৎসবে। নানা কাজে ছড়িয়ে পড়েছে। দাসদাসীরাও বসে নেই।

দাসী দুঃখীর কাজ শুধু গঙ্গা থেকে জল বয়ে আনা। জল-ভর্তি ঘড়াগুলো পর-পর সাজিয়ে রাখা।

দু দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যে প্রভুকে একটু দেখে তার অবকাশ নেই। আরো জল আনো, আরো জল। তাড়াতাড়ি করো। তোমার আবার দেখবার কী হয়েছে!

দুঃখী শুধু ঘড়া করে গঙ্গাজল আনে না. তার দুঃখনদী থেকে অশ্রুজল এনে তার হৃদয়কুম্ভটি ভরে রাখে।

যখন জলবহনই আমার কাজ তখন অম্লানচিত্তে তাই করে যাব।

এত জল আনে কে? প্রভু বুঝি বাহিকার নিষ্ঠাভক্তি প্রত্যক্ষ করলেন।

শ্রীবাস বললে, আমার বাড়ির দাসী। নাম দুঃখী।

দুঃখী? এমন লোকের নাম দুঃখী হয় না। আজ থেকে ওর নাম সুখী। বললেন প্রভু, আমার মন বলছে ও চিরন্তন কাল সুখী থাকবে। ওকে সবাই সুখী বলে ডেকো।

প্রভুর করুণায় সবাই বিহ্বল হয়ে গেল। দুঃখীকে ডাকতে লাগল সুখী বলে। শ্রীবাস আর দুঃখীতে দাসীবুদ্ধি করতে পারল না। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।' সেবাপরায়ণ হয়ে উঠল। যে বিগ্রহই হোক, প্রেমযোগে সেবা করলেই কৃষ্ণলাভ।

আর দুঃখী? তার সুখ দেখে কে! আমি শুধু জল বয়ে বেড়াই। এখন আবার আনন্দাশ্রুতে অন্তরের ঘট পূর্ণ করে রাখছি।

অন্য অভিলাষ না করে সে শুধু নিজের কাজটুকু করে গেছে। শুধু নিষ্ঠায়ই তার এই কৃপালাভ।

আর এমন কৃপা, সন্ন্যাস নেবার সময় প্রভু যখন ভক্ততৃপ্তির জন্যে গঙ্গাজলে

তর্পণ করছেন তখন যাদের নামোচ্চাণ করলেন তার মধ্যে একজন এই দুঃখী দাসী।

দাসী হই যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা-অভিমানী সব তারা না দেখিল॥

॥ ৯৮ ॥

নারায়ণী

শ্রীবাসের অগ্রজ নলিন পণ্ডিত। তারই কন্যা নারায়ণী।

নারায়ণীর এক বছর বয়সের মধ্যেই তার বাবা-মা তিরোহিত হল। মালিনী শিশুকে নিয়ে এসে লালনপালন করতে লাগল।

প্রভুর মহাপ্রকাশের সময় নারায়ণীর বয়স মোটে চার বছর। প্রভু সেই চার বছরের বালিকাকেই তাঁর চর্বিত তাম্বুলের অবশেষ দান করলেন। পরম আনন্দে নারায়ণী খেল সেই পরমপ্রসাদ। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল 'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র'।

প্রভু তখন নারায়ণীকে আদেশ করলেন, নারায়ণী, কৃষ্ণ বলে কাঁদো।

হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলে তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করল নারায়ণী। এক রত্তি শিশু, তার চোখের জলের সমুদ্রে পৃথিবী ভেসে যেতে লাগল।

ছোট শিশু কী, বনের পশু-পাখিকেও আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদাব। বললেন প্রভু, আসুক বিধর্মী রাজা, আনুক তার হাতি-ঘোড়া, সৈন্যসামন্ত, সকলকে আমি কাঁদাব কৃষ্ণনামে।

প্রভু নীলাচলে চলে গেলে শ্রীবাস কুমারহট্টে বাস করতে এল। সেখানকার বিপ্র বৈকুণ্ঠদাসের হাতে নারায়ণীকে সম্প্রদান করল। নারায়ণী গর্ভবতী হলে বৈকুণ্ঠদাস অপ্রকট হল। শ্রীবাস নারায়ণীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল।

যথাকালে নারায়ণী পুত্রসন্তান প্রসব করল। সেই পুত্রই শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর।

কত বড় মায়ের কত বড় ছেলে।

অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥

॥ ৯৯ ॥

দময়ন্তী

রাঘব পণ্ডিতের বোন, প্রভুর প্রিয় দাসী।

প্রভুর জন্যে বারো মাসের উপযোগী নানারকম ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে ঝালি ভরে রাঘবের সঙ্গে প্রতি বছর পাঠায় নীলাচলে। প্রভুও বারো মাস ধরে ভক্তের প্রীতিসুধাসিঞ্চিত ভোগ্যদ্রব্য আস্বাদ করেন।

কী নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে তৈরি করছে! কী অন্তরঙ্গ স্নেহ মিশিয়ে!

কী তৈরি করছে?

তৈরি করছে আমকাসুন্দি, আদাকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি। আমসি, আম-তেলের আচার। পুরোনো শুকনো পাটপাতা গুঁড়ো করে দিচ্ছে। প্রভুর পঞ্চামৃতেও তত সুখ নয় যত এই সামান্য কাসুন্দিতে বা পাটপাতায়। ভাবগ্রাহী প্রভু তো বস্তু দেখেন না, স্নেহ দেখেন। প্রভুর প্রতি দময়ন্তীর যে মধুর মনুষ্যবুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজপরিকরদের যেমন তেমনি। প্রভু স্বয়ং ভগবান—দময়ন্তীর মনে এ ভাব নেই। প্রভু তার মনের মানুষ, আপনজন, এই শ্রদ্ধা প্রীতিতেই সে প্রেরিত।

গুরুভোজনে আমাশা হতে পারে তারই প্রতিষেধ হিসেবে পাটপাতা পাঠানো।

আর এই নির্মল স্নেহটুকু স্মরণ করেই প্রভুর আনন্দ।

আলাদা-আলাদা থলের মধ্যে করে দিচ্ছে ধনের চালের, মৌরির চালের নাড়ু, শুণ্ঠিখণ্ড, শুকনো কুল, নারকেলের রসকরা আর গঙ্গাজল। শালিধানের আতপ চিঁড়ে। কতক চিঁড়ে আবার দোভাজা। চিনিপাকের নাড়ু, কর্পূর-মরিচ-লবঙ্গ-এলাচের সুবাসমাখানো। তারপর শালিধানের খইয়ের মুড়কি। এমন কি ঘিয়ে-ভাজা ফুটকড়াই। আরো কত কী, অতশত কে নাম জানে?

তবে এমনভাবে তৈরি করা যেন সম্বৎসর চলে। কেননা বছরে একবারই তো যাবার হুকুম।

শুধু খাবার জিনিসই পাঠাচ্ছে না দময়ন্তী, পাঠাচ্ছে খুঁটিনাটি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য। পাঠাচ্ছে বস্ত্রে-ছাঁকা গঙ্গামৃত্তিকা, মৃত্তিকার পাপড়ি—দাঁত মাজবার জন্যে। মাটির ভাণ্ডে আচার ইত্যাদি আর থলেতে অন্যান্য বস্তু। পরিপাটি করে সাজিয়ে সব মিলিয়ে তৈরি হল বিশাল ঝালি—রাঘবের ঝালি।

রাঘবের আদেশ আর দময়ন্তীর আরাধনা।

ঝালির শেষ বন্ধনমুখে নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দেওয়া। ঝালি বহন করবার জন্যে তিনজন মুটে, একের পর এক বইবে মাথায় করে। মুনসব বা মূলরক্ষক মকরধ্বজ কর।

এমনি প্রতি বৎসর।

দময়ন্তীর সারা বছর আর কোনো সাধন নেই। শুধু সেবা আর তন্ময়তা। শুধু সততযুক্ততা।

॥ ১০০ ॥

মাধবী

বৃদ্ধা তপস্বিনী। জগন্নাথের লিখন-অধিকারী শিখি মাহিতির বোন। পরমা বৈষ্ণবী। রাধিকার গণের মধ্যে গণনীয়া।

অথচ ছোট হরিদাস এই তপস্বিনীর কাছ থেকে চাল সংগ্রহ করে এনেছিল বলে প্রভু কর্তৃক পরিত্যক্ত হল। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে? কিন্তু ছোট হরিদাস এই চাল সংগ্রহ করেছিল নিজের জন্যে নয়, প্রভুর জন্যে। আর সে সংগ্রহ নিজের তাগিদে নয়, ভগবান আচার্যের অনুরোধে। আর সে চালের অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে প্রভুর বাধেনি।

হ্যাঁ, এমনি লোকশিক্ষা।

ছোট হরিদাস সন্ন্যাসী হয়ে কেন প্রকৃতি সম্ভাষণ করবে? হোক মাধবী সাধ্বী ধর্মরতা, হোক সে রাধিকার দাসী, তবু সে রমণী। হরিদাস কেন তার পালনীয় নিয়মরেখা থেকে ভ্রষ্ট হবে?

নিয়ম যদি কঠোর, তার বিচ্যুতির শাসনও মমতাহীন। এমনি লোকশিক্ষার দাবি।

কিন্তু, এ কি হরিদাসের বর্জন না হরিদাসের অর্জন ?

॥ ১০১ ॥

শ্রীনিবাস আচার্য

কাটোয়ার কাছে গঙ্গার পূর্বতীরে চাকন্দি গ্রামে আবির্ভাব। পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া।

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের সময় গঙ্গাধর উপস্থিত ছিল। কেশমুণ্ডন, বেশপরিবর্তন—এসব শোকাবহ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না, উন্মাদ হয়ে গেল। যেহেতু গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসনাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, গঙ্গাধর অহোরাত্র চৈতন্য-চৈতন্য বলতে লাগল। এই থেকে তার নাম হল চৈতন্যদাস।

অপুত্রক গঙ্গাধর, প্রভুর ইচ্ছায় তার পুত্রকামনা জাগল। লক্ষ্মীপ্রিয়া বললে, নীলাচলে চলো, প্রভুর দর্শনে কামনা পূর্ণ হবে।

নীলাচলে চলল দুজনে। সিংহদ্বারে প্রভুর সঙ্গে গঙ্গাধরের দেখা হল। প্রভু বললেন, জগন্নাথ দর্শন করো। জগন্নাথই বাঞ্ছাকল্পতরু।

জগন্নাথদর্শনের পর প্রভু আদেশ করলেন, গৌড়ে ফিরে যাও, নিরন্তর নামকীর্তন করো, যা চেয়েছ তাই পাবে।

কী চেয়েছে ব্রাহ্মণ ? গোবিন্দকে সবাই ধরল।

আমি তার কী জানি। প্রভুর ইচ্ছা হলে প্রভুই ব্যক্ত করবেন।

প্রভুই ব্যক্ত করলেন। বললেন, ব্রাহ্মণ পুত্রকামনা করে এসেছে। ওর কামনা সিদ্ধ হবে। আমারই শুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস নামে ওর পুত্র জন্মাবে। রূপ-সনাতন ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করছে, শ্রীনিবাস ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করবে।

গঙ্গাধর স্ত্রীকে নিয়ে গৌড়ে ফিরে গেল। অবিশ্রান্ত নাম করতে লাগল।

যথাসময়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভসঞ্চার হল। বৈশাখী পূর্ণিমার রোহিণী নক্ষত্রে জন্মাল শ্রীনিবাস।

নাম তো আগের থেকেই রাখা। গঙ্গাধর পুত্রকে গৌরচরণে সমর্পণ করে দিল।

শৈশব থেকেই ছেলেকে নাম শেখাল লক্ষ্মীপ্রিয়া। বলো তো গৌরগোবিন্দ গোপীনাথ, নিত্যানন্দ গদাধর, অদ্বৈত শ্রীবাস, বলো তো রাধাকৃষ্ণ। শিশু সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না—যেটুকু পারে না সেটুকু পারার চেয়েও মধুর শোনায়।

কিছুটা বড় হতেই ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির কাছে পড়তে গেল শ্রীনিবাস। বিদ্যার বিভায় উজ্জ্বল হতে লাগল। পিতৃমুখে শুনতে লাগল চৈতন্যচরিত। ভক্তির কান্তিতে প্রশান্ত হয়ে উঠল। যে দেখল সেই বুঝল শ্রীনিবাস সত্যিই শ্রীনিবাস।

গঙ্গাধরের পরলোক হল। মামার বাড়ি যাজিগ্রামে চলে এল শ্রীনিবাস। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর যাজিগ্রামের পথে গঙ্গাস্নান করতে এলে শ্রীনিবাসের সঙ্গে দেখা হল। দেখামাত্রই শ্রীনিবাস নরহরির পায়ে আত্মসমর্পণ করল। নরহরি তাকে হরিনাম মন্ত্র দিল। শুরু হল চৈতন্যবিরহ-ব্যাধির যন্ত্রণা। বললে, আমি নীলাচলে যাব। সপার্ষদ প্রভুকে দেখবার বড় অভিলাষ।

নরহরি উৎসাহিত হল। বাহু বাড়িয়ে কোলে টেনে নিল কিশোরকে।

আর যদি সম্ভব হয় গঙ্গাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়ব।

আমি পত্র ও লোক দিয়ে দেব। আশ্বস্ত করল নরহরি। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।

মায়ের থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল শ্রীনিবাস।

পথিমধ্যে শ্রীনিবাস শুনতে পেল প্রভু লীলা সংগোপন করেছেন। নিদারুণ শোকে অভিভূত হল শ্রীনিবাস। ভাবল নীলাচলে গিয়ে আর করব কী। অগ্নিকুণ্ড করে দেহ বিসর্জন দিই।

শ্রীনিবাসের নিদ্রাকর্ষণ হল। স্বপ্নে প্রভু দেখা দিলেন। বললেন, আমার প্রিয় পরিকরেরা রয়েছে নীলাচলে, তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। আর তোমার শোক করবার কারণ কী? তোমার হৃদয়েই তো আমার নিরন্তর বিশ্রাম।

নীলাচলে গেল শ্রীনিবাস। মন্দিরের সিংহদ্বারে বসে নামকীর্তন করতে লাগল।

কে রে এ ব্রাহ্মণকুমার ? উপবাসী থেকে এমন করুণ সুরে নাম করছে ? কে একজন তাকে মহাপ্রসাদ দিয়ে গেল। দিয়ে গেল নরেন্দ্রসরোবরের জল। শ্রীনিবাসের বিস্ময় হল, আমার দুঃখের কথা ওরা জানল কী করে ?

প্রথমেই গেল গোপীনাথের পুষ্পবাটিতে।

কে তুমি ? কার ছেলে ? কোত্থেকে আসছ ? জনে-জনে জিজ্ঞেস করতে লাগল।

আমি শ্রীনিবাস। চৈতন্যদাসের ছেলে। আসছি গৌড়দেশ থেকে। গদাধর পণ্ডিত কোথায় ?

এখানেই তো ছিল। এখন কোথায় কোন নির্জনে গিয়ে বসেছে।

গদাধরকে খুঁজে বার করল শ্রীনিবাস। দেখল সামনে ভাগবত নিয়ে বসে আছে। যেন স্মৃতি নেই—বসে আছে নিশ্চল হয়ে। শ্লোক উচ্চারণ করতে পারছে না, চোখের জলে পুঁথির অক্ষর ম্লান হয়ে গিয়েছে।

পরিচয় পেয়ে শ্রীনিবাসকে আলিঙ্গন করল গদাধর। এত দুঃখের মধ্যে যেন এইটুকুই শান্তি। যাও আর-আর সকলের সঙ্গে দেখা করো। সকলের থেকে আশীর্বাদ নাও।

তারপরে গেল সার্বভৌমের বাড়িতে। রায় রামানন্দের সঙ্গে বসে গৌর-গুণগান করছে সার্বভৌম। শ্রীনিবাসকে পাশে বসিয়ে দুজনে কাঁদতে লাগল। আর দুজনের কান্না একা কাঁদল শ্রীনিবাস।

সেখান থেকে গেল বক্রেশ্বরের বাড়ি। বক্রেশ্বর বললে, তুমি এসে ভালো করেছ। তোমাকে দিয়ে প্রভু তাঁর অনেক কাজ সম্পন্ন করবেন।

সেখান থেকে পরমানন্দ পুরীর আস্তানায়। সেখানে পরমানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসী মৃতপ্রায় পড়ে রয়েছে—দিবস না রজনী কোনো বোধ নেই। শ্রীনিবাসকে পেয়ে সবাই প্রাণ পেল। এখন থেকে শ্রীনিবাসেই প্রভুর বিলাস-প্রকাশ হবে এই সকলের বিশ্বাস।

চলো এবার শিখি মাহিতির ভবনে। শিখি আর তার বোন মাধবী শ্রীনিবাসের আশায়ই জীবন রেখেছে। কানাই খুটিয়া বললে, তুমি এলে, যেন অন্ধের নয়ন প্রকাশিত হল। দুই সেবক, গোবিন্দ আর শঙ্কর, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তিনি কেন আরো কটা দিন থেকে গেলেন না ? তাহলে তুমি তাঁকে দেখতে পেতে।

প্রভুর ইচ্ছায়ই তোমার এতদিন আসা হয় নি। বললে গোপীনাথ

আচার্য। তাঁকে তুমি দেখলে না বটে কিন্তু আমরা তাঁকেও দেখলাম, তোমাকেও দেখলাম।

সকলের সঙ্গে দেখা হল কিন্তু স্বরূপের রঘুনাথ কই? মহাদুঃখে রঘুনাথ বৃন্দাবনে চলে গিয়েছে। আর রাজা প্রতাপরুদ্র? সেও নীলাচল-ছাড়া।

শ্রীনিবাস গদাধরের কাছে এসে বসল। ভাগবত পড়ব।

প্রভুও তাই আদেশ করে গিয়েছেন। কিন্তু চেয়ে দেখ পুরাতন পুঁথি জীর্ণ হয়ে গিয়েছে—শুধু তাই নয়, মাঝে-মাঝে অক্ষর চোখের জলে মুছে গিয়েছে। এ পুঁথি আর পড়া যাচ্ছে না। তুমি গৌড়ে ফিরে যাও, সরকার-ঠাকুরের কাছ থেকে একখানা নতুন ভাগবত নিয়ে এস।

শ্রীনিবাস তক্ষুনি গৌড়ে ফিরে চলল। শ্রীখণ্ডে নরহরির সঙ্গে দেখা করে বললে, পণ্ডিত-গোস্বামী নতুন ভাগবত চেয়েছেন। তাঁর যেখানা ছিল সেখানা চোখের জলে ভেসে গিয়েছে।

নতুন ভাগবত নিয়ে পরদিনই শ্রীনিবাস নীলাচলের দিকে যাত্রা করল। বেশিদূর যেতে হল না, যাজপুরে পৌঁছে খবর পেল গদাধর মহাপ্রয়াণ করেছে।

হা গৌর-গদাধর—শ্রীনিবাস শোকে ভেঙে পড়ল। স্বপ্নে আদেশ পেল, নবদ্বীপে যাও, সেখান থেকে বৃন্দাবন।

নবদ্বীপে বংশীবদনের সঙ্গে দেখা হল। তখন শচীমাতা নেই কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া আছে। গৌরবিরহে নিদ্রাত্যাগ করেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। তণ্ডুলে হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ করে সেই কটি তণ্ডুলের অন্ন প্রভুকে ভোগ দিয়ে বাকিটুকু নিজে খায়। শ্রীনিবাসকে আশীর্বাদ করে দিল। শান্তিপুরে গেলে আশীর্বাদ করল সীতা দেবী। তারপরে খড়দহে গিয়ে জাহ্নবার আশীর্বাদ নিল। অদ্বৈত-নিত্যানন্দ লোকান্তরিত, তবু তাদেরই আশীর্বাদ এল সীতা ও জাহ্নবার মাধ্যমে। তারপর গেল খানাকুলে অভিরাম ঠাকুরের গৃহে। অভিরাম তার জয়মঙ্গল চাবুক দিয়ে তিনবার আঘাত করল শ্রীনিবাসকে, সঞ্চারিত করল প্রেমশক্তি। সেখান থেকে ফিরল শ্রীখণ্ডে, তার অধ্যাত্ম-সাধনার প্রথম গুরু নরহরির চরণে। নরহরিও আশীর্বাদ করে দিল। দিয়ে দিল পথের সন্ধান।

শেষে গেল মার কাছে যাজিগ্রামে। কিশোর ছেলে, মা তবুও বারণ করতে পারল না। অগ্রহায়ণের শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীনিবাস আবার ঘর ছাড়ল।

গয়া কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ হয়ে পৌঁছুল মথুরায়। কংসনিধন করে কৃষ্ণ যে ঘাটে বসে বিশ্রাম করেছিল বসল সেই বিশ্রাম-ঘাটে। একের পর এক দুঃসহ বাক্য শুনতে লাগল। কাশীশ্বর গোস্বামীর সঙ্গোপন হয়েছে। রঘুনাথ ভট্টও অপ্রকট। সনাতন গোস্বামীও লীলা সংবরণ করেছে। কিন্তু রূপ? হায়, রূপও অরূপ হয়েছে।

কিসের বৃন্দাবন, কিসের ভাগবতপাঠ, শ্রীনিবাস শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। এক মাথুর ব্রাহ্মণের সেবায় সে প্রকৃতিস্থ হল। কিন্তু তার রোদনবিলাপের ক্ষান্তি নেই।

রাত্রে স্বপ্ন দেখল সনাতন ও রূপ তাকে বলছে, গোপালভট্ট গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নাও ও গৌড়মণ্ডলে আমাদের গ্রন্থ প্রচার করো। এ তোমার বিলাপ-বিষাদের সময় নয়, তোমার গুরুভার দায়িত্বপালনের জন্যে প্রস্তুত হও।

ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যায় গোবিন্দ-মন্দিরে এসে দাঁড়াল। আরতি আরম্ভ হয়েছে, ভিতরে-বাইরে বিরাট জনতা, একপাশে পড়ে রইল শ্রীনিবাস। জীব গোস্বামীরও স্বপ্নাদেশ হয়েছে, সেও খুঁজছে শ্রীনিবাসকে। মন্দির-অঙ্গনে ভাববিকার নিয়ে পড়ে আছে এ মানুষটি কে? শ্রীনিবাসকে চিনতে ভুল হল না। জীব তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে 'বন্ধু' বলে সম্ভাষণ করল। গোবিন্দের অধিকারী কৃষ্ণপণ্ডিত মহাপ্রসাদ এনে দিল। সুস্থ হলে বন্ধুকে নিয়ে এল নিজের আশ্রমে।

পরদিন জীব শ্রীনিবাসকে রাধাদামোদরের চরণে সমর্পণ করে দিল। রাধারমণ-প্রাণ গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাসকে মন্ত্রদীক্ষিত করল। রাধারমণকে দেখতে গিয়ে শ্রীনিবাস দেখল গৌরসুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন।

তারপর জীবের অধীনে শ্রীনিবাসের শাস্ত্রসাধনা শুরু হল। অল্প সময়ের মধ্যেই তার প্রতিভা স্ফুরিত হল, অনেক দুরূহ শ্লোকের ভাবব্যাখ্যায় মিলল তার প্রমাণ। সকলের অনুমতি নিয়ে জীব সভা ডাকল, সর্বসমক্ষে শ্রীনিবাসকে 'আচার্য' উপাধি দিল।

মিলল এসে নরোত্তম, যাকে উপাধি দেওয়া হল 'ঠাকুরমহাশয়'। দুজনে রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে মাথুরমণ্ডল পরিক্রমণ করতে বেরুল।

মিলল এসে দুঃখী কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ।

ঠিক হল এই তিনজন শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্যামানন্দ, সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র

বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে বহন করে নিয়ে যাবে। গোস্বামীদের লেখা এই সব গ্রন্থই তো ভক্তির জয়গান। সেই গীতলহরী সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার প্রতিনিধি-প্রধান শ্রীনিবাস।

গ্রন্থগুলি রাখা হল কাঠের সিন্দুকে আর সেই সিন্দুক বহন করবার জন্যে গাড়ি এল দুখানা, বলদ চারটি আর রক্ষী দশজন। অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমীতে গ্রন্থ নিয়ে যাত্রা শুরু হল। জীব গোস্বামী সদলে মথুরা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। দেখো, সাবধান।

গৌড়ের পথে গাড়ি বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করল। এটা দস্যুস্বভাব রাজা বীর হাম্বীরের এলাকা। সন্ধ্যা থেকেই তার অনুচরেরা লুটের আশায় বনে-নির্জনে ঘুরে বেড়ায়। আর এখন তো প্রায় মধ্যরাত্রি!

প্রকাণ্ড সিন্দুকে কত না জানি ধনরত্ন আছে। আর কত না জানি তারা মূল্যবান! মূল্যবান না হলে এতগুলি প্রহরী থাকে! যদি লুট করে নিয়ে যেতে পারি রাজা কত না জানি আহ্লাদে আটখানা হবেন!

রাজার তস্করেরা সশস্ত্র আক্রমণ করে বইয়ের সিন্দুক তুলে নিয়ে চলে গেল। বৈষ্ণবদের মাথায় বজ্রাঘাত হল। ধন গেলে ধন হয়, রাজ্য গেলে রাজ্য হয়, কিন্তু এই গ্রন্থগুলি নষ্ট হলে এদের বিকল্প কোথায়? হাজার কাঁদলেও তো এর সমাধান নেই।

তোমরা এখানে থেকে তবে কী করবে? তুমি, নরোত্তম, খেতুরিতে ফিরে যাও, আর, তুমি, শ্যামানন্দ, তুমি এগোও উৎকলের দিকে।

আর তুমি?

আমি একাকীই থাকব বিষ্ণুপুরে। শ্রীনিবাস ক্ষিপ্তের মত বললে, একটা হেস্তনেস্ত করে যাব।

শ্যামানন্দ দেউলি গ্রামের কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তীর বাড়িতে উপস্থিত হল।

কৃষ্ণবল্লভ গ্রন্থলুণ্ঠনের কথা শুনে বিমূঢ় হয়ে গেল। বললে, নিশ্চয়ই এ রাজার কাজ নয়। রাজা তো রাজসভায় ভাগবতপাঠ শোনে। এ নিশ্চয়ই কোনো বিচ্ছিন্ন দস্যুদলের কাণ্ড।

তুমি ভালো করে খবর নাও। গ্রন্থ না পেলে আত্মহত্যা করব।

কৃষ্ণবল্লভ খবর নিয়ে জানল গ্রন্থের সিন্দুক রাজগৃহেই রাখা হয়েছে। দিনে ভাগবতশ্রবণ, রাত্রে ডাকাতি, এমন আচরণ সুদুর্লভ নয়।

কিন্তু নিত্য ভাগবতশ্রবণের ফল কে উপেক্ষা করবে? রাজা ধনরত্ন ভেবে

সিন্দুক খুলেছিল কিন্তু দেখল এ অন্য রত্ন—গ্রন্থরত্ন। গ্রন্থ দেখে, গ্রন্থ স্পর্শ করে রাজার নির্বেদ উপস্থিত হল। দস্যুদলের নায়ককে জিজ্ঞেস করলে, গ্রন্থ নিয়ে যে আসছিল সে কোথায়? তাকে ধরে আনোনি কেন? যাও গ্রন্থাচার্যকে খুঁজে বের করো।

শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভকে বললে, আমাকে রাজসভায় নিয়ে চলো। ভাগবত-পাঠ শোনাও।

রাজসভায় উপস্থিত হল শ্রীনিবাস।

রাজপণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্তী ভাগবত পড়ছে। তার সঙ্গে শ্রীনিবাস সহসা আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। উত্তেজিত হল ব্যাস চক্রবর্তী। কিন্তু তর্কের শেষ সমাধান শ্রীনিবাসের সিদ্ধান্তে।

দৈন্যরসে শুদ্ধীকৃত রাজা বীর-হাম্বীর শ্রীনিবাসের চরণে আত্মসমর্পণ করল। বুঝতে পেরেছি তুমিই লুণ্ঠিত গ্রন্থের আচার্য। আমি পার্থিব অর্থ খুঁজে ফিরছি আর তোমার কাছে পরমার্থের ভাণ্ডার। আমাকে সেই অর্থের সুধা দাও।

শ্রীনিবাস রাজার কাছে সমস্ত গ্রন্থের বর্ণনা দিলে। সে শুধু গ্রন্থই ফিরে গেল না, পেল রাজার হৃদয়, সমস্ত বিষ্ণুপুরের হৃদয়। গ্রন্থ চুরি না গেলে এত বড় লাভ হত কী করে?

রাজা বললে, আমার উপরে এ গ্রন্থের কৃপা। ভক্তিদেবীকে আমি বন্দিনী করে এনেছি।

বৃন্দাবনে, খেতরিতে, উৎকলে গ্রন্থপ্রাপ্তির খবর চলে গেল। শুধু গ্রন্থ-প্রাপ্তি নয়, রাজ্যপ্রাপ্তি। ভক্তিস্নিগ্ধ হৃদয়ের মত বড় রাজ্য আর কী আছে?

বিষ্ণুপুর বৈষ্ণবধর্মের বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল। রাজা দীক্ষা নিল। দীক্ষা নিল ব্যাস চক্রবর্তী।

রাজার অনুরোধে শ্রীনিবাস বেশ কিছুদিন থাকল বিষ্ণুপুর। কিন্তু মা পথ চেয়ে বসে আছেন বিবেচনা করে ফিরল যাজিগ্রাম। শুনল বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার তিরোধান হয়েছে। আদিগুরু নরহরির সঙ্গে দেখা করতে গেল শ্রীখণ্ড। নরহরি বললে, মায়ের অনুরোধ রাখো। এবার বিবাহ করো। সংসারে থেকে প্রকাশ করো ভক্তিধর্ম। আর গ্রন্থমালার অধ্যাপনা করো।

গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করল শ্রীনিবাস। যাজিগ্রামে গোপাল চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদীকে বিয়ে করল। দ্রৌপদীর নাম বদলে রাখল ঈশ্বরী।

প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাসের অগ্রজ রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা

নিল। পড়তে লাগল ভক্তিশাস্ত্র। ছাত্রের খ্যাতিতে প্রখ্যাত শ্রীনিবাস।

তারপর শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গেল।

সেখান থেকে আবার গৌড়। প্রচারের জন্যে জীব এবারও অনেক গ্রন্থ দিল সঙ্গে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধতম কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত।'

এবার গাড়ি বিষ্ণুপুরে পৌঁছুল নির্বিঘ্নে। এবার রাণী ও রাজপুত্র দীক্ষা নিল। প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ।

তারপর সেখান থেকে নবদ্বীপ। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয় ভৃত্য অতিবৃদ্ধ ঈশান তখনো বেঁচে। তখনো সেই গৃহের মধ্যে। সেই বাকি যা কিছু দেখাল শ্রীনিবাসকে।

শ্রীনিবাস ফিরল শ্রীখণ্ডে। পথে শুনল ঈশানঠাকুর অপ্রকট হয়েছে।

প্রায় উনসত্তর বছর বয়সে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বিবাহ করল রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতীকে। পরে পদ্মাবতীর নাম হল গৌরাঙ্গপ্রিয়া।

লীলাবসানের সময় আসন্ন বুঝে শ্রীনিবাস রামচন্দ্রকে নিয়ে বৃন্দাবনে গেল। কার্তিকী শুক্লাষ্টমী তিথিতে লীলাসংবরণ করলে।

মহাপ্রভুর প্রেমশক্তি শ্রীনিবাসে অবতীর্ণ, তারই প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম নব-জীবনে প্রাণান্বিত হয়ে সমস্ত বাংলাকে পরিপ্লাবিত করল। 'শ্রীচৈতন্য হল শ্রীনিবাস।'

॥ ১০২ ॥

নরোত্তম দত্ত

আকুমারব্রহ্মচারী, সর্বতীর্থদর্শী ও পরমভাগবোতত্তম।

রাজসাহী জেলার রামপুর-বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে খেতুরিতে মাঘী পূর্ণিমায় আবির্ভাব। পিতা কৃষ্ণানন্দ, মাতা নারায়ণী। জেঠা পুরুষোত্তম, জেঠতুতো ভাই সন্তোষ।

কৃষ্ণানন্দ মুসলমান জায়গীরদারের অধীনে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা। যদিও রাজ্যভার কৃষ্ণানন্দের উপর, কৃষ্ণানন্দ আর পুরুষোত্তম দুই ভাইয়েরই সমান রাজসম্মান।

কানাইর নাটশালাতে পৌঁছে নৃত্য-কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু 'নরোত্তম' বলে ডাক দিয়ে ওঠেন আর পদ্মায় স্নান করতে নেমে পদ্মাবতীকে বলে যান, তোমাকে প্রেম দিয়ে যাচ্ছি, যথাকালে নরোত্তম এলে তাকে এই বিত্ত দিয়ে দিও।

নরোত্তম কোথায় ?

সে এখনো ভূমিষ্ঠ হয় নি। আগে জন্মাক, বড় হয়ে জলে নামতে শিখুক, ঠিক আসবে সে এখানে স্নান করতে।

তাকে আমি চিনব কিসে ?

তার গাত্রস্পর্শে। যার গাত্রস্পর্শে তুমি বেশি উচ্ছল হবে, জানবে সেই নরোত্তম।

অন্নপ্রাশনের সময় নরোত্তম কিছুতেই অন্ন মুখে নিল না। তখন তাকে বিষ্ণু-নৈবেদ্য এনে দেওয়া হল। আনন্দে তাই সে নিল হাত বাড়িয়ে।

জেঠা পুরুষোত্তম বললে, আজ থেকে কৃষ্ণের প্রসাদ ছাড়া আর কিছু ওকে খেতে দিও না।

বাল্যকাল থেকেই নরোত্তমের বৈরাগ্যভাব। তার উপর পূজুরি ব্রাহ্মণ পূজাশেষে রোজ তাকে চৈতন্যলীলা শোনায়। মন বৈরাগ্যে আরো বেশি গাঢ় হয়। তারপর কিশোরবয়সে—নরোত্তমের বয়স তখন বারো—স্বপ্নাদেশে পদ্মায় স্নান করতে নেমে দেখল নদী সহসা উত্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। এ নদীর জলোচ্ছ্বাস, না, নরোত্তমের প্রেমোচ্ছ্বাস ! শুধু তাই নয়, প্রেম পেয়ে তার গায়ের শ্যামবর্ণ গৌর হয়ে গেল। মনে হল এক গৌরবর্ণ শিশু তার মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। বৈরাগ্যে আরো গম্ভীর হল নরোত্তম।

তার ঔদাসীন্য দেখে তার বাপ-জেঠা বিয়ের কথা ভাবল। লাগল পাত্রী খুঁজতে।

নরোত্তম ঠিক করল বৃন্দাবনে পালাব।

কিন্তু পালাবে কী করে ? তাকে পাহারা দেবার জন্যে প্রহরী রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রেমদাতা মহাপ্রভু কি পালাবার পথ করে দেবেন না ?

কদিন পরে জায়গীরদারের আশোয়ার এসে হাজির—সদরে পুরুষোত্তম ও কৃষ্ণানন্দের তলব হয়েছে। তারা দুজন চোখের আড়াল হলেই অনায়াসে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিল নরোত্তম। গৃহত্যাগ করল।

কাশী মথুরা হয়ে নরোত্তম পৌঁছল বৃন্দাবন। সহায় নেই, সম্বল নেই, আশ্রয় নেই, আশ্বাস নেই, তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। রাজৈশ্বর্য উপেক্ষা করে এসেছে তার জন্যেও মনস্তাপ নেই। বৃন্দাবনে পরমানন্দ আছেন এই যথেষ্ট।

উদাসীন অকিঞ্চন বৈষ্ণব কেউ বৃন্দাবনে এলেই জীব গোস্বামী তার ভার নেয়। এক্ষেত্রে নরোত্তমকেও জীব গোস্বামীই আশ্রয় দিল।

ক্রমে মিলল এসে শ্রীনিবাস।

রাঘব গোস্বামীর সঙ্গে নরোত্তম ও শ্রীনিবাস সমগ্র মাথুর মণ্ডল পরিক্রমা করল। সকল সাধু-বৈষ্ণবের সঙ্গে নরোত্তমের পরিচয় হল। কিন্তু লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্রই তার চরণে আত্মসমর্পণ করল নরোত্তম। প্রার্থনা করল, আমাকে দীক্ষা দিন।

লোকনাথ বললে, আমার কোনো শিষ্য নেই। আমি কাউকে দীক্ষা দিই না।

নরোত্তম লোকনাথের কুঞ্জের কাছে বাসা নিল। জীবের কাছে পড়তে লাগল গোস্বামী-গ্রন্থ আর অগোচরে লোকনাথের সেবায় মন দিল। নীচ সেবাকেও বরণ করে নিল।

লোকনাথ সাধন-ভজনে ডুবে থাকে, লক্ষ্যও করে না কে তার জন্যে শৌচ-মৃত্তিকা তৈরি করে রাখছে। একদিন প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে নরোত্তমকে ধরে ফেলল—'মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে।' জিজ্ঞেস করল, তুমি এ কাজ করছ কেন? কে করতে বলেছে?

কেউ বলে নি। আমি নিজের থেকেই করছি। তুমি আমাকে শিষ্য বলে মেনে না নিলেও আমি তোমাকে গুরু বলে মানছি। তুমি প্রভু, আমি দাস।

লোকনাথ আরেক দিন দেখল খুব ভোরে তার অঙ্গনে কে ঝাঁট দিচ্ছে।

অন্ধকার তখনো ভালো করে কাটে নি, লোক চেনা যাচ্ছে না, লোকনাথ হাঁক দিল: কে?

নরোত্তম।

লোকনাথের চিত্ত দ্রবীভূত হল। রাজার ছেলে গুরুসেবায় ঝাড়ুদার সেজেছে, মেথর সেজেছে। লোকনাথের সঙ্কল্পভঙ্গ হল। নরোত্তমকে দিল মন্ত্রদীক্ষা।

অল্পদিনেই বহুশাস্ত্র আয়ত্ত করল নরোত্তম। সমস্ত অগ্রণী বৈষ্ণবের অনুমতি

নিয়ে জীব নরোত্তমকে 'শ্রীমহাশয়' বা 'শ্রীঠাকুরমহাশয়' উপাধি দিল।

মথুরা-পরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছে, এবার গৌড়ে ফিরে যাও। আদেশ করল জীব গোস্বামী। প্রচার-প্রকাশের জন্যে নিয়ে যাও গ্রন্থাবলী।

কাঠের সিন্দুকে করে বই যাচ্ছে গরুর গাড়িতে। সঙ্গে যাচ্ছে তিনজন, দুজন জীবের দুই বাহু, নরোত্তম আর শ্রীনিবাস, তৃতীয়জন শ্যামানন্দ।

যাত্রাকালে লোকনাথ নরোত্তমকে বলে দিল, বিয়ে করবে না, তেল মাখবে না, মাছ খাবে না, রাধাকৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবা করবে আর কীর্তন প্রচার করে বেড়াবে।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পৌঁছুলে গ্রন্থসম্পদ অপহৃত হল। এত বড় বিপর্যয়েও শ্রীনিবাস ধৈর্য হারাল না। নরোত্তমকে বললে, তুমি খেতুরিতে চলে যাও আর শ্যামানন্দকে তোমার সঙ্গে নিলেও পরে উড়িষ্যায় পাঠিয়ে দিও। আমি গ্রন্থ-উদ্ধার না করে ফিরব না।

তারপর যখন গ্রন্থ উদ্ধার হল তখন শ্রীনিবাস লোক দিয়ে সংবাদ পাঠাল খেতুরিতে।

নরোত্তমের অভাবে তখন খেতুরির রাজা সন্তোষ দত্ত। গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ শুনে সে সব চেয়ে বেশি আনন্দিত। 'করিল মঙ্গলক্রিয়া বিবিধ বিধানে।' সন্তোষের এই আচরণ সকলের প্রীতিপদ হল। রাজা হলে কী হবে, সন্তোষ নরোত্তমেরই ভাই।

শ্যামানন্দ উৎকলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল আর নরোত্তম প্রবেশ করল নবদ্বীপে।

প্রবেশপথে অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে এক প্রাচীন বিপ্রের সঙ্গে দেখা। আগন্তুক দেখে বিপ্র কৌতূহলী হল। তোমার নাম কী, কোত্থেকে আসছ?

নরোত্তম তার নাম বলল, পরিচয় দিল। বিপ্র বুঝল এ নিঃসংশয় নিমাইয়ের কৃপাপাত্র! নইলে এমন শ্রী হয়, চিত্তে এত আর্দ্রতা!

আমাকে নবদ্বীপের কথা বলুন।

গৌরপৃথ্বী সকল তীর্থের শিরোমণিস্বরূপা। কেন? যেহেতু সে নবদ্বীপ নগরীকে ধারণ করে আছে। নবদ্বীপ নগরী মহীয়সী কেন? যেহেতু সেখানে কনকবররুচি ঈশ্বর বা গৌরসুন্দরের অবতার। গৌরাবতারের বৈশিষ্ট্য কী? গৌরাবতারে ভক্তিদেবী মূর্তিমতী হয়ে নগরে-নগরে জনে-জনে আত্মপ্রকাশ করছেন।

ব্রাহ্মণ বললে, যে অশ্বত্থগাছের নিচে তুমি বসেছ এখানেই নিমাই তার শিষ্যদের নিয়ে কত শাস্ত্রচর্চা করেছে। এখানে এখনো সে শিষ্যদের নিয়ে বিহার করে দেখতে পাই মাঝে-মাঝে।

আরো বললে সব লীলাকথা। বললে, বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী দেহ রেখেছেন, শ্রীবাসও অপ্রকট।

তারপর মায়াপুরের পথ দেখিয়ে দিল ব্রাহ্মণ। ওখানেই জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি।

সেখানে প্রথমে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নরোত্তমের দেখা হল। তারপর দেখা হল ঈশানের সঙ্গে। শচী-ভৃত্য প্রভু-প্রিয় ঈশান। দামোদর পণ্ডিত কাছে এসে দাঁড়াল। তোমাকে দেখতে বড় সাধ ছিল। শ্রীবাসের দু' ভাই শ্রীপতি শ্রীনিধিও এসে আশীর্বাদ করল।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে নরোত্তম শান্তিপুরে গেল। দেখল প্রভুর মন্দিরে অচ্যুতানন্দ নির্জনে বসে আছে। ক্ষীণ দেহ, শোকখিন্ন। দু হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিল নরোত্তমকে। বললে, তোমাকে এখানে বেশি দিন আটকাব না, তুমি যত শিগগির পারো নীলাচলচন্দ্রকে দেখে এস।

হরিনদী গ্রামে গঙ্গা পার হয়ে অম্বিকাকালনায় গেল নরোত্তম। সেখানে হৃদয়চৈতন্যের থেকে আশীর্বাদ নিল। সেখান থেকে গেল সপ্তগ্রামে, নিত্যানন্দের বিহারক্ষেত্রে। উদ্ধারণ দত্তেরও তখন সঙ্গোপন হয়েছে। সপ্তগ্রাম থেকে গঙ্গাতীরের পথ ধরে চলে এল খড়দহে। খড়দহে বসুধা ও জাহ্নবা ঠাকুরাণী কয়েক দিন ধরে রাখল নরোত্তমকে। কৃষ্ণকথারসে রাত-দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল কেউ বুঝতেও পেল না। যাবার সময় কথা বলতে গিয়ে কাঁদতে লাগল বীরভদ্র। আশীর্বাদ করতে এসে মহেশ পণ্ডিতেরও সেই দশা। খানাকুলে যাবার পথ কী? পরমেশ্বরীদাস পথ দেখিয়ে দিল।

> নীলাচল পথের পথিক নরোত্তম।
> যথা ভক্ত লয় তথা করয়ে গমন॥

খানাকুলে অভিরাম ও মালিনীর আশীর্বাদ নিয়ে নরোত্তম নীলাচলের পথ ধরল।

অবিশ্রান্ত দ্রুত হেঁটে অল্পদিনেই পৌঁছে গেল নীলাচল।

ভক্তিময় কলেবর, দুই দীর্ঘ নেত্রে পুঞ্জিত অশ্রু—নরোত্তমকে দেখেই

গোপীনাথ আচার্য চিনতে পারল। আজ তুমি আসবে সকাল থেকেই এ কথা মনে হয়েছে। যাও আগে জগন্নাথ দর্শন করে এস। শিখি মাহিতি নিয়ে গেল মন্দিরে।

তারপর টোটা-গোপীনাথে গেল গদাধরের অবস্থান-ক্ষেত্র দেখতে। এইখানে বসে গদাধর ভাগবত পড়ত আর এইখানে বসে প্রভু তা শুনতেন। দেখল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্র। কাশী মিশ্রের ভবনে গোপাল গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। দেখা পেল বাণীনাথের, কানাই খুটিয়ার। মঙ্গরাজের, মামু গোস্বামীর।

তারপর পুরী-পরিক্রমা শেষ করে নরোত্তম গেল নৃসিংহপুরে, সেখানে শ্যামানন্দ আছে। সমস্ত বার্তা জানিয়ে শ্যামানন্দকে বললে নীলাচলে যেতে, আর নিজে প্রত্যাবর্তনের পথ ধরল। থামল এসে শ্রীখণ্ডে। নরহরি সরকার ঠাকুরকে দর্শন করল। দেখল গৌরাঙ্গ বিগ্রহ। সেখান থেকে গেল যাজি-গ্রামে, মিলল শ্রীনিবাসের সঙ্গে।

শ্রীনিবাস বললে, শিগগির খেতুরিতে ফিরে যাও। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করো। ভক্তিধর্ম প্রচার করো।

কাটোয়ায় গদাধরদাসের সঙ্গে দেখা করে একচক্রায় নিত্যানন্দের লীলাস্থলকে প্রণাম করে নরোত্তম খেতুরিতে ফিরে এল।

অধম দুর্জনের দল ভক্তিতে মহামত্ত হয়ে উঠল। 'খণ্ডিলা পাষণ্ড যত ভক্তি প্রকাশিয়া!'

গোপালপুরের কাছাকাছি এক গ্রামে থাকে এক ভাগ্যবন্ত লোক, নাম বিপ্রদাস। তার গৃহে ধান্য-সর্ষপের এক গোলা আছে, তার মধ্যে বিষধর সাপের বাসা, কারু সাহস নেই কাছে এগোয়। বাইরে থেকেই সর্প-গর্জন শোনা যায়।

একদিন রজনী প্রভাতে নরোত্তম এসে হাজির। বিপ্রদাসকে বললে, গোলার দরজা খোলো, আমি ভিতরে ঢুকবু।

বিপ্রদাস শতহস্তে নিষেধ করল, অমন কাজ করবেন না, ভয়াবহ সাপ আছে ভিতরে।

চিন্তা কোরো না। সাপ পালিয়ে যাবে।

বৃহৎ গোলা-দ্বার উদ্ঘাটিত হল। সাপ কোথায়? ভিতরে আছেন প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গ-সুন্দরের বিগ্রহ।

বিগ্রহ-উদ্ধারের পর তার প্রতিষ্ঠার আয়োজনে ব্যস্ত হল নরোত্তম। প্রতিষ্ঠার জন্যে সিংহাসন তৈরি করো। সিংহাসনের জন্যে শ্রীমন্দির।

এই আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা নরোত্তমের জেঠতুতো ভাই, রাজা সন্তোষ দত্ত।

সেইদিন থেকেই খেতুরিতে মহোৎসবের বাজনা বেজে উঠল। হল কীর্তনের শুভারম্ভ।

সে এক বিরাট উৎসব। সারা বাংলার বৈষ্ণবসমাজ সমবেত হল খেতুরিতে। এত বৃহৎ সমাবেশ বাংলা দেশে আর কখনো কোথাও ঘটে নি। ভক্তদের জন্যে অসংখ্য বাসা তৈরি করাল সন্তোষ, পদ্মায় নৌকোর ব্যবস্থাও প্রভূত-প্রচুর। কত কত খোল করতালই তৈরি করাল, আর খাদ্যদ্রব্যের সংস্থানও কী অপরিমেয়! কী বিশাল সংকীর্তনস্থলী, কী অপূর্ব বেদীসজ্জা, আর কী নয়নমনোহর মন্দির! সন্তোষ শুধু রাজা নয়, রাজার মত রাজা।

এল শ্রীনিবাস, গোকুল, দেবীদাস, গোবিন্দদাস—এল জাহ্নবা ঠাকুরাণী। এল রঘুনন্দন, এল বল্লভ দাস! কত কত মহান্ত, তার অন্ত নেই। বাদক নর্তক গায়ক কথক—তারও বা কে গণনা করে? মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে ছয় সিংহাসন ছয় বিগ্রহের অভিষেক হল। আগের পাওয়া গৌরাঙ্গবিগ্রহ আর নতুন বিগ্রহ পাঁচটি—বল্লভীকান্ত, ব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত আর রাধারমণ। যথাবিহিত মন্ত্রে শ্রীনিবাস অভিষেক করল আর নরোত্তম গোকুল বল্লভ দেবীদাসকে নিয়ে সংকীর্তনসমুদ্র উতরোল করে তুলল। অনিবদ্ধ গীতে কত স্বরালাপ, কত গমকমন্ত্র, কত মূর্ছনা, কত বা বিচিত্র ভণিতা। 'রাগিণী সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।' মহাপ্রভুর সঙ্গীত-আসরে যে পুলকাবেগ উথলে উঠত এখানে এখনো বুঝি সেই ভাববন্যা। তবে কি সপার্ষদ মহাপ্রভুই এলেন বিলাস করতে?

খেতুরির এই মহামিলনোৎসবই ভক্তিধর্মের স্রোতকে সারা বাংলায় উজ্জীবিত করে তুলল। এই উৎসব নিয়মিত চলল প্রতি বৎসর।

উৎসবান্তে নরোত্তম খেতুরিতেই থেকে গেল। সমপ্রাণ-সখা রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে বসে শাস্ত্রালোচনা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও নামসংকীর্তন নিয়ে মেতে রইল! বিপ্র-বৈষ্ণব একত্রে বসে পাঠ নিতে লাগল।

শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র পড়াচ্ছে, পাছপাড়া গ্রামের বৈদিক ব্রাহ্মণ গুরুদাস ভট্টাচার্য দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে নরোত্তমের নিন্দা করতে লাগল।

ভক্তনিন্দার ফল হাতে-হাতে পেল, গুরুদাসের কুষ্ঠ হল। তখন উপায়ান্তর না পেয়ে নরোত্তমের কৃপা প্রার্থনা করল। নরোত্তম তাকে প্রেমালিঙ্গন দিল। প্রেমালিঙ্গন নিতে গুরুদাসের আপত্তি হল না, দেখল রোগমুক্ত হয়ে গিয়েছে।

গোয়াসের শিবাই আচার্যের দুই ছেলে—হরিরাম ও রামকৃষ্ণ। বাপের কথায় পদ্মাপারের হাটে ছাগ-মেষ কিনতে এসেছে—ভবানীপূজার জন্যে। কেনাকাটা করে সবে ফিরছে, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। জীবহিংসা অন্যায়, অসঙ্গত—দু ভাইকে বোঝাল নরোত্তম। দু ভাইয়ের মন গলে গেল, ক্রীত পশু ছেড়ে দিয়ে চলে এল খেতুরিতে। নরোত্তমের কাছে দীক্ষা নিয়ে বসল। গোয়াসে ফিরে সরাসরি বাপের সামনে হাজির হতে সাহস হল না। বলরাম কবিরাজের বাড়িতে রাত কাটাল।

প্রভাতে দেখা হতেই শিবাই আচার্য দুই ছেলেকে নিদারুণ তিরস্কার করল। ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের কাছে দীক্ষা! ডাকো নরোত্তমকে, পণ্ডিতসমাজের সামনে, দেখি কেমন তার শাস্ত্রব্যাখ্যা।

হরিরাম বললে, পণ্ডিতসমাজকে ডাকুন, গুরুর আশীর্বাদে আমিই তাদের পরাস্ত করতে পারব।

তখন মিথিলা থেকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মুরারিকে আনাল শিবাই। নরোত্তম পর্যন্ত যেতে হল না, বলরাম কবিরাজই তাকে পরাভূত করল।

সকলে তখন বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিল।

কিন্তু গাম্ভীলার গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী নিরস্ত হয় না। সর্ববিদ্যাবিশারদ বলে তার খ্যাতি। সেও নরোত্তমের সংস্পর্শে এসে নিরবধি-সংকীর্তনে মগ্ন হয়ে গেল। প্রেমধনে ধনী হয়ে উঠল আর তারই ফলে শত শত শিষ্যের নিত্যকার অন্ন যোগানোর ভার নিল। নাম হল চক্রবর্তী-ঠাকুর।

ভগবতী-পূজক জগন্নাথ আচার্যও নরোত্তমের বশীভূত হল।

পক্কপল্লীর নরসিংহ, তার সভায় অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সর্বশ্রেষ্ঠ রূপনারায়ণ। রাজসভায় এক ব্রাহ্মণ এসে নালিশ করল নরোত্তম কুহকবলে বিপ্রদের বৈষ্ণব করে ফেলছে, এর প্রতিবিধান প্রয়োজন। রাজা বললে, আমিই নরোত্তমের সম্মুখীন হব। সে পশুবধ বন্ধ করে দিচ্ছে, তান্ত্রিক ক্রিয়া হতে দিচ্ছে না, এরও প্রতিকার চাই। রূপনারায়ণ, তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

রাজপণ্ডিত ও আরো পণ্ডিত নিয়ে খেতুরির দিকে যাত্রা করল রাজা।

রাজা ও তার লোকজন কুমারপুরে বিশ্রাম করছে, কয়েকজন কুম্ভকার ও বারুজীবী তাদের পণ্য বেচতে এল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য, গ্রাম্য বেপারী, কী চমৎকার সংস্কৃত বলছে !

তোমরা এত সুন্দর সংস্কৃত শিখলে কোথায় ?

খেতুরির মন্দিরের কাছে আমরা বেসাতি করি, ওখানকার বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসেই আমাদের এই যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ।

রাজার লোকজন মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজাকে গিয়ে বললে, আগে খেতুরির বারুই-কুমোরদের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করে পরে যেন তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন নরোত্তমকে।

কী, এত বড় কথা ! ডাকো ওসব বেপারীদের। দেখি কেমন তাদের শাস্ত্রজ্ঞান।

এ বেপারীরা আর কেউ নয়, ছদ্মবেশে রামচন্দ্র কবিরাজ, চক্রবর্তী-ঠাকুর, হরিরাম রামকৃষ্ণ আর জগন্নাথ। রূপনারায়ণ এদের সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠল না, আর সব পণ্ডিতেরাও স্তব্ধ হল।

তখন রাজা নরসিংহ সদলবলে খেতুরিতে গিয়ে নরোত্তমের চরণে শরণ নিলে।

জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়ও দীক্ষা নিল নরোত্তমের কাছে। হরিশ্চন্দ্র নাম বদলে নতুন নাম হল হরিদাস।

রাজমহলের রাজা রাঘবেন্দ্র রায়, তার দুই ছেলে—চাঁদ আর সন্তোষ। চাঁদ রায় ডাকাতি করে বেড়ায়, বাদশার খাজনা দেয় না অথচ পরের ধন লুঠ করে। সন্তোষও তার অনুগামী। ‘শক্তি-উপাসনা সদা মৎস্য মাংস খায়। পরস্ত্রী ঘরদ্বার লুটি লঞা যায়।’

চাঁদ রায়ের ঘোরতর অসুখ হল। আর বুঝি বাঁচে না।

বাপকে বললে, বদ্যি কবিরাজ ছাড়ো, নরোত্তমকে লেখ। সে এসে মন্ত্রদীক্ষা দিলেই আমি ভালো হব।

নরোত্তমের কাছে চিঠি গেল। সে দ্বিরুক্তি না করে চলে এল রাজমহলে। দস্যুকে মন্ত্রদীক্ষা দিলে। চাঁদ রায় সুস্থ হয়ে উঠল।

কিছুদিন পরে নৌকা করে যাচ্ছে চাঁদ রায়, পাঠানের পেয়াদারা এসে তাকে পাকড়াও করলে। সে যে ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছে, সে যে এখন চলেছে গঙ্গাস্নানে, এ খবর তাদের জানা নেই। চাঁদ রায় বাধা দিল না, নম্রমুখে

নবাবের সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, যে জরিমানা করবেন তা বিনা আপত্তিতে দিয়ে দেব।

তোমার অপরাধের শাস্তি জরিমানায় শোধ হবে না। দেখতেই পাবে কী হয়।

'তলঘরে' বন্দী হল চাঁদ রায়। তারপর তাকে এক মত্ত হাতির পায়ের কাছে ফেলে দেওয়া হল। চাঁদ রায় দু হাতে হাতির শুঁড় ধরে দুর্বার শক্তিতে এমন টান মারল যে হাতিই ভূপতিত হল। চাঁদ রায়কে কে আর তখন শাস্তি দেয়!

নবাবের পেয়াদারা হতভম্ব, স্বয়ং নবাবের চক্ষুস্থির।

এই বিপুল শক্তি তুমি কোথায় পেলে? চাঁদ রায়কে জিজ্ঞেস করল নবাব।

নরোত্তমের কাছ থেকে। এ শক্তি তাঁরই কৃপাশক্তি—নামশক্তি।

নবাব চাঁদ রায়কে ছেড়ে দিল। পত্তন দিল নতুন পরগণা। যাও নিজের রাজ্য স্বচ্ছন্দে ভোগ করো।

নরোত্তমের নাম—গৌরহরির নাম—দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তবু তার শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদান—সংস্কারান্ধের দল মেনে নিতে চাইল না, ঘোঁট পাকাতে লাগল; তখন বসল আরেক ধর্মসভা। সারা বাংলার অগ্রণী পণ্ডিতদের আনা হল নিমন্ত্রণ করে। এল শ্রীনিবাস, এল বীরভদ্র, সাধনসঙ্গী রামচন্দ্র তো পাশেই আছে। সে সভায় বিরুদ্ধবাদীদের মত ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নরোত্তমই যে 'দ্বিজ'—সেই তত্ত্ব সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল।

ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সর্বলোকে দেখে।
সাধকের হৃদে পৈতা সদা থাকে গোপে॥
তৈছে নরোত্তম গোসাঞি সবার আজ্ঞামতে।
হৃদয় চিরি দেখাইল শ্রীযজ্ঞোপবীতে॥

কার্তিক মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে গ্যাম্ভীলায় অর্ধগঙ্গাজলে নরোত্তম স্বেচ্ছায় অপ্রকট হল।

নরোত্তম কীর্তনসাধক, পদকর্তা ও গ্রন্থকার। যেমন সুকবি তেমনি সুগায়ক। নরোত্তমের প্রার্থনা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি ॥
ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী নন্দের নন্দন।
নরোত্তম কহে এই নামসংকীর্তন ॥

॥ ১০৩ ॥

রামচন্দ্র কবিরাজ

দুই ভাই, বড় রাম ছোট গোবিন্দ। বাবা চিরঞ্জীব সেন, মা সুনন্দা। পূর্বনিবাস কুমারনগর, পরে শ্রীখণ্ড।

মাতামহ দামোদর সেন বিখ্যাত কবি। শক্তি-উপাসক।

গোবিন্দের জন্মকালে সুনন্দা দুর্বহ প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছিল, দাসী ছুটে দামোদরকে খবর দিতে গেল—মেয়ে বুঝি আর বাঁচে না। দামোদর ভগবতীর পূজা করছিল, ক্ষণমাত্র চঞ্চল হল না, মৌনে দুর্গাদেবীর যন্ত্র দেখিয়ে দিল আর ভঙ্গিতে নির্দেশ দিল এ নিয়ে গিয়ে সুনন্দাকে দেখানো হোক। পূজায় ব্যাপৃত আছে বলেই এই মৌন নির্দেশ। কিন্তু দাসী সে নির্দেশ বুঝতে পারল না। সে যন্ত্র ধুয়ে সেই জল খাওয়াল প্রসূতিকে। আর তাতেই শুভ লাভ—গোবিন্দের জন্ম।

ফলে গোবিন্দের উপর শাক্ত প্রভাব দৃঢ় হল।

কিন্তু জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র বাপের মতন কৃষ্ণভক্ত, গৌরগতপ্রাণ।

তাদের শৈশবেই বাবা মারা গেল, তারা মাতামহের আলয়েই মানুষ হতে লাগল। পরে চলে এল কুমারনগরে। দুই ভাইই বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করল—রামচন্দ্র হল দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক আর গোবিন্দ হল দিকপাল কবি। 'গীতপদ্যে করে ভগবতীর বর্ণন। শুনি হর্ষ শক্তি-উপাসক সঙ্গীগণ।'

দুই ভাইই বিয়ে করল। রামচন্দ্রের স্ত্রী রত্নমালা আর গোবিন্দের স্ত্রী মহামায়া।

গোবিন্দের ছেলে দিব্যসিং। রামচন্দ্র নিঃসন্তান।

বিবাহান্তে দোলায় করে ফিরছে রামচন্দ্র, যাজিগ্রামের পথ দিয়ে, পুকুর-

পাড় থেকে শ্রীনিবাস তাকে দেখতে পেল। এ সুন্দর সুপুরুষ কে হে? গন্ধর্বতনয়, না অশ্বিনীকুমার? এমন উজ্জ্বল যে দেখতে, সে কৃষ্ণভজন করে তো? 'এ দেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেরে ভজয়।' লোকটি কে? নাম কী? থাকে কোথায়?

এর নাম রামচন্দ্র সেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক। থাকে কুমারনগরে।

মৃদু হাসল শুধু শ্রীনিবাস। পলকে বুঝে নিল এ তার আপনজন।

রামচন্দ্র গাঢ় কর্ণে শুনল সব দোলায় বসে। কেন কে জানে প্রথম দর্শনেই শ্রীনিবাসের কাছে আত্মসমর্পণ করল। মনে হল আবার কতক্ষণে দেখব আচার্যকে।

দিন কোনোরকমে কাটল। রাত্রে সুখশয্যায় স্ত্রী—রামচন্দ্র ধরা না দিয়ে চলে গেল যাজিগ্রাম। এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাত কাটিয়ে প্রভাতে আচার্যের ঘরের দরজায় ধরনা দিল।

দরজা খুলে দেখা দিতেই শ্রীনিবাসের পায়ে লুটিয়ে পড়ল রামচন্দ্র। শ্রীনিবাস তাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে বললে, তুমি আমার গত-গত জন্মের বান্ধব। আমার প্রথম নেত্র নরোত্তম, দ্বিতীয় নেত্র তুমি।

নরোত্তম কে? কোথায়?

এখন আবার নরোত্তমের জন্যে উতলা হল রামচন্দ্র।

শ্রীনিবাস বললে, স্থির হও। আগে গোস্বামী-গ্রন্থাবলী পাঠ করো। দীক্ষা নাও।

আচার্যের কাছেই রামচন্দ্র পাঠারম্ভ করল। অল্প কদিনেই পারদর্শী হয়ে উঠল। তারপর রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা পেল।

শিষ্য হৈয়া রামচন্দ্র ভাসে ভক্তিরসে।
বাড়িল অদ্ভুত প্রেম দিবসে দিবসে॥

এদিকে নরহরি ঠাকুর মশাইয়ের তিরোধান হল। শ্রীনিবাস শোকবিহ্বল হয়ে বৃন্দাবনে পালাল। সেখানে গিয়ে আর তার খবর নেই। শ্রীনিবাসের স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে রামচন্দ্রকে অনুরোধ করল, তুমি যদি তাঁর তত্ত্ব এনে দাও।

রামচন্দ্র বৃন্দাবনযাত্রার আয়োজন করল।

অনুজ গোবিন্দকে বললে, আমি আচার্যকে আনতে বৃন্দাবন যাচ্ছি। আর শোনো, আমাদের আর কুমারনগরে থাকা ঠিক হবে না। তেলিয়া-বুধরি গ্রামে আমাদের কিছু জমি আছে, আমার ইচ্ছে আমাদের বাসা

সেখানে তুলে নিয়ে যাই।

সেখানে কেন? গোবিন্দ তাকাল সবিস্ময়ে।

আচার্য ফিরে এলেও নিশ্চয় গৃহে বন্দী হয়ে থাকবে না। প্রায়ই নরোত্তমকে দেখতে খেতুরিতে যাবে। খেতুরি যাবার পথেই তো তেলিয়া-বুধরি। আমরা ওখানে থাকলে ওঁর যাওয়া-আসার সময় ওঁকে আমরা দেখতে পাব। হয়তো কৃপা করে কখনো-সখনো আমাদের বাসায়ও পায়ের ধুলো দিতে পারবেন।

সানন্দে সম্মত হল গোবিন্দ।

গোবিন্দের মন ক্রমশই বৈষ্ণবতার দিকে ঝুঁকছিল। তার পিতা চিরঞ্জীব চৈতন্যভক্ত, দাদা রামচন্দ্রও সেই পথে, সে যেন নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। তেলিয়া-বুধরিতে এসে সে স্থিতি পেল বটে কিন্তু মন সর্বক্ষণ অস্থির হয়ে রইল। কী করি, কোথায় যাই, আমার কী হবে? দাদা কবে ফিরবে? আচার্য কি আমাকে আশ্রয় দেবে না?

বৃন্দাবনে লোকনাথ ভূগর্ভ জীব গোপাল ভট্ট রঘুনাথদাসের সঙ্গে রামচন্দ্রের পরিচয় হল। মিলল শ্যামানন্দের সঙ্গে। তারপর শ্রীনিবাসের সঙ্গে ঘুরল দ্বাদশ বন। এবার তবে তোমার রচিত পদ-গীত শোনাও।

শোনাল রামচন্দ্র। সকলে তার কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে 'কবিরাজ' আখ্যা দিলে।

কয়েক মাস কাটল বৃন্দাবনে। তারপর শ্রীনিবাস যখন ফিরল গৌড়ে, একা ফিরল না। তার প্রত্যাবর্তনের সঙ্গী হল শ্যামানন্দ আর রামচন্দ্র।

যা বলেছিল রামচন্দ্র, ঠিক খেতুরির পথে তেলিয়া-বুধরিতে থেমেছে শ্রীনিবাস। কই গোবিন্দ কোথায়? চরণশরণাকাঙ্ক্ষী গোবিন্দ প্রস্তুত ছিল, আচার্যের পায়ে এসে পড়ল। জানি তোমার চিত্ত অতৃপ্ত। আর এও জানি কিসে এই ব্যাধির নিরসন হবে।

আপনার কৃপা।

আমার কৃপা নয়, তোমার জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের কৃপা।

নিশ্চয়, তাঁরই কৃপায় আপনাকে পেয়েছি। দাদার পদবন্দনা করল গোবিন্দ। বললে, আমাকে আচার্য প্রভুর চরণে সমর্পণ করে দাও।

শ্রীনিবাস তখন গোবিন্দকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিল। এবার তোমার সমস্ত শূন্যতার পূরণ হোক।

কিন্তু নরোত্তম কোথায় ? তাকে কে খবর দেয় ?

খবর ঠিক পৌঁছে গেছে তার কাছে। পরদিন প্রভাতেই নরোত্তম এসে হাজির হল। সারা রাত না শুয়ে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে রামচন্দ্র— নরোত্তমের দর্শন পেতেই মনে হল কত জন্মের আত্মীয়। এ জন্মে যেন আর ছাড়াছাড়ি না হয় এমনি গভীর প্রণয়ে আবদ্ধ হল পরস্পর।

খেতুরি মহোৎসবের পরিকল্পনা বুধরিতে বসেই স্থির হল, রামচন্দ্রালয়ে। তারপর রামচন্দ্রকে শ্রীনিবাস নরোত্তমের হাতে সমর্পণ করে দিল। এমন সমর্পণ যে রামচন্দ্র গৃহ ছেড়ে নরোত্তমের সঙ্গেই থাকতে লাগল।

তখন গোবিন্দকে নিয়ে পড়ল শ্রীনিবাস। তুমি কবি, আমি শুনেছি তোমার কবিত্ব আরো লোককান্ত, তুমি এবার কৃষ্ণচৈতন্যলীলা বর্ণনা করো।

গোবিন্দ নতুন কালিতে লেখনী ডোবাল। গদ্যে-পদ্যে-গীতে সহস্রধারে গৌরাঙ্গগুণগান রচনা করল। গায়কদের দিয়ে গান গাইয়ে শোনাল আচার্যকে। 'গীতামৃত বৃষ্টি হৈল সর্বমনোহিত।' শ্রীনিবাস গোবিন্দকেও 'কবিরাজ' বলে আখ্যাত করল।

তারপর দলবল নিয়ে শ্রীনিবাস খেতুরিতে গেল। রামচন্দ্র আর গোবিন্দের উপরেই উৎসবের বৃহত্তম ভার পড়ল—সমাগত ভক্তদের বাসা-ব্যবস্থা—আর ভক্তের সংখ্যা কিনা গণনার বাইরে! শ্রীপাট খড়দহ হতে স্বয়ং জাহ্নবা-মাতা এসেছেন, সঙ্গে অনেক মহান্ত, অনেক পদকর্তা। প্রেমের পারাবার উথলে পড়ছে চারদিকে। ঘাটে মাঠে পথে অঙ্গনে দিবারাত্র উদ্দণ্ড কীর্তন হচ্ছে। সংকীর্তনরঙ্গে ক্ষণকালের জন্যে সপার্ষদ দেখা দিলেন প্রভু।

উৎসব শেষে মাতা জাহ্নবা বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। গোবিন্দ কবিরাজ বললে, আমিও যাব।

আর সবাই যার-যার জায়গায় ফিরে গেল কিন্তু রামচন্দ্র ফিরল না। সে খেতুরিতে থেকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু নরোত্তমের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় মত্ত হয়ে রইল। কৃষ্ণকথার মধ্যেই নামগান, নামপ্রচার। সংসারে পুত্র-কন্যা নেই বটে কিন্তু গৃহিনী তো আছে, তার কথাও ভুলে গেল। ভৃত্যসহ দুজন দাসী থাকে বাড়িতে, তাতেই নিশ্চিন্ত রামচন্দ্র, আর অন্নবস্ত্রাদির ব্যয় তো নরোত্তমই পাঠিয়ে দেয়। তুমি অমনি থাকো, আমাকে নরোত্তমের সহায় হয়ে সারা দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে দাও।

শুধু এক রাত্রির জন্যে তাঁকে গৃহে পাঠিয়ে দিন। নরোত্তমের কাছে

রত্নমালা প্রার্থনা করে পাঠাল। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রামচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিল নরোত্তম। কিন্তু একটি পূর্ণ রাত্রিও রামচন্দ্র ঘরে কাটাল না, দ্বিতীয় প্রহরেই বেরিয়ে গেল।

বাকি জীবন নরোত্তমের প্রধান সহায় হয়ে বৈষ্ণবধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করল।

দেখে এল নবদ্বীপ। দেখে এল ঈশানকে।

ভারতবর্ষ নয়টি দ্বীপের সমাহার। নবদ্বীপেই নবম দ্বীপ। ভক্তিও নববিধা।

নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যাতে॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন —এই নবলক্ষণসম্পন্না ভক্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়ে সাধিত হলেই সর্বসিদ্ধি।

এই নবদ্বীপধামই ধ্যেয় বস্তু। এই ধাম জাহ্নবীতটে শোভমান নিত্য বৃন্দাবন। পঞ্চশিবাধিষ্ঠিত শক্তিগণবিরাজিত ভক্তিভূষিত এবং অন্তর্মধ্যাদি নয়টি দ্বীপে সমুজ্জ্বল ও মনোহর। এই ধামের মধ্যস্থলে মায়াপুর। মায়াপুরেই ভগবদগৃহ, জগন্নাথের আলয়।

এখানেই দ্রুতকনকগৌর মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বল রসবপু গৌরাঙ্গদেব করুণায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠের চেয়েও রমণীয় এই স্থান, এখানকার প্রতি গৃহেই ভক্তি-উৎসব।

হে কৃষ্ণ, তুমি দেব ঋষি নর বহুরূপে অবতীর্ণ হয়ে লোকপালন করো, জগৎদ্রোহীদের বিনাশ করো। কলিকালে যুগানুরূপ নামকীর্তনধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার করবে বলে তোমার নাম ত্রিযুগ। ছন্নাবতার কবে আবার শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করে!

রামচন্দ্র শুধু বৈষ্ণবতায় মণ্ডিত নয়, সংস্কৃতেও নিষ্ণাত। আর গোবিন্দ কবিরাজের আরেক নাম তো দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।

মাঝে মাঝে তিন বিশারদে—রামে-গোবিন্দে-নরোত্তমে শাস্ত্রব্যাখ্যা বা তত্ত্ব-তাৎপর্য নিয়ে তর্ক হত—শেষ সমাধান কোথায়? পত্রসহ লোক পাঠানো হত বৃন্দাবনে, সেখান থেকে সমাধান আসবে। নয়তো পাঠাও যাজিগ্রামে, আচার্য ঠাকুরের কাছে। তাঁর ব্যাখ্যাই শিরোধার্য।

সে যুগে গৌড় থেকে বৃন্দাবন, বৃন্দাবন থেকে নীলাচল, নীলাচল থেকে

গৌড় যেন কত সহজসাধ্য! কিন্তু ভক্তির কাছে, অন্তরের আকুলতার কাছে দূরত্ব কোথায়, ব্যবধান কোথায়? প্রত্যয়ের এত শক্তি, প্রেমের এত বেগ!

বনবিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস ভাবাবেশে সম্বিৎ হারালে রামচন্দ্রকে ডাকো, রামচন্দ্র মর্মবেত্তা, সেই পারবে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে। তেমনি রামচন্দ্র ভাবাকুল হলে শ্রীনিবাসকে ডাকো, সেই জানে এ আবেশের তত্ত্ব কী।

একদিন হঠাৎ নরোত্তমের কাছে রামচন্দ্র এসে হাজির।

কী ব্যাপার?

বিদায় নিতে এলাম। যাজিগ্রামে যাচ্ছি।

যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে। বললে, বৃন্দাবন যাচ্ছি।

আমিও যাব। বললে শ্রীনিবাস।

পথে বেরিয়ে পড়ল দুজনে। কৃষ্ণনাম যেখানে পাথেয় সেখান পথ দীর্ঘ হলেই বা কী, দুর্গম হলেই বা কী।

বৃন্দাবন পৌঁছে কিছুকাল পরেই রামচন্দ্রের লোকান্তর হল।

অল্পকালের মধ্যেই গোবিন্দ জ্যেষ্ঠের অনুগমন করলে।

॥ ১০৪ ॥

বীর হাম্বীর

বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজা হাম্বীর মল্ল। গৌরাধিপতি সোলেমানের পুত্র দাউদ খাঁ-কে যুদ্ধে পরাভূত করে 'বীর হাম্বীর' নামে পরিচিত।

প্রথম বয়সে হাম্বীর অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিল। দস্যুতা করতেও তার বাধত না। 'দস্যুকর্ম করে সদা লৈয়া দস্যুগণ।'

গোস্বামী-গ্রন্থ নিয়ে বৃন্দাবন থেকে আসছে শ্রীনিবাস, সঙ্গে শ্যামানন্দ আর নরোত্তম। গ্রন্থগুলি রয়েছে কাঠের সিন্দুকে, গরুর গাড়িতে চাপানো। বনপথ দিয়ে যাচ্ছে, যে-পথ দিয়ে শ্রীচৈতন্য গিয়েছিলেন, সনাতন গিয়েছিল—সে-পথে যেতে কী আনন্দ!

সর্বত্র ধ্বনি উঠল—এক মহাজন বহু ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে নীলচলে যাচ্ছে।

হাম্বীরের রাজধানী বনবিষ্ণুপুরের কাছাকাছি এসে পৌঁছুল গাড়ি।

রাজার গুপ্তচরেরা সংবাদ পেয়ে দস্যুদের জানাল। দস্যুরা গণকের কাছে গোনাতে গেল—লুণ্ঠনের মত সামগ্রী কিছু আছে কিনা। গণক বললে, অমূল্য সম্পদ আছে সিন্দুকে। সুযোগ ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

দস্যুরা রাজাকে খবর দিল। কোন এক মহাজন গাড়ি ভরে ধনরত্ন নিয়ে যাচ্ছে।

এর আবার কথা কী। হাম্বীর উল্লসিত হয়ে উঠল : এখুনি সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ো। অর্থসহ সমস্ত গাড়িটাই এখানে নিয়ে এস। আর দেখ, শুধু ভয়ই দেখাবে, কাউকে প্রাণে মারবে না।

তামড়গ্রাম, মালিয়াড়া ও রঘুনাথপুর অতিক্রম করে শ্রীনিবাস আর তার সঙ্গীরা গোপালপুর এসে পৌঁছেছে। কৃষ্ণকথাসুখে অর্ধেক রাত কাটিয়ে ঘুমিয়েছে, দস্যুরা এসে চড়াও হল। রাজার আদেশ মতো কারু গায়ে হস্তক্ষেপ করল না, সিন্দুক-সমেত গাড়ি নিয়ে বনে প্রবেশ করল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত নিয়ে হাজির করল রাজসমীপে।

অপহরণের খবর পেয়ে বন-বিষ্ণুপুরের লোকেরা বিক্ষুব্ধ হল। ধনী মহাজন তার সম্ভার নিয়ে জগন্নাথদর্শনে নীলাচলে চলেছে, তার উপর বলদর্পী রাজার এ কী দৌরাত্ম্য! এ পাপিষ্ঠকে কে উদ্ধার করবে? যে প্রভু নদীয়া-বিহারে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি তো নীলাচলে সংগোপিত হয়েছেন, তবে এ দুরাচারের কী করে ত্রাণ হবে! 'সে প্রভু হইলা নীলাচলে সংগোপন। একে কে করিবে হেন দুষ্টের তারণ॥' কেউ কেউ বললে, বলা যায় না। দুষ্টের দুর্বুদ্ধিমোচনের জন্যে ভক্তকে দিয়েই প্রভু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিচ্ছেন। কে জানে হয়তো এই পাপ-দেশেই তেমনি কোনো ভক্তের শুভাগমন হবে।

প্রকাণ্ড সিন্দুক দেখে হাম্বীর পুলকিত হল। কত না জানি মহামূল্য ধনরত্ন রয়েছে লুকোনো। প্রচুর প্রশংসা করল হাম্বীর, বসন-ভূষণ দিয়ে দস্যুদের পরিতৃপ্ত করল। পরে নির্জনে নিজে গেল সিন্দুক খুলতে।

গণককে ডেকে পাঠাল।

কী জানি কী ব্যাপার, গণক ত্রস্ত হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

তুমি এমন অদ্ভুত গণনা কী করে করলে!

গণনা ঠিক হয় নি?

আশ্চর্য ঠিক হয়েছে। হাম্বীর উল্লসিত হয়ে উঠল : সিন্দুকের মধ্যে অমূল্য সব গ্রন্থ। তুমি যে বলেছিলে গাড়িতে অমূল্য সম্পদ আছে, সত্যিই তাই।

তোমার কোনো গণনাই কোনোদিন মিথ্যে হয় নি। যতই গ্রন্থগুলি দেখছি স্পর্শ করছি, ততই আমার চিত্ত চঞ্চল হচ্ছে, এ কী অনন্য সম্পদ আমি লুণ্ঠন করে এনেছি! এখন বলো যার গ্রন্থ তাকে আমি কোথায় পাব?

রাজমহিষী সুলক্ষণাও এল গ্রন্থ দেখতে। গ্রন্থ দেখে সেও অভিভূত হল। বললে, এখন এগুলোকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করো।

ব্যবস্থার ক্রটি হল না। কিন্তু এ আমার কী হল? হাম্বীরের চোখে ঘুম নেই। কেবলই ভাবতে লাগল, ভক্তকৃপার কথা শুনেছি, আমার বেলায় এ যে দেখছি গ্রন্থকৃপা।

এদিকে গ্রন্থ হারিয়ে শ্রীনিবাস পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। এদের যে কোনো প্রতিলিপি নেই, এদের যে কোনো বিকল্প হয় না। যেমন করে হোক এদের উদ্ধার করতেই হবে, নইলে জীবনধারণই অর্থহীন।

নরোত্তম আর শ্যামানন্দকে ফিরে যেতে বলে শ্রীনিবাস গ্রন্থসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। ভাবল দস্যুতার প্রতিকারে রাজদ্বারে গিয়ে দাঁড়ালে ক্ষতি কী। রাজা কি শুধু দস্যুদেরই রাজা, সর্বস্বান্ত প্রজার রাজা নয়?

খুঁজতে-খুঁজতে দেউলি গ্রামে এসে পৌঁছুল শ্রীনিবাস। উঠল কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। সেখানে কথায়-কথায় শুনতে পেল মল্লপাটের রাজা বীর হাম্বীর দুই গাড়ি ধন লুট করে এনেছে। আর, শোনো মজা, দস্যুবৃত্তি থাকলে কী হবে, রাজা আবার ভাগবত শোনে।

ভাগবত শোনে, কোথায়?

কেন, রাজসভায়। ব্যাস চক্রবর্তী পাঠ করে। অনেকে শোনে।

তুমি শুনেছ?

শুনেছি বৈকি।

আমাকে তবে শোনাও একদিন। রাজসভায় নিয়ে চলো।

শ্রীনিবাস যখন রাজসভায় এসে দাঁড়াল, বীর হাম্বীরের মনে ডাক দিল এই অপূর্বসুন্দর পুরুষ নিশ্চয়ই ঈশ্বরপ্রেরিত। নইলে মন-প্রাণ এর চরণে আত্মসমর্পণ করতে ছোটে কেন?

বীর হাম্বীর সম্মানিত আসন দিল আগন্তুককে।

কে রাজা, কে পাঠক, সমস্ত সভার অধিপতি শ্রীনিবাস। রূপে তেজে সম্ভ্রম-গাম্ভীর্যে অপরূপ। হয়তো ইনিই গ্রন্থরত্নের অধিকারী।

পাঠশেষে রাজপণ্ডিতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অনুযোগ করল শ্রীনিবাস।

ব্যাস চক্রবর্তী প্রথমে রুষ্ট হল বটে কিন্তু শ্রীনিবাসের শান্ত যুক্তির কাছে সে রোষ স্থায়ী হল না। রাজা বললে, আমাদের আপনি কিছু শোনান। যদি ভ্রমরগীতা পাঠ করেন তো কৃতার্থ হই।

শ্রীনিবাস ভ্রমরগীতা পাঠ করে শোনাল। রাজা তো আর্দ্র হলই, রুষ্ট পাঠকও আর্ত হয়ে উঠল।

আপনি কী উপলক্ষে এসেছেন এখানে? নিভৃতে বীর হাম্বীর জিজ্ঞেস করল শ্রীনিবাসকে।

তখন শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত বললে রাজাকে। গোস্বামীদের গ্রন্থ প্রকাশ করতে গৌড়ে আসছিলাম, আসছিলাম বৃন্দাবন থেকে, গোপালপুরে মধ্য-রাত্রিতে বিশ্রাম করছিলাম, দস্যু এসে গ্রন্থ-সম্পুট হরণ করে নিল। বলুন আমি এখন কী করি, কোথায় যাই, কী করলে কোথায় আবার গ্রন্থের দেখা মেলে? মনে শান্তি নেই, ভাবলাম ভাগবত-পাঠ শুনে যদি কিছু শান্তি পাই, তাই এসেছি এখানে।

বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। বললে, প্রভু, আমিই সেই দস্যু। আমার সমস্ত পাপভার আপনার চরণে এনে রাখছি, আমাকে মার্জনা করুন। সমস্ত গ্রন্থ অটুট আছে, যত্নে রক্ষিত আছে, আমাকে আপনি রক্ষা করুন।

পুরীর অভ্যন্তরে গিয়ে গ্রন্থ দেখতে পেয়ে শ্রীনিবাসের আনন্দ আর ধরে না। সন্দেহ কী, গ্রন্থই সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়েছে।

রাণী সুলক্ষণাও আচার্যের পায়ে প্রণত হল।

বীর হাম্বীর বললে, আমাকে পায়ে স্থান দিলেন কিনা বলুন।

শ্রীনিবাস বললে, তোমাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পায়ে সমর্পণ করে দিলাম। সেই পাদপদ্মই নিরন্তর চিন্তা করো।

আর কী করব? ব্যাকুল হল রাজা।

নিজেকে সর্বক্ষণ অপরাধী জ্ঞান করে নামসংকীর্তন করবে। আগে তোমাকে গোস্বামীদের গ্রন্থাস্বাদ করাই, পরে তোমাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দেব।

গ্রন্থ-চুরির কথা বৃন্দাবনে জানানো হয়েছে, এখন প্রাপ্তির কথাটাও জানাতে হয়।

রাজা বললে, সেই সঙ্গে এই দস্যুর উদ্ধারের কথাটাও জানিয়ে দেবেন।

আর বলবেন, গোস্বামী যেন কৃপা করেন আমাকে।

গ্রন্থ-শকট বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেওয়া হল, খেতুরিতেও লোক গেল নরোত্তমকে খবর দিতে। শ্রীনিবাস বললে, এবার তবে আমিও যাজিগ্রামে ফিরে যাই।

রাজা বললে, আমার তবে কী হবে?

শ্রীনিবাস বললে, আরো কিছুকাল অপেক্ষা করুন। গ্রন্থাস্বাদের ফলে রঙ ধরুক।

রাজার প্রেরিত লোক মারফৎ জীব গোস্বামী হাম্বীরের কাছে চিঠি পাঠাল। এ যে বৃন্দাবনের অনুরাগ দিয়ে ভরা। গোস্বামী-প্রভু তাকে চৈতন্যভক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। রাজার আনন্দ আর ধরে না। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল অশ্রুর নির্ঝর। আমি কি চৈতন্যভক্ত?

শ্রীনিবাস ফের বৃন্দাবনে গেল। ব্যাস কিছুতেই তার সঙ্গ ছাড়ছে না। সেও বৃন্দাবনের যাত্রী হল। বৃন্দাবনে পৌঁছে ব্যাস জীব গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিতে চাইল। জীব গোস্বামী বললেন, না, আমার কাছে নয়, দীক্ষা নেবে শ্রীনিবাসের কাছে।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে এল। সঙ্গে ব্যাস ছাড়া আরো দুজন—রামচন্দ্র আর শ্যামানন্দ। নতুন দুজনের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হল হাম্বীরের। শ্যামানন্দ উৎকলে যাবে, সম্ভার-সামগ্রী সাজিয়ে দিল রাজা। ভক্তসেবায় উদ্ধারিত হয়ে উঠল।

শ্রীনিবাস দেখল, রাজার ভক্তিগ্রন্থে অধিকার জন্মেছে। ফল গাঢ়-পক্ক হয়েছে। বললে, এবার আপনাকে দীক্ষা দেব।

আষাঢ়ী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় শ্রীনিবাস হাম্বীরকে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিল। বললে, জীব গোস্বামী তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমার নতুন নাম রেখেছেন।

কী নাম?

নাম চৈতন্যদাস।

রাণী সুলক্ষণাও দীক্ষা নিল।

বীর হাম্বীরের ছেলের নাম ধাড়ি-হাম্বীর। সেও দীক্ষিত হল।

জীব গোস্বামী তাকেও নতুন নাম দিলেন—গোপালদাস। চৈতন্যদাসের পুত্র গোপালদাস।

সমগ্র মল্লরাজবংশ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হল।

পিতা-পুত্র চৈতন্যদাস আর গোপালদাস দুজনেই পদকর্তা হয়ে উঠল।

সুলক্ষণা দেখল বীর হাম্বীর স্বপ্নাবেশে শ্রীনিবাসের প্রশস্তিমূলক পাঠ মনে-মনে রচনা করে মুখে আবৃত্তি করে চলেছে। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সুলক্ষণা।

গ্রন্থকৃপা আর কাকে বলে! দর্শনে-স্পর্শনেই চিত্তের পরিবর্তন আর আস্বাদনেই একেবারে ক্রান্তদর্শন।

রাজার মত ব্যাসাচার্যও সবংশে শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা নিল। দীক্ষা নিল কৃষ্ণবল্লভ। বিষ্ণুপুরের আরো অনেকে।

বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাসের জন্যে বাড়ি করে দিল হাম্বীর। কিন্তু শ্রীনিবাসকে বাঁধতে পারল না। রাজা বললে, তবে আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। তাতেও রাজী নয় শ্রীনিবাস। রাজা রাজধানী ছেড়ে থাকলে রাজ্য চলবে কী করে?

শেষে খেতুরি-উৎসবের পর নবদ্বীপ-পরিক্রমা শেষ করে শ্রীনিবাস নরোত্তম ও রামচন্দ্রসহ যাজিগ্রামে ফিরে এল। তখন বীর হাম্বীর সেখানে এসে উপস্থিত হল। গ্রামের বাইরে অশ্ব-গজ-পদাতিকের সমারোহ ছেড়ে রেখে কয়েকজন নিরীহ লোক সঙ্গে নিয়ে রাজা গুরুর চরণে বহুবিধ দ্রব্যসম্ভার সমর্পণ করল, নরোত্তম আর রামচন্দ্রকেও প্রণতি জানাল। রাজার এই প্রথম নরোত্তম-মিলন।

দীনহীনের মত সর্বত্র ভ্রমণ করে রাজা বৈষ্ণব মহান্তদের আশীর্বাদ কুড়োল। রাজার সঙ্গে রাণীও এসেছে। গুরুপত্নীকে দিয়েছে অনেক বস্ত্রালঙ্কার।

রাণী চতুর্দোলায় এসেছে, চতুর্দোলায়ই চলে গেল, রাজা কিন্তু গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত গেল পদব্রজে। পরে যথাযুক্ত যানে আরোহণ করল।

বৈষ্ণবতাই বীর হাম্বীরকে যথার্থ বীর্যে মণ্ডিত করেছে। সে ভিতরে প্রেমার্দ্র ভক্ত কিন্তু বাইরে সুকঠিন সম্রাট। সে প্রেমে ভক্তবৎসল, যুদ্ধে শত্রুঞ্জয়। বৈষ্ণবতাই তাকে যথার্থ ন্যায়ে-নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে রাধিকাবিগ্রহ পাঠাচ্ছেন, ভক্তবৃন্দ কণ্টকনগরে পৌঁছুলে বীর হাম্বীর গোপনে তাদের সহস্র মুদ্রা পাঠিয়ে দিল। শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহেও সে কম খরচ করে নি।

বৃন্দাবনের অনুকরণে বিষ্ণুপুরে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নির্মাণ করল রাজা,

তাল তমাল ভাণ্ডির বন স্থাপন করল, স্থাপন করল যমুনা ও কালিন্দী বাঁধ, মথুরা, দ্বারকা, গোকুল নামে জনপদ। গিরি-গোবর্ধনের অনুকরণে এক মন্দির-নির্মাণ শুরু করল, শেষ করতে পারে নি। তাই লোকে এখন রাসমঞ্চ বলে। সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন বীর হাম্বীরেরই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীবাসের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বীর হাম্বীর চলেছে যাজিগ্রামে। পথে বৃষভানুপুরে এক ব্রাহ্মণের ঘরে রাত কাটাল, দেখল সেখানে সুন্দর মদনমোহনের বিগ্রহ। দেখে রাজার খুব লোভ হল এবং যাজিগ্রাম থেকে ফেরবার সময় ঐ বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে নিয়ে এল। ব্রাহ্মণ দারুণ শোকে মুহ্যমান হলে মদনমোহন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, দিবাভাগে বিষ্ণুপুরে এবং নিশাকালে বৃষভানুপুরে তোমার আলয়ে থাকব।

মল্লবংশের শেষ রাজা চৈতন্যসিংহ নানা কারণে ঋণগ্রস্ত হলে মদনমোহনের স্বপ্নাদেশ হল—আমার বিগ্রহ তুমি বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে বাঁধা রেখে টাকা সংগ্রহ করে ঋণমুক্ত হও।

লক্ষাধিক টাকায় শ্রীবিগ্রহ গোকুল মিত্রের বাড়িতে আবদ্ধ রইল। সেই থেকে মদনমোহন বাগবাজারে অধিষ্ঠান করছেন।

॥ ১০৫ ॥

জাহ্নবা বা জাহ্নবী ঠাকুরাণী

পিতা সূর্যদাস পণ্ডিত, রাজদত্ত উপাধি সরখেল, মাতা ভদ্রাবতী দেবী। জন্মস্থান অম্বিকা কালনা।

সূর্যদাসের দুই কন্যা—বড় বসুধা, ছোট জাহ্নবা বা জাহ্নবী।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বললেন, তুমিও যদি মুনিধর্ম অবলম্বন করে থাকো তাহলে পতিত সংসারের উদ্ধার হবে কী করে? তুমি যাও, গৌড়ে ফিরে যাও, গৃহী হয়ে ভজন স্থাপন করো। অনর্গল প্রকাশ করো প্রেমভক্তি।

প্রিয়শিষ্য উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে নিত্যানন্দ সূর্যদাসের গৃহে উপস্থিত হল। প্রস্তাব করল তোমার কন্যাকে বিবাহ করব। 'বিবাহ করিব, মোরে কন্যা দেহ তুমি।' যেহেতু নিত্যানন্দ বর্ণত্যাগী, সূর্যদাস প্রস্তাবে রাজী হল না।

প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিত্যানন্দ ফিরে চলল।

এদিকে বসুধার কী দশা? 'পূর্ণ নারায়ণ' তার পাণিপ্রার্থী জেনে তার অন্তরে প্রেম জেগেছিল, এখন এই প্রত্যাখ্যানের পর সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। চিকিৎসক ডাকা হল কিন্তু মূর্ছাভঙ্গ হল না। মূর্ছা মৃত্যুকে ডেকে আনল।

গৌরীদাস খবর পেয়ে ছুটে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যদাসের পায়ে পড়ল। বললে, শিগগির প্রভুকে ফিরিয়ে আনো। একমাত্র প্রভুই বসুধাকে পুনর্জীবন দিতে পারেন।

গঙ্গাতীরে বসুধার মৃতদেহ সৎকার করতে আনা হয়েছে, নিত্যানন্দের দেখা মিলল। সূর্যদাস তার পায়ে পড়ল, বললে, আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দিন।

নিত্যানন্দ বললে, মেয়ের জীবন ফিরে এলে তাকে আমার হাতে সম্প্রদান করবেন স্বীকার করুন, বাঁচিয়ে দিচ্ছি।

সূর্যদাস স্বীকৃত হল।

বসুধার গায়ে নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের বাতাস লাগল, অঙ্গগন্ধ লাগল বুঝি নাসিকায়, মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে ফিরে এল চেতনা। বসুধা চোখ মেলে দেখল প্রভুকে।

এবার তবে বিবাহের আয়োজন করো।

তার আগে তুমি অবধূত, বেদবিহিত সংস্কার করে উপবীত ধারণ করো।

তাই করল নিত্যানন্দ। বললে, 'যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই। একলে স্বতন্ত্রমাত্র চৈতন্য গোসাঞি॥'

বিয়ের পর একদিন খেতে বসেছে নিত্যানন্দ, বসুধার ছোট বোন জাহ্নবা পরিবেশন করছে, হঠাৎ জাহ্নবার মাথার কাপড় স্খলিত হয়ে পড়ল, নিত্যানন্দ দেখল, বুঝল এই আমার পূর্ণশক্তি। আমার প্রাণপ্রিয়া। সূর্যদাসকে বললে, আপনার এই কনিষ্ঠ কন্যাকে আমার যৌতুকস্বরূপ দান করুন।

সূর্যদাস বললে, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই। জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিবার সমস্ত তোমার।

বিয়ের পর স্ত্রীদের নিয়ে নিত্যানন্দ বড়গাছিতে এল। সেখানে শ্রীবাস-ঘরনী মালিনীর আশীর্বাদ নিল। তারপর নবদ্বীপ গেল শচীমাতার আশীর্বাদ নিতে। কিছুকাল সপ্তগ্রামেও বাস করল। শেষে খড়দহে এল।

বসুধার গর্ভে আট পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হল। একে একে সাত পুত্র

মারা গেল। বেঁচে রইল মেয়ে গঙ্গা ও কনিষ্ঠ পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র।

জাহ্নবা নিঃসন্তান।

তা হোক, বীরচন্দ্রই তার একশ্চন্দ্র।

বীরচন্দ্রকে মাতা জাহ্নবাই দীক্ষা দিল। বীরচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল অদ্বৈতের কাছে দীক্ষা নেয়, তাই ভেবে সে শান্তিপুরে যাবার উদ্দেশে বেরিয়েছিল কিন্তু জাহ্নবা তাকে ফিরিয়ে আনল। বললে, দূরে যাবার দরকার নেই। আমার থেকে দীক্ষা নিলেই হবে।

বীরচন্দ্র মায়ের থেকেই দীক্ষা নিল।

'প্রেমভক্তিরত্নপ্রদানে প্রবীণা' বা বিশেষজ্ঞা জাহ্নবা সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ সম্মানের পাত্রী। খেতুরির মহোৎসবে তাই তার ডাক পড়ল। বসুধা-গঙ্গা ও বীরচন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খড়দহ থেকে যাত্রা করল জাহ্নবা, সঙ্গে বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি অনেকানেক মহান্ত। হালিশহর থেকে নয়ন মিশ্র এসে দলে ভিড়ল। গ্রামে-গ্রামে লোকসংঘট্ট বেড়ে চলল, বয়ে চলল নামপ্রেমের প্রবাহ। পথিমধ্যে স্থানে-স্থানে বিশ্রাম করল জাহ্নবা—নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়িতে, আকাইহাটে কৃষ্ণদাসের বাড়িতে, কন্টকনগরে গদাধরদাসের গৌরাঙ্গ-মন্দিরে আর বুধরিগ্রামে রামচন্দ্র কবিরাজের বাড়িতে। তারপরে খেতুরিতে গিয়ে পৌঁছুলে সে কী সংবর্ধনা! সে কী আনন্দ-উদ্বেলতা!

শ্রীঈশ্বরী জাহ্নবা এসেছেন।

তাঁর জন্যে আলাদা বাসা নির্দিষ্ট হয়েছে, সেখানে তিনি উঠলেন ভক্তদের নিয়ে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ছয়টি বিগ্রহ স্থাপিত হল। বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার পর জাহ্নবা দেবী শ্রীনিবাসকে বললেন, চৈতন্যভক্তদের মাল্যচন্দন দাও। সে-নির্দেশ পালিত হলে আবার নৃসিংহ-চৈতন্যকে মাল্য দিতে বললেন। তারপর নিজে মাল্যচন্দন গ্রহণ করলেন। বললেন, এব্যার তবে গৌরগুণগান করো, শুরু করো সংকীর্তন।

খেতুরিতে প্রেমের পারাবার উথলে উঠল।

গীতপ্রিয় ইচ্ছাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্তনরঙ্গে বিলাস করতে এলেন। একা নয়, সঙ্গে নিয়ে এলেন সমস্ত পারিষদ। ক্ষণকালের জন্যে সকলে দেখতে পেল 'মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ যৈছে। সংকীর্তন মেঘে প্রভু প্রকটয় তৈছে॥'

'প্রকটাপ্রকট একত্র চমৎকার।' ক্ষণপরেই আবার সকলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সংকীর্তনস্থলে ক্রন্দনের রোল উঠল—গৌরচন্দ্র গেলেন কোথায়? কেউ বললে, এই তো এখানে নাচছিলেন অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ, তাঁরা কোথায় লুকোলেন? আর শ্রীবাস মুরারি? হরিদাস গদাধর? বক্রেশ্বরকে দেখনি? দেখেছি বৈকি। দেখেছি স্বরূপদামোদরকে, রামানন্দকে, সার্বভৌমকে, এমন কি নরহরিকে। গণসহ দর্শন দিয়ে প্রভু চকিতে কোথায় অন্তর্ধান করলেন?

জাহ্নবা বললেন, এ নরোত্তম আর শ্রীনিবাসের প্রতি প্রভুর করুণা। তিনি তাঁর বাক্যকে সত্য করে দেখালেন। যেখানেই কীর্তন সেখানেই তাঁর আবির্ভাব। এবার তবে ফাগুখেলা আরম্ভ করো।

জাহ্নবা মন্দিরে ঢুকে নিজেই প্রথমে প্রভু-অঙ্গে ফাগু দিলেন। সকলেই সে খেলায় মেতে উঠল। শুধু মানুষে-মানুষে খেলা নয়, দেবতা-মানুষে খেলা। 'ফাগুময় হইল গগন-মহীতল।'

প্রভুর ইচ্ছায় সে অদ্ভুত ফাগুখেলা।
অলক্ষিত দেবতা-মনুষ্যে এক মেলা॥

তারপর সন্ধ্যারতির পর জাহ্নবা শ্রীনিবাসকে বললেন, এবার গৌরাঙ্গের জন্মাভিষেক করো।

কেহ কহে ধন্য ফাল্গুন পৌর্ণমাসী।
এ তিথি সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী॥

পরদিন প্রভাতে স্নানাহ্নিক সেরে জাহ্নবা রাঁধতে বসলেন। বহুবিধ খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করে মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহদের ভোগ দিলেন। পরে সেই মহাপ্রসাদ নিজের হাতে মহান্তদের পরিবেশন করলেন। সকলকে খাইয়ে নিজে খেলেন।

পরদিন নরোত্তমকে বললেন, আমি বৃন্দাবনে যাব।

আর তাঁকে কে নিরস্ত করে? সঙ্গে চলল খুল্লতাত কৃষ্ণদাস সরখেল, জামাতা মাধবাচার্য, গোপাল পরমেশ্বরীদাস। আরো কেউ-কেউ।

পায়ে হাঁটা পথ—দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর—ভয় পেলেন না জাহ্নবা। ক্লেশ ক্লেশ নয়, সমস্তই নিত্যানন্দ।

এক গ্রামে ঢুকে বিশ্রাম করছেন জাহ্নবা, গ্রামস্থ ভক্তেরা এসে তাঁকে

প্রণাম করছে। দুর্জন পাষণ্ডও সে গ্রামে কম নয়, যারা বৈষ্ণববিরুদ্ধ। বলে, লোকগুলোর দুর্মতি দেখেছ, মানুষকে প্রণাম করে। চণ্ডীর কাছে এদের যে কী অপরাধ হচ্ছে বুঝতে পাচ্ছে না। 'বিপ্রপত্নী, বিপ্র কিনা প্রণামে চণ্ডীরে, এগুলার অপরাধ হৈল চণ্ডীদ্বারে।' চণ্ডীর মন্দিরে গিয়ে আস্ফালন করে বললে, আজই এগুলোকে সংহার করো। মোচন করো অনাচার।

পাষণ্ডদের স্বপ্ন দেখালেন চণ্ডী, বিপ্রপত্নী বলে যাকে হেয় করছ সে আসলে ঈশ্বরী, আমারও শিরোধার্যা।

জাহ্নবা ঈশ্বরী—নাম অতি সুমধুর।
এ নাম গ্রহণে ভবভয় হবে দূর॥

যাও, সবাই গিয়ে তাঁর পায়ে শরণ নাও নচেৎ আমি তোমাদের উচ্ছেদ করব।

নিদ্রাভঙ্গে পাষণ্ডেরা নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগল। সজল নেত্রে মহান্তদের পায়ে গিয়ে পড়ল, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। উদ্ধার করুন আমাদের।

তোমাদের উদ্ধার করব বলেই তো এই গ্রামে আমাদের আসা। বললে মহান্তেরা, ভয় নেই, ঈশ্বরী তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

পাষণ্ডেরা জাহ্নবীকে প্রণাম করল। প্রণামেই পেয়ে গেল ভক্তিরস।

আরেকদিন আরেক গ্রামে নদীতীরে বিশ্রাম করছেন জাহ্নবা, দস্যুদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। দলপতি কুতুবুদ্দিন বললে, এই গৌড়ীয়াদের সঙ্গে অনেক ধনরত্ন আছে, সব লুটে নিতে হবে। গুপ্তচরকে বললে, দেখে এস তো কী করছে লোকগুলো।

গুপ্তচর বললে, নামসংকীর্তন করে শুয়েছে এতক্ষণে।

এই তবে প্রশস্ত সময়। তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাও। তারপর এস আমার সঙ্গে।

নদীতীর কতটুকুই বা পথ কিন্তু কুতুবুদ্দিন যত চলে পথও তত অফুরন্ত হয়। মহাবেগে ছুটে চলে, পথও মহাবেগে বিস্তীর্ণ হয়। এদিকে ওদিকে যেদিকেই যায়, পথকে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারে না। এ আমরা কি শূন্যের উপরে হাঁটছি, আমাদের কি নিশিতে পেয়েছে?

রজনী প্রভাত হয়ে গেল তবু ডাকাতেরা গৌড়ীয়াদের ডেরায় গিয়ে পৌঁছুতে পারল না। দস্যুরাজ ভয় পেয়ে গেল। বললে, ওরা যাকে ঈশ্বরী

বলে নিশ্চয়ই এ তাঁরই মহিমা। চলো তাঁর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করি। ছেড়ে দিই দস্যুতা।

মনে অভিমুখিতা নিয়ে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই দস্যুরাজ নদীতীরের পথ পেয়ে গেল। জাহ্নবাসকাশে উপনীত হল। বললে, আমাদের উদ্ধার করুন।

শ্রীঈশ্বরী করুণা করলেন। দস্যুরা কৃষ্ণনাম করতে লাগল।

ক্রমে মথুরায় এসে পৌঁছুলেন জাহ্নবা। যমুনায় বিশ্রামঘাটে স্নান করলেন। মথুরার ভাগবতেরা ঈশ্বরীদর্শনে আসতে লাগল। খবর পাঠাল বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে এল। দুই দলের দেখা হল অক্রূরে।

পরমেশ্বরীদাস জাহ্নবার সঙ্গে সকলের পরিচয় করে দিল—এই গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ—এই জীব গোস্বামী। এই কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণ পণ্ডিত, মধু পণ্ডিত।

তোমাদের মধ্যে ইনি কে?

ইনি রামচন্দ্র কবিরাজের ছোট ভাই গোবিন্দ। অনবদ্য পদকর্তা।

দুই দলেই আনন্দের বান ডেকে এল।

জীব গোস্বামী জাহ্নবার জন্যে বাসা স্থির করে দিল। জাহ্নবা ঘুরে ঘুরে মন্দির ও বিগ্রহ ও দ্রষ্টব্য স্থান দেখে বেড়াতে লাগলেন। রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ দাসের সঙ্গে দেখা হল। দেখা হল কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে। তিন চার দিন সেখানে থাকলেন জাহ্নবা। রান্না করে খাওয়ালেন সকলকে। খাওয়ালেন কৃষ্ণকে।

একদিন দুপুরবেলা কুণ্ডতীরে বাঁশি শুনতে পেলেন জাহ্নবা। অস্থির হয়ে তাকালেন চারদিকে। দেখলেন শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণ কদমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে আর তাকে বেষ্টন করে আছে শ্রীমতী ও তার সখীবৃন্দ। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে জাহ্নবা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। চেতনা পেয়ে স্থির হয়ে ভাবতে লাগলেন এ নির্জন রঙ্গের কথা কার কাছে বলা যায়।

জীব গোস্বামী গোস্বামীগ্রন্থ পড়ে শোনাল জাহ্নবাকে। তারপর জাহ্নবা বনভ্রমণে বেরুলেন—দ্বাদশ বন। ভ্রমণ সাঙ্গ করে যমুনাতীরে এক গ্রামে ঢুকেছেন, শুনতে পেলেন এক বৃদ্ধের কান্না। কী ব্যাপার? শুনলেন এক নিরীহ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিল, পৌগণ্ড বয়সে সেই ছেলেটির আজ মৃত্যু হল। তার মা মৃত পুত্র কোলে নিয়ে কাঁদছে আর

ব্রাহ্মণ করছে গগন-বিদারণ হাহাকার।

করুণায় আর্দ্রচিত্ত, জাহ্নবা অস্থির হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়ালেন।

মা বারণ করল। বললে, আমার ছেলেকে ছুঁয়ো না।

জাহ্নবা বললেন, সে কী, তোমার ছেলেকে ছুঁলে আমি পবিত্র হব। বলে মৃত বালকের মাথায় হাত রাখলেন। বালক চোখ মেলল, চোখ মেলে তাকাতে লাগল চারদিকে। জাহ্নবাকে প্রণাম করে উঠে পড়ল।

এ কী অঘটন! এ কী করুণা-বিতরণ! ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী জাহ্নবার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

জাহ্নবা বললে, এ আমার কৃপা নয়, কৃষ্ণের কৃপা। কৃষ্ণই করুণাময়। তোমাদের দুঃখে বিচলিত হয়ে করুণা করে তোমাদের পুত্রকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আর কান্নার প্রয়োজন নেই। শুধু কৃষ্ণনাম করো।

মন্দিরে গিয়ে রাধাগোপীনাথ দর্শন করলেন, জাহ্নবার হঠাৎ মনে হল, দৈর্ঘ্যে রাধিকা যেন গোপীনাথের চেয়ে খাটো। 'শ্রীরাধিকা কিছু উচ্চ হইলে ভালো হয়।' ঠিক করলেন গৌড়ে ফিরে একটি নতুন রাধিকাবিগ্রহ তৈরি করাবেন। নয়ন-ভাস্করকে বললেন সেকথা। বললেন, এখন থেকে গোপীনাথকে নিরন্তর ধ্যান করবে, সেই ধ্যানেই পেয়ে যাবে তাঁর প্রেয়সীর আভাস।

জাহ্নবার মনোবাঞ্ছা বুঝতে পারল নয়ন।

তারপর গৌরীদাসের সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে জাহ্নবা তাঁর মাসির ছেলে বড়ু-গঙ্গাদাসের দেখা পেলেন। বললেন, আমার সঙ্গে গৌড়ে চলো।

জাহ্নবা গৌড়ে ফিরে যাচ্ছেন শুনে এক বৃন্দাবনভক্ত তাঁকে একটি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ উপহার দিল। জাহ্নবা গঙ্গাদাসকে বললেন, আর কথা নেই, তুমি গৌড়ে গিয়ে এ বিগ্রহের সেবা করবে।

জাহ্নবার সঙ্গে গঙ্গাদাসও ফিরে চলল। বিদায়ের ক্ষণে সমস্ত বৃন্দাবন শোকাভিভূত হয়ে গেল।

গৌড়মণ্ডলে প্রবেশ করে জাহ্নবা প্রথমেই খেতুরি গেলেন। সেখানে তিন-চার দিন থেকে গেলেন বুধরিতে। সেখানে শ্যামাদাস চক্রবর্তীর মেয়ে হেমলতার সঙ্গে গঙ্গাদাসের বিয়ে দেওয়ালেন। সেখান থেকে গেলেন নিত্যানন্দের জন্মভূমি একচক্রায়।

একচক্রায় এক ব্রাহ্মণের মুখে শুনলেন সব পুরাবৃত্ত। 'এই একচক্রা ঈশ্বরের ধাম।' 'এথা শীঘ্র প্রকটিব প্রভু বলরাম।' শুনলেন নিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃকুলের বিবরণ, মাতা পদ্মাবতীর চরিতকথা। নিত্যানন্দের বাল্যলীলা ব্রজলীলা বিচিত্রতর অবতারলীলা। পরিশেষে গৃহত্যাগ।

একচক্রা ছেড়ে জাহ্নবা গেলেন যাজিগ্রামে। শ্রীনিবাসের সঙ্গে দেখা করলেন। সেখান থেকে গেলেন শ্রীখণ্ডে। রঘুনন্দনের সঙ্গে দেখা করলেন। সেখান থেকে নবদ্বীপে, শ্রীবাসগৃহে। তারপরে অম্বিকা হয়ে খড়দহে। সেখানে মিললেন পুত্র কন্যা ও ভগ্নীর সঙ্গে—বীরচন্দ্র গঙ্গা ও বসুধার সঙ্গে।

কিছুদিনের মধ্যেই নয়ন ভাস্কর রাধিকা-মূর্তি নির্মাণ করে আনল। চিত্তের সমস্ত ভক্তি, মাধুর্য ও পবিত্রতা দিয়ে মূর্তি নির্মিত হয়েছে, সবাই ধন্য-ধন্য করে উঠল। জাহ্নবা বললেন, এখন একে কে নিয়ে যাবে বৃন্দাবনে?

পরমেশ্বরীদাস রাজি হল। তার পথের সঙ্গী হল নৃসিংহচৈতন্য।

পথিমধ্যে কাটোয়ায় শ্রীনিবাস দেখল বিগ্রহ। রাজা বীর হাম্বীর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্যে গোপনে এক হাজার টাকা দিল। বিগ্রহ বৃন্দাবনে পৌঁছুলে কথা উঠল আদি-বিগ্রহ কোথায় যাবে? জয়পুরের রাজা আদি-বিগ্রহ গ্রহণ করলেন। গোপীনাথের বামে নতুন বিগ্রহ বসানো হল। এই নতুন বা প্রতিভূ-বিগ্রহের নাম হল জাহ্নবা-ঠাকুরাণী বা জাহ্নবা-রাধিকা।

পরমেশ্বরীদাস ফিরে এসে সবিস্তার সব বললেন জাহ্নবাকে। জাহ্নবা তাকে আদেশ করলেন, তড়াআটপুর গ্রামে গিয়ে রাধা-গোপীনাথ সেবা প্রকাশ করো।

পরে আবার স্বগণ-সহ চললেন বৃন্দাবন। রাধাসহ গোপীনাথকে দর্শন করে আসি।

বৃন্দাবনে পৌঁছে রাধা-গোপীনাথকে দেখতে গেল জাহ্নবা! কিন্তু এ কী দৃশ্য। 'মধ্যে গোপীনাথ, রাধা দক্ষিণে বামেতে।' গোপীনাথের দুই পাশে দুই রাধিকা! দুই প্রেমলতিকার মধ্যে শ্যামল তমাল বৃক্ষ। মধ্যে মেঘপুঞ্জ দুই পাশে দুই বিদ্যুৎ-উদ্ভাস!

গৌড় থেকে যেসব দ্রব্য এনেছিলেন সমস্ত রাধা-গোপীনাথকে সমর্পণ করলেন, বিচিত্র অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে খাওয়ালেন দুজনকে। তারপর একদিন নিভৃতে সেই মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল।

গোপীনাথ জাহ্নবার বস্ত্র আকর্ষণ করে তার বামপার্শ্বে বসিয়ে দিল।

গোপীনাথ জাহ্নবার বস্ত্র আকর্ষিয়া।
বসাইলা আপনার বামপার্শ্বে লইয়া ॥

সেবকেরা যখন দরজা খুলল, দেখল জাহ্নবা কাঞ্চনপ্রতিমা হয়ে গোপীনাথের দক্ষিণে বিরাজ করছেন।

সবে দেখে কাঞ্চনপ্রতিমা মূর্তি হইয়া।
বিরাজয়ে গোপীনাথের দক্ষিণে বসিয়া ॥
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা দক্ষিণে জাহ্নবা
মধ্যে গোপীনাথ ইথে উপমা কি দিবা ॥

॥ ১০৬ ॥

বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র

ঠাকুর নরহরির তিরোভাব তিথিতে শ্রীখণ্ডে মহোৎসব হচ্ছে।

রাত্রে কীর্তনোৎসবে এ কে নৃত্য করছে? দেখামাত্রই দেহ-মনের তাপ শীতল হয় এ কার অঙ্গ, এ কার ভঙ্গি?

সে কি, চেন না একে? এ নিত্যানন্দের ছেলে।

তাই বুঝি নৃত্যানন্দ। কিন্তু দু চোখে দেখে আর্তির পূর্তি হচ্ছে না, যদি সহস্র নেত্র থাকত! অতৃপ্ত দর্শকের দল বলাবলি করছে।

তোমরা তো হাজার চোখ কামনা করছ, আমার যদি সামান্য দুটি চোখ থাকত! দর্শকের মধ্যে ছিল এক অন্ধ, সে আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠল: আমি যে কোন্ দিকে তাকাব তাই বুঝতে পারছি না! আমার যে চার দিকেই অন্ধকার।

না, ছুটোছুটি না করে এক জায়গায় বোসো স্থির হয়ে। একাগ্র তন্ময়তায় তাকাও সামনের দিকে।

নিত্যানন্দ-তনয়ের নাম কী? অন্ধ পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলে।

নাম বীরভদ্র।

ঠিক নাম, সুন্দর নাম। বললে সেই অন্ধ। তাঁর দুই পদ—বীর আর ভদ্র। এক পদে শাসন, আরেক পদে করুণা। বীর-পদে তিনি দুষ্টের সংহার

করছেন, অশুভ-অশিব বিনাশ করছেন, ভদ্র-পদে করুণা বিতরণ করে সর্ব-জগতের মঙ্গল বিধান করছেন, অন্ধকেও দেখতে দিচ্ছেন সেই করুণার বিগ্রহকে।

এ কী, অন্ধ যে সত্যি-সত্যিই দেখতে পাচ্ছে চোখ মেলে। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না বিসদৃশ প্রতীতি! আমি সত্যিই দেখছি, না, দেখছি বলে মনে হচ্ছে? এ কি শুধু অনুভবে, না, প্রত্যক্ষগোচরে?

কী আশ্চর্য, চোখের জলে চোখের আচ্ছাদন ক্ষয় হয়ে গেছে, স্থূলে-স্পষ্টে-স্বচ্ছন্দে দেখতে পাচ্ছি উদ্দণ্ড নৃত্য—হ্যাঁ, এই তো বীরভদ্র, চৈতন্য-পরিকর, নিত্যানন্দের পুত্র, বলবীর্য ও শিবশুভের প্রতিমূর্তি। অন্ধ সোল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল আর সেই জয়ধ্বনিতে উত্তাল হয়ে উঠল কীর্তনানন্দের সমুদ্র। সবাই উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগল :

কোথা [illegible] প্রভু শচীর নন্দন।
কোথা নিত্যানন্দ রাম দুঃখীর জীবন॥
কোথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য গুণের আলয়
কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়॥
হরিদাস শ্রীবাস স্বরূপ, রামানন্দ।
কোথা শ্রীমাধব বাসু মুরারি মুকুন্দ॥

সবার কণ্ঠে এক কান্না, এক ডাক এক আনন্দধ্বনি—গণসহ দেখা দাও গৌরবিনোদিয়া। গৌরনামে যা কান্না তাই আনন্দ, যা আনন্দ তাই কান্না। গৌরনামে আর্তি আকূতি আর আহ্লাদ সমস্ত একাকার।

বীরভদ্র ধর্মপ্রচার করতে পূর্ববঙ্গে গেলেন। সমাজের বিচিত্র অত্যাচারে বহু হিন্দু বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বহু চেষ্টাতেও তাদের সমাজে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। বীরভদ্র তাদেরকে 'ভেক' দিয়ে 'নেড়া' ও 'নেড়ি'র সৃষ্টি করল। এরাই হয়ে দাঁড়াল বীরভদ্রের প্রধান সহায়ক।

একেবারে গৌড়ের বাদশার সকাশে এসে উপস্থিত হল বীরভদ্র। বাদশা ঠিক করল এই আতিথ্যের সুযোগে বীরভদ্রের ধর্মনাশ করবে। যখন হাতে এসে পড়েছে 'খানা' খাইয়ে দিতে হবে। 'পড়েছ যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।'

বেশ তো খাব। বীরভদ্র বললে, নিয়ে আসুন আপনার খানা।

বাবুর্চি খানা নিয়ে এল। কিন্তু আবরণ তুলে নিতেই দেখল, এ কী,

খাদ্য কোথায়, তার বদলে এ যে দেখি ফুল, ফুলের স্তূপ।

সবাই বিমূঢ় হয়ে গেল।

না, ছেড়ে দেওয়া চলবে না। আবার নিয়ে এস খানা। হ্যাঁ, ভয় কী, ঢাকা দিয়েই নিয়ে এস। তারপর ফের ঢাকা তুলে ধরে দাও সামনে!

কিন্তু কী আশ্চর্য, খানা আবার পুষ্পস্তূপে পরিণত হয়েছে!

বাদশা অধোমুখ হয়ে রইল। বললে, মার্জনা করুন। বলুন কী দিয়ে আপনার পরিতোষ করতে পারি?

আর কিছু নয়, আপনার কাছে যে বহুমূল্য 'তেলুয়া' পাথরখানি আছে সেখানি আমাকে দান করুন।

আপনার মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাই আপনি যখন চেয়েছেন, বললে বাদশা, তখন আপনাকে আমি তুষ্ট করব। আপনার পরিতোষেই আমার মার্জনা হবে।

বীরভদ্র সেই পাথরে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ নির্মাণ করাল। স্থাপিত করল খড়দহে। নিত্যানন্দ পিত্রালয় একচক্রা থেকে খড়দায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কুলদেবতা বঙ্কিমদেবকে, সঙ্গে অনন্তদেব শিলা আর ত্রিপুরাসুন্দরী। শ্যামসুন্দর তাদের পাশে এসে বসল।

নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্ত ও মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। তার দুই ছেলে গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ অপ্রকট হলে তার দুই ছেলেকে জাহ্নবা দেবী পুত্রের মত পালন করেন। কেউ-কেউ বলে, রামকৃষ্ণ বা রামচন্দ্র জাহ্নবারই দত্তক পুত্র।

এই রামচন্দ্রের সঙ্গে নেড়া-নেড়ি নিয়ে বীরভদ্রের ঝগড়া হল। নরনারী একত্র করে বীরভদ্র কৃষ্ণভজন করছে, এটা রামচন্দ্রের মনঃপূত নয়। বললে, কোন শাস্ত্রেই নারীর স্বাতন্ত্র্যধর্মের বিধান নেই।

কিন্তু বীরভদ্র তা মানতে চাইল না।

কণ্টকনগর পেরিয়ে অম্বিকার পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে নদীর দক্ষিণ তীরে গভীর বন-জঙ্গল কাটিয়ে বাঘনাপাড়া পাটের পত্তন করে রামচন্দ্র। বনে বাঘের উপদ্রব ছিল বলে গ্রামের নাম হল ব্যাঘ্রনাদাশ্রম—শেষে তারই অপভ্রংশে নাম দাঁড়াল বাঘনাপাড়া, মন্দিরে-বিগ্রহে লোকবসতিতে বাঘনাপাড়া শ্রীমন্ত হয়ে উঠল।

সেই খবর খড়দহে বীরভদ্রের কানে গিয়ে পৌঁছল। বীরভদ্রের ক্রোধ

হল, পাটের প্রতিষ্ঠাতা কে খোঁজ না নিয়েই নাড়াদের পাঠিয়ে দিল সেখানে।

পৌষের দ্বিপ্রহর রাত্রে বারো শো নাড়া বাঘনাপাড়ায় চড়াও হল। বললে, ইলিশ মাছ আর আম খাওয়াও। নইলে—

রামচন্দ্র বললে, প্রথমটা দিতে পারব না, তবে আম খাওয়াচ্ছি এস।

পৌষ মাসে ?

হ্যাঁ, পৌষ মাসে।

আশ্রমে আম গাছ আছে ?

না। এ যে দেখছ এ তো বকুল গাছ।

তবে আম খাওয়াবে কী করে ?

বকুল গাছ থেকেই আম পাড়ব। রামচন্দ্র আশ্বাস দিলে।

বারো শো নাড়া মূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর, আশ্চর্যের আশ্চর্য, রামচন্দ্রের মাহাত্ম্যে বকুল গাছই আম্রময় হয়ে উঠল।

নাড়ারা খড়দায় ফিরে এসে বীরভদ্রকে বললে এই অপরূপ কথা। আরো বললে, যাঁর আশ্রম সেই শক্তিধর পুরুষের নাম রামচন্দ্র।

এক ডাকে চিনতে পারল বীরভদ্র। তখুনি ছুটল বাঘনাপাড়ায়। দুইজনের মিলন হয়ে গেল। কোনো মতভেদ বা মনোমালিন্য রইল না।

রাজবলহাটের কাছাকাছি ঝামটপুর, সেই গ্রামের যদুনন্দন চক্রবর্তী, পত্নীর নাম লক্ষ্মী দেবী—তাদের দুই মেয়ে শ্রীমতী আর নারায়ণী। এই দুই মেয়েকেই যদুনন্দন বীরভদ্রের হাতে সম্প্রদান করল। যৌতুক দিল অভিনব। শিষ্যত্বই সেই যৌতুক। যদুনন্দন জামাইয়ের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে তার শিষ্য হয়ে গেল। বীরভদ্র যে চৈতন্যেরই অভিন্ন বিগ্রহ।

বধূদের দীক্ষা দিলেন জাহ্নবা। দীক্ষা দিয়ে বধূদের নিয়ে শ্রীপাট খড়দহে ফিরলেন।

শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। সুন্দরী স্ত্রী কিন্তু সন্তান নেই। বীরভদ্র বিষ্ণুপুরে গেলে শ্রীনিবাস তাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল। পদ্মাবতীর স্বহস্তের রান্না, তাই এত স্বাদ। পদ্মাবতীর স্বহস্তের পরিবেশন, তাই এত শ্রী।

কিন্তু সেবা যে চালাবে এর গর্ভের সন্তান নেই। শ্রীনিবাস মিনতি করল : তুমি যদি কৃপা করো তবেই আমার পুত্রলাভ হয়। 'তোমার সিদ্ধ কলেবর প্রভুর নিজ শক্তি। পঙ্গু কুব্জ এই গর্ভে জন্মায় সন্ততি।'

বীরভদ্র পদ্মাবতী নাম বদলে রাখল গৌরাঙ্গপ্রিয়া। তারপর তার হাতে

নিজের চর্বিত তাম্বুল দিয়ে শক্তি সঞ্চার করে দিল। দশ মাস অন্তে যথাসময়ে শ্রীনিবাস পুত্রলাভ করল। কিন্তু দেখা গেল সেই পুত্রের দক্ষিণ চরণ বাঁকা। তাই বলে একে কেউ বক্রগতি বোলো না, এ গোবিন্দগতি। বীরভদ্র খঞ্জ শিশুর তাই নাম রাখল। কিংবা বল গতিগোবিন্দ।

মায়ের আদেশ নিয়ে বীরভদ্র স্বগণসহ বৃন্দাবন যাত্রা করল। পথিমধ্যে সপ্তগ্রামে এক সুকৃতিমান বণিকের গৃহে সংকীর্তন করে পতিত-দুঃখিতদের ভক্তি বিলোল। এল শান্তিপুর, মিলল অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণ মিশ্রের সঙ্গে। সেখান থেকে অম্বিকা হয়ে নবদ্বীপ। নবদ্বীপ থেকে শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ডে ঠাকুর কানাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। সঙ্কীর্তনে তাকে তুষ্ট করে গেল যাজিগ্রামে। সেখানে শ্রীনিবাসের সম্বর্ধনা পেল। যাজিগ্রাম থেকে বুধরি হয়ে চলল খেতরিতে। সেখানে মিলল নরোত্তম ঠাকুরের অভিনন্দন। নরোত্তমকেই বৃন্দাবনের সঙ্গী করল।

দেখ দেখ নিত্যানন্দ-বলদেবের সন্তানকে দেখ। যে দেখে তারই আর পলক পড়ে না। মানুষের এত রূপ হয়? এত তেজ! আর সঙ্গীদেরও দেখ। সবাই যেন প্রেমানন্দের পারাবার!

অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গদাধর পণ্ডিত, গোবিন্দদেবের অধিকারী অনন্ত আচার্য। ব্রজবাসীদের আনন্দে বৃন্দাবন মুখর হয়ে উঠল। বীরভদ্র সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গোবিন্দ, গোপীনাথ আর মদনমোহনকে দর্শন করল। দর্শন করল রাধাবিনোদ, রাধারমণ আর রাধাদামোদর। তারপর ভূগর্ভ আর জীব গোস্বামীর অনুমতি নিয়ে চলল বনভ্রমণে। মধু-তাল-কুমুদ-বহুলার অরণ্যে। তারপর দেখতে গেল দুই কুণ্ড—রাধা আর শ্যাম, সেখান থেকে গিরিগোবর্ধন। গোবর্ধন থেকে বেরিয়ে চলল কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটিরে।

কৃষ্ণদাসের পিতা ভগীরথ কবিরাজ, মাতা সুনন্দা। জন্মস্থান ঝামটপুর, কাটোয়ার তিন মাইল উত্তরে। কৃষ্ণদাসের যখন ছ বছর বয়স, তার পিতৃবিয়োগ হল। যৌবনের সূচনাতেই দেখা দিল ঘোরতর বৈরাগ্য। নিত্যানন্দ স্বপ্নে আদেশ করলেন বৃন্দাবনে যাও, রূপ-সনাতন-রঘুনাথের সঙ্গে মিলিত হও। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে গেল আর ঐ তিন গুরুর আশ্রয় নিল। চিরকুমার কৃষ্ণদাস সারা জীবন বৃন্দাবনেই কাটাল আর রচনা করল বৈষ্ণববেদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

কৃষ্ণদাসের সঙ্গে বীরভদ্র আরো সব কৃষ্ণলীলাস্থান দর্শন করল। কাম্যবনে গিয়ে বিমলাকুণ্ডে স্নান করল, তারপর গেল বৃষভানুপুরে। পাবন সরোবরে স্নান করে গেল ঘাবটে। সেখানে রামঘাটে রামরাস করল। তারপর ভাণ্ডীরে গিয়ে দেখল কৃষ্ণ-বলরামের ক্রীড়াবিলাস। নন্দঘাট চীরঘাট দেখে এল গোকুলে, কৃষ্ণজন্মস্থান দেখল। সেখান থেকে গেল রাওলে রাধিকার জন্মস্থান দেখতে। মথুরায় বিশ্রান্তি ঘাটে স্নান করল। তারপর গণ-জনসহ ফিরল গৌড়ে।

গৌড়ে ফিরেই খড়দহে এসে জননীকে প্রণাম করল।

বীরভদ্রের প্রেমভক্তিময় তিন শিষ্য—গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ আর রামচন্দ্র। আরেক শিষ্য ছিল কাঁদরার জয়গোপালদাস। জয়গোপাল গুরুলঙ্ঘন করেছিল তাই তাকে শিষ্যত্ব থেকে বিতাড়িত করল।

দ্বিতীয়া স্ত্রী নারায়ণীর গর্ভে বীরভদ্রের এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করল। পুত্র রামচন্দ্র ও তিন কন্যা ভুবনমোহিনী, নবদুর্গা ও নবগৌরী। রামচন্দ্রের চার পুত্র—রামদেব, কৃষ্ণদেব, বিষ্ণুদেব ও রাধামাধব—ও এক কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরী। ভক্ত-সংসারের বিস্তার ঘটল।

নিত্যানন্দ-দুহিতা গঙ্গার বিয়ে হয় মাধবাচার্যের সঙ্গে। মাধব নিত্যানন্দের ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য। পাণ্ডিত্যের জন্যে অর্জন করেছে আচার্য উপাধি। গঙ্গা ন্যাসীর কন্যা, তায় আবার গুরুকন্যা—তার সঙ্গে বিয়ে তো অশাস্ত্রীয়। তাছাড়া নিত্যানন্দ রাঢ়ী শ্রেণীর আর মাধব বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এমন বিয়ে বিধেয় হয় কী করে? কিন্তু নিত্যানন্দের ইচ্ছায় সমস্ত অসাধ্য সুসাধ্য হয়, সমস্ত অসিদ্ধও সুসিদ্ধ হয়ে যায়।

মাধব ও গঙ্গার পুত্র গোপালবল্লভ।

রাধিকা গৌরী ও কৃষ্ণ হরি, দুয়ে মিলে গৌরহরি। রাধারমণকে ভজনা করা অর্থই রাধার মনকে ভজনা করা। আরও সংক্ষেপে গোবিন্দের গো আর রাধার রা একত্র করে গোরা। আর যা বৃন্দাবন নামে খ্যাত তাই নবদ্বীপ বা নববৃন্দাবন। সত্য যুগে তীর্থ কুরুক্ষেত্র, ত্রেতায় তীর্থ পুষ্কর, দ্বাপরে তীর্থ নৈমিষারণ্য আর কলিযুগে তীর্থ নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপে যে পূর্ণানন্দসুন্দর গৌরবিগ্রহ নরহরি উদিত হয়ে সুধাসারবর্ষী হরিনাম দান করে পাপীদের পাপসমুদ্র থেকে উদ্ধার করছেন সেই ভক্ত-অভয়ঙ্করের চিরন্তন জয় হোক।

হৃদয়চৈতন্য

আগে নাম ছিল হৃদয়ানন্দ, পরে হল হৃদয়চৈতন্য।

তেমনি আগে নাম ছিল 'দুঃখী', হৃদয়চৈতন্যের কাছে দীক্ষা পেয়ে নাম হল কৃষ্ণদাস। পরে সেই কৃষ্ণদাসেরই নাম হল শ্যামানন্দ।

মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে পুণ্যকীর্তি মাধব মিশ্রের বাড়ি। মাধবের দুই ছেলে গদাধর আর কাশীনাথ। কাশীনাথের দুই ছেলে নয়নানন্দ আর হৃদয়ানন্দ।

এই গদাধরই মহাপ্রভুর পর্ষদ গদাধর পণ্ডিত। হৃদয়ানন্দ তাঁর হাতেই লালিত-পালিত, শিক্ষিত-দীক্ষিত। শুধু সেবক নয়, ছাত্র।

সূর্যদাস সরখেলের ছোট ভাই গৌরীদাস। এই সূর্যদাসের দু মেয়ে জাহ্নবা আর বসুধাকে বিয়ে করেন নিত্যানন্দ। গৌরীদাস জন্মস্থান শালিগ্রাম ছেড়ে কাটোয়ার অদূরে অম্বিকা কালনায় এসে গঙ্গাতীরে বাসা বাঁধে।

কালনায় গৌরীদাসের গৃহে এসেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এসেছিলেন নৌকো করে, নিজে বৈঠা চালিয়ে। সে বৈঠা দিয়েছিলেন গৌরীদাসকে। বলেছিলেন, তুমি যে মানুষকে ভবনদী পার করিয়ে দেবে এ বৈঠা তারই প্রতীক।

আরো একবার এসেছিলেন নিত্যানন্দকে নিয়ে। গৌরীদাস তাঁদের ছেড়ে দিতে চায় নি, বলেছিল, এখানে যাবজ্জগৎ বন্দী হয়ে থাকবে। প্রভু বলেছিলেন, তাই যদি তোমার অভিলাষ, তবে আমাদের বিগ্রহ করে রেখে দাও।

গৌরীদাস গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করল।

বিগ্রহসেবার জন্যে একটি যোগ্য ভক্ত চাই। তারই সন্ধানে গৌরীদাস গদাধরের দ্বারস্থ হল। বললে, আমি একটি ভিক্ষা নিতে এসেছি।

কী ভিক্ষা? বলো, গদাধর তাকাল মুখের দিকে: তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই।

তোমার হৃদয়ানন্দকে ভিক্ষে চাই।

গৌরীদাসকে বিমুখ করল না গদাধর। হৃদয়ানন্দকে তার হাতে সঁপে দিল। আর গৌরীদাস হৃদয়ানন্দকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে সঁপে দিল বিগ্রহসেবায়।

মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে মহোৎসব হবে, গৌরীদাস ভিক্ষায় বেরুল।

হৃদয়ানন্দকে বলে গেল, যথারীতি যুগলবিগ্রহের সেবাপূজা কোরো, আমি যথাসময়ে ফিরব।

কিন্তু কই, সেই সে গেছে, গৌরীদাসের আর খবর নেই। মহান্তদের নিমন্ত্রণপত্র এখুনি পাঠিয়ে না দিলে তারা নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হবে কী করে? এখনো আনুষঙ্গিক কত আয়োজন অসমাপ্ত।

গুরু এসে পৌঁছুবার আগেই হৃদয়ানন্দ সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করল।

উৎসবের আগের দিন গৌরীদাস উপস্থিত হল। আপনার ফিরতে বিলম্ব দেখে আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করেছি। তৃপ্ত মুখে বলল হৃদয়ানন্দ।

কোথায় গৌরীদাস তাকে আশীর্বাদ করবে, তা না, উল্টে রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার বিনানুমতিতে তোমার এই স্বতন্ত্রাচারের অর্থ কী?

হৃদয়ানন্দ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তুমি যখন আমাকে অতিক্রম করে আমাকে অমান্য করলে তখন তোমার আর এ আশ্রমে স্থান নেই। তুমি অন্যত্র চলে যাও।

গুরুর আদেশ মেনে নিল হৃদয়ানন্দ। গঙ্গাতীরে এক বৃক্ষতল আশ্রয় করে রইল।

গৌরীদাস নিজেই উৎসব শুরু করল আশ্রমে।

হৃদয়ানন্দের নিমন্ত্রণের ভিত্তিতে ধীরে-ধীরে লোকসমাগম হচ্ছে। প্রভুর জন্যে প্রভূত উপচার নিয়ে একজন আসছিল, গঙ্গাতীরে হৃদয়ানন্দকে দেখে সেখানেই বাহকদের থামতে বললে। হৃদয়ানন্দ বললে, উৎসব এখানে নয়, উৎসব আশ্রমে। সেখানে নিয়ে যাও।

গৌরীদাস সমস্ত ফিরিয়ে দিল। বললে, এ সমস্ত হৃদয়ানন্দের নিমন্ত্রণে এসেছে, এ আমি গ্রহণ করব না। এ উপচার নিয়ে হৃদয়ানন্দকে আলাদা উৎসব করতে বলো।

বাহকেরা দ্রব্যসম্ভার আবার হৃদয়ানন্দের কাছে ফিরিয়ে আনল।

গুরুদেব আমাকে আলাদা উৎসব করতে বলেছেন? বেশ তাই হবে। হৃদয়ানন্দ গঙ্গাতীরে সেই বৃক্ষতলেই উৎসব আরম্ভ করল।

উৎসবের কোলাহল শুনে আমন্ত্রিতদের অধিকাংশই সেই বৃক্ষতলে আকৃষ্ট হল। গৌরীদাসও নিজের আয়োজনে আশ্রমে উৎসব করছে। মধ্যাহ্নভোগের সময় পূজক গঙ্গাদাসকে বললে, মন্দিরের দরজা খোলো। ভোগ লাগাও।

মন্দিরের দরজা খোলা হল। মন্দির শূন্য। বিগ্রহ নেই।

গৌরীদাস লাঠি হাতে নিয়ে ছুটল গঙ্গাতীরে। নিশ্চয়ই হৃদয়ানন্দ বিগ্রহ সরিয়েছে।

গঙ্গাতীরে পৌঁছে দেখল অদ্ভুত কাণ্ড! কীর্তন হচ্ছে আর কীর্তনমণ্ডলীর মধ্যে বিগ্রহদ্বয় নৃত্য করছেন।

গৌরীদাসের হাতে লাঠি দেখে দুই বিগ্রহ অন্তর্হিত হতে চাইল। কিন্তু গৌরীদাস দেখল, চৈতন্যচন্দ্র হৃদয়ানন্দের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন।

দু বাহু বাড়িয়ে হৃদয়ানন্দকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল গৌরীদাস। বললে, তুমিই ধন্য। আজ থেকে তোমার নাম হৃদয়চৈতন্য।

মন্দিরে ফিরে এসে দেখল যুগল বিগ্রহ আবার স্বস্থানে উপস্থিত হয়েছে। হাসছে উজ্জ্বল নেত্রে। যেন বলছে, কী, চিনলে তো হৃদয়ের গুরুভক্তি? আর চিনলে তো কে তার হৃদয়স্থ?

এই হৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দের দীক্ষাগুরু।

শ্যামানন্দের বাল্য নাম দুঃখী। হৃদয়চৈতন্যের কাছে কৃষ্ণমন্ত্র নেওয়ার দরুন তার নাম হল কৃষ্ণদাস।

পরে তার নাম শ্যামানন্দ হল। কেন? কোথায়? কী করে?

॥ ১০৮ ॥

শ্যামানন্দ

মেদিনীপুরের ধারেন্দা-বাহাদুরপুর গ্রামে সদগোপ বংশে জন্ম—পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা দুরিকা দাসী। অনেক দুঃখের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল বলে নাম হল দুঃখী। কেউ কেউ বলে দুখিয়া।

বাপ পূর্ববাস ত্যাগ করে উড়িষ্যায় দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস করে। বাল্যকাল থেকেই দুখিয়ার মধ্যে বৈরাগ্যের লক্ষণ ফুটতে থাকে। ব্যাকরণপাঠ শেষ করে হঠাৎ তার গঙ্গাস্নানে স্পৃহা জাগে। বাবাকে বললে, আমি গঙ্গাস্নান করতে যাব।

কোথায়? কার সঙ্গে? শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল উচাটন হল।

এক দল স্নান-যাত্রী অম্বিকা-কালনায় যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে।

অনুমতি না দিয়ে লাভ নেই, ছেলেকে আটকানো যাবে না। শুধু এইটুকুই আশা করা যাক, স্নান-অন্তে আবার সে ঘরে ফিরে আসবে।

কিন্তু দুখিয়া আর ফিরল না। অম্বিকা-কালনায় তার হৃদয়চৈতন্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হৃদয়চৈতন্য দেখল বৈরাগ্যের বৃন্তে ভক্তির একটি অম্লান পদ্ম। বললে, এস, তোমাকে মন্ত্র দিয়ে দি।

হৃদয়চৈতন্য তাকে কৃষ্ণমন্ত্র দিল। বললে, আজ থেকে তোমার নাম হল কৃষ্ণদাস।

দুখিয়া হাসল। বললে, দুঃখী কৃষ্ণদাস।

সত্যিই তো, কৃষ্ণকে না পাওয়া পর্যন্ত জীবনমাত্রই দুঃখী।

শুধু গঙ্গায় কৃষ্ণদাসের চিত্ত তৃপ্ত হতে চাইল না, বললে, যমুনা দেখব।

হ্যাঁ, দেখবে বৈকি। ব্রজবনে যাবে।

গুরুসেবায় কিছুকাল অতিবাহিত হলে কৃষ্ণদাসকে হৃদয়চৈতন্য বৃন্দাবনে যাবার অনুমতি দিল।

নবদ্বীপ হয়ে বৃন্দাবনে চলে গেল কৃষ্ণদাস। সেখানে আরেক কৃষ্ণদাসের দেখা পেল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের। কৃষ্ণদাস জীবগোস্বামীর চরণে আশ্রয় নিল। আর কথা কী। জীব তাকে শাস্ত্র পড়াতে বসল। জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় অজ্ঞানতিমির কেটে যেতে লাগল।

প্রত্যূষে নির্জন বনবীথি ধরে পথপরিক্রমায় বেরিয়েছে কৃষ্ণদাস। ললাটে গোপীচন্দনের তিলক, হাতে জপমালা, মুখে গৌর-গুণগান। যেতে-যেতে কৃষ্ণদাস থমকে দাঁড়াল, পথের উপর একটি সোনার নূপুর পড়ে আছে! ব্যগ্র হাতে নূপুর কুড়িয়ে নিল কৃষ্ণদাস। মাথায় ঠেকাল। বুকের মাঝখানে আঁকড়ে ধরল দুহাতে।

কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেল যে একটি কিশোরী পথের ধুলোয় কী খুঁজতে-খুঁজতে এগিয়ে আসছে।

দেবী, আপনার কি কিছু হারিয়েছে? স্নিগ্ধ বিনয়বচনে জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণদাস।

কিশোরী চমকে উঠল। দেখল এক সৌম্যকান্তি নবীনযুবক। বললে, হ্যাঁ, হারিয়েছে। আমার নয়, আমার সখীর। আপনি পেয়েছেন?

কী?

আমার সখীর বাম পদের নূপুর। কিশোরী আরো একটু জুড়ল : কাল

রাত্রির নৃত্যে নূপুর শিথিল হয়ে পড়েছিল, বাড়ি ফেরবার সময় পথে তাই স্খলিত হয়ে পড়েছে।

দেখুন তো এটা কিনা। কৃষ্ণদাস বুকের ভিতর থেকে নূপুর বার করে দেখাল।

কিশোরী হাত বাড়াল। আর, কিছু বলবার বা চাইবার আগেই নূপুর নিজের থেকে কিশোরীর হাতে গিয়ে পড়ল।

এ কি ইন্দ্রজাল নাকি? মরু-নীর না গন্ধর্বনগর? কিশোরীও যে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কৃষ্ণদাস মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

যখন জ্ঞান হল দেখল জীবগোস্বামীর কাছে সে শুয়ে আছে। জীব বললেন, তুমি মহাভাগ্যবান, তুমি রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার চরণনূপুর বুকে ধরেছ। দেখেছ তার প্রিয় সখী ললিতাকে। এই নূপুর পেয়ে শ্রীমতী তো বটেই তার প্রিয়দয়িত শ্যামসুন্দরও আনন্দিত হয়েছেন। আজ থেকে তোমার নাম হোক শ্যামানন্দ।

শ্যামানন্দ উঠে বসল।

আর দেখ, বললে জীবগোস্বামী, সেই নূপুর তুমি মাথায় ধরেছিলে বলে তোমার কপালে নূপুরাকৃতি তিলক ফুটে উঠেছে। আজ থেকে তোমার তিলকও নূপুরাকৃতি হোক। এ তিলকেরও নাম হোক শ্যামানন্দী তিলক।

হৃদয়চৈতন্যের কাছে খবর পৌঁছুল কৃষ্ণদাস জীবের কাছে নতুন দীক্ষা নিয়েছে ও নতুন তিলক ও নতুন নাম গ্রহণ করেছে। তারপর শ্যামানন্দ যখন কালনায় ফিরে এল তখন তার আগের তিলকের পরিবর্তে নতুন তিলক-অঙ্কন দেখে হৃদয়চৈতন্য দারুণ ক্রুদ্ধ হল ও শ্যামানন্দকে পরিত্যাগ করল।

তোমার তিলকের যে আকার নির্দেশ করে দিয়েছিলাম তা মুছে ফেলে দেখি নতুন তিলক পরেছ। এ অবমাননা অসহ্য। হৃদয়চৈতন্য বললে, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করলাম, তুমি আশ্রম ত্যাগ করে এ মুহূর্তে চলে যাও।

অশ্রুপ্লুত চোখে নীরবে তাকাল শ্যামানন্দ।

একটু বুঝি মায়া হল হৃদয়চৈতন্যের। বললে, তবে যদি ঐ তিলক ধুয়ে মুছে আগের তিলক ধারণ করো আদেশ ফিরিয়ে নিতে পারি।

কিন্তু নূপুরতিলক শ্যামানন্দ কী করে মুছে ফেলবে? সে যে তার ললাটে

স্পর্শমাত্রই আপনা থেকে ফুটে উঠেছে।

আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেল শ্যামানন্দ। গঙ্গাতীরে অনাহারে পড়ে রইল।

আশ্রমের বিগ্রহ স্থির থাকতে পারল না। সে হৃদয়চৈতন্যকে স্বপ্নে দেখা দিল। বললে, এ তুমি করেছ কী, আমার আনন্দকে তুমি নির্বাসিত করলে? তার কপালে যে আমারই নূপুরচিহ্ন। আমার নূপুরই তো রাধিকার পায়ে।

সমস্ত ঘটনা স্বপ্নে উদ্ঘাটিত হল।

হৃদয়চৈতন্য তার ভুল বুঝল। ভুল বুঝে তার সংশোধন করতে এক মুহূর্ত দেরি করল না। গঙ্গাতীরে ছুটে গেল। কোলে তুলে নিল শ্যামানন্দকে।

জিজ্ঞেস করল, তোমার গুরু কে?

আমার শ্রীগুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু।

আর সংশয় রইল না। গুরুশিষ্যে মিলন হয়ে গেল।

বৃন্দাবনেই ঠাকুর নরোত্তম ও আচার্য শ্রীনিবাসের সঙ্গে শ্যামানন্দের বন্ধুত্ব হয়েছিল। এরা তিনজনই বীরচন্দ্রের আনুগত্যে বাংলা-উড়িষ্যায় বৈষ্ণবতার জয়পতাকা প্রোথিত করল। বইয়ে দিল প্রেমভক্তির বিপুল বন্যা।

বিষ্ণুপুরে গ্রন্থাপহরণের পর শ্রীনিবাস শ্যামানন্দকে খেতুরিতে পাঠিয়ে দিলেন। খেতুরির মহোৎসবেও সে উপস্থিত ছিল। গ্রন্থপ্রাপ্তির খবর পৌঁছুলে শ্যামানন্দ কালনায় ফিরে এল। সেখান থেকে সে উড়িষ্যায় যাত্রা করল। সুবর্ণরেখার ধারে রয়নী-গ্রামের অধিপতি অচ্যুত, তার পুত্র রসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব নিল। ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীভক্তিই পরাকাষ্ঠা—এই প্রচার-মূল্যে পেয়ে গেল আরো অনেক শিষ্য, উঠল বিরাট শ্যামানন্দী পরিবার।

দামোদর যোগাভ্যাসী বৈদান্তিক। শ্যামানন্দ তাকে তর্কে পরাস্ত করল। পরাস্ত করে তার সমস্ত শূন্যতা ভক্তিরসে ভরে দিল। শ্যামানন্দের শিষ্য হয়ে দামোদর 'নিতাইচৈতন্য' বলে কাঁদতে লাগল।

ধারেন্দাতে সেরখাঁ নামে এক দুরন্ত পাঠানকেও উদ্ধার করল শ্যামানন্দ। তার শিষ্য রসিকানন্দও প্রেমভক্তি প্রচার করে বহু পাষণ্ডকে ভক্ত করে তুলল।

শ্যামানন্দে মেতে উঠল দিক-দেশ।

সমগ্র উৎকল ও বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় ধারেন্দা, নৃসিংহপুর, বলরামপুর, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি শ্যামানন্দ ও তার প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য

রসিকানন্দের প্রেমভক্তি প্রচারের কেন্দ্র হয়ে উঠল। খবর এল গুরুদেব হৃদয়চৈতন্য অপ্রকট হয়েছেন। এর অল্প পরেই রসিকানন্দকে শ্রীপাটের মহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করে ও তার হাতে শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের ভারার্পণ করে শ্যামানন্দ নিত্য লীলায় প্রবেশ করল।

শেষ

এই গ্রন্থ লিখতে প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছি: শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মূল গ্রন্থ ও শ্রীরাধাগোবিন্দনাথকৃত তার টীকা, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীশ্রীব্রজধাম ও শ্রীগোস্বামিগণ, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত অমিয়-নিমাইচরিত, দ্বিজপদ গোস্বামী-রচিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, রামকিঙ্কর দাস সংকলিত ঠাকুর হরিদাস, মুরারিলাল অধিকারী প্রণীত বৈষ্ণবদিগদর্শনী, ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান ও ডক্টর রবীন্দ্রনাথ মাইতি-রচিত চৈতন্য-পরিকর।